প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারী ১৯৮০

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅজিতকুমার জানা
অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (দোতলা)
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণ ঃ
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২, নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৭০০০০৯

গ্রন্থন ঃ
দীননাথ বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস্‌
৮০, বৈঠকখানা রোড,
কলকাতা-৭০০০০৯

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস (২য় সংস্করণ)
বাংলা সাহিত্যে বঙ্গেতর ভারত
টডের রাজস্থান ও বাংলা সাহিত্য
বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্র (২য় সংস্করণ)
লোক উৎসব ও লোক দেবতা প্রসঙ্গ
লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার (২য় সংস্করণ)
লোক সংস্কৃতি ঃ নানা প্রসঙ্গ
সাহিত্য সমীক্ষা
নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ
প্রগল্প (২য় সংস্করণ)
চৈতন্য পরিক্রমা (সম্পাদিত)
দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ (সম্পাদিত)

সূচী

ভূমিকা

মূলতঃ একশত বৎসরের প্রাচীন প্রায় দেড় শত বাংলা গ্রন্থের পরিচিতি জ্ঞাপক আলোচনা হল বর্তমান গ্রন্থটি। আলোচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে কাব্য, নাটক, প্রহসন, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, জীবনী ও অনুবাদ। আলোচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সিংহভাগ অধিকার করেছে নাটক ও প্রহসন। তারপরেই সংখ্যার বিচারে যথাক্রমে কাব্য ও উপন্যাসের স্থান। আলোচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে যেমন শতাধিক বৎসরের প্রাচীন, তেমনি কিছু গ্রন্থ আবার অপেক্ষাকৃত ভাবে অর্বাচীন কালে রচিত। আলোচিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই এ পর্যন্ত অনালোচিত। যে গ্রন্থগুলি পূর্বে আলোচিত হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই সমালোচকদের অকৃপণ সমালোচনায় সমৃদ্ধ নয়।

বর্তমান গ্রন্থটি রচনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণা সারস্বত সাধনার কিংবদন্তী পুরুষ আচার্য সুকুমার সেন। তাঁর অবিস্মরণীয় 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডটি বর্তমান গ্রন্থটি রচনার পরোক্ষ প্রেরণা, অপরপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রেরণাও আচার্য সেন স্বয়ং। এমন একটি গ্রন্থ রচনার জন্য তিনিই বর্তমান লেখককে উৎসাহিত করেছেন এমন কি হরিণাভি ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত একটি পুস্তিকার সম্ভাব্য রচয়িতা হিসাবে যে শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম উল্লিখিত হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত আচার্য সেনের প্রভাব সঞ্জাত।

বর্তমান গ্রন্থটি রচনার ব্যাপারে নানা জনের কাছ থেকে নানাভাবে সহায়তা পেয়েছি। কেউ সন্ধান দিয়েছেন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের, কেউবা কৌতূহল প্রকাশ করে উৎসাহিত করেছেন। আবার কেউবা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে বর্তমান লেখককে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

আলোচিত গ্রন্থগুলির বেশ কিছুই সাহিত্য গুণ মন্ডিত নয়। তাই হয়ত সেগুলি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়নি। আবার কিছু গ্রন্থ সাহিত্য গুণ সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও সমালোচক কিংবা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে থাকবে। বলাবাহুল্য সাহিত্যের ইতিহাসে সব ধরণের গ্রন্থেরই স্থান লাভের অধিকার। সাহিত্যানুরাগীদের বাংলা সাহিত্য-সমুদ্রের পরিচয় গ্রহণে সহায়তাকল্পে রথী মহারথীদের দ্বারা রচিত হয়েছে যে সেতু, বর্তমান গ্রন্থে লেখক তাতে কাঠবিড়ালীর ভূমিকা পালন করে থাকলেই নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করবেন।

মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও জাতীয় গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থবিভাগের কর্মী-বন্ধুদের কাছে বর্তমান লেখক কৃতজ্ঞ।

এমনতর একটি গ্রন্থ প্রকাশের দুঃসাহস দেখানোয় অপর্ণা বুক

ডিস্ট্রিবিউটার্সের কর্ণধার শ্রীমান্ অজিত জানাকে জানাই অভিনন্দন। শ্রমসাধ্য শব্দসূচী প্রণয়নের জন্য কৃতী ছাত্র শ্রীমান্ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. কে জানাই স্নেহাশীর্বাদ।

বাংলা বিভাগ
নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ।

বরুণকুমার চক্রবর্তী

কল্পনা কুসুম

উর্ব্বশী-নাটক প্রভৃতির রচয়িত্রী

শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক

বিরচিত।

কলিকাতা।

জি. পি. বসু এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট ৩০৯ সংখ্যক

ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৬৮, বৈশাখ।

নির্ঝরিণী

শ্রীমতী মৃণালিনী-প্রণীত।

১ নং হ্যারিংটন্ ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীযুক্ত তারাগতি ভট্টাচার্য্য দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,

শ্রীতারিণীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

অবসর

শ্রীবরদাচরণ মিত্র

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা।

১৩০২।

অথ

দশাননবধমহাকাব্য।

সর্ব্বদেবময়ং পূতং সর্ব্বতীর্থাদিসংযুতং
ব্রহ্মণঃসম্ভসম্ভূতং নমামি বিপ্রসত্তমম।

সিতশতদলকান্তি ত্রাপিসংহারকর্ত্রি
ত্রিভুবনসুখদাত্রি জ্ঞানসম্পদ্বিধাত্রি,
চরণকমলভৃঙ্গং পশ্য মাং পাহিধাত্রি
বিদমদমনগতৈ গ্রন্থসম্পূর্ণতায়ৈ।

প্রথমসর্গ।

গীতিচ্ছন্দঃ।

চমকি বিশ্ব নববীর্য্য-সূর্য্য-নৃপ রজনি-রাজ্য অবসানে,
উদিত উদয়গিরি-কনক-মঞ্চ'পরি গজি সপ্তমণিবর্ণে।
দীপ্তরশ্মিচয় সৈন্যনিচয়সম, (বিষমযুগায়ি বিনিন্দে)
ভস্মিল হতকর-পতিত-রজনিকর-যোদ্ধৃনিকর-উডুবৃন্দে।
ঝলমলরবিকরপুঞ্জ রঞ্জি ভব মঞ্জুলকিরণতরঙ্গে,
ধ্বজকুলসদৃশ সমুজ্জ্বলি সজ্জিত সুরপুর-শৃঙ্গ-বরাঙ্গে।

১ মঞ্চ উচ্চাসন। ২ মঞ্জু মনোহর। ৪ উডু নক্ষত্র। ৬ মঞ্জুল সুন্দর।

সতী বিলাপ।

WOOPAKHANA MOONJAREE

TRANSLATED FROM THE DOCAMERON
OF BOCCACIO
BY
KALLYPUDO MOOKERJEE

উপাখ্যান মঞ্জরি।

শ্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
ইংরাজি হইতে সঙ্কলিত

CALCUTTA
PRINTED BY
BABU BHUVANA CHANDRA VASAKA
At the Sangbáda Jnánaratnakara Press.
No 6 Nimtollah Ghaut Street.
1870.

পরামুক্তি

বা

রাধিকার গোলোক-মিলন।

শ্রীবেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

([illegible] সম্প্রদায়ে অভিনীত।)

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, "সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে"
শ্রী[illegible] চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১১ সাল।

মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

VIRTUE'S MYSTERIOUS WAYS

AN ORIGINAL BENGALLEE DRAMA

BY

ALGHORNAUTH CH[illegible]

[illegible]

ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি

নাটক।

জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী ইছাপুর নিবাসী

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক মুদ্রিত
[illegible]

মানস-মিলন।

(পৌরাণিক নাটক)



ধনকৃষ্ণ সেন প্রণীত।

কলিকাতা,

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ভবানী-ঠাকুর।

মানবচরিত্রের অপূর্ব্ব ইতিহাস।

কলিকাতা।

Mary Carpenter Series

SURUCHIR KUTIR

সুরুচির-কুটীর।

প্রথম ভাগ।

CALCUTTA

ROY PRESS DEPOSITORY

জীবন-প্রদীপ

(উপন্যাস)

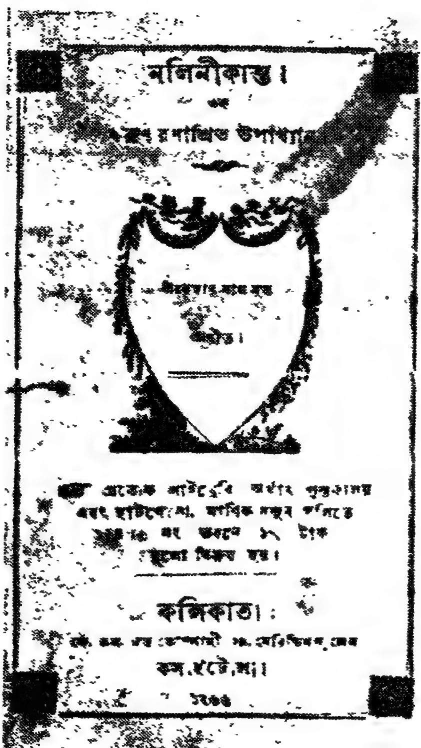
শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

"There is in man a higher than Love of happiness he can do without happiness instead thereof find blessedness."
Thomas Carlyle

"And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety"
Wordsworth

কলিকাতা,

১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে,
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও ১০৮, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন।

ধর্ম্ম বিষয়ক।



হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ হইতে

প্রকাশিত।

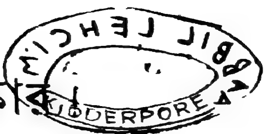


Calcutta:

G P Roy & Co Printers

1869.

বিবাহসংস্কার।

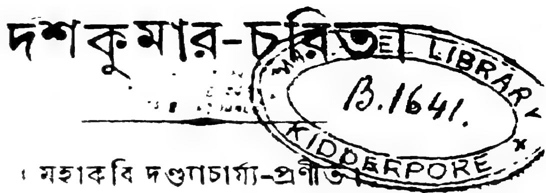


(সামাজিক প্রবন্ধ)

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত।

কলিকাতা,

দশকুমার-চরিত।



। মহাকবি দণ্ডাচার্য্য-প্রণীত।

অনুবাদ।

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত।

কলিকাতা,

বঙ্গবাসী ষ্টীম্ মেসিন-প্রেস হইতে

শ্রী ... রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাঃ মাঃ ... এক আনা।

প্রথম অধ্যায়

মূলতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যে রচিত কিছু কাব্যগ্রন্থের আলোচনা দিয়েই শুরু হ'ল গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ। আলোচিত কাব্যগ্রন্থগুলির অধিকাংশই প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনুল্লিখিত রয়েছে। মুষ্টিমেয় যে ক'টি গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রেও গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইতিহাসকারগণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন অথবা সংক্ষিপ্ততম মন্তব্যেই তাঁদের বক্তব্য শেষ হয়েছে।

একথা ঠিকই যে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মত কাব্য শাখারও উল্লেখযোগ্য বিস্তৃতি ঘটেছিল। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বহু প্রতিভাবান কবির আত্মপ্রকাশ এই সময়ের বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আবার সেইসঙ্গে প্রতিভাহীন কিংবা সীমিত শক্তির অধিকারী অথচ কবিযশঃপ্রার্থী অনেকেই নিজেদের রচনাকে মুদ্রিতাবস্থায় দেখতে অথবা গ্রন্থবদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। আমাদের আলোচিত কবিরা কিন্তু সকলেই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। এঁদের অনেকেই ছিলেন যথার্থ কবিপ্রতিভার অধিকারী। কিন্তু নানা কারণেই এঁদের দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিতি। এঁদের কবিকৃতি আস্বাদনের জন্য ত বটেই, সেইসঙ্গে সাহিত্যের ইতিহাসে এইসব উপেক্ষিত কিংবা অনালোচিত কবিদের আলোচনা ঐতিহাসিক কারণেই যে প্রয়োজন, এই অনস্বীকার্য সত্যের কথা মনে রেখেই স্মৃতির অন্তরালে নিমজ্জিতদের সৃষ্টি সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থাদির মধ্যে প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন (১৮৩৯) শাক্ত পদের সংকলন ('পরমার্থসঙ্গীতসার') যেমন আছে, তেমনি আছে 'পরিব্রাজকের সঙ্গীতে'র মত বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী কাব্যগ্রন্থ, যার বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচ্য কাব্যগুলির মধ্যে অধিকাংশই যদিও গীতি কবিতার সংকলন, তাই বলে মহাকাব্য এবং আখ্যানকাব্যও আলোচনা থেকে বাদ যায়নি। এইসব কবিদের বিচিত্র ক্ষমতার সঙ্গে বিচিত্রতর অভিপ্রায়ের সঙ্গেও পরিচিত হবার সুযোগ মেলে তাঁদের কাব্যগুলি থেকে। কোন কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন বেদান্তের তত্ত্বকে পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে, আবার কারও উদ্দেশ্য ছিল সমসাময়িক অশুভ সামাজিক প্রথাগুলিকে নির্মম ভাবে আলোচনা করে সেগুলিকে সমাজজীবন থেকে নির্বাসিত করা। সমাজ সংস্কারের মহতী উদ্দেশ্য নিয়েই অধিকাংশ কবিকে অবশ্য কাব্য রচনায় ব্রতী হতে দেখা গেছে। বিধবাদের প্রতি সমাজের অযৌক্তিক

নির্মমতা, বহুবিবাহের কুফল, অল্প বয়সী কন্যার বিবাহ, পণপ্রথার অযৌক্তিকতা, মদ্যপানে সমাজের ক্ষতি, পূজা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত অকারণ আড়ম্বরানুষ্ঠানে অকাতরে অর্থ ব্যয় এ সবই কবিতাগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবার নিছক ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের জন্যও কোনো কোনো কবিকে কাব্যচর্চায় ব্রতী হতে দেখা গেছে। পতিবিরহে কাতরা অথবা ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতিচারণার সূত্রে রচিত এঁদের কবিতাগুলি পাঠকচিত্তকে সহজেই নাড়া দেয়। বেশ কিছু কবিতাতেই কবিদের একদিকে যেমন ইংরেজ-বিরোধিতা, ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণে সুগভীর বেদনাবোধ প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি অনেক কবিকে আবার ইংরেজদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখা গেছে। কোনো কোনো কবিকে ভূগোল বা বিজ্ঞানকেও কাব্যের বিষয় করতে দেখা গেছে।

আলোচ্য কাব্যের কবিরা অধিকাংশই পয়ার, ত্রিপদীকেই তাঁদের ভাব-প্রকাশের বাহন করলেও, কেউ কেউ মধুসূদনের প্রভাবে শুধু মহাকাব্য রচনাতেই ব্রতী হন নি, সেইসঙ্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারেও এঁদের প্রয়াসী হতে দেখা গেছে। বাংলা কাব্যসাহিত্যে মধুসূদনের প্রভাবের গভীরতা আমাদের মুগ্ধ করে।

মোটের ওপর আলোচিত কাব্যগুলি থেকে আমরা যেমন সমসাময়িক সমাজজীবনের নানা উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাই, তেমনি এইসব কাব্যের স্রষ্টাদের বিচিত্র মানসিকতার সার্থক পরিচিতি লাভ করি। আলোচ্য কাব্যের কবিরা কম-বেশি সকলেই শিক্ষিত ছিলেন, বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এঁদের সামাজিক দায় সম্পর্কে সচেতনতা, উদার মানসিকতা বিশেষতঃ মানবিকতা বোধ আমাদের এঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। এমন কি একাধিক মহিলা কবিকেও দেখা গেছে তাঁরা উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে যুক্তিশীলতার দ্বারা চালিত হয়ে কবিতা রচনা করেছেন। সংক্ষেপে, আধ্যাত্মিকতা কবিদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

'পরমার্থ সংগীতসার', রামপ্রসাদ, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, কমলাকান্ত বিশ্বাস, নীলমণি ঘোষ, মথুরামোহন বিশ্বাস, অম্বিকাচরণ, দীন মহেশ, রামনারায়ণ, নারায়ণ, শ্রীনাথ, নরচন্দ্র, ভোলা, দ্বিজ রামচন্দ্র প্রমুখদের শাক্তপদের সংকলন। সংকলক—রাজনারায়ণ সেন। সংকলনটির প্রকাশকাল ১২৪৬ সাল (১৮৩৯)। মোট ৪০১-টি শাক্ত-গীতের সংকলন এটি। সংকলক সংকলনের ভূমিকায় সংকলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন :

'বঙ্গভূমিস্থ শাক্ত ভক্তিপরায়ণ মহাশয়েরা বাদ্য ও রসনাযন্ত্রে জগদম্বার গুণোৎকীর্তন পূর্বক ধর্মালোচনার উপায়ার্থ সংগীত রচনা করিয়াছেন তাহা জগতস্থ অধম জীব তারণের বিশিষ্ট উপায় জন্য ধার্মিক ব্যক্তিদিগের তাহাই গায়নে শ্রবণে প্রচুর যত্ন আছে কিন্তু বহু দিবস গত হইল ঐ সকল গীত অনেক ভক্ত কর্তৃক রচিত হইয়াছে তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র না থাকন প্রযুক্ত গীত-

রচকেরা সেই সমুদয় মুদ্রাঙ্কন করাইয়া চিরঃ জীবিত রাখনের উপায় করিতে পারেন নাই—তথাচ গীত কর্তাদিগের লেখনী বিনির্গত পুস্তক ছিল এবং তাহার কতেক কতেক প্রতিলিপি জগদম্বার গুণামৃত পানানন্দে ইচ্ছুক কোন কোন ভক্তে প্রাপ্তে যত্নপূর্বক রাখিয়াছিলেন কিন্তু সেই সকল মনুষ্যগণের একালে কাল প্রাপ্তি হওয়াতে গীতচয় প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে তবে তন্মধ্যে অতি মনোহরা যাহা লোকেরা সদত আলোচনা করেন তাহা এক্ষণকার কিয়ত কিয়ত সাধু মনুষ্যগণের কণ্ঠস্থ আছে অপরন্তু নব্য ভক্তলোকেরা তদনেকাংশ জ্ঞাত নহেন অথচ তাহা প্রাপনার্থে অতি উৎসুক ও যত্নযুত অতএব এ অকিঞ্চনেরো লিপ্সা যে পূর্বোক্ত মহাশয়দিগের ইপ্সাপূর্ণ হয় তন্নিমিত্ত বহু দিবসাবধি যত্নপূর্বক নানা বন্ধুগণ নিকট হইতে পূর্বোক্ত গীত সকল সংগ্রহ করিয়া "পরমার্থ সংগীত সার" আখ্যা প্রদান পূর্বক এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম…।'

বোঝা যায় রাজনারায়ণের সংকলনটি প্রকাশের মূলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব সবিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্তকবি যে প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের লুপ্তপরিচয় ও রচনা প্রকাশ করতেন, তা থেকেই রাজনারায়ণের মনে সংকলনটি প্রকাশের পরিকল্পনা এসেছিল। যাইহোক রাজনারায়ণ যে ইতিহাস চেতনার পরিচয় দিয়েছেন, সেজন্য অবশ্যই তাঁকে সাধুবাদ জানাতে হয়। অবশ্য রাজনারায়ণ তাঁর সংকলনে কেবল প্রাচীন কবিদের রচনাকেই স্থান দেন নি, সেই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নবীনদের রচনাকেও স্থান দিয়েছিলেন।

সংকলনের অন্তর্ভুক্ত রামচন্দ্রের একটি পদে মনকে পশু, বিষয়কে বন, ষড়রিপুকে হিংস্র প্রাণী এবং পাপ ক সাপ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

আরে মন মম পশু সম ভ্রমি বিষয় বনে।
হিংসক লেগেছে পাছে কাম আদি ছয় জনে।
পাপ তাপ ভুজাঙ্গিনী দংশন করিলে ফণী,
কোথা বিষহর মণি, পাবে কার স্থানে।

মথুরামোহন বিশ্বাস রচিত একটি পদের অংশ বিশেষ উদ্ধার করা গেল—

তোর মনে কি এই ছিল মা ওগো হরসুন্দরি।
রাখিলে মম জ্ঞান চক্ষু অজ্ঞানে আবৃত করি।
মনে সাধ দিবানিশি, হেরিব ও পদশশি,
বসাইয়া হৃদকমল সিংহাসনোপরি। ১
ক্ষণে দেও দরশন ক্ষণে হও অদর্শন,
মা হয়ে ছেলের সঙ্গে খেলাও ভাল লুকোচুরি। ২
এলোকেশি দিগম্বরি, মুণ্ডধারি শিরোপরি
বারেক সুস্থিরা ভব, দেখি আমি নয়ন ভরি। ৩
বিশ্বাস মথুরা মোহন, কালীপদে যার মন,
তাকে আর বিড়ম্বন, ক্ষমা দেমা ক্ষেমঙ্করি। ৪

সংকলনে সংগীতগুলিকে বর্ণমালার ক্রম পরম্পরায় সাজান হয়েছে। তবে স্থানাভাবে পদগুলিকে যথাযথ ভাবে সাজানো সম্ভব হয়নি। কোনো কোনো পদের পদকর্তার নামও অনুল্লিখিত রয়েছে।

'অথ মনমথ মঞ্জরী' কাব্যটির রচনাকাল ১২৫৮ বঙ্গাব্দ, রচয়িতা শ্রীকন্ঠনাথ রায় বসু। কাব্যটির সংশোধন করেছেন কালীনাথ ন্যায়রত্ন।

কবি প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তাঁর পিতামহ ছিলেন পার্বতীচরণ রায়, এবং কবির পিতা হলেন বৈকুন্ঠনাথ রায়।

কাব্যারম্ভের পূর্বে কবি বিনয় প্রকাশ করে বলেছেন—

নির্গুণ অনাথ, না জানে স্তুতি দেবের।
রাখিয়ে তাহারে, গেল স্বর্গপুরে ক্রমে ক্রমে সকলেতে।
বিদ্যা বুদ্ধি হীন দয়ার অধীন ; ইচ্ছা কিছু প্রকাশিতে ॥

কাব্যটির কাহিনীটি বড় অভিনব। বলা হয়েছে একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর সভাকবি কালিদাসের কাছে জানতে চাইলেন—

একদিন কাব্য ছলে ; কালিদাসে জিজ্ঞাসিলে,
বল দেখি দেখেছো কোথায় ॥
লইয়ে যুবতী নারী, থাকে সদা ক্রোড়ে করি,
কিন্তু নাহি করে আলাপন।

কালিদাস জবাবে বললেন—

মিথিলা নগর ধাম ; যোগেন্দ্র ভূপতি নাম ;
মনমথ নামে পুত্র তার ॥
সর্বগুণে গুণাকর বর্ণনে হয় বিস্তর
সংক্ষেপে কহি যে দণ্ডধর
মুঞ্জরী নারীর নাম, বিরহেতে অবিরাম,
দগ্ধ হতো তাহার অন্তর।
তবু নাহি আলাপন রাজনন্দন,
সদত রহিত বিষাদীতে।
কেমনে নারীর পণ, কিরূপে কৈল পালন,
কহিবে এ সব সমুদয়।

অতঃপর শুরু হ'ল মূল কাহিনী। মিথিলারাজ যোগেন্দ্রের মনমথ নামে এক সন্তান ছিল। মনমথ ছিল বিদ্যানুরাগী, অস্ত্রচালনায় পারদর্শী, অতিথি বৎসল কিন্তু বিবাহে ছিল তার নিরাসক্তি। একদিন নারায়ণ ছদ্মবেশে এসে এ হেন মনমথের কাছে খেতে চাইলেন। পরিতোষ পূর্বক ভোজনে তৃপ্ত নারায়ণ বললেন—

তুমি যেমন শ্রীমান, দেখেছি তোমা সমান ;
যদি বিধি মিলায় দুজনে।

সুরাট নগরে ধাম, সুরেন্দ্রভূপতি নাম
তার কন্যা মঞ্জরী বাখানে

মনমথ চলল সুরাট নগরে। সেখানে মালিনীর সহায়তায় নারীর ছদ্মবেশে রাজকুমারীকে দেখে মুগ্ধ হল। রাজকুমারীও মনমথকে দেখে আকৃষ্ট হল। কিন্তু মঞ্জরীর পণ—

সুখ না পাবে সেজন ; করেছি কঠোর পণ
যদবধি না হবে পালন ॥

পণটা কি ?

আপনার ইচ্ছায় অঞ্চল পাতি ধরায়
তায় যদি শোয়াই পতিরে।
তবে ত তাহার সঙ্গে ; রব আমি রসরঙ্গে··· ।

রাজকুমার মনমথ মঞ্জরীর ভাই ক্রিটেশ্বরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। ক্রিটেশ্বর চাইল তার বোনের সঙ্গে মনমথের বিবাহ দিয়ে মনমথের সঙ্গে সম্পর্ককে চিরস্থায়ী করতে। দু'জনের বিবাহ হল। মনমথ মঞ্জরীকে নিয়ে চলে গেল মিথিলায়। মনমথ-মঞ্জরী একত্রে শয়ন করে, কিন্তু আলাপ করেনা পরস্পরে। মনমথ কেবল ভাবে মঞ্জরী কবে তার ওপর সদয় হবে।

এদিকে মঞ্জরী তার পূর্বের পণ বিস্মৃত। মিলনের জন্য সে ব্যাকুল। একদা সে তার পিতাকে পত্র লিখে জানাল বিবাহে সে সুখী নয়। সুরেন্দ্রপতি জানালেন মনমথকে হত্যা করে তিনি কন্যার আবার বিবাহ দিয়ে তার আশা পূরণ করবেন।

সুরেন্দ্রপতি মিথ্যা করে পুত্রের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ করলেন কন্যা-জামাইকে। এদিকে সৈন্যদের পাঠালেন পথিমধ্যে মনমথকে বিনাশ করার জন্য। মনমথ সৈন্যদের সকলকে হত্যা করে অচৈতন্য হয়ে পড়লে মঞ্জরী জল দিয়ে নিজের আঁচল পেতে মনমথকে শোয়াল। মনমথের জ্ঞান ফেরার পর উভয়ে কামক্রীড়ায় মত্ত হল। মঞ্জরী জানতে চাইল মনমথ কেন এতদিন রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়নি। মনমথ মঞ্জরীকে তার পণের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। মঞ্জরী তখন তার বাবাকে তার পত্রলেখা, নিমন্ত্রণের অছিলায় তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি সব কিছুই প্রকাশ করে দিল। মনমথের কাছে সে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

দুজনে ফিরে গেল মিথিলায়। মনমথের পিতার মৃত্যু হলে মনমথ পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হল। একদিকে রাজকার্য অন্যদিকে কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা চলতে লাগল। যথাসময়ে মঞ্জরীর পুত্র হল। পুত্রকে মানুষ করে, তার ওপর রাজ্যের ভার দিয়ে মনমথ মঞ্জরী স্বর্গারোহণ করল। কাহিনীটি অভিনব এবং উপভোগ্য। রতিক্রীড়ার পুঙখানুপুঙখ বর্ণনা কবি দিয়েছেন ফলে বর্ণনা বাস্তব হলেও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হয়েছে।

হাস্যরস সৃষ্টিতে কবি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মনমথকে বর বেশে দেখে নারীদের পতিনিন্দার উল্লেখ করতে হয়। মঙ্গলকাব্যের প্রভাব পুষ্ট এই পতিনিন্দা। একজন রমণী তার অধ্যাপক স্বামী সম্পর্কে বলেছে—

মম দুঃখ শুনিলে বিলাপে শিবা বনে
পতি হল অধ্যাপক স্বপাক আপনে।
...বাসে না হয়ে বাস প্রবাসে চিরকাল
মধ্যে মধ্যে এলে নাথ ঘটে মহাকাল
অমাবস্যা পূর্ণিমাদি তিথি ধরে কত।
কালে ভদ্দরে শয়ন হয় কদাচিৎ।
অশুচি বলি পান হরিতকী খান সুখে।
দুর্গন্ধে কার সাধ্য মুখ দেয় সেই মুখে॥
সহজে কহিলে কথা মন্দ কত্তে চায়।
একে রাগী অনুরাগী নস্য নাকে তায়।

আর এক রমণী তার জুয়াড়ী স্বামীর জন্য দুঃখ করেছে—

পতি মোর জো খেলে প্রধান জোয়ারি।
স্তোক দিয়ে টাকা লয় করিয়ে গোহারি।
জিনিতে নাহিক শুনি হারেন কিবল।
সব গেছে বাকি আছে আশ্রয় সম্বল।
দিনে রেতে কোন মতে দেখা নাহি হয়।
হারিলে আসেন ছুটে পেলে নাহি রয়॥

কবির বাস্তবরস পরিবেশনের প্রশংসা করতে হয়। ছন্দ ব্যবহারেও কবি যথেষ্ট নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে একাবলী, ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, পয়ার, দীর্ঘ চৌপদী, লঘু চতুষ্পদী, লঘু ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ।

'**শুকবিলাস**' কাব্যটির রচয়িতা নন্দকুমার কবিরত্ন। কবি জানিয়েছেন চুনীলাল দাসের আদেশে কাব্যটি রচিত হয়েছে। কাব্যটির প্রকাশকাল ১২৫৮। কাব্যে বর্ণিত হয়েছে রাজা বিক্রমাদিত্যের লীলা, বর্ণিত হয়েছে শুক সংবাদ।

পঞ্চদেবের বন্দনা গেয়ে কাব্যের সূত্রপাত। কাব্যটি রচিত হয়েছে বহুল প্রচলিত কাহিনীকে অবলম্বন করে।

একদা লক্ষ্মী ও শনির মধ্যে বিরোধ দেখা দিল—দুজনের মধ্যে বড় কে? বিচারের জন্য তাঁরা এলেন বিক্রমাদিত্যের কাছে। দুজনেই জানালেন নিজ নিজ ক্ষমতার কথা।

লক্ষ্মী কন ভূপতি বলিবে সাবধান।
শনি হতে আমি বড়—নহে অপ্রমাণ॥
শনি কন মহারাজা করহ বিচার।
আমি বড় লক্ষ্মী হৈতে জানিবেন সার॥

চিন্তিত বিক্রমাদিত্য মীমাংসার ব্যাপারে কালিদাসের পরামর্শ যাচঞা করলেন। কালিদাস পরামর্শ দিয়ে বললেন—

এই যুক্তি কর রায়, মুখে নাহি কইও কায়, ছোট বড় করিয়া নির্ণয়। উচ্চ

নীচ সিংহাসন গৃহে করহ স্থাপন, আইলে দিও বসিতে নিশ্চয়। বসিবার অনুসারে, কহিবেন দুজনারে, ছোট বড় করিয়া বিচার। উচিত কহিতে ভয়, না করিহ মহাশয় ভাল মন্দ সুকৃতি সঞ্চার ।।

সেইমত দুটি সিংহাসন স্থাপিত হলে প্রথমে শনি এসে অপেক্ষাকৃত ছোট সিংহাসনে বসলেন, আর লক্ষ্মী বসলেন উচ্চ সিংহাসনে। শনি যখন সিদ্ধান্ত জানতে চাইলেন তখন বিক্রমাদিত্য বললেন—

ভূপতি কহেন তায়, ছোট বড় দুজনায়, করিবার সাধ্য কি আমার।
আপনারা আপনার, করেছেন সুবিচার ছোট বড় বসিয়া আসনে।

বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধান্তে স্বভাবতঃই লক্ষ্মীদেবী সন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেন শনি, শনি বিক্রমাদিত্যের অনিষ্ট করার প্রতীক্ষায় রইলেন। পুণ্যবান বিক্রমাদিত্যের দেহে প্রবেশের কোন সুযোগই শনি পান না। শেষপর্যন্ত সুযোগ মিলল। কিরূপে ?

(বিক্রমাদিত্য) ভোজনান্তে করিলেন চরণ ক্ষালন।
সর্বত্র ধুইলা পায় নৃপ শিরোমণি।
গোড়ালি রহিল বাদ দেখিলেন শনি ।।
বিবেচনা করিলেন এই ত সময়।
পাপ হৈল ভূপতির প্রবেশিতে হয় ।।
ধর্মসাক্ষী করি শনি করিল প্রবেশ।
ভূপতি নাহিক জানে এতেক বিশেষ ।।

শনির কারণে বিক্রমাদিত্যের কুবুদ্ধি ঘটল। আত্মীয়দের সঙ্গে তিনি বিবাদে লিপ্ত হলেন। বন্ধুরা সব বিরুদ্ধবাদী হয়ে উঠল। রাজা ইষ্টের কথাও শোনেন না। নবরত্নের সঙ্গেও শাস্ত্রালাপ করেন না। সর্বদাই তাঁর চিত্ত চাঞ্চল্য। অকারণ মনস্তাপের শিকার হলেন তিনি। রাজকার্যেও তাঁর মন রইল না। পাশাখেলায় তাঁর সমস্ত ধনরত্ন গেল। রাজ্য হল লণ্ডভণ্ড। রাণী বিরলে বসে চোখের জল ফেলেন।

বিরলে বসিয়া রাণী নিরবধি কান্দে।
কজ্জল গলিত মুখে মৃগ যেন চান্দে ।।

বিক্রমাদিত্য শেষ পর্যন্ত রাজ্য হারা হলেন, বনে গমন করলেন তিনি। শনির চক্রান্তে রাজার উদর বৃদ্ধি পেল, হাত-পা স্ফীত হল, চলচ্ছক্তি রহিত হলেন তিনি। শনির কারণে রাজা নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হলেন। জলে ভেসে ভেসে উপনীত হলেন মহারাষ্ট্রে।

মহারাষ্ট্রের রাজকন্যা প্রতিদিন শিবপূজা করেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে রাজকন্যাকে দেখা দিয়ে মহারাষ্ট্রে বিক্রমাদিত্যের উপস্থিতির কথা জানালেন। রাজকন্যা বিক্রমাদিত্যকে গন্ধর্বমতে বিবাহ করলেন। এর পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত স্বয়ম্বর সভাতেও রাজকন্যা বিক্রমাদিত্যকেই বরমাল্য অর্পণ করলেন। স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজারা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে রাজকন্যা বরণ করায় নিন্দা করতে লাগলেন—

কিবা জাতি কোথা ঘর নাহি পরিচয়
রাজকন্যা হইয়া কেমনে রুচি হয়।
অদ্যাবধি আমাদের তোমার ভবন।
আগমন অধিষ্ঠান হইল বারণ॥
অন্নজল গ্রহণ করিবে কোন জন।
তনয়া জামাই লয়ে থাকহে রাজন॥

কন্যার পিতা এবং ভ্রাতারাও রাজকন্যাকে ভর্ৎসনা করলেন। রাজকন্যাকে নিয়ে বিক্রমাদিত্য বনবাসী হলেন।

একদা মাংস ভক্ষণে বিক্রমাদিত্যের প্রলোভন হল। রাজকন্যা রাজগৃহে উপস্থিত হয়ে মাতার কাছ থেকে কিছু রান্না করা মাংস সংগ্রহ করে আনার সময় ভ্রাতৃজায়াদের কাছে অপমানিত হলেন।

ব্যঙ্গমা পক্ষীর ছদ্মবেশে লক্ষ্মী বিক্রমাদিত্যকে শনির আক্রোশ থেকে মুক্ত হবার ঔষধের সন্ধান দিলেন। সেইমত ঔষধ সেবনে বিক্রমাদিত্য শনি-মুক্ত হলেন। বেতালকে আহ্বান করে তিনি মহারাষ্ট্রে মায়ায় পুরী নির্মাণের আদেশ দিলেন। রাজপুত্রদের অহঙ্কার বিনাশ করে তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করলেন। তৎপূর্বে মহারাষ্ট্র-অধিপতি বিক্রমাদিত্যের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি অন্যায় আচরণ করার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে নিলেন।

এইবার শুক-সারীর প্রসঙ্গ। শুক সারিকে জানাল—

বড়রাজা বটে কিন্তু একদোষ আছে।
মন্ত্রণা যে দেয় হেন মন্ত্রী নাই কাছে॥
সারি কহে নবরত্ন আছে ত পণ্ডিত।
শুক বলে তারা কি জানিবে রাজনীত॥

শুক ইচ্ছা প্রকাশ করল বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রণাদাতা হতে। সারি যখন শুককে মন্ত্রী হতে বলল, তখন কিন্তু শুক পরিহাস করে বলল—

নৃপসঙ্গে যাব আমি, একাকিনী রবে তুমি,
বুঝ কেহ হইয়াছে আর॥
আমি যাব দেশান্তর, মজা হবে নিরন্তর,
থাক্তে আমি ভাল নাহি হয়।
বুঝি এই অভিপ্রায়, নহিলে কেন আমায়
যাও যাও কহ অসময়।

সারি শুকের কথায় দুঃখিত হয়ে বলল—

আমি নাম ধরি সারি, না হই সামান্যা নারী
পরপতি না হেরি কখন।
আপনার পতি যেই, পরাৎপর গুরু সেই,
সেই ভালবাসা ভাল জানি॥
সে যদি এমন কয়, প্রাণ ত্যাজিব নিশ্চয়
বলিয়া হইল অভিমানী।

যাইহোক, শুক বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে রাজসভায় উপনীত হল। শুকের সৎ পরামর্শে রাজার আর কোন দুঃখ রইল না।

একদিন রাজসভায় এক রাক্ষসী এসে বিক্রমাদিত্যকে বললে তার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে না পারলে সে রাজসভার সকলকেই ভক্ষণ করবে। সে জানাল তৃষ্ণার্ত এক হরিণ এবং এক হরিণী এমন এক স্থানে এসে উপনীত হল যেখানে পানীয় জল নেই। শেষে তারা জলের সন্ধান পেল, কিন্তু তা দুজনের পানের উপযোগী নয়—

একস্থানে দেখে জল আছয়ে কিঞ্চিৎ।
প্রাণরক্ষা হয় পান কৈলে একজন।
দ্বিতীয় জনের তাহে না রহে জীবন।
বিভাগ করিয়া খাইলে দুজনে সে জলে।
কার তৃষ্ণা নিবারণ না হয় সফল।
তথাপি পুলকচিত্ত হৈল দুজনার।

হরিণ হরিণীকে জলপানের পরামর্শ দিল, কেননা, গর্ভবতী হরিণী তাহলে ভাবী শাবক সহ রক্ষা পাবে। কিন্তু হরিণী এতে নারাজ, সে হরিণকেই জল পান করতে বলল, কারণ হরিণীর মতে তার মৃত্যুতে কোনো ক্ষতি নেই, হরিণের মৃত্যুতেই ক্ষতি। নারী খায় পুরুষের ভাগ্যে। পুরুষের কল্যাণেই নারীর কল্যাণ। নারী মারা গেলে পুরুষ পুনরায় বিবাহ করে সব কিছুর অধিকারী হতে পারে, এমনকি সন্তানও লাভ করতে পারে। কেউই কিন্তু শেষ পর্যন্ত জল পান করল না। তৃষ্ণায় উভয়েরই মৃত্যু হল। এখন রাক্ষসীর প্রশ্ন—দুজনের মধ্যে কার প্রেম বেশি ?

বিক্রমাদিত্য জানালেন, তাঁর বিচারে হরিণের প্রেমই অধিকতর। কেননা,

প্রকৃতি হইয়া কষ্ট সহে যথোচিত।

রাক্ষসী এই উত্তরে সন্তুষ্ট হল না। তখন—

শুক বললে শুনিতে পিরীত বড় বটে।
মায়াতে মরিল সে পিরীতি নাহি ঘটে।
পিরীতি হইলে ঠিক বিচ্ছেদ না হয়।
মরিলে বিচ্ছেদ ঘটে পিরীতি না রয়।
দেশান্তরে কোন দেশে কেবা জন্ম লবে।
কেবা কোন জাতি হবে কোথায় মিলিবে।
মরিল ফুরায়ে গেল পিরীতের আশা।
পূর্বাপর সবে জানে মহতের ভাষা।
একজন জল খাইলে বাঁচিত দুজন।
তবে ত পিরীতি বলি যথার্থ মিলন।

রাক্ষসী সন্তুষ্ট হয়ে বিদায় নিল। এমনিতর নানা আখ্যানে কাব্যটি পূর্ণ। আখ্যানগুলির মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ মানসিকতা পরিস্ফুট। সারির বক্তব্যে আমরা দীর্ঘকাল পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর যে মানসিকতা হওয়া

সম্ভব তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করি। কিংবা শুক কর্তৃক বর্ণিত গুরুভক্তি বিলাসে রাজগুরুর দাসীকে সম্ভোগের যে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, আসলে তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত লাম্পট্যেরই তা প্রকাশ। এছাড়াও কমলিনী উপাখ্যান ইত্যাদির সংযোজনে কাব্যটি উপভোগ্য হয়েছে। কাব্যটি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। ক্ষেত্রবিশেষে কবি অলংকার প্রয়োগে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কাব্যে কবির আত্মপরিচয় অনুপস্থিত। কবি বিভিন্ন আখ্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন উপদেশাবলী প্রচার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে **'ছন্দাবলী'** নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বিষয়ে নাম পত্রে উল্লিখিত হয়েছে 'নানাবিধ ছন্দ সংগৃহীত কবিতা' বলে। গ্রন্থে শিব বিবাহের মন্ত্রণা, শিব বিবাহের সম্বন্ধ, শিবের ধ্যান ভঙ্গে কামভস্ম, রতি বিলাপ, রতির প্রতি দৈববাণী, হরগৌরীর কথোপকথন, রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন, বিদ্যার রূপ বর্ণন, ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ক গীত ইত্যাদি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ কবিদের রচনা থেকে পয়ার, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের নিদর্শন স্বরূপ সংকলিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি একটি সংকলন গ্রন্থ যদিও সংকলকের নাম অনুল্লিখিত রয়েছে। পাঠকের সঙ্গে বিভিন্ন বাংলা ছন্দের পরিচয় ঘটাতেই বর্তমান গ্রন্থটি পরিকল্পিত হয়েছে।

হালিশহর, কুমারহট্ট নিবাসী দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত **'বিবিধদর্শন'** কাব্যটির প্রকাশকাল ১২৭২ বঙ্গাব্দ।

'বিবিধদর্শন কাব্য'টি মোট ৬টি সর্গে সমাপ্ত। কবি প্রতিটি সর্গের পৃথক পৃথক নামকরণ করেছেন। প্রথম সর্গটির নাম 'বিবেকোদয়', দ্বিতীয় সর্গটির নাম 'স্বভাব দর্শন', তৃতীয় সর্গটির নাম 'কাশী দর্শন', চতুর্থ সর্গটির নাম 'বিন্ধ্যাচল দর্শন', পঞ্চম সর্গটির নাম 'প্রয়াগ দর্শন' এবং ষষ্ঠ সর্গটির নাম 'জ্ঞানোদয়'।

কবির উদার মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে কাব্যে। আধ্যাত্মিকতায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ হওয়া সত্ত্বেও কবি সংসার-বিবাগী নন। তবে সংসারের মায়ায় ঈশ্বর বিস্মৃতিকে কবি সমর্থন করেন নি। মানুষে মানুষে অর্থহীন ভেদাভেদ জ্ঞানের বিরুদ্ধে কবিকে সোচ্চার হতে দেখা গেছে। আবার অন্ধ অনুচিকীর্ষার মনোভাবকেও কবি সমালোচনা করেছেন তীব্রভাবে।

সব মানুষই ভগবানের সন্তান, অতএব কাউকেই ঘৃণা করা উচিত নয়। কবির ভাষায়—

জনকের অধিকার, পেয়েছে সমান।
তবু সবে দ্বন্দ্ব করে, হইয়া অজ্ঞান ॥
কেহ কহে সর সর, ম্লেচ্ছের সন্তান।
"হিঁদেন" বলিয়া কেহ, করে হেয় জ্ঞান ॥

কেহ বলে কাট ওরে, কাফর কুমার।
প্রতিযোগী বলে দূর, দূর দূরাচার ॥
এইরূপে পরস্পর, বিরোধী সবাই।
বিভুর সন্তান সবে, সুবাদেতে ভাই ॥ (১ম সর্গ)

বিলিতিয়ানার অন্ধ অনুসরণে কবির ব্যঙ্গোক্তি—

সকলেই ঠিক যেন, "বিলিতি" হয়েছে।
সুমধুর মাতৃভাষা, অবজ্ঞা করেছে ॥
"সাহেবেনা" চলিতেছে, কথায় কথায়।
হয়েছে সুসভ্য সবে, আর কেবা পায় ॥
চারিদিকে পরিপূর্ণ, চেয়ার ও শেজ।
ঝুলিতেছে টানা পাখা, জ্বলিতেছে সেজ ॥ (১ম সর্গ)

বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদেরও এক হাত নিয়েছেন কবি—

শিখিয়াছে কবিতার, দুই এক পদ।
অন্বয় করিতে হলে, বিষম বিপদ ॥
মদ ভরে তবু ভূমে, নাহি ফেলে পদ।
মাতিয়া বেড়ায় যেন, উন্মত্ত দ্বিরদ ॥
কপালেতে "আর্কফলা" কিবা শোভা পায়।
কেহ যেন দাগা করে, দিয়েছে বিদায় ॥
পরমেশ উপাসনা, আসলেতে ফাঁক।
শিষ্যগণে ঠকাইতে, আহ্নিকের জাঁক ॥ (২য় সর্গ)

মনে রাখতে হবে যে কবি স্বয়ং ছিলেন ব্রাহ্মণ, তবু ব্রাহ্মণের কপটতাকে তিনি ক্ষমা করেননি।

'কাশীদর্শন' নামক তৃতীয় সর্গে কবি তাঁর কাশী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার সিংহভাগ অধিকার করেছে কাশীবাসীদের নৈতিক অধঃপতনের বিবরণ। বালককে কুমারী সাজিয়ে অর্থোপার্জনের শঠতা কি ভাবে ব্যর্থ হয়েছে তার বিবরণটি উপভোগ্য হয়েছে।

চতুর্থ সর্গে কবি তাঁর 'বিন্ধ্যাচল' পর্যটনের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিন্ধ্যাচলের বিবরণ দানের তুলনায় কবির আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই সিংহভাগ অধিকার করেছে।

পঞ্চম সর্গে কবি তাঁর প্রয়াগ দর্শনের কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কৌশলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন কবি—

নিগড় সদৃশ তারে বাঁধিলি তড়িৎ।
বার্তাবহ হয়ে বার্তা, দেয় সে ত্বরিত ॥
সখ্য ভাব ধরাইলি, অনল ও জলে।
তাহে যান চালাইলি, জলে আর স্থলে ॥

এই একই সর্গে ত্রিবেণীর মেলায় উপস্থিত সাধুদের বিবরণ বেশ উপভোগ্য—

কোথা হেরি, যোগীবর ধর্ম-কাচ-ধারী।
শ্মশান নিবাসী, যথা, মহেশ ভিখারী ॥
ঘোর শীত, তবু বাস, নাহি ধরে অঙ্গে।
বিভূতি, মনের সাধে, মাখিয়াছে রঙ্গে ॥
এ বেশেতে, পাইলাম, বেশ পরিচয়।
সাধু নয়, সাধু নয়, সাধু কভু নয় ॥
শীত-ভীত নহি, ইহা আভাসে জানায়।
সাধু নাম ধরে হায়! শুনে হাসি পায় ॥ (৫ম সর্গ)

৬ষ্ঠ সর্গে সংসার ত্যাগের অযৌক্তিকতা বিবৃত হয়েছে। কবির যুক্তিশীল মনের পরিচয় কাব্যের আদ্যন্ত লভ্য, আধ্যাত্মিকতার কারণেও কবিকে যুক্তিহীন বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হতে দেখা যায়নি।

ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত **'চিত্ত-রঞ্জিকা'**র প্রকাশকাল ১৮৬৭ (১৯২৩ সম্বত)। কবিই তাঁর এই কাব্য পুস্তিকাটির প্রকাশক।

চিত্ত-রঞ্জিকা মূলতঃ একটি দীর্ঘ বর্ণনাত্মক কবিতার পুস্তিকা। তবে দীর্ঘ কবিতার শেষে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের কবিতাও সংযোজিত হয়েছে। দীর্ঘ কবিতাটির কবি কোনো নামকরণ না করলেও দ্বিতীয় তথা শেষ কবিতাটির নামকরণ করেছেন 'এক বন্ধুর পুষ্পোদ্যান'। নানাবিধ পুষ্প ও বৃক্ষাদিতে সজ্জিত একটি মনোরম উদ্যানের রমণীয় বিবরণে কবিতাটি সমৃদ্ধ।

এইবার দীর্ঘ কবিতাটির প্রসঙ্গ। গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত—এই ছয়টি ঋতুর আবির্ভাবে বঙ্গ প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন ঘটে তারই বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে আলোচ্য কবিতাটিতে। প্রকৃতির বিবরণদানে কবির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য সেই বিবরণ যে আদ্যন্ত কবিত্ব-গুণমণ্ডিত হয়েছে তা নয়। প্রকৃতির বর্ণনা দান প্রসঙ্গে কবি মাঝে-মাঝেই মানব সমাজ সম্পর্কিত তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন, আর এইভাবেই প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন।

কবির কবিতায় লিরিক্যাল সৌন্দর্য অনুপস্থিত থাকলেও এবং রোমাণ্টিকতার অভাব ঘটলেও তাঁর আধুনিক মানসিকতার প্রতিফলন ঘটায় কবিতাটির গুরুত্ব একেবারে অগ্রাহ্য করার মত হয়নি। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় কবির স্বাধীনতা প্রিয়তার কথা। কবি গ্রীষ্মের সকালের বিবরণ দান প্রসঙ্গে অফিসযাত্রীদের দ্রুত কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার প্রসঙ্গে স্বাধীনতার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। স্বাধীনতাকে 'মাত' সম্বোধন করে বলেছেন:

ওমা স্বাধীনতা! বাস কর যথা,
(মা বলি আমি কেমনে;
তব পুত্র নই, অধীনতা বই,
মরণ সম জীবনে)

পরাধীন দেশের নাগরিক বলে স্বাধীনতা রূপী জননীর সন্তান হবার যোগ্যতা লাভে বঞ্চিত কবির খেদোক্তি প্রকাশিত হয়েছে—

ওগো স্বাধীনতা ! বীর জন মাতা,
তব যে মহিমা কত ;
হইয়া অধীন, কেমনে এ দীন
বর্ণিতে হইবে রত। (পৃঃ ১৬—১৭)

কবি কৃষিজীবী মানুষের প্রতিও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তথাকথিত সভ্য মানুষকে এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবার আবেদন জানিয়েছেন, কৃষকের প্রতি অত্যাচারী জমিদারকে অনুরোধ করেছেন এদের প্রতি পীড়ন থেকে বিরত হতে—

ওহে সভ্য ভ্রাতৃগণ বলি আমি তাই,
কৃষকেরে মনে কর সহোদর ভাই।
ওহে জমিদার ভাই বলি আমি তাই.
পীড়ন না করো 'চাসা' ধর্মের দোহাই। (পৃঃ ৬০)

মাঝে মধ্যে কবি-কল্পনার প্রকাশ ঘটেছে কবিতাটিতে। বর্ষার অবসানে শরতের আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে কবির মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

বরষা হইল বৃদ্ধ শুভ্র হলো কেশ,
কেশে ফুল কেশ যার জেন সবিশেষ।
অতি বৃদ্ধ হলে পর শক্তি নাহি থাকে,
রাজ্য কার্য্যে অক্ষম সে হয় তারি পাকে। (পৃঃ ৪৩)

স্বাধীনতা-প্রিয় কবি স্বভাবতঃই বাঙ্গালীর অধঃপতনের জন্য তার চাকুরি-প্রিয়তাকে দায়ী করেছেন—

চাকুরি কুকুরি মজাইল বঙ্গবাসী,
অর্থ দিয়া চাকুরির যাহারা প্রয়াসী।
চাকুরি করিয়া মন নিস্তেজ হইল,
তোষামোদি বঙ্গজনে সেই শিখাইল। (পৃঃ ৫৪)

কবি তাঁর জীবনের সার্থকতা নিরূপণ প্রসঙ্গে উদার মানসিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন—

মানব জনম ধরি করিনু কি কাজ,
উন্নত কি করিলাম আপন সমাজ।
যে দেশেতে জনমিনু তাহে শত শত,
কুসংস্কার পরিপূর্ণ হেরি অবিরত ;
তাহার উচ্ছেদ তরে কি কার্য করিনু ;
আপন উদর জন্য সকলি ভুলিনু। (পৃঃ ৩৪)

কবিতাটিতে নানা সময়েই কবি তাঁর উপদেশবাণী প্রকাশ করেছেন। যেখানে উপদেশ মূল বর্ণিতব্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে সীমিতাকারে প্রকাশিত

হয়েছে, সেখানে তা উপভোগ্য হয়েছে। যেমন, অস্তাচলগামী সূর্যের বিবরণ দানের প্রসঙ্গে কবির উক্তি—

রক্তিমা বরণ কায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
পাসরিছে মনোদুঃখ জলে ঝাঁপ দিয়া।
উচ্চ পদ পেয়ে যেই করে অহঙ্কার,
দিবাকর সম দশা নিশ্চয় তাহার। (পৃঃ ২৭)

কিন্তু যেখানে উপদেশের তালিকা প্রসঙ্গ বহির্ভূত ও দীর্ঘায়িত হয়েছে, সেখানে সেই তালিকা কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয়বাহী হলেও তা রসিক পাঠকের বিরক্তি উৎপাদনের কারণ হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত দুঃখী ব্যক্তির তালিকা, প্রকৃত বন্ধুর তালিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কবির কবিতাটি আদ্যন্ত পয়ার ও ত্রিপদীতে রচিত। ছন্দোনৈপুণ্যের পরিচয় তেমনভাবে কবি দিতে পারেন নি। অলংকার প্রয়োগেও কবি গতানুগতিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কবিতাটির মাঝে মাঝে কবি নিজের বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে **Cowper, Milton, Thomson, Long fellow, Young, Byron, Shakespeare, Gray** প্রমুখাদির কিছু কিছু পংক্তি উদ্ধার করেছেন।

ঈশানচন্দ্র বসু—রচিত **'চিত্ত-বিনোদ'** কাব্যটির প্রকাশকাল ১৮৬৮। কাব্যটি ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়েছে।

কবি 'দেশহিতৈষী সহৃদয় ভ্রাতৃগণ'কে উদ্দেশ করে তাঁর কাব্যটি রচনার কারণ উল্লেখ করেছেন—

'জননী ভারতভূমির দুরবস্থা কীর্তনের দ্বারা সর্বসাধারণের করুণা সঞ্চারের উদ্দেশেই আমি এই অভিনব পরিচ্ছদধারী সকরুণবাদী চিত্ত বিনোদকে সমাজ নেপথ্যে অবতারিত করিলাম—'।

'চিত্ত-বিনোদ কাব্যটি চারটি সর্গে বিভক্ত। প্রথম সর্গটির নাম 'দেবীদর্শন', দ্বিতীয় সর্গটির নাম 'বিলাপ', তৃতীয় সর্গটির নাম 'পরিচয়', এবং চতুর্থ সর্গটির নাম 'অবগাহন'।

আলোচ্য কাব্যটির ফলশ্রুতি দেশপ্রেম। অতীতের ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতবর্ষের অধোগতির কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত কবি আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। একটি কাহিনীর অবতারণা করে কবি ভারতমাতার দীন-দুঃখী রূপকে পরিস্ফুট করেছেন। এক শারদ সন্ধ্যায় কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য আস্বাদনকালে যখন নিদ্রামগ্ন হলেন, তখন স্বপ্নে এক বন্ধুকে উপস্থিত হতে দেখলেন। বন্ধু সমভিব্যাহারে কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আস্বাদনে নির্গত হলেন। সৌন্দর্য আস্বাদনকালে এক রমণীর বিলাপে আকৃষ্ট হয়ে উভয়ে গোপনে তার পরিচয় উদ্ঘাটনে তার কাছে উপনীত হলেন এবং অবহিত হলেন বিলাপরতা রমণীটি আর কেউ নন, ভাগ্য বিড়ম্বিতা ভারতবর্ষ।

কাব্যের কাহিনী অংশ দুর্বল কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে কবির কল্পনাশক্তির পরিচয় মেলে। ১ম সর্গে কবি প্রদত্ত শারদ সন্ধ্যার বিবরণ উপভোগ্য—

দেখ, গগনের শোভা কিবা মনোহর,
বিভু যেন রচিয়াছে ক্রীড়া সরোবর
নীলিমা হয়েছে স্নিগ্ধ সুনির্মল জল,
শশি তাহে বিকশিত শ্বেত শতদল,
দীপিতেছে তারাবলি কুমুদ কলিকা
ভাসিতেছে সূক্ষ্ম মেঘ শৈবাল জালিকা
মকর কুম্ভীর আদি যাদোগণ প্রায়,
বিচ্ছিন্ন জলদ খণ্ড খেলিয়া বেড়ায়। (পৃঃ ৮)

ক্যব্যের ৪র্থ সর্গেও কবির কল্পনা শক্তির পরিচয় মেলে। তবে কাব্যটির প্রধান গুরুত্ব স্বদেশ প্রেমের প্রকাশে ।

২য় সর্গের প্রারম্ভে ক্রন্দনরতা ভারতমাতা তাঁর সন্তানদের অধোগতির কারণ উল্লেখে বিলাপ করেছেন—

চতুর্দিক হতে
বিজাতীয় লোকে আসি, বায়সের মত
করস্থ মোদক পুঞ্জ, লতেছে কাড়িয়া
সুকৌশলে, তোরা সব থাকিস্ চাহিয়া
ভেল্ ভেলু. অপগণ্ড বালকের মত !
কাঁদিস কেবলমাত্র, মার মুখ চেয়ে !
অবোধ অদূরদর্শী, সংহিতাকারক
ধূর্তদের ব্যবস্থাতে আস্থা করি এবে,
হয়েছ সকলে এত, দুরবস্থা গ্রস্ত ।
(তারা সব কুলাঙ্গার) করেছে যাহারা
সিন্ধুযাত্রা প্রতিষেধ, কপোল কল্পিত
আর যত অযৌক্তিক বিধি প্রণয়ন। (পৃঃ ২১—২২)

অথচ এক সময়ে ভারতবর্ষ নিজের ঐতিহ্যে ছিল দীপ্যমান, পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার আধার রূপে ছিল তার জগৎজোড়া স্বীকৃতি—

সমস্ত পৃথিবী যবে ছিল অনুর্বরা
অরণ্যানী সম হীন বন্য পশু প্রায়
নরের আবাস, ঘোর অজ্ঞান তিমিরে
সমাচ্ছন্ন। ধরা মাঝে আমিরে তখন
দীপিতাম রত্ন নিভ। (উজলে যেমন
কৌস্তুভ কেশব বক্ষে) আভায় উজ্জ্বল
দশদিক, কে গৌরব না করিত মোর।

বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতার একা মাত্র আমি
জন্মভূমি, মোর কাছে কেবা নহে ঋণী !
(২য় সর্গ, পৃঃ ২৩)

দ্বিতীয় সর্গে ভারতমাতা রামচন্দ্রের মত আদর্শ নরপতি, কবিকুলশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব, আর্যভট্ট, ভাস্কর, যুধিষ্ঠির, পরশুরাম, দৃঢ়ব্রত ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, ভীমসেন, অর্জুন প্রমুখদের উল্লেখে বর্তমান পুরুষদের জন্য বিলাপ করেছেন। তাছাড়া সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, খনা প্রমুখাদির উল্লেখে বর্তমান কালের নারীদের অধোগতিতেও দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।

পরাধীনতাকে সকল অনর্থের মূল বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে—

একেত পরাধীনতা অনর্থের মূল
বিনাশে ইহাতে রূপ, গুণ, বল বীর্য
পৌরুষত্ব। পরাধীন জনের কখন
না হয় অভীষ্ট সিদ্ধ। (২য় সর্গ, পৃঃ ২৯-৩০)

বালিকাদের শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, পিতা-মাতারা কন্যাদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়েছে—

বালিকাকাল হরে সে বৃথায়
পুতলি খেলায়, আর যত অনর্থক
অলীক চর্চায়, যাহে, নাহি ফল লেশ !
এ সকল দেখিয়াও জনক-জননী
না নিবারে দুহিতারে, না করে নিয়োগ
বিদ্যালয়ে। (২য় সর্গ, পৃঃ ৩৫-৩৬)

অল্প বয়সী কন্যাদের বিবাহেরও বিরোধিতা করা হয়েছে তীব্র ভাবে—

কেহ কেহ, প্রদানে কন্যারে
সপ্তম নবম বর্ষে। (স্বর্গীয় ভোগের
প্রত্যাশায়) যে সময় বিবাহের মর্ম
কিছুই না জানে বালা খেলায় কৌতুকী।
শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলি যারা করে অহঙ্কার
তাহাদের মধ্যে কোন শ্রেণী বিশেষের
আছে হেন মন্দ প্রথা স্মরিলে সে কথা
হাসি পায় দুঃখ ধরে ! বৈবাহিক পণে,
আবদ্ধ অপত্য বর্গে গর্ভাবস্থা হতে !
কত শত নরাধম, হয়ে অর্থ লোভী
প্রদানে বিরূপ, বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ জনে
অবোধ বালিকা। (২য় সর্গ, পৃঃ ৩৬)

৩য় সর্গেও অর্থহীন সংস্কার, সামাজিক প্রথা ও পানদোষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে বলা হয়েছে—

দুর্ধর্ষ জাত্যাভিমান বাল্য পরিণয়
অবৈধ অধিবেদন, গরল কলস
ব্যভিচার, পানদোষ, প্রচণ্ড পিশাচী
ভ্রূণহত্যা, ভোগস্পৃহা মহানর্থকরী
কুটিল কৌলিন্য প্রথা কুলটা নিদান।
(৩য় সর্গ, পৃঃ ৬০-৬১)

মধুসূদনের অনুসরণে কবি কাব্যের কিয়দংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করেছেন, আর কিয়দংশে অন্ত্যানুপ্রাস রক্ষা করলেও প্রতিটি চরণে চতুর্দশটি অক্ষর ব্যবহার করেছেন। বলাবাহুল্য মধুসূদনের মত শব্দ প্রয়োগে কবি নৈপুণ্য দেখাতে পারেননি। বরং এক্ষেত্রে তাঁর দুর্বলতা নানাস্থানেই পরিস্ফুট হয়েছে। কবি 'পান করিয়া' অর্থে প্রয়োগ করেছেন 'পানিয়া' (১ম সর্গ, পৃঃ ৭), 'আচ্ছন্ন করিয়াছে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 'ছাদিয়াছে' (১ম সর্গ, পৃঃ ৭, ২০), 'লইতেছে' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে 'লতেছে' (২য় সর্গ, পৃঃ ২২), মহৎ ইচ্ছার অধিকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 'মহেচ্ছু' (২য় সর্গ, পৃঃ ২৩), 'পান করিতেছে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 'পানিতেছে' (২য় সর্গ, পৃঃ ২৬), 'শান্ত করিতে' অর্থে 'শান্তাইতে' (৪র্থ সর্গ, পৃঃ ৭৭), 'স্নান করাইয়া' অর্থে 'স্নানাইয়া' (৪র্থ সর্গ, পৃঃ ৮২) ইত্যাদি।

ক্ষেত্র বিশেষে কবির উক্তি প্রবাদের মর্যাদা লাভের অধিকারী হয়েছে—

অন্যায়োপজীবী ধনীদের হর্ম্ম্যশালা
কখন ঘুচাতে নারে হৃদয়ের জ্বালা! (১ম সর্গ, পৃঃ ৯)

কিংবা,

প্রত্যুৎপন্নমতিমান্ সর্বকলাভিজ্ঞ
হিতৈষী বন্ধুর শুনে নিগূঢ় মন্ত্রণা (১ম সর্গ, পৃঃ ১৮)

'কাব্যমালা'র প্রকাশকাল ১৮৭০। কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতার নাম অনুল্লিখিত রয়েছে। কবি জানিয়েছেন—

মধুর পিরীতি রস—আমিত ইহারি বশ,
অন্য রস কটু বলি স্পর্শিতে না চাই।

তাই বলে গ্রন্থে সংকলিত সব কবিতাই মধুর রসের নয়। মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও মিলনের আনন্দ যেমন কিছু কবিতাতে প্রকাশিত তেমনি কিছু কবিতাতে আবার বিচ্ছেদের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে।

কাব্যগ্রন্থে মোট ৪৮টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। 'কান্তের প্রতি কান্তার উক্তি' কবিতায় প্রবাসে গমনরত কান্তকে কান্তা প্রশ্ন করেছে—

চৌম্বক-শলাকা সম মানস তোমার,
একমাত্র ধ্রুবতারা আমি হে উহার।
শুনেছি সাগর-গামী নাবিক সকলে,
তীর হীন নীর তরে সে শলাকা বলে,

থাকুক জলদে ঢাকা নভঃ সমুদয়,
সে তার তারার পানে স্থির ভাবে রয়।
তুমি কি তেমতি নাথ, থাকিয়া অন্তরে,
অধীনীরে নিরন্তর স্মরিবে অন্তরে ?

'ভুলনা আমায়' কবিতায় নায়িকা বিরহ-যন্ত্রণাকে স্বীকার করে নিয়ে নায়ককে কর্মপথে অগ্রসর হবার প্রেরণা যুগিয়েছে পাছে নায়কের পৌরুষ লঙ্ঘিত হয়, আর এইভাবে প্রেমের গভীরতার স্বাক্ষর রেখেছে—

প্রশস্ত হৃদয়ে আমি দিতেছি বিদায়,
যদিও বলিতে ইহা ঝরে দু-নয়ন।
না চাহি প্রণয়-ডোরে করিয়া বন্ধন,
পুরুষার্থ হতে করি বঞ্চিত তোমায় ;

নায়ক প্রবাসে গমন করে নায়িকাকে বিস্মৃত হওয়ায় এবং সেই সঙ্গে তাকে বিরহানলের শিকার করায় ক্ষুব্ধ নায়িকা মদন দেবের আচরণের সমালোচনায় ব্রতী হয়েছে—

কে বলে কেবল পঞ্চ শর ধরে স্মর ?
অসংখ্য বিশিখে তার দহে এ অন্তর।
সকলি কি বাণ তার অবলার তরে ?
কঠিন পুরুষ বক্ষ লক্ষ্য নাহি করে ?

'সখীর উত্তর' কবিতায় বিরহিনী নায়িকাকে তার সখী এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছে—

ভাল বলি বিরহ, মিলন আশা যাতে ;
সংযোগে কি সুখ ? বিচ্ছেদের ভয় তাতে।

তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের—

সুখ নিয়ে, ভাই, ভয়ে থাকি,
আছে আছে দেয় সে ফাঁকি—
দুঃখে যে সুখ থাকে বাকি
কেইবা সে সুখ নাড়বে ?

'অলি-দংশন' কবিতায় নায়িকা অলির দংশনে যন্ত্রণা-কাতর হলে মদন দাহে দগ্ধ নায়ক তাকে প্রশ্ন করেছে—

এতই জ্বলন যদি অলির দংশনে,
কত জ্বালা সই আমি ভেবে দেখ মনে।

'বায়ু দূত' কবিতাটি দীর্ঘতম এবং এটি 'মেঘদূতে'র অনুসরণে রচিত।

কোনো কোনো কবিতায় নারীদেহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দানে কিংবা দেহজ মিলনের অকপট প্রকাশে কিছুটা স্থূলতা লক্ষিত হয়। তবে কবির বর্ণনাদানের ক্ষমতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব প্রশংসনীয়।

প্রাণরঞ্জন পণ্ডিত রচিত **'মিত্রলাভ'** একটি মাত্র কবিতা নিয়ে রচিত পুস্তিকা। পুস্তিকাটির প্রকাশকাল ১৮৭০।

কবি মূলতঃ পয়ার এবং মাঝে মাঝে ত্রিপদী ছন্দে সংস্কৃতে রচিত কয়েকটি

পরিচিত কাহিনীকে প্রকাশ করেছেন। জরদগব নামক শকুনি দীর্ঘকর্ণ নামক বিড়ালের দোষে কিভাবে অকালমৃত্যু বরণ করল, কিংবা চম্পকবতী নামক এক হরিণ অজ্ঞাতকুলশীল ক্ষুদ্র বুদ্ধি নামক শৃগালের দ্বারা প্রতারিত হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হতে চলেছিল এবং কিভাবে সুবুদ্ধি নামক কাক ইত্যাদির সহায়তায় সে প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম হ'ল বর্ণিত হয়েছে। কবি কাহিনীগুলির মাধ্যমে প্রকৃত বন্ধুর আচরণ, বন্ধুর কথা অমান্য করলে কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা, অপরিচিতের সঙ্গে বন্ধুত্ব কেমন করে মানুষকে বিপদের সম্মুখীন করে সেই বিষয়ে অবহিত করেছেন।

গুপ্ত পল্লী নিবাসী মহিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত '**প্রমীলা বিলাসে**'র প্রকাশকাল ১৭৯৩ শকাব্দ। গ্রন্থটি শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত। একটি রূপকথা ধর্মী কাহিনীর সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের পরিচিত ঘটনাকে সংযুক্ত করে আলোচ্য গ্রন্থে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

সৌদাস নগরের রাজা ছিলেন ভীমসিংহ। তাঁর রাণী ছিলেন প্রমোদিনী। একদিন এক যোগী এসে উপস্থিত হলেন ভীমসিংহের কাছে। যোগীকে রাজা জানালেন তাঁদের সন্তানহীনতার কথা। যোগী আশ্বাস দিলেন রাজার সন্তান হবে। সত্য সত্যই রাণী যথাসময়ে গর্ভবতী হলেন। একটি কন্যা জন্মাল—নাম দেওয়া হল তার 'প্রমীলা সুন্দরী'। রাণী কন্যা সন্তানের জন্য দুঃখিত হলেন, কিন্তু রাজা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

কন্যা দিয়া পুত্র পাব ছাড়হ বিষাদ।

রাজকন্যা বড় হলে যথা সময়ে তার স্বয়ম্বর সভার আয়োজন হল, রাজকন্যা বরণ করলে বিদর্ভ রাজকে। কিন্তু বাসর ঘরে সর্পাঘাতে বিদর্ভরাজের মৃত্যু হল। নবোঢ়া রাজকন্যা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে বনে গমন করলে। সেখানে মৃতদেহটি জলে ভেসে গিয়ে উপনীত হল এক সাধকের কাছে। সাধক করুণার বশবর্তী হয়ে জীবিত করে তুললেন প্রমীলার মৃত স্বামীকে।

এক মালিনী তাকে নিয়ে এল নিজের গৃহে এবং একটি শিকড়ের সাহায্যে দিবাভাগে তাকে সে হীরামন পাখী করে রাখত, রাত্রে বিদর্ভরাজ অবশ্য স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতেন। পক্ষীরূপী বিদভরাজকে ক্রয় করল রাজকন্যা বিলাসবতী। অতঃপর বিলাসবতীর কাছ থেকে বিদর্ভরাজ গিয়ে উপনীত হলেন এক ব্রাহ্মণের দুই অনূঢ়া কন্যার কাছে। শেষ পর্যন্ত যোগিনী বেশে প্রমীলা তার স্বামীকে খুঁজে বের করলে। চন্দ্রবিলাস বিলাসবতী, দুই ব্রাহ্মণকন্যা তিলোত্তমা ও প্রিয়ংবদার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন। প্রমীলা স্বামী ও সতীন সহ রাজা বীরেন্দ্রশেখরের কাছ থেকে প্রথমে নিজের বাড়ী এবং পরে বিদর্ভরাজ্যে গিয়ে উপনীত হল।

সমগ্র কাহিনীটি শুক পক্ষীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটির তিনটি খণ্ড—প্রথম খণ্ডটি বর্ণিত হয়েছে কাব্যে—পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে। দ্বিতীয় খণ্ডটি কথোপকথনের মাধ্যমে বর্ণিত, তাই কিছুটা নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ডটি বর্ণিত হয়েছে গল্পাকারে। এমন অভিনবভাবে গ্রন্থ রচনা সচরাচর দেখা যায় না। কবি প্রমীলার রূপ বর্ণনায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বিধুমুখীর পতিনিন্দা বেশ উপভোগ্য হয়েছে—

পতির গুণের কথা কি বলিব আর।
আবগারি মহল হয় উদরে তাহার॥
যতগুলি অলংকার বাপে দিয়াছিল।
সবগুলি চুরি করি কুকর্মে রাখিল॥
দিবস রজনী থাকে বারাঙ্গনা বাসে।
বাসেতে নাহিক গতি মাসেক্ ছ মাসে॥

মদ ও মদের প্রতিক্রিয়ার বর্ণনায় বলা হয়েছে—

বরুণের কন্যা ভাই নামেতে বারুণী।
সুরলোকে স্থিতি তেঁই সুরা নাম শুনি॥
ভূমিতে শুঁড়ীর ঘরে মদ্য তাঁর নাম।
যাহার সঙ্গিনী তিনি বিধি তঁার বাম॥
যতক্ষণ সুরাদেবী বোতলেতে রন।
শান্তমূর্তি ধরি তিনি রন ততক্ষণ॥
মানুষের জঠরেতে প্রবেশিলে পরে।
কুকর্ম করায় ভয়ানক মূর্তি ধরে॥
তখন না থাকে আর মানুষের জ্ঞান।
বাতুলের কার্য করে হইয়া অজ্ঞান॥
... ...
হইয়া অজ্ঞান কভু নেশার ঝোঁকেতে।
ঝোলারূপ দোলা চড়ি যান পুলিশেতে॥
কভু বা সাহস করি খানায় পড়িয়া।
শিকার করেন ছুঁচো বাহু প্রসারিয়া॥
গড়াগড়ি যান কভু রাস্তায় পড়িয়া।
শতমুখী মারে কভু বেশ্যাতে আসিয়া॥
নেশার ঝোঁকেতে কেহ কুক্কুরী ধরিয়া।
করে সুখ লাভ তারে প্রেয়সী ভাবিয়া॥
কভুবা পাখীরে শূন্যে উড়িতে দেখিয়া।
উড়িতে বাসনা করে ছাদেতে উঠিয়া॥
অশেষ সুরার দোষ কি কহ বিশেষ।
যে খেয়েছে সে-মজেছে কি বলিব শেষ॥

স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় কবি ছিলেন মদ্যাসক্তির বিরুদ্ধে।

নিজের স্ত্রী ভ্রমে কন্যার সঙ্গে রাজা ভীমসিংহের রসালাপ রুচিবোধকে আহত করে। মাঝে মাঝে কবি কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন প্রভাতের বর্ণনায় বলা হয়েছে—

পূর্বদিক রমণীর ঘোমটা খুলিয়া।
উঠিলেন দিননাথ চিত্ত বিনোদিয়া॥

কবি অলঙ্কার প্রয়োগে, বিশেষতঃ উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক প্রভৃতির ব্যবহারে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তবে অলঙ্কার ব্যবহারে কবি ভারতচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

ক. নাসা যেন তিলফুল, মোহিতে রমণী কুল
মিলিয়াছে ধনুষ্কোটি সাতে॥

খ. ক্ষীণ কটি অতিশয়, লজ্জিত কেশরী হয়
ডম্বরুর নাকরি বাখান।
উরু জিনি করি-কর, পদনখে শশধর
পদহেরি কামিনী অজ্ঞান॥

গ. শুনি সুমধুর বাণী পিকরাজ হারি মানি
কাননেতে করিলা গমন।

ঘ. হেরিয়া বেণীর শোভা, জগজন মনোলোভা,
বিবরে লুকায় ফণী হইয়া অধীর

ঙ. দেখিয়া ওষ্ঠের তল, লজ্জা পেয়ে বিম্বফল,
অভিমানে খসি পড়ে ধরার উপর॥

গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় রচিত **'গীত-হার'** প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। লেখক 'গীত-হার'কে নানাবিষয়ক বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সংকলন বলেছেন। গ্রন্থটি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে উৎসর্গীকৃত।

'গীত-হার' রচনার কারণ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে ঃ

'আমার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে আদিরস ভিন্ন সঙ্গীতের প্রকৃত উপজীব্য আর নাই লোকের ইত্যাকার যে একটি কুসংস্কার আছে, সেইটি দূরীভূত করা।' অর্থাৎ সঙ্গীত শিক্ষার্থীর সঙ্গীত শিক্ষার সুবিধার্থে এবং তৎসহ লোকের রুচি পরিবর্তনের উদ্দেশেই সঙ্গীত সংকলনটির পরিকল্পনা। কিন্তু লেখকের এতসব বক্তব্য সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় সংকলনের অধিকাংশ রচনাই যত না সঙ্গীত পদবাচ্য হয়ে উঠেছে, তদপেক্ষা কবিতা হয়ে ওঠার দাবিই এগুলির অধিক।

মোট ৫৭টি রচনা স্থান পেয়েছে 'গীত-হার'এ। ঈশ্বরতত্ত্ব, সামাজিক বিষয়, বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ ইত্যাদি বিষয়ে কবি তাঁর কবিতাগুলি রচনা করেছেন। তবে মুখ্য যে দুটি সুর প্রবল হয়ে উঠেছে—তা হল পরকালের ভাবনা এবং স্বাজাত্য প্রেম।

'ব্রিটেনির প্রতি ভারত ভূমির উক্তি'তে কবি ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সভ্যতার কথা ভারতমাতাকে দিয়ে বলিয়েছেন—

তোমারি শৈশবকাল উদয়েরি আগে,
রূপে আলো করেছিলাম ধরা পূর্বভাগে॥

সে রূপ সৌন্দর্যরাশি, দেখিত সকলে আসি,
মিষর গ্রীরিস বাসী সুসভ্য প্রাচীন ॥

ভারতভূমি ব্রিটেনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে যেহেতু—
'যবন পীড়া জ্বালা নিভালে আমার'—
উল্লেখ করা যেতে পারে যে কবির স্বাজাত্যবোধ উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'চিতোর রাজ্যের অধিপতি প্রতাপ রায়ের রোদন' কবিতায় কবি প্রতাপের ব-কলমে পরাধীন ভারতবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন ঃ

জননী ভারত, কাঁদি অবিরত,
কহিছে সন্তানগণে বিনয় করিয়ে কত,
ঘুচাও যাতনা দাসীত্ব পীড়ন ॥

গত স্বাধীনতা মান, হত ধন জ্ঞান,
কীর্তি গৌরব দীপ হয়েছে নির্বাণ,
শোকেতে ম্রিয়মাণ ভারত আনন ॥

'পুরুষার্থ উপার্জনে স্বদেশবাসিগণের প্রতি উক্তি' কবিতায় কবি ভারতবাসীকে মৃত্যু ভয় থেকে মুক্ত, বাহুবলে বলীয়ান হবার আহবান জানিয়েছেন—

ভারতের বীরগণে স্মরণ করিয়ে,
বীর ধর্মেতে ব্রতী হও বীর পণে,
প্রিয় জন্মভূমির গৌরব সাধনেতে, করো না ভয় মরণ ॥

'হিন্দুমেলা' কবিতাতেও কবির স্বাজাত্যবোধ প্রকাশিত। ভারতমাতার হীনতামোচনে, হিন্দুজাতির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে কবির আহবান—

আত্মনির্ভর রূপ অমূল্য রতন, উপার্জনে তারি কর যতন,
দারিদ্র দীনতা, পর অধীনতা,
ঘুচিবে সকল দুখ আত্ম নির্ভরে ॥

কবি কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালীকে নিয়ে যেমন কবিতা লিখেছেন, তেমনি কয়েকজন বিখ্যাত ইংরেজও তাঁর কয়েকটি কবিতার বিষয় হয়েছেন। 'শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কবিতায় বিদ্যাসাগরের দয়াধর্ম ও বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে তাঁর সাহসী ভূমিকার কথা স্মরণ করা হয়েছে—

হিন্দুকুল কামিনীর বৈধব্য যন্ত্রণা,
ঘুচাতে কাতর স্বরে, কাঁদিলেক যে জনা,
দয়ার বিদ্যার সেই সাগর মহান ॥

কবির মানবিকতা বোধ, বিজ্ঞান চর্চার প্রতি সমর্থন তাঁর আধুনিক মানসিকতার পরিচয়কে বহন করে।

'ভগবৎ চিন্তা', 'ভগবৎ স্তোত্র', 'ঈশ্বরের ধ্যান', 'বাসনা নদী পার', 'পথের সম্বল', 'জীবন যাত্রা', 'বাঁশ বাজি' প্রভৃতি কবিতায় কবি ঈশ্বর নির্ভরতার

স্বপক্ষে বলেছেন, স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন জীবনের ও জগতের অনিত্যতা সম্পর্কে।

কম-বেশি প্রায় সব কবিতাতেই কবির উপদেশ দানের প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছে।

শ্যামাচরণ শ্রীমানী রচিত '**সিংহল বিজয় কাব্য**'টির প্রকাশকাল ১৮৭৫। কাব্যের নামপত্রে লিখিত হয়েছে—

The Conquest of Ceylon
by
Vijoy a Prince of Bengal
An epic poem

অর্থাৎ কবি তাঁর কাব্যটিকে মহাকাব্য বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু আসলে এটি একটি আখ্যানকাব্য, মহাকাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। অন্যান্য ত্রুটির কথা বাদ দিলেও উল্লেখযোগ্য কবির এই কাব্যটি মাত্র চারটি সর্গে বিভক্ত। কাব্যটির ভূমিকায় কবি কাব্যটি রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন, "বর্তমানকালে বঙ্গের দুরবস্থা দেখিয়া অনেকেই অনুমান করেন যে, হীন বীর্য বঙ্গ সন্তানগণ কোনকালেই যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্যে সংসক্ত হয়েন নাই এবং হইবেনও না। ভবিষ্যতের অপারজ্ঞেয় গর্ভে যে কি অন্তর্নিহিত আছে তাহার পরিজ্ঞান মানব-বুদ্ধির অতীত; কিন্তু অতীতকালের ঘটনাবলী সংগ্রহ করিতে পারিলে যে উপরোক্ত মতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারা যায় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

আহ্লাদের বিষয় এই অধুনা অনেকেই চক্ষুরুন্মীলন করিয়া এতৎ সংক্রান্ত বিষয় সকলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।—ইহাই আমার উপস্থিত কাব্য রচনার উত্তেজক। বঙ্গ রাজকুমার বিজয় ৫৪৩ পূঃ খৃঃ সাত শত মাত্র সহচর সমভিব্যাহারে লংকাদ্বীপ অধিকার করেন—ইহা স্বদেশ গৌরবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে! তদ্বিবরণ বর্ণনই আমার ক্যাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।"

অর্থাৎ বাঙ্গালীর অতীত শৌর্য বীর্যের কাহিনী বর্ণনায় বাঙ্গালীকে তার অতীতের গৌরবময় কীর্তি বিষয়ে অবহিত করাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। এদিক দিয়ে কবি দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। কাব্য মধ্যেও কবি পরাধীনতার বেদনাকে প্রকাশ করে বলেছেন—

বঙ্গ-স্বাধীনতা সহ
হায়, হয়েছে বিলীন এবে!—শোভিবে কি
দুঃখিনী জননী আর, কভু সে শোভায়? (পৃঃ ৪৭)

কবি, মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন লক্ষিত হয়। মধুসূদন তাঁর কাব্যারম্ভে সরস্বতীর বন্দনা গেয়েছেন, সিংহল বিজয় কাব্যের কবিকেও সরস্বতীর আবাহন রচনা দিয়েই কাব্যারম্ভ করতে

দেখা গেছে। কবি মধুসূদন তাঁর কাব্যে কল্পনাদেবীকেও আবাহন জানিয়েছেন—

তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা!

শ্যামাচরণ লিখেছেন—

আরো ভিক্ষা মাগি দাস, তরুণী কল্পনা,
তব দাসী, বিমোহিত যার মায়া জালে
ত্রিভুবন—কুহকিনী, কনক বরণী।

কবি মধুসূদনেরও বন্দনা গেয়েছেন—

নমি পদে, শ্রীমধুসূদন! অবগাহি
সুখাত সলিলে তব, পরম-নির্ভয়ে
হংস যথা, মানস সরসে! মোরে দেহ
বর; হাসিতে হাসিতে ভাসি যেন দেব
মধু কবিতা সাগর—তরঙ্গ মাঝারে! (১ম সর্গ, পৃঃ ২)

মহারাজ সিংহবাহুর রাজসভার বিবরণ দানেও মধুসূদনের প্রভাব লক্ষণীয়—

রাজনিকেতনে, মণিময়
রজত আসনে বসি, দেব সিংহবাহু
সাধিছে, রাজ্যের কার্য, ধর্মরাজ সম,
স্বর্ণ ছত্র হাতে ছত্রধর, কিবা শোভা
তার, পুনঃ কি সুমিত্রা দুলাল, ঊর্মিলা—
রমণ অবতীর্ণ ধরাধামে?

তুলনীয়—

ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে! (মেঘনাদ বধ কাব্য)

রাবণের রাজসভার অতুলনীয় বর্ণনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শ্যামাচরণ লিখেছেন—

মেরুশৃঙ্গ পরে শোভিতেছে
ভূতলে কি আজ? চারিদিকে সভাসদ
পাত্র মিত্র আদি, যথা যোগ্যস্থানে, বসি—
সুবর্ণ, মুকুতা যুক্ত দিব্য আবরণে।
বিবিধ বর্ণের স্তম্ভ প্রস্তরে গঠিত,
বিরাজিছে সারি সারি, বোধিকা উপরে
ধরি ভাস্কর্য, সংযুক্ত দিব্য পাড়;—ছাদ
সর্বোপরে, গম্বুজ আকার, শোভাময়,
কতশত খোদিত রঞ্জিত বিভূষণে—(পৃঃ ২৪)

বলাবাহুল্য মধুসূদনের বর্ণনার চমৎকারিত্ব ও গাম্ভীর্য আলোচ্য কাব্যে অনুপস্থিত। কিছু কিছু শব্দ অথবা বাক্য এবং অলংকার প্রয়োগেও

মধু-কবির প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন 'মণিহারা ফণী যথা', 'কেন না মরিলি তুই হর কোপানলে ?' 'বাখানিল' ইত্যাদি।

মেঘনাদবধকাব্যে কবি রাবণকে দৈব বিশ্বাসী রূপে চিত্রিত করেছেন আমাদের আলোচ্য কাব্যেও রাজকুমার বিজয়ের সখা অনুরাধকে সান্ত্বনা বাণী উচ্চারণে দৈববাদকে সমর্থন করতে দেখা গেছে—

বিধির এ খেলা
ভাই খণ্ডিতে কে পারে ? (পৃঃ ৪৫)

আলোচ্য কাব্যটি চারটি সর্গে বিভক্ত—সর্গগুলি হ'ল যথাক্রমে বর্জন, সমাগম, মন্ত্রণা এবং বিজয়। উল্লেখ করা যেতে পারে মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গটির নামও 'সমাগম'। কাব্যটি কবি রচনা করেছেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে। কাব্যটি রচনায় কবির মূল সূত্র—'মহাবংশ'। তবে তাঁর স্বকপোলকল্পিত কাহিনীও যুক্ত হয়েছে—যেমন সৌদামিনী নাম্নী বারাঙ্গনার প্রতি বিজয় কুমারের আকৃষ্ট হওয়ার উপাখ্যানটি। যক্ষবালা কুবেনী চরিত্রে প্রমীলার ছায়াপাত ঘটেছে। আলোচ্য কাব্যে কিছু অলৌকিক ঘটনাও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যেমন ত্রিদিব ঈশ্বর প্রভঞ্জনকে আদেশ দিয়েছেন তার অনুচরদের সাহায্যে রাজকুমার বিজয়কে সিংহলে পোঁছে দিতে। কালসেনের মৃত্যুতে পশুমিত্রা দেবীর আর্তনাদ মর্মস্পর্শী।

'**ভগ্নীবিলাপ**' কাব্যটির রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ দাঁ। কাব্যটির প্রকাশকাল ১৮৭৬। মনে হয় সত্য কোন বিয়োগান্ত ঘটনা অবলম্বনেই কাব্যটি রচিত। কাব্যটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত—সূচনা, বিলাপ ও উপসংহার।

সূচনাংশটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কাব্যের সিংহভাগ অধিকার করে আছে 'বিলাপ' অংশটি। 'বিলাপ' রচিত হয়েছে ত্রিপদীতে। এক যুবক বিলাপ করেছে তার কনিষ্ঠা ভগ্নীর জলে ডুবে আত্মহত্যার কারণে। যুবকটি এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছে যে তার স্নেহের পাত্রী বোনটি যদি কোনো রোগের শিকার হত, তবে তার এত দুঃখ হত না। সীমাহীন দুঃখ তার, আদরের বোনটি আত্মঘাতিনী হয়েছে বলে।

যুবকটি অনুমান করেছে বোনটির আত্মঘাতিনী হওয়ার কারণ বিষয়ে।— কখনও অনুমান করেছে—

শাশুড়ি রাক্ষসী কিরে, হানিল তব অন্তরে,
মর্মভেদী বাক্যবাণ, সহিতে নারিলে ?
তাপেতে তাপিত তনু, তাই কি ত্যজিলে ?

এরূপ অনুমান যে অযৌক্তিক নয়, তার প্রমাণ স্বরূপ যুবক উল্লেখ করেছে শাশুড়ীর হাতে তার ভগ্নীর প্রহৃত হওয়ার ঘটনা—

সুকোমল যে অন্তর, কখন সহেনি কার
কর্কশ বচন ; কিন্তু তুই পাপীয়সী
প্রহারি স্বচ্ছন্দ্যে তারে, হাঁসিতেছে খুশী।

যুবকটির মনে এই সন্দেহ জেগেছে,সত্য সত্যই ভগ্নী তার আত্মঘাতিনী হয়েছে, নাকি শ্বশুর বাড়ীর লোকেরাই তাকে হত্যা করে রটনা করেছে তার আত্মঘাতিনী হওয়ার কাহিনী ?

পারেত নিষ্ঠুর জন, হরিতে জীবন ধন,
একাকিনী অসহায়া, অবলা পাইয়া,
দুষ্ট, নিদারুণ, রুষ্ট সহসা হইয়া।

অযোগ্য পাত্রে কন্যাকে পাত্রস্থ করার জন্য যুবকটি তার পিতাকে দায়ী করেছে—

ভুলিয়া পরের বাক্যে সঁপিলে কন্যায়
অধম পামর কুলে, একবার না চাহিলে
হেরিতে তখন পিতঃ ! ভাবী জামাতায়।

আবার কখন বিধবা বোনটিকে নিজেদের কাছে রাখলে হয়ত বা তার জীবনটুকু রক্ষা পেত বলে মনে হয়েছে তার—

বিধবা হয়েছ বলি, রাখিতাম যত্ন করি
পিতৃগৃহে ; ঘুচিত তো নিশ্চয় তখন
যতেক যন্ত্রণা তব ; যেতনা জীবন।

বাল্যবিবাহ প্রথা, কৌমার বিবাহ প্রথাকে দূরীকরণের আহ্বান জানান হয়েছে কাব্যে—

অষ্টম বর্ষীয়া বালা, জানে কি সে এত জ্বালা
সহি বিবাহের লাগি, যাবে তার প্রাণ ?
কৌমার বিবাহ ছাড় বঙ্গের সন্তান।

উপসংহারে দেশাচারের হাত থেকে বঙ্গললনাকে মুক্ত করার আহ্বান জানান হয়েছে।

'গীতাবলী' প্যারীমোহন কবিরত্ন রচিত, এটির প্রকাশকাল ১৭৯৮ শকাব্দ। ১৬৫৬ শকাব্দে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সাহানুই গ্রামে কবির জন্ম। মৃত্যু ১২৮১ শকাব্দে। প্যারীমোহনের পিতার নাম দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়। বাল্যকালাবধি কবিরত্ন গীত রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। কমলাকান্ত কবির খুল্ল প্রপিতামহ। প্রথাগত শিক্ষা কবির তেমন হয়নি, কিন্তু স্বভাব-কবিত্বের অধিকারী তিনি ছিলেন। বর্ধমানের মহারাজা মাহতব চাঁদ কবিকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

গীতাবলী ১০৩টি গানের সংকলন। তাছাড়া কয়েকটি অসম্পূর্ণ সঙ্গীতও সংকলনে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে অধ্যাত্ম বিষয়ক সঙ্গীতের সংখ্যা ৫৮ এবং অন্যান্য বিষয়ক সঙ্গীতের সংখ্যা ৪৫।

কবির অধ্যাত্ম বিষয়ক সঙ্গীতগুলি সম্পর্কে প্রথমে আমরা আলোচনা করতে পারি। একটি গানে কবি স্রষ্টার অস্তিত্ব কল্পনার কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

কুম্ভ দেখে জ্ঞান হয় কুম্ভকারে, বিশ্ব দেখে তেমনি দৃশ্য হয় তাঁরে.
কর্তা ভিন্ন কর্ম হয় কি প্রকারে, ধূম দেখে যেমন অগ্নি নিরূপণ ।।
(৩নং সঙ্গীত)

রূপে ভিন্নতা থাকলেও স্বরূপে সব দেব-দেবীই যে এক, অতএব ঈশ্বরের রূপ নিয়ে বিসংবাদ অকারণ—

এক স্বর্ণে অলঙ্কার, গঠন বিবিধাকার, বাউটী বালা কণ্ঠমালা ঝুমকো সিঁতি চন্দ্রহার, আকার প্রকার ভেদে নানাবিধ নাম তার, একত্রে সব গলিয়ে দেখ পুনর্বার স্বর্ণ হবে। (৬নং সঙ্গীত)

কোনো কোনো গানে রামপ্রসাদের প্রভাব সুস্পষ্ট—

আর কতকাল ভুগ্‌বো কালী হয়ে আমি কুয়োর ঘড়া,
এই ভব কূপে, কোন রূপে নিবৃত্তি নাই ওঠা পড়া ।।
আশি লক্ষ পাটে ঠেকে সর্বাঙ্গে পড়েছে কড়া।
আবার গলার কশা, শক্ত ফাঁশা, মায়া মোহ দড়ি দড়া ।।

কালীর প্রতি কবির অচলা ভক্তি বহু গানেই প্রকাশিত—

কালীপদ কোটরেতে মনপাখী মোর কর বাসা।
কি করবে পাপ ঝড় বাদলে. সুখে কাল কাটাবি খাসা ।।

ভক্তিগীতির মাধ্যমে কবি অত্যন্ত কৌশলে ইংরেজ শাসনের সমালোচনা করেছেন।

মন গভর্নর, সেটা গো বানর, যে বেটা এদেশে আছে গো।
তারে দরখাস্ত দিলে, অগ্নি দেয় ফেলে, বিপক্ষের পক্ষে নাচে গো ।।

কিংবা অন্য একটি গানে কবি বলেছেন—

পাপ পুরুষ গবর্ণর, রাজ-অনুচর দেহ দেশ আছেন শাসিতে।
এঁর কেবল অভিলাষ, প্রজার সর্বনাশ, জানে না ভবিষ্যতে হবে ভাবিতে ।।

অলঙ্কার প্রয়োগে কবি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন—

এইবেলা মন নেরে ডেকে. নীলাব্জ বরণী মাকে।
নিলাম নিলাম কচ্চে শমন, কখন নেবে নিলাম ডেকে ।।
কাল নিলে নিলাম ডেকে, কার শক্তি কে রাখবে ডেকে।
লয়ে যাবে ডাকে ডাকে, এখন আর কি হবে ডেকে ।।

সমসাময়িক নানা বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করে সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন কবি। ১২৭১ সালে অনুষ্ঠিত ঝড়, দুর্ভিক্ষ নিয়ে গান বেঁধেছেন, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখের মহাপ্রয়াণে কবি শোক গাথা রচনা করেছেন, দ্বারকা নাথ মিত্রের জজ হওয়া উপলক্ষ্যেও কবি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। কবি ছিলেন সংস্কার মুক্ত আধুনিক মনের অধিকারী। তাঁর যুক্তিবাদী মানবিকতাবোধের পরিচয় আমরা পাই নানা গানে। 'বিদ্যাসাগর মহাশয়' গানটিতে কবি ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা বিবাহ প্রচলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ, তাঁর অতুলনীয় দাক্ষিণ্য, শিক্ষা প্রসারে তাঁর প্রয়াস ইত্যাদির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন—

ঘুচাইতে দেশের যত কুসংস্কার, বিপ্লব করাতে কুৎসিত ব্যাভার,
উপদেশচ্ছলে গ্রন্থসব প্রচার, করেছেন যা আর হবার নয় ।।

বিদ্যাসাগরের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা প্রসঙ্গে কবির উক্তি—

পুস্তকে মাসিক যে টাকাটা আয়, দানে অন্নদানে প্রায় সব যায়,
নিজ অশনে বসনে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়, নিতান্ত যা নৈলে নয় ।।

'বহুবিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর ও তারানাথের বিচার' গানেও কবি বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেছেন—

মনুবাক্য অর্থ রেখে অপ্রকাশ, মনোগত ভাব করেছেন প্রকাশ, ব্যর্থ অর্থ লোকে প্রতারণার আশ, বলে দোষারোপ নির্দোষী সাগরে। জ্ঞানাম্বুধি তাই প্রত্যুত্তর তার, লিখেছেন আহা অতি চমৎকার, সে ব্যাখ্যা বিচার খণ্ডে সাধ্যকার, বিধাতার কলম বেরিয়েছে বাজারে। নদনদী যত আছে এ সংসারে, ক্ষুদ্ররূপী সব ক্ষুদ্র বেগ ধরে, অপ্রকাশ কিছু নাই নর নিকরে সাগরের বেগ সহিতে কে পারে ।।

ঈশ্বর গুপ্তের মত ভোজ্য বিষয় নিয়েও বেশ কয়েকটি গান লিখেছেন কবি এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কলাইএর ডাল, আলু-বেগুন, কপি, চিংড়ি, মৎস্য, পাঁঠার মাংস ইত্যাদি।

'গাধাবলি' (পদ্যনীতি) হরিমোহন রায় কর্তৃক সংশোধিত এবং অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশকাল ১২৮৭। কাব্যগ্রন্থটির নামপত্রে কবির নাম নেই।

গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক তাঁর এই অভিনব গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

'কেবল দেশের কতকগুলি জঘন্য রীতি সংশোধন করাই গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য।'

'ব্রহ্ম বন্দনা' দিয়ে কাব্যের শুরু। কবি লিখেছেন ঃ

অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথে করিয়া প্রণাম।
রচিব পুস্তক দিয়া গাধাবলি নাম ।।
ইহাতেও যদি হয় অজ্ঞানের জ্ঞান।
তবে ত জানিব মম সার্থক বিধান ।।

'ব্রহ্ম বন্দনা'র পর 'সরস্বতী বন্দনা'। কবি লিখেছেন—

চিন্তি তব গুণাবলি, রচিব গর্দ্দভাবলি,
লক্ষ্য করি সুজন মন্ত্রণা ।।
করি মম চিত্তে বাস তুলে দাও সুবাতাস,
লেখনী চালাব তার বলে।
যা লিখাবে কৃপা করি, ওগো সর্ব শুভঙ্করি,
তাহে জ্ঞান দিও গাধাদলে ।।

মোট ১০৮টি পদ্যে রচিত নীতিকথা সংকলিত হয়েছে, সবই রচিত হয়েছে পয়ারে।

ড. সুকুমার সেন 'গাধাবলি' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন 'ব্যর্থ রচনা' বলে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য, বাস্তবিক কাব্যটি অভিনব ও উপভোগ্য হয়েছে। মানুষের বিভিন্ন ত্রুটিগুলিকে সমালোচনা করেছেন লেখক। এই ত্রুটি কখনও চারিত্রিক. কখনও পেশাগত আবার কখনও বা নিছক অনভিপ্রেত আচরণগত।

কবি বলেছেন—

একের নামের পত্র অন্যে খুলে পড়ে।
নরগাধা সেইজন, তাহা নাহি নড়ে॥ (২ সংখ্যক)

কিংবা,

কোন কথা কার সঙ্গে না হইতে শেষ।
অন্য জন প্রশ্ন করে বিষয় বিশেষ॥
তাহার উত্তর তারে না দেয় সে জন।
আরো মনে করে এটা গাধা বিচক্ষণ॥ (৫ সংখ্যক)

অথবা,

নিজ বুদ্ধি বিদ্যার প্রশংসা যেবা করে।
মনুষ্যের মধ্যে গাধা বলে সেই নরে॥

সাংবাদিকতার ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট সম্পাদকও রেহাই পাননি কবির কাছে—

সংবাদ পত্রের যে বা সম্পাদক হয়।
সে যদি দেশের হিতে নিযুক্ত না রয়॥
ধনী কিংবা দরিদ্রের প্রতি সমভাবে।
নাহি লিখে সত্য কথা পক্ষপাতি ভাবে॥
না লেখে দেশের হিতকর সমাচার।
পরনিন্দা পরচর্চা করে অনিবার॥
অর্থ-লোভে লেখে সদা অকথ্য কথন।
সে জন কেমন গাধা বুঝ বিচক্ষণ॥ (৪৭ সংখ্যক)

কবি বহু বিবাহে পারদর্শী কুলীন ব্রাহ্মণকে সমালোচনা করে বলেছেন—

ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম প্রধান কুলীন,
করিতে শতেক বিভা না হয় মলিন।
শতনারী নিয়ে রাখিবেন কুল মান,
আগে আগে উড়ে তার কলঙ্ক নিশান।
এত বিয়ে যাহার করিতে নাহি ভয়,
তাহারে বলিতে গাধা উচিত কি নয়? (৮৪ সংখ্যক)

এই ভাবে কবির দ্বারা সমালোচিত হয়েছে অন্যের দ্বারা রচিত গ্রন্থ নিজের নামে প্রচারে রত ব্যক্তি,স্ত্রী-পুত্রের প্রতি পরাঙ্মুখ হয়ে সুনাম অর্জনের আশায় অন্যদের দান-ধ্যানে রত ব্যক্তি, নিজে মূর্খ হয়েও পিতৃ-পিতামহের জ্ঞানের

গৌরবে গৌরবান্বিত যে ব্যক্তি সম্মান লাভে প্রত্যাশী কিংবা পক্ষপাতিত্বকারী শিক্ষক।

ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন কাব্যটিতে মানুষকে গাধা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কবি ত্রুটি যুক্ত ব্যক্তিদেরই গাধা বলে ভর্ৎসনা করেছেন, সাধারণভাবে মানুষকে তিনি 'গাধা' বলেন নি। ডঃ সেন আরও বলেছেন আলোচ্য গ্রন্থে 'চারি ছত্র করিয়া এক শত আট স্তবক আছে', কিন্তু এই তথ্যও যথার্থ নয়। আমরা যে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছি, তাতেই তা প্রমাণিত। দেখা গেছে কবি যেমন দুই পংক্তির রচনা সন্নিবিষ্ট করেছেন, তেমনি ১৮, ২২, ২৬ পংক্তির কবিতাও রচনা করেছেন। সব কবিতাই চারটি ছত্র সম্বলিত নয়।

'হরিষে বিষাদ' কাব্যটির মুদ্রাকর বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন। কাব্যটির প্রকাশকাল ১৮৮১।

'আমোদিনী-বিয়োগে' এই শোক কাব্যটি রচিত।

কিছুই জীবনে লাগিছে না ভাল,
আঁধার জীবনে আলোক নাই,
হাসি, খুশী আর নাহি লাগে ভাল,
অভাগার আজি সে 'আমোদ নাই'।

কাব্যটি দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত—'আমোদিনী-বিয়োগে' এবং 'হৃদয়োচ্ছ্বাস'। 'আমোদিনী-বিয়োগে' পর্যায়ে স্থান পেয়েছে ১৬টি কবিতা, প্রতিটি কবিতা চারটি পংক্তি সম্বলিত। এগুলিতে পত্নীহারা কবির আর্তি প্রকাশিত। অপরপক্ষে 'হৃদয়োচ্ছ্বাস' পর্যায়ে স্থান পেয়েছে ২৯টি কবিতা। এই পর্যায়ের কবিতাগুলি অধিকতর উপভোগ্য, কারণ কবির ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা কবিতাগুলিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে, প্রকাশিত হয়েছে কবির অকৃত্রিম পত্নী প্রেম। সদ্য পরলোকগতা স্ত্রীর সঙ্গে কবির বিবাদ, মান-অভিমান, নিদ্রাচ্ছন্ন পত্নীকে কবির আদর, পরলোকগতা স্ত্রীর পত্র, পত্নীর অবর্তমানে কবি কি করবেন কবি পত্নী কর্তৃক একদা জিজ্ঞাসিত হয়ে কবি যে উত্তর দিয়েছিলেন তার প্রসঙ্গ, ভাবী সন্তানকে নিয়ে উভয়ের সুখ স্বপ্ন ইত্যাদি কবিতাগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। কবির সঙ্গে তাঁর পরলোকগতা পত্নীর একদা বিবাদ হলে পত্নী কি রূপে তার অভিমান প্রকাশ করেছিলেন একটি কবিতায় কবি তা চমৎকার ভাবে বলেছেন—

প্রেয়সিরে—
আর একদিন হায়—কতদিন হল,
নিশার স্বপন প্রায়,
ছায়াসম মনে হয়,
বিবাদ হইল দোঁহে কথায় কথায় ;
কত কথা বলেছিল অভাগা তোমায়,

শুনিয়ে নিঠুর কথা,
মরমে পাইয়ে ব্যথা,
বলেছিলে দু'নয়নে জল ছল ছল,—
'বলিতে দিয়াছে বিধি, বল-বল-বল।'

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত **'আরণ্য-প্রসূন'** খণ্ডকাব্য, কাব্যগ্রন্থে, রচয়িতার নাম নেই। প্রকাশকাল ১২৮৮। মূলতঃ সামাজিক সমস্যা এবং ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণে বেদনাবোধ প্রকাশের উদ্দেশ্যেই কাব্যটি রচিত।

'আক্ষেপ' প্রথম ও সুদীর্ঘ কবিতা। এই কবিতায় ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণে কবির বেদনা প্রকাশিত হয়েছে—

দাসত্ব শৃঙ্খলে নয়নের জল,
উদয়াস্ত হায় বহিছে কেবল,
দুঃখিনী ভারতে সুখী কেবা বল
রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, আহা!

কবি স্বাধীনতাকেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করেছেন—তাই এর অভাবে অন্য সব কিছুই অর্থহীন—

স্বাধীনতা সার নাহিক যাহার
সুখ সাধ আশা সকলি মিছার,
অধীন জনের বিলাস কি সাজে
কার মুখে হাসি—কিসের সুখ।

আপনার দেশে প্রবাসীর মত,
আছে ত সকলি বল বুদ্ধি হত,

এই দীর্ঘ কবিতায় কবি ইংরেজ সরকার প্রদত্ত উপাধির অসারতা, দেশের কারণে আয়োজিত অর্থহীন সভা ও বক্তৃতা, পত্রিকার প্রকাশ, ইংরেজ কর্তৃক ভারত-শোষণ ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

বিধবাদের প্রতি কবির ছিল অন্তরের সহানুভূতি। একাধিক কবিতাতেই কবি বিধবাদের বিড়ম্বিত জীবনের কথা উল্লেখ করে তাদের প্রতি যেমন নিজের সহানুভূতি দেখিয়েছেন, তেমনি পাঠককেও সহানুভূতিশীল করে তুলতে চেয়েছেন। 'বঙ্গ বিধবা' কবিতায় কবি দুঃখ করে বলেছেন ঃ

সকলের দুঃখ ঘটে রহে না ত চির,
বিধবার অবিরাম বহে অশ্রু নীর;

কবি প্রশ্ন করেছেন সমাজের কাছে—

পত্নীর বিয়োগে সবে গৃহশূন্য কয়,
সন্তান সন্ততি যেন তারা কেহ নয়,
সেই ঘর সেই দ্বার একের বিহনে,
অরণ্য সমান লাগে পুরুষের প্রাণে;

তবে কেন বিধবার প্রতি প্রতিকূল,
হাসিয়া'শাসিতে চাও হলে সে ব্যাকুল ?

'সুখের সংসারে যেন সে কেহই নয়' কবিতাটিতেও বিধবাদের প্রতি কবির সহানুভূতি প্রকাশিত।

আপন সংসার নাহিক তোমার
খাও পর যার এ জনমে তার
ক্রীতদাসী যত থাকে সেই মত
তুমিও তেমতি থাক গিয়া রত
গৃহ-ভার লয়ে কটু কথা সয়ে
অন্তরে পুড়িয়া অধরে হাসি।

'পাষাণ-প্রতিমা'ও বঙ্গ বিধবাকে নিয়ে রচিত।

'কন্যাদায় হইতে কন্যাগুণে রক্ষা' কবিতায় কবি পণপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করেছেন। 'শিশু' কবিতাটি একটি শিশু সন্তানের অকাল মৃত্যুতে রচিত। করুণ রসের আধার এই কবিতাটি সহজেই পাঠকচিত্ত দ্রবীভূত করে। বাল্য বিবাহের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা এবং নারী স্বাধীনতারও বিরোধিতা করেছেন কবি।

উর্বশী-নাটক' (১৮৬৬), ঊষা নাটক (১৮৭১) প্রভৃতি নাটক রচয়িত্রী 'কামিনীসুন্দরী দেবী একটি কাব্যগ্রন্থেরও রচয়িতা। কামিনীসুন্দরী দেবী রচিত '**কল্পনা কুসুম**' কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশকাল ১২৮৮।

কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে মোট ২০টি কবিতা। তন্মধ্যে কয়েকটি বেশ দীর্ঘাকৃতির। যেমন অভাগিনীর বিলাপ, রতির বিলাপ, দুখিনী, আমার মনের কথা। স্বামী বিয়োগে কবির মনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তারই প্রকাশ ঘটেছে 'অভাগিনীর বিলাপ' কবিতায়—

সেইসব আছে যেন কিছু নাই,
নাই আর যেন তেমন ;
সেই আমি আছি, সেই দেহ আছে,
সেইত রয়েছে মন !

'দুখিনী' কবিতাটিতেও স্বামী হারা কবির মর্মবেদনা প্রকাশিত—

থাকি থাকি যাই যাই, সংসারে কিছুই নাই,
ধন নাই মান নাই আদর গৌরব।
যা ছিল এখন নাই, পুড়ে হয়ে গেছে ছাই,
সুখ নাই সাধ নাই, পুড়ে গেছে সব।
পুড়ে গেছে জীবনের আমোদ-উৎসব।

'পক্ষীমাতা' কবিতায় শাবক-হারা পক্ষী-জননীর প্রতি কবির সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। 'স্বর্গীয় মাতা'য় কবির বাল্যস্মৃতিচারণা মূর্ত হয়ে

উঠেছে। 'জন্মভূমি' কবিতাতে স্মৃতিচারণার সূত্রে জন্মভূমির প্রতি কবির সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে—

ইষ্টমন্ত্র সম জপি যে পবিত্র নাম,
সর্ব দুঃখনাশ করে সেই মোক্ষ ধাম ;

বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে চৈতন্যদেব এবং বিদ্যাসাগরকে নিয়ে রচিত দুটি পৃথক কবিতায় কবি এই দুজন মহামানবের উদ্দেশে তাঁর হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। 'চৈতন্যদেব' কবিতায় কবি মহাপ্রভুর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নাম-রত্ন দানের বিষয়ে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

আত্ম পর নাই, সকল সমান,
নাম-রত্ন দাও সকলেরে দান,
জাতিভেদ নাই তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী,
ধন্য হে বৈষ্ণব-সাধু চূড়ামণি !

'বিদ্যাসাগর' কবিতায় কবি বিধবা বিবাহ প্রবর্তনকারী, অবলার সহায়ক বিদ্যাসাগরের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে বলেছেন ঃ

কৃতজ্ঞতা সহ বঙ্গ কুলবালা,
নমে পিত তব পায় ;
দুর্ভাগা বালিকা তোমারি দয়ায়
অকূলেতে কূল পায়।

কবির আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী কয়েকটি কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষতঃ নারী স্বাধীনতা এবং নারী শিক্ষার প্রতি কবির ছিল অন্তরের সমর্থন। 'বিদ্যা' কবিতায় কবির আহবান ধ্বনিত হয়েছে—

অতএব সবে হও বিদ্যাবতী,
বুদ্ধিমতী যদি হবে ধরণীতে।
গুণবতী সতী সকলে বলিবে,
কর বিদ্যা শিক্ষা যত্নের সহিতে ॥

'নব্য-উন্নতিশীলার মনের কথা'য় নারীর দাসত্বে কবির ধিক্কার ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে—

সহোদরা ভগ্নী আমরা সকলে,
সমাজের দোষে স্বতন্ত্র হই।
এক পিতা হতে হয়েছি উদ্ভব,
এক মাতা পৃথ্বী ইথে ভিন্ন নই ॥
তবে কেন সবে আত্ম-ভেদ করি,
রয়েছি পরের অধীনা হয়ে ?
চিরদাসী চির কারাবদ্ধ হয়ে ?
ধিক এ জীবনে কতই সয়ে ॥

মূলতঃ এ যুগে মহিলা কবিরা আপনজন বিয়োগ বেদনা এবং ঈশ্বরানুভূতিকেই তাঁদের কবিতার বিষয় করে এসেছেন, কিন্তু কামিনীসুন্দরী দেবী

সেদিক দিয়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রেখেছেন স্বীকার করতে হয়।

'সতী বিলাপ' কাব্যটির রচয়িতা মাধবচন্দ্র মিত্র বিদ্যারত্ন। কাব্যটির প্রকাশকাল ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ।

ভূমিকায় কবি তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন; 'সতী স্ত্রী কাহাকে বলে, তিনি পতির প্রতি কিরূপ আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শন করেন, স্বামীর সুখ ও দুঃখের অংশভাগিনী হইয়া কিরূপে ধীরভাবে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করেন, এবং হাজার অবস্থা বিপর্যয়েও তাঁহার ভক্তি ও ভালোবাসা কিরূপ অচল অটল ও অবিকৃত ভাবে থাকে, এবং পতি বিয়োগে তাঁহার কিরূপ বিষম অবস্থা উপস্থিত হয়, ইদানীন্তন বামাগণকে এইগুলি স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে।'

কাব্যটি রচিত হয়েছে স্বামীহারা এক স্ত্রীর জবানীতে। বলাবাহুল্য কবি ভূমিকায় 'সতী স্ত্রী'র ভূমিকা সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন, কাব্যে বর্ণিত বিধবা নারীটিকেও সেইমত আচরণ করতে দেখা গেছে। কাব্যটি মূলতঃ পয়ার ছন্দে রচিত, মাঝে মাঝে অবশ্য ত্রিপদীও ব্যবহৃত হয়েছে। সংস্কৃতজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও কবি যে সংস্কৃতানুগ বা তৎসম শব্দ ব্যবহারে দুর্বলতা না দেখিয়ে সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা ভাব প্রকাশের উপযোগী হয়ে উঠেছে, সেজন্য কবির প্রশংসাই প্রাপ্য।

মৃত স্বামীর কারণে বেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে বিধবা রমণী স্বভাবতঃই বিবাহিত জীবনের নানা স্মৃতির উল্লেখ করেছে—যেমন তার স্বামী একদা একশত টাকার জন্য স্ত্রীকে গহনা বিক্রয়ের অনুরোধ করলে রমণী সেই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া দূরে থাক বরং স্বামীকে তীব্রভাবে ভৎসনা করেছে, কিংবা প্রবাসী স্বামীর দীর্ঘ পত্র লিখন ইত্যাদি ঘটনাগুলির উল্লেখ বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

কাব্যে কবি ভালবাসার সংজ্ঞা দিয়েছেন, বলেছেন—

> ভালবাসা কারে বলে ?—যদি নিজ প্রাণ,
> অকাতরে পার তুমি করিবারে দান,
> তার তরে যারে বল আমার আমার
> প্রাণ দিলে যদি প্রাণ থাকে রে তাহার ;
> তবেই জানিও অরে জানিও নিশ্চয়,
> প্রণয়-রতনে তব মণ্ডিত হৃদয়। (পৃঃ ৬৪)

পতিব্রতা রমণীর প্রসঙ্গে কবির বক্তব্য—

> ভালবাসা সেই জানে, যাহার হৃদয়,
> নিজ সুখে দৃষ্টিহীন সকল সময়,
> ভাবে ভর্তা কিসে সুখে রবে অনুক্ষণ,
> তারই তরে নিরন্তর করে আকিঞ্চন ;

কি সুখ কি দুখ বল সকল সময়,
এক ভাবে পতিগত যাহার হৃদয় ;
দারিদ্র্যে কণাও যার না কমে আদর,
সৌভাগ্যে না হয় যার যত্ন বহুতর ;
দশাহীন হলে যার দুখের বিভাগ,
লইবারে অণুমাত্র না হয় বিরাগ ; (পৃঃ ৬৫)

পতিহারা রমণীর বিলাপ রচনাতেও কবি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন—

যাহার গুণের কথা ভাবি বার বার,
অপার আনন্দে মন নাচিত আমার ;
যে ভাবে যে কালে হোক, হেরে যার মুখ,
পাইতাম নিত্য নব দরশন সুখ ;
যারে দেব-সম আমি করিতাম মনে,
স্বর্গসুখ পাইতাম থাকি যার সনে ;
যার সনে মহাবনে করিবারে বাস,
অণুমাত্র অন্তরে না হয় কভু ত্রাস ;
যার সনে তৃণোপরে করিলে শয়ন,
প্রাসাদ-শয়ন-সুখ তুচ্ছ করে মন ;
অনাহারে যার সনে করিলে ভ্রমণ,
অপ্রসন্ন মানস না হয় কদাচন ;
প্রাণ বিসর্জন দিতে হলে যার তরে,
কি করিব ভেবে ক্লেশ না হয় অন্তরে ;
সেইজন তুমি নাথ ! বলহ কোথায়,
লুকাইয়া রহিয়াছ ছাড়িয়া আমায় ।

পতি বিয়োগ বেদনায় বিধুরা রমণী পাখী, গাছ, লতা ইত্যাদির কাছে তার স্বামীর সন্ধান লাভের ব্যর্থ প্রয়াস করেছে। সন্ধান লাভের প্রয়াস ব্যর্থ হলেও সন্ধান লাভের প্রয়াসের বর্ণনায় কবি সাফল্য দেখিয়েছেন।

কাটীপাড়া নিবাসী মোহিতকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত '**পদ্য ভূগোল কথা**'র প্রকাশকাল ১২৯৩। ছত্রধর মিত্রের সাহায্যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লেখক তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন ঃ

'সাধারণত দেখা যায় বালকেরা গদ্য অপেক্ষা পদ্য পড়িতে ভালবাসে ; পদ্যে লিখিত পাঠগুলি গমনে, ভোজনে, স্নানে, ক্রীড়নে সকল সময়ই আবৃত্তি করিতে থাকে, এবং কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলে। প্রকৃতপক্ষে ছন্দোবদ্ধ বিষয় সকল, সকলেরই শীঘ্র কণ্ঠস্থ এবং অভ্যস্ত হইয়া যায়। এই জন্য বালকগণের সুখশিক্ষা হেতু প্রচলিত এবং সমাদৃত কয়েকখানি ভূগোল গ্রন্থ ও মানচিত্র অবলম্বন করতঃ সংক্ষেপে পয়ার ছন্দে এই ক্ষুদ্র ভূগোলখানি সংকলিত হইল।'

ছাত্র ও শিক্ষকের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গ্রন্থটি রচিত রয়েছে। ভূগোল সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সাধারণ জ্ঞান ব্যতিরেকে এশিয়া ও ভারতবর্ষের বিস্তৃত ভৌগোলিক পরিচয় গ্রন্থটিতে উপস্থাপিত।

পৃথিবীর আকৃতি, ঋতু পরিবর্তনের কারণ, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, সূর্যের ব্যাস, সূর্যের আকৃতি, উপদ্বীপ, যোজক, দ্বীপ, অন্তরীপ, উপকূল, পর্বত, সমতল, মরুভূমি, সাগর ইত্যাদি সম্পর্কে উল্লেখের পর এশিয়া প্রসঙ্গে এশিয়ার সীমা, এশিয়া মহাদেশের দ্বীপ, নদ-নদী, হ্রদ, প্রণালী, বিভিন্ন প্রকার ভূমি, পণ্য দ্রব্যাদির বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

অনুরূপভাবে 'ভারতবর্ষ' পর্যায়ে ভারতের সীমা, লোকসংখ্যা, ভারতের পরাধীনতার কারণ, প্রাকৃতিক বিভাগ, ভারতের অন্তর্গত রাজ্য, অন্যান্য মহাদেশগুলির বিবরণও প্রদত্ত হয়েছে।

ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগের পরিচয় দান প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—

সমুদায়ে দুই ভাগে ভারত বিভক্ত
তাহাদের নাম আর্যাবর্ত, দাক্ষিণাত্য ;
"হিমালয় হতে বিন্ধ্য পর্বত" গ্রহণে,
আর্যাবর্ত নাম এর দেন ভূবিদ্‌গণে।
বিন্ধ্য হতে কুমারিকা অন্তরীপ ধরে,
দাক্ষিণাত্য নাম দান করিলা ইহারে।

ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

ভারতের উর্বরতা খ্যাত চিরদিন,
তাই সদা বিদেশীয় গণে করে দীন।
বহু রত্ন ধন হায়। উদরে ইহার,
তাই মোরা পরিয়াছি অধীনতা হার!

বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে—

আয়লণ্ডে —নানাবিধ শস্য আলু আর,
সুরা, বৃষ নানা দিশ রপ্তানী বিস্তার।
স্কটলণ্ডেতে কার্পেট আদি বস্তু চয়,
কার্পাসী ও ঊর্ণা বস্ত্র অতি সুখময়।
ইংলণ্ডে কার্পাসী, লোম নির্মিত বসন,
নানা যন্ত্র, গন্ধ দ্রব্য, কাগজ লবণ,
সীস, লৌহ, টীন, কাচ, সূতা, পুস্তকাদি.
আর নানাবিধ বস্তু খাদ্য অতি স্বাদি।
পর্তুগাল, স্পেন হতে মদ্য ও পশম,
লবণ, বিবিধ ফল ও কারা রেশম।
ফ্রান্স হতে নানাবিধ ছিট, মকমল,
রেশমী, পশমী বস্ত্র, কাচ এ সকল,

কাচের বাসন, ঘড়ি, মদ্য, অলঙ্কার,
কাগজ ইত্যাদি পণ্য রূপেতে বিস্তার।
সুইজারলণ্ডে ঘড়ি, বিবিধ খেলনা।
ইতালী ও গ্রীসে মদ্য, ফলমূল নানা,
মার্বেল প্রস্তর, তৈল, পশম রপ্তানি।
অষ্ট্রিয়া হইতে লৌহ, কাচবস্তু জানি,
ইস্পাত, পশম আর রেশম প্রচুর।
জর্মানিতে যন্ত্র, বস্ত্র, তামাক (সুদূর)।
বেলজিয়ম ও হলণ্ডে—তিমিতৈল শোন,
পাট ও মসিনা আদি। দেন্মার্কেতে শোন,
যব, রাই, গম, ওট, চর্ম, মদ্য, পণ্য।
নরবে ও সুইডেনে,—আল্‌কাতরা গণ্য,
বাহাদুরী কাষ্ঠ, লৌহ তাম্র ভরা ভরা।
রুশিয়ায়, যব, ওট, পাট, আল্‌কাতরা। ইত্যাদি।

লেখকের গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনাটি অভিনব হলেও বাংলায় পদ্যে ভূগোল রচনার ক্ষেত্রে কিন্তু ইনি পথিকৃতের সম্মান লাভের অধিকারী নন। পয়ার রচনায় কবির কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য তবে ভৌগোলিক পরিচয় দানের ক্ষেত্রে সকল সময় ছন্দ ত্রুটিমুক্ত থাকে নি, বিষয়বস্তুই সেজন্য দায়ী।

কটকের সেটেলমেণ্ট অফিসার বরদাচরণ মিত্র কালিদাসের 'মেঘদূতে'র সার্থক বঙ্গানুবাদ (১৮৯৩) করে সেকালের বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তিদের কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত তো বরদাচরণের অনূদিত 'মেঘদূত'কেই শ্রেষ্ঠ অনুবাদ বলে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তাছাড়া স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখেরাও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন বরদাচরণের অনুবাদ কর্মে। বরদাচরণ 'মেঘদূত' অনুবাদের দু'বছর পরে প্রকাশ করেন তাঁর কাব্যগ্রন্থ '**অবসর**' (১৩০২)। গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে ৩২টি কবিতা। কবিতাগুলি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির দ্বারা সংশোধিত।

কবি বোধকরি তাঁর সরকারী কর্মের অবসরে কাব্যচর্চা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই তাঁর কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ করেছেন 'অবসর'। কেননা গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে কথিত হয়েছে, 'পুস্তকের নামে রচনার ইতিহাস।'

বরদাচরণের কবিতাগুলি পাঠে বোঝা যায় যে সত্য সত্যই তাঁর কবি-প্রাণ ছিল আর ছিল প্রকাশক্ষমতা। সহজ সরল ভাবে কবি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। আর এ ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে তাঁর ছন্দোনৈপুণ্য।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে সর্বাধিক স্থান পেয়েছে প্রেমের কবিতা। কবির প্রেমানুভূতিই তাঁর কাব্যরচনার মূল উৎস রূপে দেখা দিয়েছে। এরপরই উল্লেখ করতে হয় গার্হস্থ্য রসের কবিতার। অনেক ক্ষেত্রে আবার প্রেম ও

গার্হস্থ্য চিত্রকে সমন্বিত করে প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়াও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও স্থান পেয়েছে। কিছু বাৎসল্য রসের কবিতা ও একাধিক ইংরিজী কবিতার বঙ্গানুবাদও সংকলনে স্থান পেয়েছে।

চন্দ্রগ্রহণে কবি তাঁর প্রিয়াকে কক্ষমধ্যে আহ্বান জানিয়েছেন। কেন না কবির শঙ্কা—

হতেছে ভয় মনে,—ফেলিয়া শশী,
তোমার মুখখানি গ্রাসে বা রাহু। (আশঙ্কা)

'কেন আসি' কবিতায় কবি তাঁর সৌন্দর্য-প্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন। সখীর রূপৈশ্বর্যের আকর্ষণে তাঁর আকৃষ্ট হওয়া অকপটে প্রকাশিত হয়েছে। স্পর্শ-সুখ নয়, এক্ষেত্রে দর্শন-সুখই কবিকে স্বর্গীয় তৃপ্তি দেয়। এই প্রসঙ্গে কবির প্রশ্ন—

নয়নে—ফুলধনু।
বল না, ফুলতনু!
দেখিয়ে কেন লোকে
অবশ হয়,
যখন ফুলবধূ
বিলায়ে মনমধু,
আলোকি বন-হৃদি
ফুটিয়ে রয়!

'দেবতা' কবিতায় নারী তার দয়িতকেই দেবতার আসনে বসিয়েছে, নিরাকার দেবতার ধ্যানে তার অক্ষমতার কথা জানিয়ে বলেছে ঃ

দেখি তাঁরে, পূজি তাঁরে, ভাবি তাঁরে মনে,
বিরাজেন সদা তিনি পাতিয়া আসন,
হৃদয়-মন্দিরে প্রেম-স্বর্ণ-সিংহাসনে!

'দগ্ধ-হৃদয়ে' ব্যর্থপ্রেমের দীর্ঘশ্বাস অনুরণিত হয়েছে, প্রেমরূপ অমৃত আস্বাদনের বাসনায় গরল ভক্ষণের পরিণতি বর্ণিত হয়েছে--

বল্, কেনরে পশিলি স্মৃতির আগারে,
জ্বালিয়ে রূপের বাতি,
মোর হৃদি যতু-গৃহে লাগালি আগুন,
আলোকিতে তার রাতি?
হায়, বিবেক-বিদুর পড়ে বহুদূর,
না দিল বারতা মোরে,
দেখি, এবে সে আগুন জ্বলিয়া দ্বিগুণ
বেড়ি চারি ধারে ঘোরে।

'শিশুর কান্না শিশুর হাসি' এবং 'খোকার মার প্রতি' কবিতা দুটিতে গার্হস্থ্য রস পরিবেশিত হলেও শেষ পর্যন্ত প্রেমের সুরই বড়ো হয়ে উঠেছে।

প্রথমটিতে বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়েছে নতুন গড়িয়ে আনা সোনার দুল পরতে গিয়ে ষোড়শী যুবতীর প্রতিক্রিয়ার বর্ণনাটি—

নয়ন দুটি বুজে এলো,
সুখে ? ব্যথায় ? কে তা জানে,
পতি পরতে বলেছিল,—
দুললো সাধের দুলটি কানে।

দ্বিতীয় কবিতায় খোকার মধ্যে খোকার মার খোকার পিতাকে প্রত্যক্ষ করার বিষয়টি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে—

তেমতি ভুরুর সুবঙ্কিম টান,
সেই অবয়ব, গঠন প্রথা—
শিশু পিতা হতে লভিয়াছে প্রাণ,
প্রদীপ হইতে প্রদীপ যথা।

'মহানদী' অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কবিতা। কবিতাটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। গ্রীষ্মের মহানদীর সঙ্গে বর্ষার মহানদীর বৈপরীত্যের চিত্রটি উপভোগ্য হয়েছে। ক্ষেত্রে বিশেষে কবি চমৎকার চিত্রকল্প উপহার দিয়েছেন। যেমন 'শিশুর কান্না শিশুর হাসি' কবিতায় দেখি—

নলিন নয়ন ভরে এল
স্বচ্ছ তরল সলিল-কণে,
সরোবরে ভাসলো যেন
কমল-কুঁড়ি ভ্রমর সনে ;

কোনে কোনো ক্ষেত্রে কবি শব্দের ব্যবহারে ঈষৎ অসতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন।

মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার রচিত **'আশা-কাব্য'**টির প্রকাশকাল ১৩০২। কাব্যটি দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত ; প্রতিটি অধ্যায় আবার চারটি করে পরিচ্ছেদে সমাপ্ত।

কাব্যটি অভিনব, আশার সুদূর প্রসারী ক্ষমতা সম্পর্কে কবি আলোকপাত করেছেন।

মানুষ যে ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর থাকে তার কারণ ভবিষ্যৎকেই মানুষ সুখের আগার বলে মনে করে, আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ বর্তমানকে অনায়াসে অবহেলা করে—

উপস্থিত অবহেলি এইরূপে সবে
দূরে তাকাইয়া থাকে ভবিষ্যৎ পানে।
জীবনের যে প্রদেশ ভ্রমি নাই কভু,
আনন্দ কানন সেই সুখের আবাস
যতদূরে আছে ততোধিক মনোহর। (পৃঃ ৮)

সুখের আশায় ভ্রমণরত কবি উপলব্ধি করেছেন সুখের প্রয়াসেই প্রকৃত সুখ, আর ক্রমোন্নতি সাধনের মহামন্ত্র হল আশা—

সুখের প্রয়াসে সুখ, সুখে সুখ নাই,
ক্রমোন্নতিসাধনের মহামন্ত্র আশা। (পৃঃ ১১)

কবি আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী, কেননা তা না হলে মানুষকে কখনই এতখানি আশান্বিত ও জ্ঞান পিপাসু হতে দেখা যেত না—

মরিলেই যদি হয় আত্মার বিনাশ,
তবে কেন এত আশা, জ্ঞানের পিপাসা ?
নহে প্রতারণা কভু মানব-প্রকৃতি,
থাকে আত্মা জীবনান্তে, লভে কর্মফল (পৃঃ ২০)

যে যুক্তিশীলতা মানুষকে স্বর্গীয় আনন্দানুভূতির সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত করে, কবি সেই জ্ঞান ও যুক্তিশীলতার পক্ষপাতী নন—

বুদ্ধি তর্ক ফিরি আসে ধরিতে না পারি
যাহা, বলে কল্পনার সৃষ্টি এ সকল,
আকাশ-কুসুম যথা কিম্বা চন্দ্রে নর,
হৃদয় সহজে পায় দেবীর প্রসাদে,
আনন্দ অপার পেয়ে সে পরশমণি।
মূর্খতাই যেন তাহা, কিন্তু তাহা নেই,
স্বর্গীয় আনন্দ মিলে যদি, তাহা হলে
জ্ঞানী হলেই ত দোষ! কি ফল সে জ্ঞানে ? (পৃঃ ২৩)

আলোচ্য কাব্যটি তত্ত্ব নির্ভর, তবু মাঝে মাঝে কবি তাঁর সৃজনী ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন যেখানে তার অবকাশ পেয়েছেন। বর্ষার বর্ণনায় আমরা কবির মৌলিক সৃজনী ক্ষমতার পরিচয় পাই—

সৃষ্টিস্থিতি—ঐকতান প্রলয় নিকটে।
বিকট চালিত অঙ্গ দশন দর্শন
অট্টহাস, ছিন্নবাস, ঘূর্ণিত অলকা—
এ মেয়ে কেমন, যেন দিগম্বরী রণে! (পৃঃ ৩)

কাব্যটিতে কবি বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎকালের বিবরণ দিয়েছেন, তাছাড়াও দূরের দৃশ্য বস্তুর সঙ্গে জীবনের ভবিষ্যৎ সুখের তুলনা, সুখের প্রকৃতি, সুখের প্রয়াস, সাংসারিক সুখের সঙ্গে ছেলে খেলার পবিত্র আনন্দের তুলনা, আশার উৎপত্তি, প্রাণী ও জড় পদার্থের আকর্ষণ শক্তি, জ্ঞানের অনন্ত স্রোত, আশা বৈতরিণী, ওমর খৈয়ামের পরলোক বর্ণনা, মৃত্যুভয়, জীবাত্মার গতি, পুত্র শোকাতুরা জননীর স্বপ্ন, সুনীতি ও সুরুচির উপাখ্যান, নানা বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যটি রচিত।

‘নির্ঝরিণী’ কাব্যটির রচয়িতা মৃণালিনী দেবী। কাব্যটির প্রকাশকাল ১৩০২। মোট ৫১টি কবিতার সংকলন এটি।

‘প্রতিধ্বনি’র কবি তাঁর ‘নির্ঝরিণী’কে উৎসর্গ করেছেন তাঁর সদ্য পরলোকগত স্বামীকে। মূলতঃ স্বামীর বিরহ বেদনাই কাব্যগ্রন্থটির অধিকাংশ

কবিতা রচনার প্রেরণা। কবি কাব্যটি উপহার দিয়েছেন প্রখ্যাত মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীকে। 'উপহারে'ই কাব্যটির মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে ঃ

আছে গানে—এ আমার অশ্রুজল হাহাকার,
অশান্তি হতাশ, আর মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস,
নাই হাসি নাই বাঁশী, নাই প্রেমমধুরাশি,
নাইকো চাঁদের আলো, মলয়া, ফুলের বাস।
নাই সৌরকরধারা, নাই শশী নাই তারা,
আছে শুধু অমানিশা ঘন ঘোর অন্ধকার।
তাই লয়ে,—যাহা আছে, এসেছি তোমার কাছে,
—তোমার পবিত্র করে দিতে তুলে উপহার।

আলোচ্য কাব্যে কবি তাঁর পরলোকগত স্বামী এবং তজ্জনিত শোকাবেগ প্রকাশ করেছেন যে সব কবিতায় সেগুলি ছাড়াও কয়েকটি অন্য শ্রেণীর কবিতাও রচনা করেছেন। প্রথমে আমরা সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে নিতে পারি।

'আমরা সাতটী' ও 'বালকের শোক' কবিতাদ্বয় দুটি বিখ্যাত ইংরেজী কবিতার অনুবাদ। কবি স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন মূলের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বিদ্রোহ' উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী', গিরীন্দ্রমোহিনীর 'সন্ন্যাসিনী' ঐতিহাসিক নাটক এবং রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' পাঠের প্রেরণায় রচিত হয়েছে যথাক্রমে 'সেমন্তী', 'মনোরমা', 'দুটীফুল বা রত্ন ও শ্রুতি' এবং 'হাসি' কবিতা চতুষ্টয়। 'পত্র' কবিতাটিতে সহোদরা অগ্রজাকে পত্র লেখার জন্য মিনতি করেছেন কবি।

রয়েছি য'দিন হেথা
ভুলোনা ভুলোনা তারে,
রেখো স্থান একটুকু
হৃদয়ের এক ধারে।

'নিন্দুক' সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে শ্লেষোক্তি পাঠে রচিত—

আসিয়াছে রাহু! রবিরে গ্রাসিতে,
আসাই হয়েছে সার;
রবির প্রখর কিরণে তুমিই
পুড়ে হবে ছারখার।

'শৈবলিনী' বাৎসল্য রসের কবিতা। 'অ্যানী বেসান্ট' প্রশস্তিমূলক কবিতা—হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে নিবেদিত প্রাণা বিদেশিনী মহিলার প্রতি কবির অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশিত হয়েছে।

'দুর্গোৎসব' কবিতাটি দেবী দুর্গার রূপ বর্ণনা কিংবা দুর্গার প্রতি অন্তরের ভক্তি নিবেদনের পরিবর্তে কবির স্বদেশপ্রাণতার পরিচয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। দুর্গার প্রতি কবি আবেদন জানিয়ে বলেছেন—

মুছে দে মা আঁখি জল, দে বুকে নবীন বল,
দুরবল হোক্ বলবান;

অন্নপূর্ণে দেমা অন্ন, ঘুচুক বঙ্গের দৈন্য,
দুর্ভিক্ষ পীড়িত পরাণ।

এমন কি ভক্তের উদ্দেশে কবির যে পরামর্শ বাণী ধ্বনিত হয়েছে, তাতেও তাঁর স্বদেশপ্রাণতা তথা নিপীড়িত দুর্বল মানুষের প্রতি আত্যন্তিক দুর্বলতা সূচিত হয়েছে—

পূজিতে চরণ মা'র, লয়ে পুষ্প অর্ঘভার,
কারা ভাই দুয়ারে দাঁড়ায়ে!
এ নয় পূজার রীতি, যদি চাও মার প্রীতি,
দাও হস্ত দরিদ্রে বাড়ায়ে।

'ঈশ্বর', 'একটি সঙ্গীত' এবং 'সংকীর্তনে' কবির ভগবদ্ভক্তি প্রকাশিত।

এইবার আমরা অবিমিশ্র শোক-কবিতাগুলির প্রসঙ্গে আসতে পারি। 'দশমী নিশি' কবিতায় সদ্য বৈধব্যের শিকার কবির আর্তি ধ্বনিত হয়েছে—

রমণীর শিরশোভা, সিঁথায় সিঁদুর রেখা,
হায়! তাহা গিয়াছে মুছিয়া;
কত সাধ কত আশা, কত স্নেহ ভালবাসা,
হায়! সবি গিয়াছে ঘুচিয়া।

'শুকতারা' কবিতার বক্তব্যে দুটি সুস্পষ্ট বিভাগ—একটিতে কবি শুকতারার কাছে তাঁর পরলোকগত স্বামীর মঙ্গলবার্তা জানতে চেয়েছেন। অপরটিতে শুকতারাকে তিনি তাঁর স্বামীর কাছে দূতরূপে মিনতিসহ প্রেরণ করেছেন—

বলিও—"যাহার, অপরাধ কভু,
ধরিত না তব সরল হৃদি;
কোন্ অপরাধে ত্যজিলে তাহারে,—
ভুলে অপরাধ করেছি যদি।
বলিও—"ক্ষমিতে, হবে কি নিঠুর?
পাব না কি ক্ষমা নিকটে তাঁর?"

'বরিষা-হৃদয়ে' কবি তাঁর শোকে প্রকৃতিকেও মুহ্যমান দেখেছেন—

ভগ্নস্বরে কেঁদে কেঁদে বায়ু বহে যায়
হইয়া আকুল;
পাখীরা গাইছে গান,
তুলিয়া করুণ তান,
কাঁদিতেছে তরুলতা,—ম্রিয়মাণ ফুল।

'বাসনা' কবিতায় কবির শুধু গৈরিক বেশ ধারিনী যোগিনী সাজার অভিলাষই ব্যক্ত হয়নি, তার থেকেও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে শূন্যতাবোধ থেকে মুক্তি পেতে জগতের হিতসাধনে ব্রতী হবার বাসনা—

জগৎসংসার মোর আপনার ঘর,
সকলেই ভাই বোন কেহ নহে পর।

ভাই ভগিনীর কাজে জীবন আমার
যাপিবে, কামনা মোর নাহি কিছু আর।

'বাল্যসখীর বৈধব্য শ্রবণে' বাল্যসখীর দুর্ভাগ্যে কবি হৃদয় বিগলিত হয়েছে: সেইসঙ্গে 'বাসনা'র বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে কবি বাল্যসখীকে তার তপ্ত হৃদয়ের বেদনা প্রশমনের সন্ধান দিয়েছেন—

বিপুল বৃহৎ এ জগৎ মাঝে
কেহ কারো নয় পর—
ভাই বোন সব ; এ পৃথিবী শুধু
বৃহৎ একটি ঘর।

'নির্ঝর' কবিতায় কবি নির্ঝরের দোসর হতে চেয়েছেন, কেননা কবি নির্ঝরকে তাঁরই মত শোকাকুল বলে কল্পনা করেছেন—

বড় সাধ দেখি তোরে, কাঁদি তোর গলা ধরে,
মিশাই এ অশ্রু সাথে তোর আঁখিজল
কহিব সুখের কথা, দেখাব হৃদয় ব্যথা ;—
দেখাব জ্বলিছে সদা বুকে কি অনল।

'কোথায়' কবিতায় মৃত্যুলোকের সঙ্গে মর্ত্যলোকের সম্পর্ক বিষয়ে কবির কৌতূহল প্রকাশিত। 'বিটপী বিচ্যুতা বিশুষ্ক ব্রততী' একটি রূপকাশ্রয়ী কবিতা। কবির আশ্রয়হীনতা বিটপীর কক্ষচ্যুতা ব্রততীর মাধ্যমে ব্যঞ্জিত হয়েছে—

ঝটিকায় গিয়েছে ভাঙ্গিয়া—
বিটপিটী আশ্রয় তার ;
ভেঙ্গেছে সাধের ঘর, তাইও ধূলার পর
লুটিছে, আশ্রয় পুনঃ কোথা পাবে আর !

'যাও তুমি হাসি' এবং 'এস অশ্রু, এস' কবিতাদ্বয়ের প্রথমটিতে হাসিকে বিসর্জন দিয়ে দ্বিতীয়টিতে অশ্রুকে আবাহন করা হয়েছে। হাসির উৎসই যেখানে নিঃশেষিত, জীবন যেখানে মরুময়, শ্মশানতুল্য, সেখানে হাসির কোন ভূমিকা থাকে না, হাসি সেখানে একান্তভাবেই অনাবশ্যক—

নিবিড় শ্মশানে পরিণত
হয়েছে সাধের ফুলবন ;
ফুরায়েছে সবি আশা মোর,
প্রাণ এবে মরুর মতন।

অন্যদিকে ঠিক একই কারণে কবি চেয়েছেন নির্জনে নিভৃতে অশ্রুকে নিয়ে বিভোর থাকতে—

সংসারের কোলাহল আর
ভাল নাহি লাগে কানে মোর ;
নিরজনে আপনার মনে
তোরে লয়ে রহিব বিভোর।

'সুখ কারে বলে' কবিতায় সুখের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছেন। যদিই বা সুখ বলে সত্য সত্যই কিছু থেকে থাকে, তবে তার অস্তিত্ব নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, তার প্রতি কোনো গুরুত্ব আরোপ করতে কবি অনিচ্ছুক।

ক্ষণিক সে কিছু কিছু নয়।

'আমার অতীতে' কবি অতীত স্মৃতি চারণায় বর্তমানের শূন্যতাকে অতিক্রম করতে প্রয়াসী—

জীবনে অতীতই শুধু সুখদ আমার ;
এ জগতে যদি দেখা নাহি পাই আর,
তাহারই মধুর ধ্যানে কাটাব জীবন।
আমার অতীতই সত্য,—সে নয় স্বপন।

'মৃত্যু'তে মৃত্যুর নির্মমতার প্রতি ভর্ৎসনা উচ্চারিত হয়েছে। 'একা' নিঃসঙ্গতার বেদনায় আকীর্ণ। আবার 'চিরদিন একা নয়ে' কবি তাঁর নিঃসঙ্গতার অবসান নিজেই ঘটিয়েছেন মানবপ্রীতির বিস্তারে—

যদিও একেলা আমি
তোমরা ত পর নও ;
পিতার সন্তান যদি
আমার ত ভাই হও।

'পরপারে' মৃত্যুর রহস্যভেদের চেষ্টা করা হয়েছে। 'সাধ' কবিতায় বিশ্বপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গে'-র প্রভাব যেন ক্ষীণভাবে অনুভূত হয় এই কবিতায়—

আজিকে আমার প্রাণে উঠিয়াছে কি উচ্ছ্বাস,
আপনারে বিলাইতে হইতেছে অভিলাষ।
অণু পরমাণু হয়ে জগতে ছড়ায়ে রব,
নিজের সামগ্রী মত সবারি আপন ক'ব।

'একাদশী'তে কবি তাঁর সদ্যোমৃত স্বামীর সীমাহীন যন্ত্রণা, অনাহারজনিত বেদনা ও অত্যাচার ভোগের পরিপ্রেক্ষিতে একাদশী তিথি পালন যে মোটেই কষ্টসাধ্য নয়, সে কথাই ব্যক্ত করেছেন।

'বিধবা'য় কবি বৈধব্যের শিকার হলেও তাঁকে 'বিধবা' বলে সম্বোধনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার কথা অকপটে জানিয়েছেন—

জ্বলন্ত আগুন মাখা যেন
মোর কাছে ও "বিধবা" নাম,
জানি. তাই হয়েছি যে আমি,
জেনেছি বিধাতা মোরে বাম।
কিন্তু তবু পারি না সহিতে—
বিধবা আমারে যদি বলে ;
বুক ফেটে যায় যেন মোর,
সপ্তসিন্ধু নয়নে উথলে।

বিধবার নিরাভরণ মূর্তির মতই কবির শোক জ্ঞাপক কবিতাগুলি অনলঙ্কৃত, সহজ ও সরল। হৃদয়-বেদনার অনাবিল প্রকাশে তা সহজেই পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে।

শশধর রায় রচিত '**ত্রিদিব বিজয় কাব্য**'টি, এখন থেকে নব্বই বৎসর পূর্বে রচিত (১৩০৩)। কাব্যটি মোট আটটি সর্গে বিরচিত।

কবি, মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনুসরণে আদ্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যটি রচনা করেছেন। অবশ্য মধুসূদনের মত প্রতিভাবান কবির পক্ষে যা ছিল সহজসাধ্য আমাদের বর্তমান কবির ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই তা ছিল দুঃসাধ্য। তাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহারে যেমন ত্রুটি লক্ষিত হয়, তেমনি ত্রুটি লক্ষিত হয় শব্দ চয়নে। ছন্দের তাগিদে কবি এমন কিছু কিছু শব্দের প্রয়োগ করেছেন, যে প্রয়োগের সঙ্গে আমাদের ইতঃপূর্বে পরিচয় ছিল না। যেমন, উভে (উভয়ে), উমে (উমা), পবিত্রেণ (পবিত্র করেন), ভখিলা (ভক্ষণ করলেন), গ্রহ (গ্রহণ কর), পরিণ' (পরিণয়), মুক্তিদ (মুক্তিদাতা), ভাষিলেন (ভাষণ দান করলেন), তঙ্কে (আতঙ্কে)। মধুসূদনের কল্পনার ঐশ্বর্য, বর্ণনার চমৎকারিত্ব এবং ব্যবহৃত ভাষার যে ওজস্বিতা তা আলোচ্য কাব্যে অনুপস্থিত। মধুসূদন তাঁর কাব্যে শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার প্রয়োগে যথেষ্ট নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু আলোচ্য কাব্যে কবি অলঙ্কার প্রয়োগেও তেমন শক্তিমত্তার স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি। মেঘনাদবধ কাব্যে প্রকৃতির বর্ণনা কিংবা যুদ্ধের বর্ণনা ঐশ্বর্যমণ্ডিত। কিন্তু আলোচ্য কাব্যে প্রকৃতি অথবা যুদ্ধের বিবরণও অত্যন্ত দুর্বল। চরিত্র চিত্রণেও মধুসূদনের সঙ্গে আলোচ্য কবির কোন তুলনাই হয় না। অবশ্য উল্লেখ করতে হয় যে মধুসূদন রচনা করেছিলেন মহাকাব্য (Epic of Art) অপরপক্ষে আলোচ্য কাব্যের কবির সেরকম কোনো পরিকল্পনা ছিল না। তারকাসুর বধের মত পৌরাণিক কাহিনীটিকে আটটি সর্গে সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন কবি। কাব্যের বর্ণনাতেও মধুসূদনের প্রভাবের ছাপ নানা ক্ষেত্রেই স্পষ্ট।

কোথাও কোথাও পংক্তিগত সাদৃশ্যের সন্ধানও মেলে। ঘটনাগত সাদৃশ্যের পরিচয়ও কাব্যের নানাস্থানেই সুলভ। যেমন, মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্র উমাকে সন্তুষ্ট করে তাঁকে নিয়ে উপনীত হয়েছেন ধ্যানমগ্ন মহাদেবের কাছে। আলোচ্য কাব্যেও ইন্দ্র উমাকে সঙ্গে নিয়ে করুণালাভের জন্য ধ্যানমগ্ন মহাদেবের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। তারকা সুরের মন্ত্রীর আচরণের সঙ্গে মেঘনাদবধকাব্যে রাবণের সচিব সারণের আচরণের সাদৃশ্য বর্তমান। বীরবাহুর মৃত্যুতে বিকলচিত্ত রাবণকে যেমন সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সারণ তাঁর প্রজ্ঞার উল্লেখ করেছিলেন, তারকাসুরের মন্ত্রী তেমনি বলেছেন ঃ

বিজ্ঞ তুমি,
অজ্ঞাত সে নহে কিছু তোমার গোচরে।
কি সাধ্য এ দাসে যে সে বুঝায় তোমারে ? (৩য় সর্গ)

মেঘনাদবধে বর্ণিত হয়েছে ঃ

হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে ? (১ম সর্গ)

মেঘনাদবধ কাব্যে পুত্রশোকে কাতরা চিত্রাঙ্গদাকে রাবণ সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন—

এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ? (১ম সর্গ)

'ত্রিদিববিজয়' কাব্যে মহাদেবের সহচর নন্দীকে তারকাসুরকে একই ভাষায় সান্ত্বনা দিতে দেখা গেছে—

এ বিলাপ, কভু—
সাজে কি তোমারে, সুধি ? (৮ম সর্গ)

সমুদ্রোপরি নির্মিত সেতুর কারণে রাবণ সমুদ্রের উদ্দেশে বলেছিলেন ঃ

কোন্ গুণে কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ? (১ম সর্গ)

'ত্রিদিববিজয়ে' তারকাসুর তাঁর মন্ত্রীর উদ্দেশে বলেছেন ঃ

কোন গুণে কহ মোহিলা তাঁহার মন ? (৩য় সর্গ)

মেঘনাদবধকাব্যের প্রারম্ভে কবি বীররসের কাব্য রচনায় কল্পনার সহায়তা প্রার্থনা করে বলেছেন—

তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা ! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র,

'ত্রিদিব বিজয়ে' তারকা সুর বলেছেন—

আইস, আইস, দেবি, তুমি তেজোময়ী
মত্ততা, হৃদয়-পদ্মে রচ পদ্মাসন ; (৪র্থ সর্গ)

লঙ্কাধিপতি সৌমিত্রীর বীর্যবত্তায় মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন—

বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি-কেশরী ! (৭ম সর্গ)

আমাদের আলোচ্য কাব্যে তারকা সুরের প্রশংসা করে দেব সেনাপতি কার্তিক বলেছেন ঃ

ধন্য বলি মানি
তোমা, বীর কুলর্ষভ ; বাখানি তোমার
বীরপণা । (৭ম সর্গ)

আমাদের কবি কাব্যের কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে মেনকা ও হিমালয়ের কাছে দেবর্ষি নারদের দ্ব্যর্থক ভাষায় মহাদেবের পরিচয় দান উল্লেখযোগ্য। দেবর্ষি উমার জন্য পাত্রের সন্ধান দিলে হিমালয় পাত্রের সম্পর্কে জানতে চান। তখন দেবর্ষি মহাদেবের সম্পর্কে দ্ব্যর্থক ভাষায় পরিচয় দিয়ে বলেন ঃ

জনমুখে
অনাদি নামে বিখ্যাত ; নাম রাখিবার
কিন্তু ছিল নাক কেহ, স্বনামে সে ধন্য
বিশ্বে। গোত্রহীন পাত্র, কিন্তু গোত্রপতি
সম। বয়সে প্রাচীন নহে, প্রাচীনের
স্মৃতি বহিভূর্ত, কিন্তু নহে যুবা। শিশু
সম বলিলেও পারি বলিবারে সত্য।
মহাকাল কালের পরিধি প্রান্তে নিত্য
বিরাজিত ; মহাশক্তি বিভূতি ভূষিত।
নিবাস অনন্ত পুরে, পরিণামে জীব—
কুলে যে সুরে বসতি ; বিশ্বের নিবাস
তিনি। স্বভাবে সে আশুতোষ সদা সত্য
প্রিয়, ইন্দ্রিয় বিকার হীন, ধর্ম্মপ্রাণ
সদা। (৪র্থ সর্গ)

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা মঙ্গলে' ঈশ্বরী পাটনীর কাছে দেবী অন্নপূর্ণার আত্ম পরিচয় দানের কথা মনে করিয়ে দেয়।

মেঘনাদবধ কাব্যের মেঘনাদের সঙ্গে আলোচ্য কাব্যের দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়র সাদৃশ্যের সন্ধান মেলে বিশেষতঃ দেশপ্রেমের প্রকাশে।

বিশ্বকর্মার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে পরাধীনতার বেদনা প্রকাশ করে কার্ত্তিকেয় বলেছেন

এ কলঙ্ক,
এবিষাদ সহিতে না পারি, শিল্পিবর।
কেমনে বা সহিছ সে তুমি ? (৫ম সর্গ)

পুনরায়,
শিখাও বিদ্যা ;
কেমনে সে নাশিব রিপুরে, সুকৌশলি ;
আপনার দেশে আপনি বসিব পুনঃ,
বসাইব দেবে নিরাপদে।

পরাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে কবির মর্মপীড়ারই অভিব্যক্তি লক্ষিত হয় কার্ত্তিকেয়ের বক্তব্যে।

ইন্দ্রের উপস্থিতিতে মহাদেব অভয়াকে তাঁর ঔরসে দেবসেনাপতির জন্মের কথা বললে অভয়ার এই প্রসঙ্গে বিজয়ার কাছে সলজ্জ উক্তি—

নতশির লাজ ভরে
রহিনু খানিক। কি বিষম দায়ে ভোলা
ফেলিলা তখন, কি কব, বিজয়ে, তোরে।
.... কহত লো,
কি ভাবিলা শিশু, হায়, বাসব সে কালে ? (২য় সর্গ)

অভয়ার চরিত্রটিকে যেন মূর্তিমতী করে তুলেছে।

এইবার 'ত্রিদিব বিজয়' কাব্যে কবির ব্যবহৃত কয়েকটি স্মরণীয় উক্তির উদ্ধার করা হ'ল—

ক) রাজশক্তি অদম্য না হলে
শান্তি, সুখ বৃথা বাক্য, রোগীর প্রলাপ। (৩য় সর্গ)

খ) বিচারী যদি অবিচারে রত—
কতকাল সহে জীব, হে বিচারপতি? („)

গ) পতনের অগ্রে চিন্তা, কি চিন্তা পতনে? (৭ম সর্গ)

ঘ) কণ্টকীর শাখে ফুটে পারিজাত কভু? („)

ঙ) জন্ম যদি ভবে, মৃত্যু বিধি—
বশে অনিবার্য ; (৮ম সর্গ)

পরিশেষ কাব্যে প্রযুক্ত কয়েকটি অলঙ্কারের নিদর্শন গৃহীত হল—

ক) এত কহি স্বরীশ্বর স্মরিলা স্মরেরে (অনুপ্রাস ; ১ম সর্গ)

খ) বাঁচিত কি কভু নারীলতা,
আশ্রয়ের তরুশাখা বিনা? (রূপক ; ২য় সর্গ)

গ) কে আর জাগাবে, মাতঃ চিত্ত মরুতলে
বাসনা প্রস্রবণ? (রূপক : „)

ঘ) জীব—
বৃক্ষে, কহ, ক্ষেমঙ্করী, কে আর ফুটাবে
নয়ন রঞ্জন ফুল, কুসুমেষু বিনা? (রূপক ; ২য় সর্গ)

ঙ) গাইবে তটিনী কভু কুলু কুলু স্বরে? (সমাসোক্তি ; „)

চ) শুক্লপক্ষ কলা সম, বাড়িলা দুহিতা (উপমা : ৪র্থ সর্গ)

ছ) নিজগুণে হর দয়া করি, হর। (যমক ; ৪র্থ সর্গ)

কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত **'মানস-কুসুমে'**র (১ম ভাগ) প্রকাশকাল ১৮৯৭। কাব্যটি মোট সাতটি অঙ্কে বিভক্ত। প্রতিটি অঙ্কে চারটি করে কবিতা সংকলিত হয়েছে। অর্থাৎ মোট ২৮টি কবিতার সংকলন এটি।

১ম অঙ্কের অন্তর্গত 'চিত্রল—সমর' কবিতাটি ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে রচিত। পাঞ্জাব সীমায় চিত্রলে উমরাখান রবার্টসন নামীয় এক ইংরেজ সেনাপতিকে ব্রিটিশ দুর্গ মধ্যে বন্দী করে রাখলে ব্রিটিশ সৈন্য রবার্টসনের মুক্তির জন্য সচেষ্ট হয়। এই বিষয় নিয়েই কবিতাটি রচিত। কবি এই কবিতায় যুদ্ধবিরোধী—মানসিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন—

কত শত নারী হবে অনাথিনী,
কত শত শিশু হবে পিতৃহীন!
কত শত মাতা হারাবে সন্তান,
কত শত মুণ্ড ভূমে হবেলীন!

কবিকে ব্রিটিশের সমর্থনেও সোচ্চার হতে দেখা গেছে৷ তাই কবি প্রার্থনা জানিয়েছেন—

অতীব দুর্গম দীর্ঘ গিরিপথ
তোমার কৃপায় হউক সরল,
ভাস্কর উদয়ে তারাগণ মত
অদৃশ্য হউক বিপক্ষ সকল।

'পূর্ণ চন্দ্র' কবিতাটি চন্দ্রালোকিত প্রকৃতির অনবদ্য লিপিচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত কবিতাটি শেষ হয়েছে নীতি-উপদেশে—

রূপের গৌরব কর রে মিছে !
নয়ন মুদিলে হারাবে সকল,
নামটী কেবল রহিবে পিছে ॥

'নববর্ষ' দীর্ঘ কবিতা, বর্ণনামূলক। কবিতাটি শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে রচিত। কোনো কোনো স্থলে ছন্দের ত্রুটি লক্ষিত হলেও কবি কবিতাটিকে উপভোগ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কবিতাটির প্রথম দিকে প্রকৃতির বর্ণনা থাকলেও, শেষ পর্যন্ত নববর্ষে বাংলাদেশের মানুষ কেমন উৎসবে মত্ত হয়, তারই জীবন্ত বর্ণনাদান করেছেন। কবিতাটির ঐতিহাসিক মূল্য তাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরোহিতের মাধ্যমে গৃহস্থের পূজার্চনার আয়োজন, বালিকাদের বিভিন্ন প্রকার ব্রতানুষ্ঠান এবং সর্বোপরি চড়কের বিবরণ কবিতাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বালিকাদের ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজন প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

কেউ বলিছে "আয় গো দিদি, পুণ্যি পুকুর খুঁড়ি,
মাঝে পুত্‌বো তুলসীগাছ, চার কোণে চার কড়ি।"
হরিচরণ আঁকে কেহ, কেউ বা ফুল তোলে,
কেউ বা গোকাল ব্রত করে, দূর্বা আনতে চলে।

দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তর্গত 'মেঘ' কবিতায় কবি বৈপরীত্য সৃষ্টির মাধ্যমে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। প্রচণ্ড দাবদাহে দগ্ধ ধরণীর বক্ষে বৃষ্টির অঝোর ধারা অভিনন্দিত হয়, কিন্তু জলপথের যাত্রীরা কখনই প্রসন্নচিত্তে মেঘবর্ষণকে অভিনন্দিত করে না—কবি মন্তব্য করেছেন—

একে উপজিল সুখ
অপরে বিষম দুখ,
অমৃত আধার দোষে হইল গরল ;

'শারদোৎসব'ও সুদীর্ঘ কবিতা, এই কবিতায় দুর্গা পূজা উপলক্ষে বঙ্গদেশ কেমন উৎসব-মুখর হয়, তার বিবরণসহ দেবী পূজার সার্থকতা বিষয়ে কবি মন্তব্য করেছেন। শহরের বাবুর দুর্গা পূজা উপলক্ষে খানাপিনার যে আয়োজন, কবি তার বাস্তবানুগ বিবরণ দিয়েছেন—

ব্রাণ্ডির বোতল ঘরে আছে দু'ডজন ;
শ্যাম্পিন শেরির কিছু হবে প্রয়োজন।
চপ কটলেট চাহি, আর চানাচুর,
সোডা লেমনেড আর, বরফ প্রচুর।

'রেলগাড়ী' কবিতাটিও সুদীর্ঘ। এই কবিতায় রেলগাড়ীর ইঞ্জিন ও কামরাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীর বিবরণ, গাড়ীর আসা-যাওয়াকে কেন্দ্র করে স্টেশনের চাঞ্চল্য, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে যাত্রীদের খাওয়া-দাওয়া, বিভিন্ন যাত্রীর টিকিট কাটা ও ট্রেনে চড়ার অভিজ্ঞতা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। রেলগাড়ী এদেশে চালানোর জন্য ইংরেজদের প্রতি কবির প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধাবোধও প্রকাশিত হয়েছে।

তৃতীয় অঙ্কের অন্তর্গত 'অন্ধের উক্তি' কবিতায় প্রকৃতি ও মানব সমাজের দর্শনীয় বস্তু আস্বাদনের সুযোগ লাভে বঞ্চিত অন্ধ ব্যক্তির অনুযোগ প্রকাশিত—

শুনেছি হে হরি তুমি নিরাকার,
সৃষ্টিও তোমার নিরাকার বুঝি,
আঁধার আঁধার ত্রিভুবন ।।

চতুর্থ অঙ্কের অন্তর্গত 'ভারতে দুর্ভিক্ষ' কবিতায় কবি দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভারতের মর্মন্তুদ চিত্র অঙ্কিত করে কাল সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু দুর্ভিক্ষের কারণ স্বরূপ অভিহিত করেছেন ভারত বাসীর পাপকে। কবিতাটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। 'হাসি' কবিতায় হাসির প্রকার ভেদ বর্ণিত হয়েছে। শিশুর সুন্দর হাসি, জটিলতাযুক্ত চপলা বালার হাসি, নবোঢ়ার সলাজ হাসি, যুবা-যুবতীর প্রেমময় হাসি, বিশুদ্ধ প্রেমের হাসি, স্বার্থপরের কুটিল হাসি, পাগলের অর্থহীন হাসি ইত্যাদির বিবরণ দিয়েছেন। 'আলোকলতা' কবিতায় কবি আলোকলতার সঙ্গে বারবনিতার তুলনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন—

দেখতে কেমন চিকন চাকন, হলুদ পানা রং,
আলোকলতার বারবনিতার, একই রকম ঢং।
বাইরে যেমন নধর শরীর, নাই ভিতরে সার,
ভিতর ভরা তিক্ত রসে, বাইরে চমৎকার।

সপ্তম অঙ্কের অন্তর্গত 'কৃষ্ণকুমারী' কবিতাটি রাজস্থানের বহুখ্যাত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'হীরক জুবিলি' কবিতায় কবি ইংরাজের প্রশস্তিতে মেতেছেন—

রাজার উৎসবে তোমার উৎসব,
রাজার কুশলে তোমার কুশল ;

মহম্মদ মীর আল্লা প্রণীত '**বিধবা-গঞ্জনা**' কাব্য গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৯৭। এই একই কাব্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও একটি কাব্য—'বিষাদ ভাণ্ডার'।

কাব্যের প্রথমেই সংযোজিত 'আভাসে' কবি তাঁর কাব্য রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেছেন—

অবলা রমণী কুল চির পরাধীনা
সেই হেতু বিধবারা থাকে পতিহীনা।

তাও এ ভারতে কতিপয় পাপালয়-
ভিন্ন আর পৃথিবীর কুত্রাপিও নয়।
তাইত বাসনা আজ, করিয়া যতন
বিধবা হৃদয় চিত্র করিব অঙ্কন।
শুনাব বিষাদ গীতি, পরান ভরিয়া,
ভারত সন্তান গণে, বিনয় করিয়া। (পৃঃ ২)

মানবিক গুণসম্পন্ন মুসলমান কবির হিন্দু বিধবার দুঃখে বিগলিত হওয়ার ফলেই বর্তমান কাব্যটির আত্মপ্রকাশ।

'বিধবা-গঞ্জনা' কাব্যটি দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। বিধবাদের স্বার্থবিরোধী দেশাচার, যুক্তিহীন সামাজিক নিয়ম, বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায় সমাজের অধঃপতনের চিত্র, বহুবিবাহ প্রথা, বৃদ্ধের সঙ্গে অল্পবয়সী কন্যার বিবাহ দানের অযৌক্তিক প্রথা ইত্যাদির নির্মম চিত্র কাব্যটিতে পরিস্ফুট।

কবি সরলা, তরঙ্গিনী, সৌদামিনী প্রভৃতি চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশের জন্য।

সরলা ও তরঙ্গিনী দুই সখী। সরলা সধবা অপরপক্ষে তরঙ্গিনী পতিহীনা। তরঙ্গিনীর বেদনার তীব্রতা প্রকাশের জন্য কবি সরলার পতিসঙ্গ-সুখের প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন—

এ চিত্ত আকাশ পতিরূপ চন্দ্র করে
সতত বিদ্যুৎ সম আলোকিত করে॥
ধরায় হয়েছি মোরা স্বরগ-নিবাসী।
প্রণয় পয়োধি-নীরে মহানন্দে ভাসি॥
পতিপদে সঁপিয়াছি জীবন যৌবন।
পেয়েছি অক্ষয় সুখ হেরে স্বামীধন॥ (পৃঃ ১০)

অপরপক্ষে বৈধব্যের শিকার তরঙ্গিনী জানিয়েছে তার দুর্ভাগ্যের কথা—

শৈশবে সময়ে পিতা দেন মোর বিয়ে।
শৈশবেই স্বামী ধন যান ফাঁকি দিয়ে॥
বিফল জীবন মোর, বৃথা এ সংসার।
মানব জনম হায়! হইল অসার॥ (পৃঃ ৮-৯)

পতিপ্রেমে বঞ্চিতা, সাজসজ্জার সুযোগ লাভে এবং পতির সঙ্গে রঙ্গ রস করা থেকে চিরতরে বঞ্চিতা হতভাগিনী বিধবা রমণীর কাতরোক্তি কবি বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

পরি অলঙ্কার, ঠমক ঝঙ্কার,
কাহারে শুনাব আর।
ভাল শাড়ী পরে, সুবাহার করে,
সামনে দাঁড়াব কার?
হইয়াছি রাঁড়ী, গহনা ও শাড়ী,
এ জীবনে পরিব না।

লয়ে স্বামী ধন, প্রেম আলিঙ্গন,
আর ভবে করিব না ॥
ফুলেল মাথায়, আলতা হাতে পায়
আমি আর দিব না লো।
মুখে মুখ দিয়া, পান কেড়ে নিয়া
কভু আমি খাব না লো !!

তরঙ্গিনীর মনোবেদনা তীব্র হয়ে উঠেছে নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতে—

সাধে কি সেজেছি আমি চাতকিনী সৈ লো।
দহিছে হৃদয় মম প্রাণপতি বৈ লো !!
অনন্ত বিরহানল,
হৃদযেতে অবিরল
জ্বলে যেন হলাহল, কাহারে তা কই লো
পড়েছি ভীষণ রণে,
এ পোড়া যৌবন বনে,
বিন্ধিছে কণ্টক মনে, আর কত সই লো !!
চাতকিনী শূন্য ভবে
মেঘ-বারি বিনে মরে
তবুও সে আশা করে, আমি তাও নই লো ?

কবি বিধবাদের পরামর্শ দিয়েছেন মুসলমান হয়ে পুনরায় বিবাহ করে স্বামীসঙ্গ সুখলাভে জীবনকে সার্থক করে তুলতে—

কলেমা লইয়া সধবা হইয়া,
সাধ দু কালের ধন ॥ (পৃঃ ২৩)

সৌদামিনী বিবাহিতা, কিন্তু তার মনোবেদনা তার বৃদ্ধ পতির কারণে—

মা বাপের চখে মোর পড়েছিল ছাই।
টাকার লোভেতে অন্ধ হয়েছিল তাই ॥
পাইয়া অনেক টাকা মোর পিতা মাতা।
ভুলিয়া দুজন তারা আমার মমতা ॥
তিন কেলে বুড়ো বর না বয়ার
এনে দিল তার সাথে বিবাহ আমার।

'অনন্তোচ্ছ্বাস' ২২টি পৃথক পৃথক পদ্যের সংকলন। এই পদ্যগুলিতেও বিধবাদের জন্য কবির আর্তি প্রকাশিত। 'দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কবিতায় কবি বিধবা বিবাহের ব্যাপারে অক্লান্ত কর্মী বিদ্যাসাগরের তিরোধানে শোক প্রকাশ করে এই আশা ব্যক্ত করেছেন—

হীন কবি কয়, সেই মহোদয়—
ভারত ব্যাপিয়া,
যে বীজ বপিয়া,
গেছে অঙ্কুরিয়া (কালে) ফলিবে নিশ্চয় !!

'তাই ওঃ', 'কেন না মা!' 'সন্তাপিত পাখী' কবিতাগুলিতেও বিধবাদের দুঃখ-বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। 'মাতা মহারাণী' কবিতায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রশস্তি গাওয়া হয়েছে।

১৭৫৪ শকাব্দে (১৮৩২) মেটেরি বা মাটিয়ারি গ্রামে গীতিকার বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। বিষ্ণুরামের পিতা ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। বিষ্ণুরামদের আদি নিবাস ছিল নদীয়া জেলার মধ্যবর্তী বিল্ব গ্রামে। কবির পিতামহ এখান থেকে কাটোয়ার পরপারবর্তী গঙ্গাতীরস্থিত মেটেরি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। বিষ্ণুরাম মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কাশিমবাজারের জমিদার অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের কাছে কাজ করতেন।

বিষ্ণুরামের গীত রচনার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বাল্যাবস্থা থেকেই। পাঁচালীকার দাশরথি রায় বিষ্ণুরামের বাল্যকালে রচিত কৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'এ বালকের যে রসে গীত বাঁধা সে রস প্রকাশের উপযুক্ত বয়ঃক্রম হয় নাই, কালে এ বালক মহাকবি হইবে।'

রাজনারায়ণ বসুও বিষ্ণুরামের গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি বিষ্ণুরামের বেশ কয়েকটি সঙ্গীত ভাষান্তরিত করেছিলেন। 'সোম প্রকাশ' খ্যাত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তো বিষ্ণুরামকে রামপ্রসাদের পরেই স্থান দিয়েছিলেন। মনীষী রমেশ চন্দ্র দত্তও কবির সঙ্গীত প্রতিভার অনুরাগী ছিলেন!

১৮৬৮ সালে বিষ্ণুরামের 'গীত-মালা'র ১ম ভাগ মুদ্রিত হয়। এর নয় বছর পরে ১৮৭৭ সালে 'গীত-মালা'র ২য় ভাগ মুদ্রিত হয়। এরপর দীর্ঘ তেইশ বছর পরে ১৯০০ সালে **'গীত-মালা'**র ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়।

মোট ৩০৮টি গানের সংকলন 'গীত-মালা'। প্রতিটি গানের সঙ্গে সুর ও তাল উল্লিখিত হয়েছে। 'গীত-মালা'র গানগুলি উপদেশ মুলক ও অধ্যাত্ম বিষযক। বস্তুত পক্ষে অধ্যাত্ম বিষয়ক সঙ্গীত রচনাতেই কবির অনায়াস নৈপুণ্য। ২৮ সংখ্যক সঙ্গীতে কবি ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিরূপণের চেষ্টা করেছেন—

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।
তত্ত্ব আর তত্ত্বাতীত হে, তত্ত্ব তার না পাই বেদ পুরাণে,
তত্ত্ব করে না পাই তত্ত্ব ও তার বেদ পুরাণে।
তুমি জনক কি জননী ভাই কি ভগিনী,
স্বজন পরিজন কি পুত্র কন্যে;
এ নয় তোমাতে সম্ভব, এ কি অসম্ভব,
সম্পর্ক নাই কিন্তু পর ভাবিনে।

৫৪ সংখ্যক গীতে কবির ঈশ্বরপ্রীতির অনাবিল প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়—

ওরে, আমার মন ভুলালে যে, কোথায় আছে সে।
সে দেখে আমি দেখিনে ফিরে চাই আসে পাশে।

কখন রই মুদে আঁখি, কখন এক দৃষ্টে থাকি
কত বলে কত ডাকি, দেখব মনের আশ্বাসে।

১০৭ সংখ্যক গানে কবি নক্ষত্রদের ব্রহ্মের উপাসক, চন্দ্র ও সূর্যকে যথাক্রমে আচার্য ও উপাচার্য রূপে কল্পনা করে এক অভিনব চিত্রকল্প রচনা করেছেন—

ব্রহ্ম উপাসনা করে গগনে নক্ষত্র গণে।
ঐত প্রকৃত সভা অশক্ত শোভা বর্ণনে।
যেমন আছে অবধার্য, করিছেন সভার কার্য,
আচার্য আর উপাচার্য, চন্দ্র সূর্য দুই জনে।

১০৯ সংখ্যক গীতে কবি জলে-স্থলে, হৃদয়ে, পবনে সর্বত্র দেবতার প্রকাশ লক্ষ্য করে অভিভূত হয়েছেন—

জলেতে লিখেছ জগৎ-জীবন,
পবন হিল্লোলে হয় দরশন,
জ্বলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
জ্যোতির্ময় নামে জগৎ দেখাতেছ।

১১৪ সংখ্যক গানে কবি ঈশ্বর লাভের সহজ উপায়টি ব্যক্ত করেছেন—

প্রেম আছে তাই জগৎ আছে, প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে,
ওরে, প্রেম লয়ে যায় তাঁরি কাছে, এই প্রেম পবিত্র হলে।
প্রাণ ছাড়তো প্রেম ছেড়না, প্রেমের গাছেই সে ফল ফলে,
তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন, ধরা পড়েন প্রেমের কলে।

১২৪ সংখ্যক গানে কবি তরুর কাছে লব্ধ নীতি শিক্ষার উল্লেখ করেছেন—

পর হিতেরি তরে, প্রাণ দান দিস্ অকাতরে,
বলব্ কি ধন্য তোরে, ধন্য ধর্ম বল রে;
আশ্রিত হিংস্রকে, আতপে করিস্ রক্ষে,
এ নীতি শিখাল কে, লোকে যা বিরল রে।

এইবার ভিন্ন রসের কয়েকটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে।

১২২ সংখ্যক গানটিতে কলকাতার বৈশিষ্ট্য, বিশেষত কলকাতার দর্শনীয় বস্তুগুলির বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, বর্ণিত হয়েছে কলকাতার কর্ম চঞ্চল জীবনধারা—

কত দোকান পসারী,
কত বালাখানা চিড়িয়াখানা কারখানা ভারি,
চলে ট্রাম গাড়ি, ফুটপাথ দুধারি;
পথের ধারে ধারে উঠছে বারি,
সার গাছের ছায়াতে পথিক জুড়ায়।
শোভে চক্ চাঁদ্নি বাজার,
যেমন অসুমার আমদানি তেমনি হয় উজাড় বোঝার,
রাত্রি দিন গুলজার, লোক হাজার হাজার;
ও কেউ, কিনছে বেচ্ছে ইচ্ছে যে যার,
লাভে মূলে কেউ হারায় কেউ গড়ে যায়।

সার সার গ্যাসের আলো,
আবার, ইলেকট্রিক লাইটের আলো তা হতেও ভালো,
অলিতে গলিতে নাই আঁধার কালো ;
আলো রেলে জলে লালে নীলে,
পুলে কলে উজ্বলে আলোক মালায়।

১৪৪ সংখ্যক গানে ১৩০৪ সনে অনুষ্ঠিত ভূমিকম্পের স্মৃতি বর্ণিত হয়েছে—

এমন ভূমিকম্প কে কবে দেখেছে আর।
সদাই শঙ্কা তাই পাছে হয় আবার ;
সাল তেরশ চা'র ত্রিশে জ্যৈষ্ঠ রহিবে স্মরণে সবার।
ভেঙ্গেছে কম ঘর এক তালা, পড়ে নাই এক খড়ের চালা,
সকল হতে নিরাতঙ্ক গাছ তলাই।

১৪৫ সংখ্যক গানটি কৌতুক রসের। ভেজাল ঘিয়ের কারণে ব্রাহ্মণদের জন্য পুনরায় চিঁড়ে ফলার প্রবর্তিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এটি—

ভারতের যা পরম ভোগ্য যে ঘৃতে করে আরোগ্য
যাতে হয় হোম যাগ যজ্ঞ, তাই গেলো ত কেন রই।
কালচক্রে ঘুরে ফিরে, আবার যখন এলো চিড়ে,
আরও কত আসতে পারে, আশানন্দে

১৪৮ সংখ্যক গানটিতে মহাকবি মধুসূদনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে—

মরে কথা কওয়া সম্ভবে মধুর,
অমিলেতেও যাঁর কবিতা মধুর,
ভাবের মিলই মিল ভাবেই সব মধুর
এত দূরে আগমন।
আজি এ শ্মশানে অপূর্ব দর্শন,
এক স্থানে রবি শশী তারাগণ,
কারো জ্যোতিভর্ঙ্গ নাই সে কারণ,
মধুর কাব্যেতে যেমন ;

বেশ কয়েকটি গানেই কবি ভারতবাসীর সুরাসক্তিতে বেদনা প্রকাশ করেছেন। যেমন ১৫৭ সংখ্যক গানে কবি লিখেছেন,

হেন ভারত সন্তানে, মত্ত হয়ে সুরাপানে,
তত্ত্ব পথ ত্যজে অজ্ঞানে, ধনে প্রাণে মারা যায়।

কিংবা ১৫৮ সংখ্যক গানে কবির খেদোক্তি, 'সোনার ভারত মজালে মদিরায়'। ভারতবর্ষের অধঃপতনেও কবির দুঃখবোধ প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটি গানে। ১৫৬ সংখ্যক গানে কবি বলেছেন—

জাতীয় সম্মান গিয়েছে অনেক দিন।
হে ভারতবাসীগণ, করিয়ে দেখ স্মরণ,
সেই স্মরণ মনন নিদি ধ্যাসন ;

ভজন সাধন যত, সে দিন হয়েছে গত
যেদিন হয়েছে ভারত স্বধর্ম হীন পরাধীন।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে, 'তরু বল রে বল', 'মন যে তোমারে চাহে, তোমারি সে গুণে', 'তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার' ইত্যাদি।

'ভক্তির উপহার' (পরমার্থ বিষয়ক কবিতাবলী) নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার বিরচিত। নীলমণি মুখোপাধ্যায় ছিলেন সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। লেখক গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

'The Bhaktir Upaher is written with the object of teaching our young student lessons on piety, loyalty and morality.'

অর্থাৎ ছাত্রদের জন্য রচিত এটি ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণে লেখকের নাম অনুল্লিখিত ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের নাম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণটির প্রকাশ কাল ১৯০০ সাল। গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে ঊষা স্তোত্র, সূর্যোদয়, গোষ্ঠগাথা, ঈশ্বর স্তোত্র (১ম থেকে সপ্তম), শ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া, জাতীয় সঙ্গীত, ব্রিটন সাম্রাজ্য, কীর্তি, ধর্ম, সজ্জন চরিত, খল চরিত, স্বাস্থ্য-নিবাস, রাম-চরিত এবং অর্জুন-চরিত। 'ঈশ্বর স্তোত্রে' কবি আহ্বান জানিয়েছেন ধর্মে উৎসর্গীকৃত প্রাণ হতে—

ধ্যানেতে যদি না পার, ধর্মে প্রাণ পণ কর,
ধর্ম-চর্চা হতে হবে জ্ঞান—শ্রদ্ধা—বুদ্ধি,
ঈশ্বরের অনুগ্রহে পাবে পরে সিদ্ধি।

সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ নীলমণি বাবু ছিলেন ইংরেজ সরকারের একান্ত অনুগত, তাঁর সেই আনুগত্য নানাভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। শুধু নিজের আনুগত্য প্রকাশ করেই তিনি কর্তব্য শেষ করেননি, ছাত্রদেরও ইংরেজ রাজত্বের প্রতি অনুগত করতে চেয়েছেন।

'শ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া'য় কবি ইংরেজের স্বাধীনতা প্রিয়তার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন, কিন্তু নিজে স্বাধীনতা প্রিয়তার পরিচয় দানে ব্যর্থ হয়েছেন পরাধীন দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও। ভারতবাসীর রাজভক্তি ঐতিহ্যানুগত বলে কবি উল্লেখ করে পরোক্ষে দেশবাসীকে ইংরাজ রাজত্বের প্রতি অনুগত করে তুলতে চেয়েছেন—

রাজভক্তি ভারতের কুল ক্রমাগত,
যুগ যুগান্তর হতে ধর্মে পরিণত।

'জাতীয় সঙ্গীতে' কবি জানিয়েছেন—

'আমাদের মন প্রাণ রাজ্ঞীতে অর্পিত।'

'ব্রিটন সাম্রাজ্য' কবিতায় কবি ফ্রান্স, জার্মানি, রুশিয়া, ইটালী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের তুলনায় ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। ভারতের প্রসঙ্গে কবির বক্তব্য—

অপূর্ব অচিন্ত্য বিধাতার বিধি,
ভারতে ব্রিটেনে রবে নিরবধি
এক সূত্রে গ্রথিত ধরার কণ্ঠহার

'কীর্তি' কবিতায় কবি রামচন্দ্র, বাসুদেব, বাল্মীকি, ব্যাসদেব, কালিদাস, ভারতচন্দ্র, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব, রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখাদির কীর্তি বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, বলতে চেয়েছেন কীর্তিই মানুষকে স্মরণীয় করে রাখে। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে কবি বলেছেন ঃ

অমর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারসাগর,
শতধারা দয়ার প্রভব ধরাধর ;
সরল, স্বাধীনচেতা, কোমল-অন্তর,
বঙ্গভাষা-নলিনীর নব-বিভাকর ;
অনাথার চিরবন্ধু, দেশ-হিতে রত,
বিদ্যার উন্নতি তরে দীক্ষিত সতত ;

অখিলচন্দ্র পালিত রচিত **'হৃদয়-গাথা'** কাব্যটিকে (১৯০২) বিরহ-কাব্য বলে অভিহিত করা যায়। কেননা এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতারই সুর বিরহের। কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছে নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে।

আলোচ্য কাব্যটির পাঁচটি পর্যায়—(ক) বাল্যরচনা ; (খ) হৃদয়-গাথা ; (গ) বিবিধ ; (ঘ) পত্র এবং (ঙ) অনুবাদ ও অনুকৃতি। তন্মধ্যে 'হৃদয়-গাথা' পর্যায়েই সর্বাধিক কবিতা স্থান পেয়েছে। 'বাল্য-রচনা' পর্যায়ে স্থান পেয়েছে 'বিদ্যুতের প্রতি', 'বিসর্জিতা দেবী প্রতিমা' এবং 'কে তুমি' কবিতাত্রয়। 'বিদ্যুতের প্রতি' কবিতায় কবি বিদ্যুৎকে নারীরূপে কল্পনা করে নিজের রূপের কারণে অহংকারী বলে অভিযুক্ত করেছেন এবং বিদ্যুৎ অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দরী আছে বলে বলেছেন—

তোমা চেয়ে আছে রূপ মনোমুগ্ধকর ;
দেখাই তাহারে আমি, বল গো বিচারি তুমি
তোমা চেয়ে সেইরূপ নহে কি সুন্দর ?

কবি স্পষ্টতঃই তাঁর প্রেয়সীর কথা এখানে বলতে চেয়েছেন। কিন্তু বালকোচিত লজ্জায় নামটি প্রকাশ করতে পারেননি, স্থানটি শূন্য রেখেছেন। 'বিসর্জিতা দেবী প্রতিমা' কবিতাটিতে ত্রয়োদশী 'সরোজিনী'র অকালমৃত্যুতে কবির বেদনাদীর্ণ হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে। কবি 'সরোজিনী'কে 'সহোদরাধিক স্নেহ' করতেন। তার অকাল মৃত্যুতে তাই কবির খেদোক্তি—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে বুঝি নন্দন উদ্যানে,
পথ ভুলে একবার, এসেছিলে এ সংসার
তা বলে কি চিরকাল থাকিবে এখানে ?

'হৃদয়-গাথা' পর্যায়ে 'বিদায়' কবিতায় কবি তাঁর বহু অভিলষিত প্রণয়িনীকে না পাওয়ার বেদনাকে প্রকাশ করেছেন।

'সেই একদিন আর এই একদিন' কবিতায় কবি তাঁর প্রেয়সীর সান্নিধ্য সুখ ও বিরহজনিত বেদনার তুলনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। 'আদর' কবিতাতে কবির মর্মবেদনা ধ্বনিত হয়েছে—

জীবনের সুখ তুমি
হৃদয়ের অধীশ্বরী,
তোমা ছাড়া হয়ে আমি
জীবনে রয়েছি মরি!

'সে' কবিতায় কবি তাঁর প্রেয়সীর সঙ্গে অভিন্নতাকে ব্যক্ত করেছেন—

বিশ্ব রসাতলে যাক,
শাস্ত্র পুড়ে হোক খাক,
দূরে যাক কর্মকাণ্ড নীতি ধর্ম জ্ঞান,
'সে আমার—আমি তার' এই ধ্রুব জ্ঞান।

'দেখা' কবিতায় কবি প্রেয়সীর দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন—

কেন পোড়া আঁখি সদা থাকি থাকি,
কাঁদে দরশন তরে,

'সেই মুখে' প্রিয় মুখটির স্মৃতিচারণায় পর্যবসিত। 'কেমনে' কবিতায় কবি বিচ্ছেদ বেদনার উপশম ঘটিয়েছেন এইভাবে—

হৃদয়ের দরশন, হৃদয়ের আলিঙ্গন,
হৃদয়ের যে চুম্বন, মূল্য তার নাই!

'স্বপনে' কবি বাস্তবে অপ্রাপ্তির অপূর্ণতাকে পূর্ণ করেছেন—

স্বপনেই বুকে রাখি স্বপনেই চুমি মুখ,
স্বপনেতে কত আসে অজানা অগাধ সুখ!

'সাধ' কবিতায় কবি বিরহ শূন্য রোমাণ্টিক পরিবেশে প্রেয়সীর সঙ্গে কালাতিপাত করার মধুর চিত্র এঁকেছেন—

জ্যোৎস্নার ঘর বাঁধি আকাশের গায়,
তারার আলোকমালা জ্বেলে দিব তায়,
নন্দনের পারিজাত বিছাব যতনে,
মানসের কমলিনী মিশাব তা সনে,
সেই ঘরে-প্রাণ ধন, তোমায় আমায়,
কাটাইব চিরকাল, এই সাধ যায়।

'মিলন ও বিরহে' কবি দার্শনিকতার পরিচয় দিয়েছেন—

মিলনেতে সুখ, আছে কিনা আছে
কিছুই বুঝিতে নারি,
বিরহের সুখ সুতীব্র সুন্দর
এই ত কহিতে পারি।

'পূজা' কবিতায় কবি তাঁর প্রেয়সীকেই দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। কবি অকপটে স্বীকার করেছেন তিনি নিরাকার দেবতার প্রতি আকৃষ্ট নন,

তাঁর জীবন দেবী অবয়ব সমন্বিতা, যে কবিকে তার রূপে আকৃষ্ট করে, হাসিতে মোহিত করে, ভালবাসায় মুগ্ধ করে।

'পারিলাম কই' কবিতাটি শৈশব ও বাল্যের মধুর স্মৃতি চিত্রণে অসামান্য—

সে যে এক শুভ যোগ আমার জীবনে,
সেই চাঁপা ফুল তোলা,
সেই শালুকের মালা,
শুধুই কি ছেলেখেলা খেলেছি দুজনে ?

'ফুল' কবিতায় কবি তাঁর প্রেয়সীকে 'ফুলকন্যা' রূপে চিত্রিত করেছেন। 'স্মৃতি'তে স্মৃতিভারে ভারাক্রান্ত কবির মর্মবেদনা প্রকাশিত। 'আমারে ভুলেছে' কবিতায় কবি তাঁর প্রেয়সীর পক্ষে যে তাঁকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়, এই বিশ্বাস প্রকাশ করে সান্ত্বনা লাভে সচেষ্ট হয়েছেন—

আমাদের ভালবাসা অনন্ত অক্ষয় :
আমারে ভুলেছে সখা ? তাও কভু হয় ?

'চিন্তা'য় কবি তাঁর প্রেয়সীর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। যদিও তার সামাজিক নিয়মে বিবাহ-পূর্ব প্রেমিকের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই, তথাপি তাঁর প্রেয়সী স্বীকার করেছে তার প্রেমিকই তার সর্বস্ব—

সে মোর সমাজ, জাতি, সে মোর ঈশ্বর,
সে যদি হৃদয়ে থাকে আর কারে ডর !
সমাজ ঘোষণা দাও নগরে নগরে,
'ডুবেছে রাধিকা কৃষ্ণ-কলঙ্ক সাগরে'।

কোন কিছুই কবির প্রেয়সীর স্মৃতিকে ম্লান করতে পারবে না, তা তাঁর চিত্তে অনন্তকালের জন্য জাগরূক থাকবে। বিস্মৃতিকে কবি কিভাবে অতিক্রম করবেন তার চমৎকার বর্ণনা দেখা যায়—

বিস্মৃতির ধূলা হায়,
মলিন করিলে তায়,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস বায় উড়ায়ে দিব,
তাহে নাহি যায় যদি,
অশ্রুতে বহাব নদী,
সেই জলে ধুব নিত্য যতদিন জীব।

'মিলন ও বিরহে' যে কবি বিরহের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, 'বিরহ' কবিতায় সেই কবিকে স্বীকার করতে হয়েছে—

অভিমান অবিশ্বাস, বিরহেতে করে বাস,
প্রণয়ের শত্রু নাই বিরহ মতন,

'হৃদয়-গাথা'র তৃতীয় পর্যায়ে কবি নানা রসের কবিতা সংকলন করেছেন। 'সুন্দর চিত্রে' সন্তান ক্রোড়ে জননীর রূপ দর্শনে মুগ্ধ কবি চিত্রকর ও কবিদের সৃষ্টির অর্থহীনতা উপলব্ধি করেছেন। 'কবি ও ফুল' কবিতায় কবি এই দুইয়ের মধ্যেকার সাদৃশ্য দেখিয়েছেন—

কীট ছাড়া ফুল যথা ফোটে না সংসার বনে,
শোক তাপ ছাড়া কবি দেখিবে না এ ভুবনে।

'কে তুই' কবিতায় কবি নবজাতককে বিধাতার আশীর্বাদ বলে বর্ণনা করেছেন। 'অমিয়-গাথা' সমসাময়িক বাংলা কাব্যের সমালোচনায় মুখর—

ক্রিয়াগুলি খুঁজে মরে কোথা তার কর্তৃপদ!
কর্তারা না পায় ক্রিয়া,—কবিতার কি বিপদ!
নূতন নূতন ভাব নূতন নূতন শব্দ,
অনর্গল আমদানী, দেখে শুনে আছি স্তব্ধ!
ধোঁয়া ধোঁয়া সব ঠেকে চোকে দেখি অন্ধকার।
কবিতা শুনিয়া করি দূরে হতে নমস্কার।

কবি প্রাচীন পন্থী—তিনি বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্রের কাব্যধারায় আস্থাবান।

'অমিয়-সুধা' দীর্ঘ কবিতাটি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত এক ব্যর্থপ্রেমের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। অমিয়, সুধা ও সুধার পিতা—এই তিন চরিত্রের উপস্থাপনা ও কথোপকথনে কিছুটা নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে।

'হৃদয়-গাথা'র চতুর্থ পর্যায়ের কবিতাগুলি পত্রাকারে উপস্থাপিত হওয়ায় একপ্রকার নাট্যরস সৃষ্টি হয়েছে। প্রিয়র পত্র, প্রবাসীর পত্র, পত্র, উত্তর ইত্যাদি কবিতাগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'ললিতের প্রতি' কবিতাটি এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। পঞ্চম পর্যায়ে কবি লর্ড বায়রণ এবং লঙ ফেলোর কবিতাবলম্বনে ছটি কবিতা রচনা করেছেন।

শেষপর্যন্ত আশাহত চিত্তকে কবি সঞ্জীবিত করেছেন শেষ কবিতায় প্রেয়সীর মাধুর্যমণ্ডিত মুখের কথা ভেবে—

বিষণ্ণ হৃদয় মোর যদিও বিকল,
যদিও একক আমি বিশাল ভুবনে,
নির্ভয় হৃদয় হয়, লভি পুন বল,
তাহার মধুর মুখ পড়ে যবে মনে।

সুরমা সুন্দরী ঘোষ প্রণীত **'রঞ্জিনী'** কাব্য গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩০৯ বঙ্গাব্দ। কবি তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন নগেন্দ্রবালা বসুকে—

কবিতা-কমলবনে
মোরা দোঁহে ফুল্লমনে
করিতাম খেলা;
গাঁথিয়া দিয়েছি হার
সোহাগের উপহার
কৈশোরের বেলা।

মোট ৫০টি কবিতার সংকলন আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি। গ্রন্থের প্রথম কবিতাটির নামেই কাব্যটির নামকরণ করা হয়েছে 'রঞ্জিনী'।

হে আমার মানস-রঞ্জিনী !
হাসিতে অশ্রুতে ডুবায়ে তুলিকা
ফুটায়ে তুলেছি স্বপন-কলিকা ;
কোনটী ফুটেছে,
কোনটী টুটেছে
সরমে মরমে
যেন কলঙ্কিনী !
তবু তুমি মানস রঞ্জিনী !
আঁধার হৃদয়ে কনক দেউটী,
কভু মিটি মিটি, কভু উঠ ফুটি ;
জীবন থাকিতে
দিব না নিভিতে !
আমি যে পিয়াসী ;
তুমি তরঙ্গিনী !

কবির জীবন দেবতাই (?) রঞ্জিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। যে ছিল একান্তভাবেই কবির নিজস্ব, তা বিশ্বময় ব্যাপ্ত হওয়ায় কবি-চিত্ত ব্যাকুল হয়েছে পাছে তাকে হারাতে হয়। শেষ পর্যন্ত কবি নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে পুনরায় তাঁর রঞ্জিনী তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে, আবার তাঁকে মুগ্ধ করবে।

কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা 'বিদায়', এতেও রঞ্জিনীর প্রসঙ্গ এসেছে। রঞ্জিনী কবির কাছে বিদায় প্রার্থনা করায় কবি-চিত্ত বেদনায় আচ্ছন্ন হয়েছে। রঞ্জিনীর উদ্দেশে কবি এই প্রার্থনা জানিয়েছেন—

সাথে সাথে ঘুরায়েছি প্রান্তরে পাথারে ;
স্নিগ্ধ শয্যা পাতি দিব আজিকে তোমায়।
শুধু এই কর, সখী, দেখা দিও ফিরে
একটী নির্মল প্রাতে এ জীবন-তীরে !

কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের বহুখ্যাত 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির প্রভাব পড়েছে—

যারে ভালবাসি, তারে আরো কাছে টানি,
'ছেড়ে নাহি দিব'—বলি দৃঢ় করি পাশ !
তবু যেতে দিতে হয়। মিছে শুধু ভ্রান্তি ;

'শেফালিকা' কবিতায় কবি শেফালিকাকে 'উদ্ভিদ বালিকা' বলে অভিহিত করেছেন। শেফালিকা যেন ঊষার অশ্রু। বিধবার বৈধব্যবেশের সঙ্গে শেফালিকার তুলনা করেছেন কবি—

যেন জেগে বসে থাক রজনীর শেষে
শুদ্ধ স্নাত শুভ শুভ্র বিধবার বেশে ;

মুখে নাই ভাষা,
বুকে নাই আশা !

কবি কুমুদরঞ্জনের মানসিকতার সঙ্গে এই কবিতায় প্রতিফলিত কবির মানসিকতার গভীর সাদৃশ্যের সন্ধান মেলে।

'ভরা বাদলে' কবিতায় কবির বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হয়, কারণ—

বিষম দুর্যোগ আজ অন্তরে বাহিরে ;
এ বিরহী হিয়া
উঠে শিহরিয়া,
বর্ষার বিলাপ শুনি ভাসে আঁখিনীরে।

'নবজাত' কবিতায় কবি প্রথমে জন্মকে মায়ার বন্ধন বলে ভাবলেও শেষ পর্যন্ত নবজাতকের প্রতি স্নেহ-মমতায় আত্মহারা কবিকে স্বীকার করতে হয়েছে—

বুকে রাখি হৃদি ধনে
ভাবি শুধু স্ফীত মনে,—
ত্রিভুবনে সুখী কেবা আছে মোর পারা !

'তপোবন-গিরি' কবিতাটি দীর্ঘ। কবিতাটির প্রতিটি পংক্তি চোদ্দটি অক্ষর-যুক্ত হলেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ কবি ব্যবহার করেন নি, অন্ত্যানুপ্রাসকেই রক্ষা করেছেন। ভারতের বিগত ঐতিহ্যের স্মরণে কবিচিত্ত বেদনার্ত হয়েছে—

সেই সব পুণ্যময় বরণীয় দিন
কোন্ মহাকাল গর্ভে হয়ে গেছে লীন ?
লুকায়েছে কোথা সেই অতুল বৈভব
ভারতের ? এবে সেই লীলা ভূমি সব
দৈত্য দানবের ? অতীতের পুণ্যফল
স্মরিয়া ঝরিছে শুধু নয়নের জল !

বেশ কয়েকটি কবিতায় নারীর প্রাধান্য সূচিত হয়েছে। এই রকমের কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে 'শাপান্তে', 'অর্জুনের প্রতি চিত্রাঙ্গদা', 'উত্তরার বৈধব্য', 'রতি বিলাপ', 'কচের প্রতি দেবযানী'।

'শাপান্তে' কবিতায় সিংহ শাবকের সঙ্গে ক্রীড়ারত ভরতকে দেখে দুষ্মন্তের শকুন্তলাকে মনে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিত্ত একই সঙ্গে বিষাদ ও হর্ষে ভরে উঠেছে। দুষ্মন্তের প্রতি কবির বক্র দৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে এইভাবে—

কোথা আজি তব প্রিয়া, হে মূঢ় রাজন্,
বিনা দোষে অবিচারে করেছ বর্জন
সেই সতী প্রতিমারে।

কাব্য গ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'নির্বাসিতা সীতা'। কবি সীতা চরিত্রটিকে অসামান্য মর্যাদা ও অভিমান বোধের আধার রূপে গড়ে তুলেছেন। লক্ষ্মণ কর্তৃক নির্বাসিতা সীতা সামান্য নারীর মত মূর্চ্ছিতা হলেন না, দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন না, শুধু সীতার কণ্ঠের বজ্র ঘোষণ ধ্বনিত হয়েছে—

ভাবিতেছি শুধু মনে—
ধর্ম কি সহিবে, হায় আজি অকারণে
রাজ হস্তে অপমান ? সে অমূল্য ধন,
দেবেন্দ্র দুর্লভ, নিমেষের অযতন
সহে না যে তার ; যশে নাহি ক্রীত হয় ;
বলে নাহি হারে ; রাজদণ্ডে তারি ক্ষয় ?

রামচন্দ্রের আচরণের প্রতিশোধ নিয়েছেন সীতা এই বলে—

তাঁহার সন্তান
ধরেছি যে গর্ভে আজি. যদি থাকে প্রাণ,
পিতৃ গুণে বিমণ্ডিয়া তুলিব বাছারে।
আর এক কথা আছে, বলিও তাঁহারে—
সাধিব দুশ্চর তপ লয়ে মনস্কাম,
জন্মে জন্মে পতি যেন হন মোর রাম !

স্পষ্টই বোঝা যায়, নিছক রামচন্দ্রের প্রতি সীতার অন্ধ আনুগত্যই এখানে প্রকাশিত হয়নি, প্রকাশিত হয়েছে সীতার ক্ষুব্ধ চিত্তের মর্মবেদনাও।

'বঙ্গ জননী' কবিতায় বঙ্গ জননীর দীনতা ও হীনতায় কবির বেদনাবোধ প্রকাশিত হয়েছে—

হে আমার জন্মভূমি,
পতিতা, তাপিতা,
মুখে তব অন্ন নাই,
বুকে জ্বলে চিতা !
ঘরে ঘরে মা তোমার, উঠে শুধু হাহাকার,
তুমি হাসিতেছ বসি, চির উদাসীনা।
তাই মা, তোমার লাগি বাজে না এ বীণা !

কবির মানসিকতায় গতানুগতিকার প্রতিফলন ঘটে নি, কবি-প্রাণ তাঁর ছিল, আর ছিল ভাব প্রকাশের উপযোগী ছন্দ ব্যবহারের নৈপুণ্য। এক ধরণের কমনীয়তা তাঁর কবিতাগুলিকে আকর্ষণীয় করেছে।

জমিদার হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী বিরচিত **'দশাননবধ মহাকাব্য'**টির প্রকাশ-কাল ১৩১০ সাল। দশ বৎসর পূর্বে ১৩০০ সনে কবি তাঁর এই গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড 'রাবণ বধ কাব্য' নামে মুদ্রিত করেছিলেন। এই কাব্যটির আলোচনার প্রারম্ভে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' (২য় খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ) কাব্যটিকে 'দশানন বধ' বলে অভিহিত করেছেন। সাহিত্য সভার সম্পাদক রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী কাব্যটির ভূমিকায় কাব্যটিকে 'দশাননবধ' বলে অভিহিত করেছেন। অনুমান করা যায় ড. সেন এই ভূমিকার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাব্যটিকে 'দশানন বধ' বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কাব্যটির নাম কিন্তু 'দশাননবধ মহাকাব্য'।

কাব্যটির নামকরণ থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' কবিকে আলোচ্য কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। কাব্যটির বিজ্ঞাপনে কবি স্বয়ং বলেছেনঃ

'কোন কোন ব্যক্তি আমাকে বলিতেছেন যে গ্রন্থখানি সংস্কৃতে লিখিলেই ভাল হইত, কিন্তু আমার যখন মেঘনাদবধ কাব্যের পরে একখানি রাবণবধ কাব্য রচনা করিতেই ইচ্ছা তখন বাঙ্গালাতেই লিখিতে আমি বাধ্য।' অর্থাৎ কবির কাব্য রচনার উদ্দেশ্য মধুসূদনের অবলম্বিত বিষয়টির সম্পূর্ণতা দান।

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের অনুসরণে কবি 'দশাননবধ মহাকাব্য' রচনায় ব্রতী হলেও মধুসূদনের কাব্যের সঙ্গে আলোচ্য কাব্যটির পার্থক্য নানা বিষয়েই। মধুসূদন তাঁর মহাকাব্যটিকে ন'টি সর্গে বিভক্ত করেছিলেন। কিন্তু হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী তাঁর কাব্যটিকে দশটি সর্গে বিভক্ত করেছেন। সর্গগুলি হল যথাক্রমে সন্ধিবিরতি জ্ঞাপন, শায়কাহরণ, চণ্ডিকা স্থাপন, অন্তঃপুরদর্শন, পাবকাধিষ্ঠান, লঙ্কা সংরক্ষণ, বধ, স্বর্গারোহণ, প্রতিজ্ঞাপূরণ এবং পূর্ণমনস্কাম। তন্মধ্যে শেষ দুটি সর্গ 'পরিশিষ্টে'র অন্তর্গত।

মধুসূদন তাঁর কাব্যটি রচনা করেছিলেন আনুপূর্বিক অমিত্রাক্ষর ছন্দে, কিন্তু আলোচ্য কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিবর্তে একদিকে প্রযুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দ (গীতি, তূণক, তোটক, রথোদ্ধতা, মালিনী, ইত্যাদি) অন্যদিকে কবি তাঁর স্বরচিত ছন্দও ব্যবহার করেছেন। যেমন গীতিচ্ছন্দ, দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু চৌপদী, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ চৌপদী, কুরঙ্গ নর্তন, মধুমাধুরী, কলহ, পূতি, ভ্রমর গুঞ্জন, বাসন্তী, শিখিনর্তন, উগ্রচণ্ডা, সজ্জনতোষিণী, সুরধুনী, কাঞ্চনমালা ইত্যাদি। বস্তুতপক্ষে 'দশাননবধ মহাকাব্যে'র অন্যতম আকর্ষণ কবির ছন্দ রচনার নৈপুণ্য।

মধুসূদন তাঁর কাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রভাবকেই আত্মসাৎ করে-ছিলেন কিন্তু হরগোবিন্দের কাব্যে একান্তভাবে প্রাচ্য দেশীয় ভাবেরই প্রতিফলন লক্ষিত হয়। মধুসূদন তাঁর কাব্যে অলঙ্কার প্রয়োগে বিশেষতঃ উপমা প্রয়োগে বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু স্বীকার করতে হয় হরগোবিন্দ অলঙ্করণ পরিপাট্যে মধুসূদনের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারেন নি। কবি উপমা, ব্যতিরেক প্রভৃতি অলঙ্কারের ওপরই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে আলোচ্য কাব্যে প্রযুক্ত অলঙ্কারগুলি তেমন অভিনবত্বের অধিকারী নয়, গতানুগতিক।

মধুসূদন যেমন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যভাবের সহায়তায় বিভিন্ন চরিত্র এবং ঘটনার বিবরণ দানে বাঞ্ছিত সাফল্য লাভ করেছেন, হরগোবিন্দ তেমনটি লাভ করেন নি। মহাকাব্যোচিত সমুন্নতি 'দশাননবধ মহাকাব্যে' অনুপস্থিত, যদিও মধুসূদনের কাব্যের তুলনায় বর্তমান কাব্যে একটি অতিরিক্ত সর্গ সংযোজিত। ফলে আলোচ্য কাব্যটি বর্ণনামূলক কাব্যে পরিণত হয়েছে।

মধুসূদন তাঁর কাব্যের গাম্ভীর্য সৃষ্টির জন্য স্বেচ্ছাকৃত ভাবে বেশ কিছু

অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। হরগোবিন্দের কাব্যে সংস্কৃতেরই রাজকীয় আধিপত্য। বাংলার এখানে দুয়োরাণীর অবস্থা। কবি নিজেও তাঁর গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে এই বিষয়টিকে পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন। আর সেই কারণেই সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা 'দশাননবধ মহাকাব্যে'র ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। পঞ্চানন তর্করত্ন, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রমুখেরা যে প্রশংসা করেছিলেন সেজন্য দায়ী কবির ব্যবহৃত ছন্দ এবং সংস্কৃত বহুল বাংলা। এমনকি রামগতি ন্যায়রত্ন এমনও মন্তব্য করেছিলেন—'আমার মতে মেঘনাদবধকাব্য অপেক্ষা আপনার রাবণবধ কাব্য অনেকাংশে ভাল হইয়াছে'। বলাবাহুল্য এরূপ মন্তব্য আসলে উচ্ছ্বাস সর্বস্বতা দোষে দুষ্ট অথবা মেঘনাদবধ কাব্যের রসাস্বাদনে রামগতির অক্ষমতাই দায়ী। নতুবা যে হরগোবিন্দকে ন্যায়রত্ন 'কালে বঙ্গীয় কবিগণ মধ্যে সর্বোচ্চ আসন অধিকার করিতে পারিবেন' বলে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, তিনি বিস্মৃতির অন্তরালে নিমজ্জিত, অপরদিকে মেঘনাদ বধ মহাকাব্য পূর্ণ গরিমায় আজও বিদ্যমান।

এইবার আমরা কাব্যটির ব্যাপক পরিচয় গ্রহণ করতে পারি। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে মধুসূদনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আলোচ্য কাব্যটি রচনায় বর্তমান কবি প্রয়াসী হন। বস্তুত মেঘনাদবধ কাব্যের পরিশিষ্ট রূপেই 'দশানন বধ মহাকাব্য' রচিত। মেঘনাদ বধ কাব্যের চরিত্রগুলি যেমন আলোচ্য কাব্যে স্থান লাভ করেছে, তেমনি কবি নূতন অনেক চরিত্রেরও সংযোজন ঘটিয়েছেন আলোচ্য কাব্যে। মেঘনাদবধ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে মেঘনাদের লক্ষ্মণের হাতে অকালমৃত্যু ঘটার পর শ্রীরামচন্দ্র এবং লঙ্কাধিপতির মধ্যে অনুষ্ঠিত সন্ধির ফলে সাতদিন যুদ্ধবিরতি অনুসৃত হয়েছিল মেঘনাদের পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পাদনের জন্য। 'দশানন বধ মহাকাব্যে'র প্রথম সর্গেই সন্ধির বিরতিজ্ঞাপন বর্ণিত হয়েছে এবং তদনুযায়ী প্রথম সর্গটি 'সন্ধিবিরতি-জ্ঞাপন' নামে অভিহিত হয়েছে।

প্রথম সর্গে কবি লঙ্কাধিপতির যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে লঙ্কাধিপতির গাম্ভীর্যময় অদ্বিতীয় রূপটি প্রকটিত—

অভ্র-লঙ্ঘি-উন্নত-দশমস্তক পূর্ণ নিবিড় কচ পুঞ্জে,
স্ফুরিত-বিকটপুট রুষ্ট-সিংহসম, শমন গর্ব পরিভঞ্জে।
জ্বলিত মহোজ্জ্বল—বিংশ নয়ন অতি নৃশংস দৃষ্টি বিসর্পে,
সূর্য বীর্য জিনি শৌর্য সমন্বিত, ঘূর্ণিত সতত সদর্পে।
বিকট বদন পরিমণ্ডিত অতিশয় কৃষ্ণকূর্চ ফুল পুঞ্জে,
প্রচণ্ড-মদজল—মণ্ডিত-গজপতি—গণ্ডযুগল পরিগঞ্জে।
শমন দণ্ড জিনি সুদৃঢ় সমুজ্জ্বল বিংশতি ভুজ—গুরুবীর্যে,
সহস্রকর রবি বহূর্ধ্বগত হই ঘূর্ণিত সতত অধৈর্যে।
রক্ত বসন, জিনি বহ্নি মহোজ্জ্বল, বদ্ধ সুদৃঢ় কটি কেন্দ্রে,
সব্য—অংস 'পর পট্ট বসন বর, ফণিবর সম অচলেন্দ্রে।

সান্ধ্যসূর্য জিনি চন্দন বিন্দু, স্ফুলিঙ্গ নির্গত চক্ষে,
রক্ত কুসুম ময়—মাল্য বিলম্বিত বিপুল উপলসম-বক্ষে।

দ্বিতীয় সর্গে রামচন্দ্রের মূর্চ্ছিত সৈন্যবাহিনীর কারণে কৌণপ সমুদ্রগর্ভে নির্মজ্জিত হয়েছে ফণীশ্বরের প্রাসাদে উপনীত হবার জন্য। সমুদ্রের তলদেশের যে অভিজ্ঞতা কৌণপ লাভ করেছে, তা স্পষ্টতই কবির কল্পনা-ঐশ্বর্যের পরিচায়ক।

সপ্তম সর্গে নিদ্রিত রাবণ যে সব ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে বিচলিত হয়েছেন, তাতেও কবির কল্পনাশক্তির পরিচয় মেলে। সেইসঙ্গে রাবণের ভবিষ্যৎ পরিণতির ছায়াপাত ঘটিয়ে কবি মনস্তাত্ত্বিক করে তুলেছেন সমস্ত বিবরণটিকে—

শমন—চক্রসম বিকট নক্রগণ পরিক্রমই গুরুগর্বে,
উগরই অবিরল বহ্নি গরল চয় ভস্মি চতুর্দিশি সর্বে!
অগ্নিবর্ণ বহু ভৌতিকতনু অতিকৃশতম দীর্ঘ উলঙ্গ,
মস্তক-উপরি অগ্নিগিরি ভৈরব বিসর্পি কিরণতরঙ্গ।
মজ্জিত উত্থিত শত শত অবিরত অট্টহাস্য করি রঙ্গে,
দশমুখ সন্নিধি উপগত কতশত গজগতি গর্জন সঙ্গে।
শঙ্কিত কম্পিত অগতি ধরণিপতি দৌড়িল পবন বিনিন্দে,
ক্ষতবিক্ষত তনু হইল নিরতিশয় কণ্টক কঙ্কর বৃন্দে।

কিংবা, তপ্তরুধিরময়—লৌহপাত্র লই মদ্য বিঘূর্ণিত মুণ্ডে,
বর্ষই অবিরত শঙ্কর শির 'পরি, গলিত রক্ত দশতুণ্ডে।
তখন অকস্মাৎ কর্বুর-অধিপতি সমধিক বিস্ময় সঙ্গে,
নিরখিল অদভুত ভৈরব রমণী, প্রচুর বিকম্পিত-অঙ্গে।
অন্ধ তিমিরসম কৃষ্ণবর্ণতনু অস্থিচর্মময় মাত্র,
সৃক্কদন্তচয় সতত রুধিরময় রক্তবর্ণ দুই নেত্র!
রক্তবসন বর পরিহিত অবিরত রক্তমাল্যচয় বক্ষে,
করতলবিধৃত খড়্গবর ভৈরব, বহ্নি বিনির্গত চক্ষে।
তীব্র দৃষ্টি করি বিকটহাস্যসহ কৌণপপতি লই সঙ্গে,
চলিল ভয়ঙ্কর মূর্তি দম্ভসহ দক্ষিণ দিশি মন 'রঙ্গে।

পুত্রশোকাতুরা মন্দোদরী যুদ্ধে গমনোদ্যত রাবণকে মুখে কিছু না বললেও অশ্রুজল ও নীরবতা অবলম্বনের দ্বারা বাধা দান করেছিলেন, মেঘনাদবধ-কাব্যের কবি তা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আলোচ্য কাব্যে কবি সম্রাজ্ঞীর কোন নাম উল্লেখ করেন নি, যুদ্ধে গমনোদ্যত রাবণকে অনুরোধ জানিয়ে 'যুবতী শীর্ষমণি'কে বলতে দেখা গেছে—

সকলি-ত বিনষ্ট হে, প্রখরনর-সঙ্গরে,
তবু কি সমরৈষণা নিহিত তব অন্তরে?
কি ফল কহ এক্ষণে, বধি রিপু রণাঙ্গনে,
হৃদয়গত দুঃখ কি স্থগিত হইবে ক্ষণে?

বলাবাহুল্য মধুসূদনের কাব্যে মন্দোদরীকে ক্রন্দনরতা ও নীরব দেখিয়ে কবি

তার যে ভাবমূর্তি গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন, 'দশাননবধ মহাকাব্যে' সম্রাজ্ঞীকে বাঙ্ময় করে কবি তা করতে সক্ষম হননি।

'মেঘনাদবধকাব্যে' রাবণ শোকাচ্ছন্ন মন্দোদরীকে বলেছিলেন—

যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;
রণক্ষেত্র যাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব !
বৃথা রাজ্য সুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহ ! যাও ফিরি ; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরি ?

তখন রাবণের মন্দোদরীর প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং পুত্রশোক দুইই পাঠকের হৃদয়কে দ্রবীভূত করে। কিন্তু 'দশাননবধ মহাকাব্যে' রাবণ যখন বলেন—

তিষ্ঠহ সুবদনি, উজ্জ্বল গৃহমণি,
বর্জন কর, ধনি, হৃদয় অধৈর্য্যে ;
উক্ত বিষয় যত, সর্বমম বিদিত,
বাক্য কি সমুচিত মমকৃতকার্যে ?

তখন রাণীর প্রতি সহানুভূতি অপেক্ষা রাবণের আত্ম গরিমাই প্রকটিত হয়। মধুসূদনের রাবণ ছিলেন দৈববাদী, কর্মফলে তাঁর আস্থা ছিল না। কিন্তু কবি হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরীর রাবণ কর্মফলে বিশ্বাসী—

কর্মসদৃশ ফল ভুঞ্জই অবিকল,
জন্তুকুল সকল ভুবন অনন্তে।

মেঘনাদবধ কাব্যে বীরবাহুর মৃত্যুতে বিকলচিত্ত রাবণকে সান্ত্বনা দিতে মন্ত্রী সারণ বলেছিলেন—

এ ভবমণ্ডল
মায়াময় ; বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।

কিন্তু হরগোবিন্দের রাবণ শোকাকুলা রাণীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে পার্থিব সুখ যে অসত্য সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

ঈক্ষহ গুণবতি, অদ্ভুত ভবগতি,
পার্থিব সুখ, সতি, বিষম-অসত্য,
বান্ধব পরিজন ঊর্মিমিলিত তৃণ,
পান্থজনমিলন সদৃশ অনিত্য।

রাবণের বক্তব্যে গীতার প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। রাবণ বলেছেন—

জন্মপর মরণ মৃত্যুপর জনম
ঘূর্ণিত ঘনঘন জগত সমস্তে,

জীর্ণবসন চয় বর্জি নরনিচয়
যদ্বিধ পুন লয় অভিনব বস্ত্রে।

স্মরণীয় গীতার সেই চিরন্তন উক্তি 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি' ইত্যাদি। শুধু তাই নয় গীতার অনুসরণেই রাবণ নিরাসক্ত কর্মের কথা বলেছেন—

নিস্পৃহ হই অতি কর্ম করহ সতি,
কর্মই গুণবতি, সহচর অন্তে,

তুলনীয়, কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে তাঁর সৈন্যদের উত্তেজিত করার সময়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—

বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি ;

'দশানন বধ মহাকাব্যে'ও রাবণ বলেছেন ঃ

দুর্জয়-অনুপম রাক্ষসকুল সম
রক্ষিনু সুতসম অবিরত বক্ষে,
সম্প্রতি হতমতি কর্বুরকুলপতি,
উদ্যম করি অতি বধ রিপু পক্ষে।

মেঘনাদ বধ কাব্যে রাবণের উক্তি সৈন্যদের যেমন উত্তেজিত করেছিল, তাঁর বীরত্ব ব্যঞ্জক উক্তি যেমন সৈন্যদের উৎসাহিত করেছিল, 'দশাননবধ মহাকাব্যে' রাবণের উক্তি তেমন বীরত্ব ব্যঞ্জক হয়নি স্বীকার করতে হয়। তবে রাবণের সঙ্গে রামচন্দ্রের যে যুদ্ধের বিবরণ কবি দিয়েছেন তা উপভোগ্য। লক্ষহস্তীসহ হস্তী সৈন্যাপতির রঘুপতির সৈন্যদের আক্রমণ, অঙ্গদ কর্তৃক ভৈরব রাক্ষস হত্যা, অশ্বসৈন্যপতি-লৌহজঙ্ঘের আক্রমণ এবং তার প্রতিরোধে হনুমানের প্রয়াস, কুম্ভক, সুগ্রীব প্রমুখাদির বীরত্ব-ব্যঞ্জক যুদ্ধ, রাবণ কর্তৃক বিশিখার নিক্ষিপ্ত করণ, এর প্রতিরোধে রামচন্দ্রের গরুড় বিশিখ ত্যাগ, রাবণ কর্তৃক ভৌতিক অস্ত্র নিক্ষেপ, রামচন্দ্র কর্তৃক এর প্রতিরোধে ভৈরব ভাস্কর শর ত্যাগ প্রভৃতির বিবরণ প্রশংসনীয়। গুরুর নির্দেশে রাবণের তনু পরিশুদ্ধ করার যে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, স্বাভাবিক ভাবেই তা মেঘনাদবধ কাব্যে বর্ণিত মেঘনাদের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞরত অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

হরগোবিন্দ পট্ট বস্ত্র পরিহিত রাবণের বিবরণ দিয়ে বলেছেন ঃ

অঙ্গ ধৌত করি কর্বুর-অধিপতি পট্ট বস্ত্র পরি হর্ষে,
শাস্ত্র বিহিত সব কর্ম পূর্ণ করি গুরুপদরজ লই শীর্ষে ;
শুদ্ধ শান্ত হই পরমভক্তিসহ অক্ষ মাল্য ধরি বক্ষে,
বসিল অজিন পরি পদ্মবন্ধ করি উজ্জ্বল রথবর কক্ষে।

রাবণের মৃত্যুর বর্ণনা দানেও কবি যথার্থ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন—

ঝটিতি মৃত্যুশর গর্জি ভয়ঙ্কর বজ্রসদৃশ গিরিলক্ষ্যে,
নিপতিত হইল অকস্মাৎ রাক্ষস-অধিপতি-সুবিপুল বক্ষে !!

প্রলয় সূর্য খসি নিপতিত, পরিগণি, যুগান্ত জলধিতরঙ্গে,
ক্রুদ্ধ দিগম্বর-বৈষ্ণব শরবর পতিত, গণি, ত্রিপুরাঙ্গে।
নিরখি তিমিরচয় ঘূর্ণিত মস্তক থর থর কম্পিত-অঙ্গে,
পড়িল ধরণিপতি ঘন ঘন নিঃশ্বসি উৎকট চীৎকৃতি সঙ্গে।

অষ্টম সর্গে রাবণের মৃত্যুতে রাজ্ঞী কর্তৃক পূজারত শিবলিঙ্গের বিদীর্ণ হওয়া, যুবতী সৈন্যগণ সহ রাজ্ঞীর অগ্রসর হওয়ার বিবরণ, রাবণের শেষ কৃত্যানুষ্ঠান বর্ণিত হয়েছে। যুবতী সৈন্যসহ রাজ্ঞীর অগ্রসর হওয়ার বিবরণ প্রমীলার চেড়ীবৃন্দ সহ লঙ্কাপুরী অভিযানের কথা স্বতঃই মনে করিয়ে দেয়—

গর্জিল চৌদিশি যুবতি সৈন্যগণ সিংহ যুবতি জিনি গর্বে,
কড়মড়ি দন্ত বিঘূর্ণি নয়নযুগ মূর্চ্ছিত করি সুর সর্বে!
ভৈরব গর্জন! কি সাধ্য বর্ণিব, চূর্ণ বিচূর্ণিত বিশ্ব,
সূর্য চন্দ্র পড়ি জলনিধিমজ্জিত, অদৃষ্ট-অশ্রুত দৃশ্য!!
উন্মদ সদৃশ গর্জি অতি ভৈরব উগ্রকবুরকত্রী
হইল অগ্রসর কম্পি জগৎত্রয় জগজন ভয় জনয়িত্রী!

লঙ্কাধিপতির শেষ কৃত্যের বিবরণে কবি বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন। নবম সর্গে সীতার অগ্নি পরীক্ষা বর্ণিত হয়েছে। এই সর্গে কবি ব্রাহ্মণ-ভোজনের যে চিত্র উপস্থিত করেছেন তা কবির পরিহাসপ্রিয়তার পরিচায়ক—

শুষ্ক কাষ্ঠ সম কন্ঠ হস্তপদ, অস্থি বিনির্গত বক্ষে,
কিন্তু উদরবর উচ্চ নিরতিশয়, রক্ত সহিত সিতচক্ষে।
কূর্চরহিত মুখ অসিত চিহ্নযুত বিলিপ্ত, গণি, মসিচূর্ণ,
ক্ষুদ্র-অস্থিময় কর্কশ নিতম্ব বিষম দ্রুপরিপূর্ণ!
বিকট গন্ধময় বসন মলিনতম, পাংশু পূর্ণপদ পত্র,
বিল্ব সদৃশ মুণ্ডিত কৃশ মস্তক দীর্ঘ শিখা স্থিত তত্র।
দরিদ্র অতিশয়, অর্থগৃধ্নু অতি, উদর অন্ন পরিশূন্য,
তবু যে স্থিত অসু অস্থি মধ্যগত পূর্ব পুরুষ গণপুণ্য।
তখন বিপ্রগণ বসিল পংক্তি রচি বিভক্ত হই দুই-অংশে,
মধ্য-অবস্থিত মধ্য বর্তিজন সতত আত্ম পরশংসে।
স্বল্প দৃষ্টিযুত বক্র পৃষ্ঠকটি বধির কথঞ্চিৎ কর্ণ।
সতত কটিস্থিত শম্বুক বিরচিত নস্য পাত্র কমদৃশ্য,
অনুপম গণি নিজবুদ্ধি:গর্বময়, তুচ্ছ গণই সর্ববিশ্ব!

দশম ও শেষ সর্গে বর্ণিত হয়েছে গুহক চন্ডাল, ভরদ্বাজ মুনি প্রমুখাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সীতা, লক্ষ্মণ সহ রামচন্দ্রের অযোধ্যা নগরীতে উপস্থিতি তথা রাজ্যাভিষেকের বিবরণ। বিবৃত হয়েছে অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের নির্দেশ প্রজাদের হিতসাধনে। স্পষ্টতই কবি রামচন্দ্রকে আদর্শ নরপতি হিসাবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন এইভাবে—

চৌর্য-অনৃত করহ শূন্য, দস্যু নিকর গরব চূর্ণ,
চেষ্টহ সব সচিব তূর্ণ, হিংস্রক জন মর্দনে।

সুন্দর সর করহ সৃষ্ট, শীঘ্র দমহ সলিল কষ্ট,
নির্মিত করি মঠ গরিষ্ঠ, শিক্ষিত কর সুপ্রথা,
সৃষ্টি করহ সুপথ ঘট্ট, পণ্য সহিত বিপুল হট্ট,
রম্য সুরভি-চরণ পট্ট নিষ্কর কর সর্বথা।

পরিশেষে কাব্যে ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। কাব্যে বর্ণিত প্রতিটি চরিত্রের ক্ষেত্রে এক একটি ছন্দআনুপূর্বিক অনুসৃত হয়েছে। কবি তাঁর নিজের বর্ণনা জয়দেবের গীতগোবিন্দের অন্তর্গত 'ললিত লবঙ্গলতা'র অনুকরণে রচনা করেছেন। যুক্তাক্ষর সমাবেশে দীর্ঘরক্ষা করতে গিয়ে কবিকে সমাস বাহুল্য স্বীকার করতে হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষণ পদ বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিভক্তি যুক্ত করা হয়েছে বিশেষণ পদে। বিসর্গান্ত-শব্দের অনেক স্থলে বিসর্গের লোপ লক্ষণীয়। কোনো কোনো স্থলে কবি উ-কারের লোপ ঘটিয়ে তৎপরিবর্তে কমার ব্যবহার করেছেন। ইনু ভাগান্ত-শব্দগুলিকে কর্মকারকে কবি হ্রস্বইকারান্ত রূপে ব্যবহার করেছেন। অসমাপিকা ক্রিয়াস্থলে 'ই' প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অসমাপিকা ক্রিয়ার ণিজন্ত ও অণিজন্ত পদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই রূপে স্থান পেয়েছে।

'**বিজনে-বিলাপ**' কাব্যটির রচয়িতা অনাথবন্ধু মজুমদার। কাব্যটির প্রকাশকাল ১৩১২। কবি কাব্যটি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীকে উৎসর্গ করেছেন। দেশপ্রেম মূলক ২০টি কবিতার সংকলন এ'টি। মোটামুটিভাবে সব কবিতাতেই পরাধীনতার কারণে কবিকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখা গেছে, অতীত গৌরবের কথাও কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, জাতিগত ঐক্য স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন শক্তিশালী জাতি তথা দেশ গঠনের জন্য।

'সুপ্তোত্থিত' কবিতায় জাতিগত ঐক্যের গুরুত্ব বিষয়ে বলতে গিয়ে দেশবাসীর হীনমন্যতা সম্পর্কে কবিকে বলতে দেখা গেছে—

যাহাদের পদতলে লুটাতেছ প্রভু বলে
ধন, মান, বিসর্জিছ মানিয়ে সভয় ;
ভাণ্ডার করিয়া শূন্য দিয়ে মান ধন মাল্য
মাগিয়া লতেছ শুধু দাসত্ব অভয় ;

কিন্তু জাতিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিপক্ষ যতই শক্তিশালী হোক, ভীত হতে বাধ্য হবে বলে কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

জাতিত্বের অভিষেকে নব দিবা-করালোকে
যে দিন করিবে প্রাণ পবিত্রতা ময় ;
সে দিন তারাই দূরে লাজে ভয়ে রবে সরে
সম্ভ্রমে চাহিবে ফিরে মানিবে বিস্ময়।

'একতা' কবিতায় কবি দেশবাসীকে পরাধীন ভারতমাতার মলিন বেদনার্ত রূপ স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই ব্যাপারে দেশবাসীর প্রতিক্রিয়া শূন্যতাকে ধিক্কার দিয়েছেন—

জননীর আঁখি জলে ভাসে ক্ষিতি গিরি গলে
না জানি তোদের প্রাণ কঠিন কেমন !
তাই শুষ্ক রাখিস নয়ন ।

'জন্মভূমি' কবিতাতে কবি পরাধীন ভারতবাসীর দেশ মাতৃকাকে অপমান করার কথা বলেছেন—

সকলেই পূজে পুণ্য মোক্ষ জন্মদায়িনী
কেবল ভারতবাসী
পরায়ে গলায় ফাঁসী
করে তব অপমান পরপদ শিরে হানি ।

'আর্য-গাথা'য় কবি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন এই বলে—

কেবল ভারত রহে পর পদানতরে ।

এই একই কবিতায় কবি হিন্দু মুসলমানের মৈত্রীর বন্ধন যাচঞা করেছেন—

মায়ের দুইটি ছেলে হিন্দু মুসলমান,
দুইটি যমজ মোরা
জননীর বুক জোড়া
দুইটি যে দুঃখিনীর অন্ধের নয়ন ।
ভুলো দ্বিধা ত্যজ দ্বন্দ্ব জননী কারণ
আয় আজ ভাই ভাই
দাঁড়াইয়া এক ঠাঁই
একতারে প্রাণে প্রাণ করিয়া বন্ধন,
দাঁড়াই যেনরে দুটি যমজ সন্তান ।

খয়েরাবাদ নিবাসী রঙ্গনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত **'সাধনা'** কাব্য পুস্তকটির প্রকাশকাল ১৩১৪ । কবি 'সাধনা' উৎসর্গ করেছেন মনীষী অশ্বিনী কুমার দত্তকে ।

'সাধনা' চারটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত । প্রথম উচ্ছ্বাসে কবি ভীষ্ম, দ্রোণ, দধীচি, রাণাপ্রতাপ, শিবাজী প্রমুখাদির উল্লেখে একদিকে ভারতবাসী হিসাবে আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, অপরদিকে যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্য, মোহনলাল, সিরাজদ্দৌলা প্রমুখাদির উল্লেখে বাঙ্গালী হিসাবে আমাদের গৌরবময় অতীত সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন । কবি আহ্বান জানিয়েছেন ঃ

বিদেশী বর্জন কর ধর্মের দোহাই !
বঞ্চক বণিকগণ কত ছলে বলে
তোমাদের সর্বনাশ করিছে কৌশলে,

তাই কবির পরামর্শ—

একটি সিকিও আর বিদেশে দিও না
তবে আর তোমাদের এ দুঃখ রবে না ।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে কবি জননী অপেক্ষা জন্মভূমির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ঃ

তাঁরাই প্রকৃত সুখী এই ভূমণ্ডলে,—
যাঁহারা স্বাধীন ভাবে ভ্রমে কুতূহলে
জাতীয় কেতন তুলি,
'জয় জন্মভূমি'—বলি ;
অতি তুচ্ছ স্বর্গ সুখ তাঁহাদের ঠাঁই ;
জন্মভূমি জননীর তুল্য আর নাই !!

তৃতীয় উচ্ছ্বাসে কবি চণ্ডীর আত্মপ্রকাশের প্রেক্ষাপটসহ মেঘ, বৃষ্টি প্রভৃতির উল্লেখে একতার শক্তি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে সকলকে দেশমাতৃকার কারণে জীবন উৎসর্গের আহ্বান জানিয়েছেন।

চতুর্থ উচ্ছ্বাসে কবি দাসত্বের পরিণতির কথা বলে ইংরেজদের দাসত্ব স্বীকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন স্বদেশবাসীকে। উচ্চাঙ্গের কবি কল্পনা কিংবা ছন্দ অথবা অলঙ্কার প্রয়োগ নৈপুণ্যের কোনো স্বাক্ষর না রাখতে পারলেও অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে 'সাধনা'র কবি দেশপ্রেমমূলক রচনার ইতিহাসে আসন লাভের অধিকারী।

১৯০৮ সালে (১৩১৪) প্রকাশিত **'অবসর'** কাব্যগ্রন্থটির রচয়িত্রী হুগলীর গুপ্তিপাড়ার শ্যামাচরণ সেনের কন্যা ফুলকুমারী গুপ্ত (১৮৬৯—১৯৩১)। সর্বমোট ১০টি কবিতার সংকলন এ'টি। সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে আছে নূতন বর্ষ, ফুলনারী, অশ্রুজল, লোক, সদ্যোজাত শিশুর প্রতি, উমা, বাল্যসখা, শীত অবসান, আমার গেহ এবং উচ্ছ্বাস।

প্রথম কবিতা 'নূতন বর্ষে' কবি একদিকে বিগত বৎসরটি তাঁর ব্যর্থতায় অতিবাহিত হওয়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, অপর দিকে আগামী বৎসরটিকে বিগত বৎসরের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক করে তোলার অঙ্গীকার বাণী ঘোষিত হয়েছে—

'ফুলনারী' কবিতায় যদিও মুখ্য প্রতিপাদ্য ঃ

ফুল মত শত শত
ফুটেছে কামিনী কত
সংসার উদ্যান ভরি গৃহস্থের ঘরে,
যেজন যেমন চায় লয় সমাদরে।

কিন্তু কবিতাটির আকর্ষণ গোলাপ, যুঁই, বকুল, গন্ধরাজ, চাঁপা ও রজনীগন্ধার বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ। গোলাপকে কবি উল্লেখ করেছেন ভাব বিলাসিনী ধনী ব্যক্তির রূপবতী রমণী রূপে। যূথিকাকে উপমিত করা হয়েছে নবোঢ়া বধূর সঙ্গে, বকুল প্রতিভাত হয়েছে শান্ত গৃহস্থ বধূ রূপে, গন্ধরাজ সংযত বিধবা রমণী, অপরপক্ষে চম্পক ও রজনীগন্ধা যেন বারনারী।

'অশ্রুজল' কবিতায় কবি অশ্রুজলকে শুধু দুঃখীর সম্বল বলেই স্বীকার করেন নি, তা আনন্দপ্রদ এবং সর্বদুঃখহর বলেও অভিব্যক্ত হয়েছে। কবির ভাষায়ঃ

দরিদ্রের যত বল,
তুমি নয়নের জল,
নিরাশ প্রেমিক জনে
বাঁচাও সান্ত্বনা দানে,
শত পুত্র শোক তুমি কর নিবারণ,
ওরে অশ্রু, সুখময় সৃষ্টির কারণ।

যে ব্যক্তি অশ্রুজল শূন্য, কবি তাকেই চরম হতভাগ্য বলে বিবেচনা করেছেন। তাই কবির প্রার্থনা—

যতদিন থাকি ওগো এ মর ভুবনে,
দয়া করি এস মোর নয়নের কোণে।

'শোক' 'মৃণালিনী' নাম্নী এক নিকট আত্মীয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে রচিত শোক গাথা।

'সদ্যোজাত শিশুর প্রতি' কবিতাটি দীর্ঘ। এই কবিতায় কবি সদ্যোজাত শিশুর কাছে নানা প্রশ্ন করেছেন। তার হাসি কান্নার কারণ, পৃথিবীতে তার আবির্ভাবের কারণ, তার স্রষ্টার স্বরূপ, পূর্ব জন্মের পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে কবিমনের ঔৎসুক্য প্রকাশিত হয়েছে।

'উমা' কবিতায় মদনভস্মের পৌরাণিক কাহিনীটি বিবৃত হলেও এর মুখ্য আকর্ষণ জগতে কামের গৌরব ময় ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত।

'বাল্যসখা'য় এক বাল্য সহচরের স্মরণ করাকে কেন্দ্র করে কবি তাঁর বাল্যের ফেলে আসা মধুময় দিনগুলির স্মৃতি চারণায় মগ্ন হয়েছেন।

সেই বন সেই মাঠ
সেই পুকুরের ঘাট,
সেই জাহ্নবীর তীর
সুবিমল স্নিগ্ধ নীর
সেই নব মুকুলিত আম্রের কানন,
একে একে মনে পড়ে সজীব স্বপন।

'শীত অবসান' কবিতায় শীতের অবসানে বসন্তের প্রাদুর্ভাবে প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন অনবদ্য ছন্দে রূপায়িত হয়েছে।

'আমার গেহ' কবিতায় কবির পলায়নকর মনোভাবের পরিচয় প্রকাশিত। রূঢ় সংসারের যন্ত্রণাদগ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার আশায় কবি তাঁর নিজস্ব এক কল্পনার গৃহ নির্মাণ করার কথা বলেছেন।

'উচ্ছ্বাস' কবিতাটি আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের সর্বশেষ কবিতা এবং দীর্ঘতম কবিতা। বিলাত প্রত্যাগত ভ্রাতাকে উপলক্ষ্য করে কবিতাটি রচিত হলেও মূলতঃ দেশপ্রেমই কবিতাটিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বিদেশীয়দের ঐক্যবোধ

সাহসিকতা, বীর্যবত্তা, স্বজাতি প্রীতি গুণগুলির প্রশংসা যেমন করেছেন কবি, তেমনি আত্মভূমির চরম দুরবস্থায় তাঁর অন্তরের ক্ষোভ ও বেদনাও প্রকাশিত হয়েছে। বিদেশ প্রত্যাগত ভ্রাতাকে দেশ জননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে দীর্ঘ প্রায় নব্বই বৎসর পূর্বে রচিত এই কবিতায়—

যে দশা হয়েছে আজি জনম ভূমির,
যে দশা হয়েছে আজি ভারতবাসীর,
এদের উদ্ধার তরে
কত শক্তি এক করে,
অপমান নির্য্যাতন সহিয়া নীরবে
দেশের মঙ্গলকর্ম করিবারে হবে।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রমুখ মহিলা কবিদের ধারাতেই বর্তমান কবির স্থান। সহজ সরল ভাষায়, অনলংকৃতভাবে মনের ভাবটিকে কবি স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করেছেন প্রচলিত ছন্দে। কবির দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব সহজেই চোখে পড়ে। পরিচিত বিষয়কে গতানুগতিক অভ্যস্ত দৃষ্টিতে না দেখে ভিন্নতর দৃষ্টিতে কবি দেখেছেন। কবিতাগুলির সর্বাপেক্ষা বড় গুণ এগুলির অকৃত্রিমতা। ভাব ও ভাষার প্রয়োগে কবির স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষণীয়।

ঘর গৃহস্থালীর কাজের অবসরে কবিতাগুলি রচিত বলেই কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে 'অবসর'।

শ্রীমদ্ স্বামী পরমানন্দ পরমহংস বিরচিত **'আনন্দ-বিজ্ঞান'** (১৯১০) বেদান্তসার কাব্য। অদ্বৈততত্ত্বের অপূর্ব ভাবচয় কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। জগতের অসমত্ব নিত্য, যোগ, মায়াই অনন্ত শক্তি, নিরুদ্ধচিত্তই স্বরূপ-দর্পণ, জীবমাত্রই সচ্চিদানন্দ প্রয়াসী, ব্রহ্মবিদ্‌ই ব্রহ্ম, আমিই চেতন ইত্যাদি মোট ৬৭টি ছোট বড় কবিতা সংকালত হয়েছে। কবিতাগুলির মাধ্যমে কবি একদিকে যেমন সাধন বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য উপস্থাপিত করেছেন, তেমনি সংসারের অনিত্যতা, সচ্চিদানন্দময় হওয়াতেই মুক্তি, সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্মের স্বরূপ তত্ত্ব ইত্যাদি প্রকাশ করেছেন। কবির ছন্দের ওপর অধিকার এবং দুরূহ তত্ত্বকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপিত করার নৈপুণ্যকে স্বীকার করতে হয়।

দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত **'শিবাখ্যা কিংকর কাব্য'**টি (১৯১২) একটি কাল্পনিক কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে রচিত। শূরগড় পতি ধীর চন্দ্র সিংহের কন্যা অমরার স্বয়ম্বর সভায় গৌড়েশ্বর সুদর্শনসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অমরা পতিরূপে বরণ করে নিল মহেন্দ্রকে। সেই থেকে গৌড়েশ্বরের একদিকে মহেন্দ্রের ওপর ক্ষোভ, তেমনি ক্ষোভ রাজকন্যা

অমরার প্রতি। অমরাকে করায়ত্ত করতে সুদর্শন মণিপুর পতি, ত্রিপুরার অধিপতি, বিক্রমপুর পতি, বিষ্ণুপুরের অধিপতি প্রভৃতিদের সহায়তায় মহেন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করেন কিন্তু সুদর্শনের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় না। যুদ্ধে প্রথম দিকে বিজয়ী হলেও পরবর্তীকালে পরাস্ত হন তিনি।

কাব্যটি বৃহৎ। মোট নয়টি সর্গে সমাপ্ত। কাব্যটি আনুপূর্বিক পয়ার ও ত্রিপদীতে রচিত। কাব্যটি রচনায় কবি বেশ মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বেশ কিছু আপ্ত বাক্যের প্রয়োগ কাব্য মধ্যে লক্ষিত হয়। যেমন

ক. দুখ সহে লোক সুখের লাগিয়া
ঘটে অমঙ্গল কুশল তরে। (পৃঃ ২০)

খ. অবস্থা পূজিত সতত জগতে
পূজনীয় নর কভু কি হয়
গতিহীন বলে কে পূজে জগতে
পাবক পূজাই, অঙ্গার নয়॥ (পৃঃ ২১)

গ. ভাগ্য মানে কর্মহীন কাপুরুষগণ
যত্নে প্রচালিত এই বিচিত্র ভুবন॥ (পৃঃ ৩৭)

ঘ. রক্ত মাংস আছে যার প্রতিহিংসা আছে তার (পৃঃ ৪০)

ঙ. সুন্দরী সুন্দর পেলে ত্যজে লজ্জা ভার॥ (পৃঃ ৪১)

চ. বিদ্যা বুদ্ধি বল বীর্য দৈবেরি সকল।
পুতুল তাহার হাতে মানুষ কেবল॥ (পৃঃ ৫৭)

ছ. ঐশ্বর্য নদীর জল আসে আর যায়। (পৃঃ ৫৮)

জ. মূঢ়জন পরে দোষে না দোষে আপন। (পৃঃ ৬১)

ঝ. বেশ্যা আর শৈল শোভা দূর হতে মনোলোভা
আরোহিলে নাহি সুখ যাতনা বহুল। (পৃঃ ৭০)

ঞ. মূখের প্রভুত্ব বাড়ে মূর্খ পেলে পর। (পৃঃ ১১১)

ট. ধনীর বিনয় যশের আগার॥ (পৃঃ ১৯৮)

ঠ. শত্রু যদি হয় প্রশংসা ভাজন
শত্রুর প্রশংসা করে সাধুজন, (পৃঃ ৪১০)

কবি কাব্য মধ্যে প্রায়ই অলংকার ব্যবহার করেছেন। ব্যবহৃত অলংকারের মধ্যে রয়েছে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি। ব্যবহৃত অলংকারের কয়েকটি উদ্ধার করা গেল—

১. মৃগ শিশু জিনি আঁখি মুখ-শশধর (২য় সর্গ, ব্যতিরেক ও রূপক)

২. সুবর্ণ জিনিয়া পান পাত্র নর ভাল। (২য় সর্গ, ব্যতিরেক)

৩. পড়েছে কালিমা হের অঙ্গুলি যুগলে।
রয়েছে ভ্রমর যেন নীল শতদলে॥ (৩য় সর্গ, বাচ্যোৎপ্রেক্ষা)

৪. ললিত মালতী দামে জড়িত তোরণ।
মেঘমালা যেন চাঁদে করিছে চুম্বন॥ (৩য় সর্গ, বাচ্যোৎপ্রেক্ষা)

৫. অতি মনোহর পুরী বঙ্গে বিষ্ণুপুর।
তুলনা অতুল তার ব্যঙ্গে বিষ্ণুপুর ॥ (৩য় সর্গ, যমক)

৬. দেখিয়াছি কত রাজা কর লয়ে করে।
বীবরর কাছে আসি কত স্তুতি করে ॥ (৩য় সর্গ, যমক)

৭. ধার্মিক সুশীল তিনি আমি তার গুরু।
রাজাও আমারে সদা ভক্তি করে গুরু ॥ (৩য় সর্গ, যমক)

৮. বাহিরিনু ঘর হতে কষ্টের কলসী বাঁধি
পাপের সাগরে দিনু ঝাঁপ। (৩য় সর্গ, রূপক)

৯. পূর্ণ নিশাপতি, নহে এ নৃপতি (৪থ সর্গ, সন্দেহ)

বর্ণনামূলক কাব্যটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবির ভারতপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে কাব্যের অষ্টম সর্গে এই ভাবে—

অভয়া বরদা তুমি,
ধন্য এ ভারতভূমি,
আস্বর্গ ভুবন সিন্ধু নিবাস তোমার।
স্বরগের সুধা আনি,
দাও তুমি ভবরানী,
কর এ ভারতভূমি ভুবনের সার ॥ (পৃঃ ৩৪৩)

মাঝে মাঝে কবির কল্পনাশক্তির অনবদ্য প্রকাশ লক্ষণীয়। প্রকৃতির বর্ণনায় কবি বলেছেন ঃ

জোনাকী কানের ভূষা ঝিঝি চরণের
কখনো চাঁদনী শাড়ী কভু আঁধারের ।। (২য় সর্গ, পৃঃ ৬৮)

কাব্যমধ্যে সমসাময়িক কালের পরিচয় মেলে সংস্কার, বস্ত্র, অলংকারাদির পরিচয় থেকে। নবম সর্গে রামেশ্বর যাত্রা সম্পর্কিত বহুল প্রচলিত সংস্কারের উল্লেখ করে বলেছেন—

যাত্রার সময়,
মৎস্য দরশনে কুশল ফলে। (পৃঃ ৪৫০)

কিংবা, হয় উল্কাপাত, ডাকে গৃধ্রগণ। (নবম সর্গ ; পৃঃ ৪৮৫)

বৈচিত্র্যময় বস্ত্রাদির বিবরণে বলা হয়েছে—

পরে শাড়ী বৃন্দাবনী দেখিতে সুন্দর।
কেহ পবে বারানসী শাড়ী সর্বোপর ॥
কেহবা রেশমী পেড়ে পরিল ঢাকাই ॥
মোটা সরু খাপে শাড়ী যার তুল্য নাই।
শান্তিপুরে শাড়ী পরে কিম্বা সাতগাঁর।
পরিয়াছে চন্দ্রকোণা আছে যা যাহার ॥
(৫ম সগ ; পৃঃ ১৮০)

এইবার অলঙ্কারাদির বিবরণ—

শ্রবণে কুন্তল পরে গলে পরে হার।
হেসো সুতি আদি করি বিবিধ প্রকার ॥
হরিদ্রা বরণ তাগা পরে বাহু পরে।
বালা চুড়ী বাঁধা লোহা পরিয়াছে করে।
নিতম্ব চাপিয়া গোটে বেঁধেছে কোমর ॥
পায়ে গোল মল পরা মধুর মুখর ॥

(৫ম সর্গ ; পৃঃ ১৮০)

হাস্যরস সৃষ্টিতে কবির দক্ষতা বাস্তবিক প্রশংসনীয়। সমাধি মগ্ন সন্ন্যাস বেশী রাজা মহেন্দ্র সমাধি থেকে জাগলে গোবর্ধনের তাকে প্রেতাত্মা জ্ঞানে ভীত হওয়ার বিবরণ, গোবর্দ্ধন কর্তৃক গোস্বামীর আচরণের নিন্দা, মৃত্যু ভয়ে ভীত রামেশ্বরের জল্পনা-কল্পনা ইত্যাদি নির্মল পরিহাসে পূর্ণ।

'যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রাবাহিনী', কিংবা 'বিরাজো মা হৃদ্‌ কমলাসনে'র মত গানগলি বহুল পরিচিত হলেও অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে এইসব সঙ্গীতের যিনি রচয়িতা সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১২৫৬-১৩০৯) তেমন পরিচিত নন অনেকের কাছেই।

উনিশ শতকের প্রবক্তাদের অত্যতম শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের মুখ্য পরিচয় পরিব্রাজক এবং বাগ্মী রূপে। ভারতে আর্য ধর্মের পুনর্প্রবর্তনায় তাঁর নিরলস প্রয়াস, 'আর্য ধর্ম প্রচারিণী সভা', 'সুনীতি সঞ্চারিণী সভা' ইত্যাদির প্রতিষ্ঠাতা এবং 'ধর্মপ্রচারক', 'সুনীতি', 'দি মাদারল্যাণ্ড' ইত্যাদি মাসিক, পাক্ষিক এবং সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নীতি রত্নমালা', 'পঞ্চামৃত', 'শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি','গীতার্থ সন্দীপনী', 'ভক্তি ও ভক্ত', 'রামগীতা' ইত্যাদি। তাঁর 'পরিব্রাজকের সঙ্গীত' (ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৩১) সর্বমোট ২৪৭টি বিভিন্ন ধরণের সঙ্গীতের সংকলন। সঙ্গীতগুলি থেকে শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর অন্তর্জীবনের পরিচয় লাভ করা যায়। এগুলিতে জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ. ভক্তি সাধনার গভীর তত্ত্বগুলি চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

দুঃখের বিষয় এমন একটি পদসঙ্কলনের আনুপূর্বিক আলোচনা আজ পর্যন্ত হল না। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙালীর গানে' (১৩১২) শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের মাত্র চারটি গান স্থান পেয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত অমরেন্দ্রনাথ রায় সংকলিত 'শাক্ত পদাবলী'তে (১৯৫৭) শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর দু'টি মাত্র গান সংকলিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই ক'টি পদ অবলম্বনে কোনো কোনো সমালোচক বিচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের পদ সম্পর্কে দু'একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র কবিভূষণ ছিলেন গঙ্গা, গায়ত্রী এবং

হরিনামের মাহাত্ম্যে অটল বিশ্বাসী। অপরপক্ষে তাঁর জননী ভবসুন্দরী দেবীর বংশ ছিল শক্তি উপাসনায় ব্রতী। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন উত্তরাধিকার সূত্রে পিতামাতার ধর্মবিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় ধর্মকেই তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। একটা ধর্মীয় উদারতা তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। অন্নপূর্ণা, দুর্গা, শ্যামা, কালী, তারা মা, শীতলার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পদ যেমন কবি রচনা করেছেন, তেমনি রচনা করেছেন শিব, হরির মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পদ। দেবসমন্বয় জ্ঞাপক বেশ কয়েকটি পদেরও তিনি রচয়িতা। এরকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদ হল—

ক. কভু হও মা রণকালী, কখন হও বনমালী,
কভু হও ত্রিশূলপাণি, বব বম্ বদনে বাজে ॥ (২২)

খ. যে ভাবে যে জন মজে, যে রূপে যে জন ভজে,
দেখা দাও তায় তেম্‌নি সাজে, হৃদয় মাঝে। (৬৫)

গ. অন্নপূর্ণা তুমি মা, তুমি শ্মশানে শ্যামা,
কৈলাসেতে উমা তুমি বৈকুণ্ঠে রমা ;
ধর বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণু রূপ, সৃজন লয় পালনে ॥ (৬৭)

ঘ. কায়াতে শ্রীকৃষ্ণ রূপ ছায়া শ্রীরাধা রানী ॥ (৮৮)

ঙ. আবার শ্যাম অঙ্গে মিশায়ে সে রূপ ধরে শ্যামা ;
তখন অসি বাঁশী ভেদ থাকে না, বনমালী মুণ্ডমালিনী ॥ (৮৯)

চ. ওমা কতই তোমার নাম, কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম,
তোমায় যে ডাকে যে নাম ধরে তার পূরাও মনস্কাম ; (১০১)

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের প্রথম বয়সের রচনায় রামপ্রসাদের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। 'সঙ্গীত-মঞ্জরী'র বেশ কয়েকটি পদ নিতান্ত অসচেতন পাঠককেও রামপ্রসাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। রামপ্রসাদের 'দেমা তবিলদারীর' অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন লিখেছেন, 'দেমা আমায় জমীদারী'। পরের দাসত্ব আর কেন করি। (৪৫) ; রামপ্রসাদের বহুল খ্যাত 'মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত' পদের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন লিখেছেন—

মা আমায় দোলাবি কত।
ঘরের টানা পাখা টাঙ্গানর মত ॥ (৪৬)

এছাড়াও 'মন কেনরে জ্ঞান হারা' (৮৯), 'দেনা আমায় তোর চাকরী' (৯৩) প্রভৃতি পদেও রামপ্রসাদের প্রভাব লক্ষণীয়।

অধ্যাত্ম সাধনায় কবি গুরুবাদী, এর প্রমাণ একাধিক পদেই বিদ্যমান। গুরুর নির্দেশিত পথে যাত্রা করে তবেই অভিলষিত লক্ষ্যে ভক্ত উপনীত হতে পারে, নতুবা ঘটে বিভ্রান্তি। এই গুরু যে কেবল দীক্ষা গুরু তা নন, কখনও চৈতন্য রূপী গুরু আবার কখনও বা জ্ঞান-গুরু। একটি পদে কবি বলেছেন ঃ

আমার চেতন্ গুরু চৈতন্য মন্ত্র বলাতে। (১১)

অন্য পদে কবি গেয়েছেন ঃ

জ্ঞান-গুরু হবেন কাণ্ডারী ভয় কি ভব তুফানে। (১৬)

বরাভয়দাত্রী গুরুর উল্লেখও লক্ষ্য করা যায়—

গুরু বলেন্ ভয় কি তথা, পরিব্রাজক ভাবিস্ বৃথা,
শোন কাজের কথা— (১৬)

গুরু নির্ভরতার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত পদ গুলিতেও—

ক. গুরু দত্ত সাধনের ধন সাধো সর্বথা ; (৫৯)

খ. ওরে, দীক্ষা শিক্ষা এই দুটো রেল, পাতো সুপথ পসারি
(ওরে মহাজন যে পথে চলে)।
ও তোর পশ্চাতে গার্ড হবেন গুরু,
মন করিবে ড্রাইভারি ॥ (৬৬)

গ. তোর গুরু দত্ত, সত্যতত্ত্ব,
কর তত্ত্ব, দুখ রবে না ॥ (৪৭)

গোবিন্দ অধিকারীর বহুল প্রচলিত' 'বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের' পদের ছাঁদে পদকর্তা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বেশ কয়েকটি পদ রচনা করেছেন। গোবিন্দ অধিকারী তাঁর পদে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার অদ্বৈতমূলক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন 'মৃত্যু ও মুক্তি সংবাদ' শীর্ষক পদে কাশীর মাহাত্ম্যকীর্তন করেছেন। 'পাপ ও পুণ্যের বিবাদ' শীর্ষক পদে হরি ও হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। সেই সঙ্গে পুণ্যের অপ্রতিহত ক্ষমতাও নির্দেশিত হয়েছে। 'নন্দী ও জয়ার সংবাদ' দুর্গানামের মহিমা জ্ঞাপক পদে রূপান্তরিত। 'ভোগ ও বৈরাগ্যের সংবাদে' সংসারের অনিত্যতা প্রকাশ করে ভোগাসক্তি থেকে মামুষকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সেইসঙ্গে বৈরাগ্যের জয়গান ঘোষিত হয়েছে। উল্লিখিত চারটি পদই কথোপকথনের ঢঙে রচিত হওয়ায় একপ্রকার নাটকীয়তা সঞ্চারিত হয়েছে। কালী, পুণ্য, দুর্গানাম এবং বৈরাগ্যের স্বপক্ষে প্রচারে পদকর্তা অবলম্বিত রীতিটি চমৎকার ফলপ্রসূ হয়েছে স্বীকার করতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বেশ কয়েকটি পদে দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার তুলনায় ভারতের বর্তমান দীন অবস্থায় কবি ব্যথিত হয়েছেন। শৌর্য বীর্যে ভারতের পুনর্জাগরণ কবি প্রার্থনা করেছেন আন্তরিকভাবে। অধ্যাত্ম বিষয়ক সঙ্গীত রচনা প্রসঙ্গে দেশপ্রেমের এই অভিব্যক্তি আমাদের বাস্তবিক চমৎকৃত করে। একটি পদে কবি বলেছেন—

ওহে ভারত তোমার মহিমা প্রচার
করহে আবার এই নিবেদন ॥ (০)

কিংবা কবির দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের খেদোক্তি—

সোনার ভারতভূমি রসাতলে যায় হে। (৪)

অপর একটি পদে কবি ভারতীয় ঐতিহ্যে দীক্ষিত হবার বাসনা প্রকাশ করেছেন—

ভারতীয় ভাবে দেও হে দীক্ষা রক্ষাং কুরু চিদ্‌রূপ হে। (৪০)

ভারতের অধঃপতিত অবস্থায় কবির অন্তর্বেদনার প্রকাশ ঘটেছে একাধিক পদেই—

পুণ্য ভূমি এ ভারত, আছে কি আর পূর্বের মত
নামমাত্র আছে কেবল, প্রাণশূন্য শব যেমন ॥ (৩৮)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বাজাত্যবোধের অন্যতম পরিচয় হয়ে উঠেছিল দেশমাতৃকাকে চিন্ময়ীরূপে বন্দনায়। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নও এই পরিচয়দানে বিরত থাকেন নি—

কত যে মহিমা তব, বিভব আর কত কব,
করযোড়ে করে স্তব, সর্বদেশী জনে গো ॥
... ...
তোমারই ঐশ্বর্য লয়ে, তোমারই মঙ্গল গেয়ে,
তোমারই সেবক হয়ে, ভ্রমিব ভুবনে গো ॥ (৪০)

একাধিক পদে পদকর্তা অনবদ্য চিত্রকল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। নদীর বিচিত্র রূপের বর্ণনা দান প্রসঙ্গে কবি নদীকে কখনও গৈরিক বসনা তপস্বিনী রূপে রূপায়িত করেছেন, আবার কখনও তার ক্ষীণ রূপ দেখে কৃচ্ছ্রসাধনায় রতা তপস্বিনী বলে বর্ণনা করেছেন—

গৈরিক বসন পরি, তপস্বিনীর বেশ ধরি,
ভাব-তরঙ্গে তুফান ভারি, বরষার জল গো ॥
কভু দেখি গো তোরে, যেন তপস্যা করে,
অতি ক্ষীণ কলেবরে, শুকায়ে বিকল গো ॥ (১৯)

সংসার অরণ্য মধ্যে মানুষ ব্যাধের বধ্য জীবন মাত্র, তাই কোনক্রমে এই অরণ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই জীবের কাম্য—জীবকে মৃগের সঙ্গে, কালকে ব্যাধের সঙ্গে, লতাকে মায়ার সঙ্গে, বিষয়কে বৃক্ষের সঙ্গে অভেদ কল্পনা করে কবি বলেছেন ঃ

জীব মৃগ রে, কি আর কর ;
সাবধানে এ বনে বিচর।
এ ঘোর গহনে, কুহক-কাননে,
আছে ব্যাধ দণ্ডধর ॥
আছে মায়া-লতা এ বন বেড়িয়ে,
যেদিকে যাইবে ধরিবে জড়িয়ে,
আসিবে কাল ধেয়ে মৃত্যুবাণ লয়ে,
করিবে সন্ধান শর ॥
ঐ দেখ ভীম দুষ্ট ব্যাধ কাল,
বিষয় বৃক্ষতলে পাতিয়াছে জাল, (২৮)
ইত্যাদি।

'শেষ জীবনের সঙ্গীত' পর্যায়ে সংযোজিত একাধিক পদে পদকর্তার ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের ছায়াপাত ঘটেছে। পদকর্তা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন কিন্তু বিপর্যয়ের কারণে কোনো দুঃখ অথবা ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি, বরং প্রসন্ন চিত্তে প্রতিকূলতাকে বরণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

নিজ নিন্দা-রজে গড়াগড়ি দিব (৯৫)

অপর পদে কবি তাঁর প্রতিকূলতা জনিত পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ

আমায় কেউ বলে ভণ্ড পাষণ্ড কেউ বলে অবিশ্বাসী
(কপট লম্পট শঠ কেউ বলে মা)।
আবার কেউ বলে বা চোর জুয়াচোর গালি দেয় রাশি রাশি
(ও তোর এমনি কৃপা)।
নিন্দাফুলের মালা সেই পরে, যে ঐ পদ অভিলাষী (৯৬)

পদকর্তা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের কৈশোর তথা দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে রচিত পদগুলিতে একপ্রকার স্বাভাবিক সারল্য লক্ষিত হয়। অনলঙ্কৃত ভাষায় সহজ ছন্দে কবি তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনার কথা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দীক্ষা গ্রহণের পর রচিত বেশ কিছু পদে তত্ত্ব প্রাধান্য লক্ষণীয়। সাধনার গূঢ় তত্ত্বগুলি পদগুলিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। যেমন—

'আমার রূপ সাগরে যাওয়া নাওয়া কঠিন হলো' পদটিতে ষট্‌চক্র ভেদসহ সাধন প্রণালীর কাঠিন্য বর্ণিত হয়েছে। 'একবার মিটয়ে সন্দ মনের দ্বন্দ্ব আনন্দে বল্ হরি বোল্' পদটিতে যখন বলা হয়

'ওরে,পাঁচ হাওয়া পাঁচ ছাওয়া ঘরে—
পাঁচ ভূতে তুলিছে রোল ;—
যদি পাঁচ পাঁচে পঁচিশের মানুষ
দেখ্‌বি তবে দুয়ার খোল্ ॥

তখন বোঝা যায় পদকর্তা 'পাঁচ হাওয়া' বলতে পঞ্চপ্রাণ, 'পাঁচ ভূত' বলতে পঞ্চভূত, 'পঁচিশের মানুষ' বলতে চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতীত আত্মার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে নাম মাহাত্ম্যে পদকর্তার অবিচল আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, বিশেষত হরি নামে—

ক. জান না কি—কেবল হরিনামে শেষের গতি। (২১)

খ. নামামৃত প্যান কর সবে ভাই (হরি)
এমন্ নাম্ কখনও শুনি নাই ॥ (৩৭)

গ. হরি নামটি সুধাময় নামে পাপ তাপ দূর হয়,
নামে জন্মে ভক্তি জীবন্মুক্তি আপনি হয় উদয় ;—(৬০)

স্তবজাতীয় পদগুলিতে ধ্বনি মাধুর্য ছাড়া শিল্পগুণের তেমন প্রকাশ ঘটেনি স্বীকার করতে হয়—

ক. মধুমর্দন, দীন শরণ, দুর্মদ দনুজারি (২)

খ. শঙ্কর পশুপতে নমস্তে পাশ পরশুধারী। (৫০)

অলঙ্কার প্রয়োগে কবি গতানুগতিকতাকে অনুসরণ করলেও মাঝে মাঝে যে বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। একই সগুণ ব্রহ্মই পঞ্চ-দেবতা রূপে প্রকাশিত—এই দার্শনিক প্রত্যয়ের কথা বলতে গিয়ে কবি ঢোল বাদ্য ও গঙ্গার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—

…নানা বুলি বাজায় ঢুলী বাজে কিন্তু একই ঢোল।
ওরে, পাঁচ ঘাটে এক গঙ্গা বটে ঠারে ঠোরে বোঝ্ পাগল ;—(৩৯)

স্বভাবসিদ্ধ সাধনা ব্যতিরেকে কারো পক্ষে যে প্রকৃত ভক্ত হওয়া সম্ভব নয়, একটি পদে পদকর্তা গাছপাকা ফলের স্বাভাবিক মিষ্টত্বের অধিকারী হওয়া প্রসঙ্গে তা বুঝিয়েছেন—

আপন যুতে না পাক্‌লে কি গাছপাকা ফল হয়।
তাতে হয়না মেওয়া রে—মিষ্ট রোওয়া
কথার হাওয়ায় জানা যায়॥ (৪৮)

ভগবদ্‌ভক্ত সিদ্ধপুরুষ ব্রহ্মানন্দ রসের মহাজনদের কবি রসিক পসারী বলে অভিহিত করেছেন ; অপর পক্ষে যথার্থ ভক্তকে অভিহিত করেছেন রসিক বলে—

যত রসের পসারী, তাদের দোকান দোধারি,
রসিক যারা কিন্‌চে তারা রসের মাধুরি— (৫৬)

আয়ু যে ক্রমেই মৃত্যুর কবলীভূত হয়, এই সত্য প্রকাশ করেছেন কবি সূর্য গ্রহণের চিত্রকল্পের উপস্থাপনায় :

আয়ু সূর্য কাল রাহু, ক্রমশঃ গ্রাসিতেছে॥ (১৩)

একটি পদে শ্লেষ অলঙ্কার প্রয়োগে কবি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন—

মিছা মায়ায় স্বপন্ দেখে, স্ব-পণ্ পূর্ণ করে না॥ (৩২)

অনুপ্রাস অলঙ্কারও ব্যবহৃত হয়েছে নানা পদে—

ক. তিমির বারণ অরুণ বরণ, তরুণ কিরণ ধারী (১০৪)

খ. মোহান্তে অন্তরে চিন্ত, শ্রীকান্ত শ্রীপদ প্রান্ত ; (৩১)

বেশ কয়েকটি পদে পদকর্তা সংস্কৃত পদ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন :

ক. দেহি মে পদ পতিত পাবন (২)

খ. এসো জনকং তত্ত্বজ্ঞানী, ত্রাহি বিষম্ দায় হে॥ (৪)

গ. রুরুচিৎ-স্বরূপম্ ধারণা রে॥ (৭)

ঘ. পরিব্রাজকের মিনতি, দেহি মে বিবেক-সুমতি (১৫)

ঙ. ভারতীয় ভাবে দেও হে দীক্ষা, রক্ষাং কুরু চিদ্‌রূপ হে॥ (৪০)

চ. ত্রাহি মাং ত্রাহি মাং ত্রাহি মাং জননী ॥ (৪৯)

ছ. ত্রিপুর-মদ-মর্দন—মদন মথনকারী ॥ (৫০)

জ. কিংকরে করুণাং কুরু গো উমা (৫১)

ঝ. সে যে নিত্যং দেবদুর্লভং (৫৬)

ঞ. জলবিম্ব জলাশয়ে পরিব্রাজকেন স্তুতে ॥ (৬৫)

কোনো কোনো পদে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করেছেন চমৎকার ভাবে। 'কলের গাড়ী' শীর্ষক বাউলাঙ্গের গানে গার্ড, ড্রাইভার, পম্পকল, সিট্, টিকিট্. ব্যাগ, রিজার্ভ, সিগ্‌নাল, কমিউনিকেশন, কলিশন, ইস্টেশন, লাইন ক্লিয়ার, অলরাইট শব্দগুলির সাক্ষাৎ মেলে।

কবি সুনীতি ঘোষ (১৮৮১—১৯৫৭) জন্মসূত্রে মহাকবি মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পৌত্রী এবং মানকুমারী বসুর ভ্রাতুষ্পুত্রী। কবির জন্ম যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে। সুনীতি ঘোষ অল্পবয়সেই বিধবা হন, শুধু তাই নয় জ্ঞাতি বিরোধিতায় তাঁকে পুত্রকন্যা সহ পিত্রালয়ে ফিরে আসতে হয়। একমাত্র কন্যা ঊষা বসুর মৃত্যুজনিত শোকও কবিকে পেতে হয়েছিল। এইভাবে একদিকে পারিবারিক ঐতিহ্য, অপরদিকে ব্যক্তিগত শোক কবিকে কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। উনিশ শতকের শেষ ভাগে এবং বিংশ শতকের প্রথমে কবি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিনান্তে'। কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর অপর কাব্যগ্রন্থ 'কপোতাক্ষী'। মোট কুড়িটি কবিতার সংকলন এ'টি। একাধিক কবিতাতেই কবি মধুসূদন ও মানকুমারী বসুর উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া কপোতাক্ষী, সাগরদাঁড়ী অবলম্বনেও কবিতা রচনা করেছেন। ঈশ্বরপ্রাণতা বেশ কয়েকটি কবিতাতেই পরিস্ফুট। বেদনাহত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কবির ঈশ্বরের প্রতি অভিমান প্রকাশিত হয়েছে—

দাস-দাসী অলংকার
অট্টালিকা মনোহর
চাইনি এসব কিছু নিকটে তোমার !
একটু শান্তি এ হৃদয়
চেয়েছিনু শুধু পায়,
ব্যতীত দুঃখের বোঝা কি দিয়েছ আর ? (দিনান্তে)

ঈশ্বর নির্ভরতা এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধনেই যে জীবনের সার্থকতা কবি বারংবার তা ঘোষণা করেছেন।

প্রেমের বন্ধনে বাঁধি হিয়া
মিলিত হইয়া পরস্পর,
যতটুকু যাহার শকতি
কর কাজ জগৎ পিতার। (মানবজীবন)

আদর্শ মানুষ বলতে কবি তাকেই বুঝিয়েছেন, যে দয়াশীল, নিঃস্বার্থপর ও প্রেমিক—

আছে দয়া, প্রেম যার জীবের উপর
সেই জন মানব ধরায়। (আদর্শ মানব)

বক্তব্য প্রকাশে আবেগ বর্জিত ঋজুতা কবির কবিতাগুলিতে এক বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেছে। ছন্দের ওপর কবির স্বাভাবিক অধিকার ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রায় পঞ্চাশটির মত নাটক, গীতিনাট্য, প্রহসনের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হল দ্বিতীয় অধ্যায়ে। আমরা জানি বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় নাট্যশাখাটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কিন্তু প্রাচুর্যের বিচারে অন্যান্য শাখার তুলনায় বাংলা নাটককে কোনমতেই দুর্বল বলে স্বীকার করা যাবে না। বস্তুতপক্ষে খ্যাতনামা নাট্যকারগণ ব্যতিরেকে অখ্যাত, অপরিচিত কত নাট্যকারই যে নানা ধরণের নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের একাধিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস আছে, কিন্তু আমাদের আলোচিত নাট্যকারগণের অধিকাংশই সে সব ইতিহাসে অনুল্লিখিত থেকে গেছেন। যদিই বা কেউ উল্লিখিত হয়েছেন, সেক্ষেত্রে তাঁর সব নাটক আলোচিত হয়নি। এর অন্যতম কারণ আমাদের আলোচিত নাটকগুলির সিংহভাগই দুষ্প্রাপ্য। আলোচিত নাটকগুলির মধ্যে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন নাটকের সংখ্যাই হবে কুড়িটির মত। তাছাড়া আলোচিত নাটকগুলির বিষয় বৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। যদিও এগুলির সিংহভাগেরই অবলম্বিত বিষয় হল পৌরাণিক, তথাপি ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটকের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। কয়েকটি প্রহসনও আলোচিত হয়েছে। রচনার সৌকর্যে সবগুলিই যে সমমানের নয় তা বলাবাহুল্য। কোন নাট্যকার হয়ত বা প্লট নির্মাণে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, কারও দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে সংলাপ রচনায়, কেউ বা মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন চরিত্র চিত্রণে। তবে প্লট, চরিত্র, সংলাপ সব মিলিয়ে রসোত্তীর্ণ সার্থক নাটকের সংখ্যা খুবই কম। পৌরাণিক নাটকগুলির ক্ষেত্রে প্রচারধর্মিতা এবং পূর্ব থেকেই নাটকের সমাধান বিষয়ে উল্লেখ নাটক-গুলির রসোত্তীর্ণতার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে উঠেছে। সংলাপ রচনার ক্ষেত্রেও অনেকেই সংযম রক্ষার প্রমাণ রাখতে পারেননি। অনাবশ্যকভাবে সংলাপকে দীর্ঘ করে তাকে প্রায় বক্তৃতায় পর্যবসিত করা হয়েছে। তবে সে তুলনায় সামাজিক নাটক রচনায় নাট্যকারগণ অধিকতর বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রহসনের প্রসঙ্গেও এই একই বক্তব্য।

বনমালী চট্টোপাধ্যায় রচিত '**বরের কাশীযাত্রা**' প্রহসনটির প্রকাশকাল ১২৭৪ বঙ্গাব্দ (১৮৬৭)। প্রহসনটি লেখক তাঁর খুল্লতাত গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন।

গ্রন্থোৎসর্গে লেখক বলেছেন ঃ

'আমার হৃদয় ক্ষেত্রের যত্ন-পাদপ শিশুর সমাশ্রিতা বিদ্যালতা ভক্ষক আলস্য ছাগকে মহাশয় যে উপদেশ যষ্টি দ্বারা নিবৃত্ত করিয়া উৎসাহ সলিল সিঞ্চনে বৃক্ষলতা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, উক্ত লতা এই নাটক-কুসুম প্রসব করিয়াছে। এই কুসুম মহাশয়ের শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম।'

প্রহসনটি শুরু করার আগে নাট্যকার 'মঙ্গলাচরণে' দেবী সরস্বতীর বন্দনা গেয়েছেন।

প্রহসনখানির বিষয় এক বৃদ্ধের দার পরিগ্রহের দুর্দম বাসনা কিরূপে ব্যাহত হল এবং পরিণামে বৃদ্ধ কাশীবাসী হবার সিদ্ধান্ত করলেন তারই হাস্য-করুণ বিবরণ।

অন্তিমপুর নিবাসী নিত্যানন্দ রায় নামে এক ব্রাহ্মণ তৃতীয় পত্নীকে হারিয়ে চতুর্থবার দার পরিগ্রহের মানসে ঘটককে নিযুক্ত করেন। ঘটকের নাম ঘনশ্যাম চক্রবর্তী।

ঘনশ্যাম তরুণ নগরের রূপনারায়ণ পাকড়াশীর কন্যা চতুর্দশ বর্ষীয়া ভয়বারিণীর সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহের সম্বন্ধ করে। কন্যার পিতা রূপনারায়ণ তার অপোগণ্ড পুত্রকে সম্পদের অধিকারী করার অভিপ্রায়ে বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহে সম্মত হন। কন্যা পণ নির্দিষ্ট হয় এক সহস্র মুদ্রা।

রামানন্দ মজুমদার নিত্যানন্দের বিবাহের সংবাদে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে বিবাহ করতে নিষেধ করলে নিত্যানন্দ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। মতিবাবু সৎপাত্রে কন্যা দানের জন্য রূপনারায়ণকে পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। নিত্যানন্দ বর রূপে উপস্থিত হলে পাত্রী ভয়বারিণী তাকে দেখে অত্যন্ত দুঃখিতা হয়ে দ্রুত মৃত্যুকামনা করেছে। শেষ পর্যন্ত সর্পাঘাতে ভয়বারিণীর মৃত্যু ঘটেছে। নিত্যানন্দ ব্যর্থ মনোরথ হয়ে কাশীবাসী হবার সংকল্প করেছেন।

সমসাময়িক সামাজিক প্রথাগুলিকে প্রহসনটিতে নিদারুণভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ব্যঙ্গ করা হয়েছে বৃদ্ধের বিবাহ করার হাস্যকর বাসনাকে, ব্যঙ্গ করা হয়েছে অল্প বয়সী কন্যার সঙ্গে অর্থের লোভে বৃদ্ধ পাত্রের অসম বিবাহ-দানকে। তাছাড়াও উপহাস করা হয়েছে অপোগণ্ড পুত্রের নিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য অবিবেচক পিতার অযৌক্তিক প্রয়াসকে, বহুবিবাহ করার প্রথাকে। সমসাময়িক সমাজজীবনের প্রতিফলনের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ, সর্প দংশনে ওঝার চিকিৎসা ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রহসনটিকে কোন অঙ্ক বা দৃশ্যের দ্বারা বিভক্ত করা হয়নি। গদ্য এবং পদ্যে প্রহসনটি রচিত। তাছাড়া নাট্যকার প্রহসনটিতে স্বগতোক্তির ব্যবহার করেছেন।

নাট্যকার পয়ার ও ত্রিপদী রচনায় বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কন্যার রূপ যৌবনের বিবরণ ঘটক দিয়েছেন পয়ারে—

রজনী শোভক হর—ললাট-ভূষণ।
কুমুদিনী নাথ শশী দেখিয়া বদন॥
লজ্জায় আকুল হয়ে উঠিল গগনে।
জলে ফেলি প্রণয়িনী কুমুদিনী গণে॥
তথাপি না উদে দিবা ভাগেতে সেথায়।
রজনীতে আসে যায় তস্করের প্রায়॥

রামানন্দ মজুমদার কর্তৃক বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ না করার যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে ত্রিপদীতে—

করি এ বয়সে দারা, উপকার তার দ্বারা,
প্রাপ্ত কি হইবা নিত্যানন্দ।
বৃথা আশা পরিহরি, সদত জপ হে হরি ;
যাহে তব রবে নিত্যানন্দ ॥
যদি বিয়ে কর রায়, দুঃখেতে কাঁদিবা রায় ;
তবু বাক্য সরিবে না স্বরে।
যেই কালে সেই ধনী, করিয়া কুচ্ছিত ধ্বনি ;
বিঁধিবেক কুবচন স্বরে ॥

মতিবাবুর তিলোত্তমাকে আক্রমণ করে উক্তিটিও উপভোগ্য—

যেরূপ তোমার রূপে শুনলো ঘরণি।
প্রাণসমা প্রিয়তমা মহিষ বরণি ॥
কটা কেশ গ্রীবাদেশ নাহিক এড়ায়।
কি সুদৃশ্য যবে ফুর ফুর করে বায় ॥
মরি কি উচ্চ কপাল দেখিতে সুন্দর।
যেন ভড়ে জল ভরে বান্ধিবারে ঘর ॥

ভয়বারিণী বৃদ্ধ পাত্রের বর্ণনায় বলেছে—

যার হব পরিবার যার হব পরিবার।
লোলো চর্ম শ্বেত কেশ হয়েছে তাহার ॥
নাহি ধরিলে না হাটে নাহি ধরিলে না হাটে।
তাহার সমান বুড়া নাহি মিলে হাটে ॥
মরে কাশিতে কাশিতে মরে কাশিতে কাশিতে।
কাশীতে না গিয়ে কেন আইল নাশিতে ॥

ভয়বারিণীর ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে, কিন্তু এজন্য বেচারীকে অকালে সর্পাঘাতে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। এতেই প্রহসনটির হাস্যরস খানিকটা ব্যাহত হয়েছে।

মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র এবং মনোমোহন বসু যখন নাটক রচনায় ব্রতী, তখনই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় রচনা করেন **'ধর্মস্য সুক্ষ্মাগতি'** নাটকটি (১২৭৫)। অঘোরনাথের রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থ হল যথাক্রমে 'বিয়োগী বন্ধু' (১২৮৩) এবং 'সচিত্র সিন্ধু বর্ণন কাব্য' (১২৯৮)। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নদীয়া জেলার অন্তর্গত ইছাপুর গ্রামনিবাসী। তাঁর নাটকটি সুদীর্ঘ ১১৮ বৎসর পূর্বে কলকাতা থেকে 'কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে' কালীকিংকর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত হয়।

নাটকের শিরোনামের ইংরেজীতে বলা হয়েছে 'Virtues Mysterious

ways'। নাটকের আখ্যান পত্রে নাটকটিকে 'Original Bengalee Drama' বলে দাবী করা হয়েছে।

নাটকটির 'বিজ্ঞাপনে' নাট্যকার তাঁর নাটক রচনার কারণ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

'কয়েক বৎসরাবধি অস্মদ্দেশে বঙ্গ ভাষায় বহুবিধ নাটক রচনা ও তাহার অভিনয়াদি আরম্ভ হইয়াছে, তদ্দর্শনে আমিও কৌতূহল পরবশ হইয়া ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতি নামে এই নাটকখানি রচনা করিলাম ;'

নাট্যকার তাঁর নাটকটিকে উৎসর্গ করেছেন গোবরডাঙ্গা গ্রামের জমিদার বাবু সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে।

সম্ভবতঃ সমসাময়িক কোনো বাস্তব ঘটনা অবলম্বনেই নাট্যকার নাটকটি রচনা করে থাকবেন। ধর্মের সূক্ষ্ম গতি প্রতিপাদ্য করতেই নাট্যকার নাটকটি রচনা করেছেন, কিন্তু কোনো ধর্মীয় বা পৌরাণিক ঘটনাকে অবলম্বন না করে একটি সামাজিক বিষয়কে অবলম্বন করেছেন তিনি। জগদীশপুরের জমিদার বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামলালকে দেশত্যাগী হতে বাধ্য করেছিলেন। এরপর শ্যামলালের একমাত্র পুত্র বিপিনকে হত্যা-পূর্বক তিনি নিষ্কণ্টকে বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। ভাগ্যক্রমে গুরুতর রূপে আহত বিপিন পুরোহিত ও অধ্যাপক জানকী ভট্টাচার্য ও তাঁর শিষ্যদের সেবায় নিরাময় লাভ করে। সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের সক্রিয়তায় ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বনাথ ও তাঁর অনুচরবর্গ ধরা পড়ে ও শাস্তি লাভ করে। অনেক বিপত্তির পর বিপিন কাশীধামে তার পিতা-মাতার সঙ্গে মিলিত হয়। বিপিনের স্ত্রী পদ্মগন্ধাও কাশীধামে গিয়েছিল স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে। কিন্তু তাকে গৃহত্যাগিনী অপবাদ দিয়ে প্রথমে তার শ্বশুর বধূরূপে গ্রহণ করতে অসম্মত হন। বিপিন গৃহত্যাগী হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পুত্র, পুত্রবধূ, শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতার মিলনে নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

নাটকটি পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট এবং সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারে রচিত। সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে নাট্যকার 'প্রস্তাবনা'য় নট-নটীর কথোপকথনের মাধ্যমে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। দীনবন্ধু এবং মনোমোহন এই দুজন নাট্যকারের প্রভাবই অঘোরনাথের নাটকে লক্ষিত হয়। দীনবন্ধুর মত অঘোরনাথের নাটকে বেশ কিছু প্রবাদ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, এমনকি নাটকের নামকরণেও প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে আলোচ্য নাটকে সংস্কৃত প্রবাদের আধিক্যই লক্ষণীয়। যেমন মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ, আয়ুর্ম্মর্ম্মাণি রক্ষতি, আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, লাভঃ পরং গোবধঃ, ফলেন পরিচীয়তে, ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। তাছাড়া দু' একটি বাংলা প্রবাদ বাক্যেরও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। বেশ কিছু সংস্কৃত শ্লোক নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। মনোমোহনের অনুকরণে অঘোরনাথ নাটকে বেশ কয়েকটি গীত এবং পয়ার ছন্দের কবিতার সংযোজন ঘটিয়েছেন। নাটকের সংলাপ স্থানে স্থানে বেশ দীর্ঘ হয়েছে, তথাপি

সামগ্রিক ভাবে সংলাপ ব্যবহারে নাট্যকারের নৈপুণ্যই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ব্যতীত হিন্দী সংলাপও নাটকে স্থান পেয়েছে। বিশ্বনাথের সিপাহীরা, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতিদের ক্ষেত্রে হিন্দী সংলাপ প্রযুক্ত হয়েছে। সংলাপের ভাষা সাধু হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা চলিত ভাষার জীবন্ত স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। দু' একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ক) মদন। সীতানাথ। তুই এই হাত্‌টা তুলে ধর্‌ত ভাই, কাঁধটা ভাল করিয়া বাঁধি। তোমার গাম্‌ছা খানা দাও, আমার ঐ কাপড়খানাও দাও, শক্ত করিয়া বাঁধি, এখনও বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে হে। (পৃঃ ৭)

(খ) রতা। হুজুর! আপনার হুকুম কি কখন বৃথা যায়? আমরা তাঁকে মারিয়া কুচি কুচি কর্‌য়ে ভাস্‌য়ে এসেছি, তার কোন নিশান পাবার যো নাই। (পৃঃ ১৩)

(গ) শ্যামলাল। চুপ কর শালা! তোর ও সব কথায় কাজ কি? নির্বংশের পুত্‌! এ সব তোরই কর্ম, মেরে তোর হাড় গুঁড়া করিয়া দিব, জান না বটে—যাবে কোথায় শালা? (পৃঃ ৯৮)

(ঘ) ক্ষমা। মঙ্গলা! চল্‌, আমরা যাই, যার ধন তাকে দিলাম, য়োঁদের এখন যা খুশী তাই করুন। (পৃঃ ৯৮)

এইবার চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। বিপিনকে ব্যক্তিত্বহীন রূপে দেখা গেছে। বরং সে তুলনায় পদ্মগন্ধাকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্না দেখা গেছে। লোকাপবাদের ভীতি তুচ্ছ করে সে স্বামী সন্নিধানে উপনীত হতে কাশীধামে উপনীত হয়েছে প্রতিবেশীদের সঙ্গে। পরস্বাপহারী অর্থলোলুপ রূপে বিশ্বনাথের চরিত্রটি বাস্তবানুগ হয়েছে। অপরপক্ষে বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামলালকে দেখা গেছে অধিক পরিমাণে দেশাচারে বিশ্বাসী হতে। দেশাচারের ভয়ে নির্দোষ পুত্রবধূকে গৃহে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়েছেন তিনি। জানকী ভট্টাচার্যকে নাট্যকার স্বভাব ভীরু প্রকৃতির করে সৃষ্টি করলেও তারই কারণে মুখ্যতঃ মৃত্যুপথযাত্রী বিপিনের জীবন রক্ষা হয়েছে। চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের কৃতিত্ব লক্ষিত হয় বিশেষ করে মোক্তার মহানন্দ বসু ও দারোগার ক্ষেত্রে। উভয়েই লোভী এবং অর্থের কারণে যে কোনও প্রকার অসৎ কর্ম সম্পাদনে উভয়েই দৃঢ়। দরিদ্র হয়েও বংশীধর মোদক যে বিরল কর্তব্য পরায়ণতার পরিচয় দিয়েছে সেজন্য তার সাধুবাদ প্রাপ্য। বেচারী তার সত্যপরায়ণতার কারণে অমানুষিক নির্যাতনও ভোগ করেছে।

নাটকটিতে সমসাময়িক জীবনের প্রতিফলন ঘটায় এ'টির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্পত্তির কারণে মানুষ যে কত নীচেয় নামতে পারে তার পরিচয় নাটকটিতে যেমন বিধৃত হয়েছে তেমনি একশত বৎসরেরও পূর্ববর্তীকালে থানা যে কি পরিমাণে দুর্নীতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, শান্তি শৃঙ্খলা ও আইনের রক্ষকেরা কিভাবে নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাপারে সক্রিয় ছিল তার জীবন্ত চিত্র নাট্যকার তুলে ধরেছেন। বস্তুত নাটকটির সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অংশই হল দুর্নীতি পরায়ণ দারোগার অসামাজিক আচরণ ও তার শেষ পর্যন্ত

ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে ধরা পড়া। তাছাড়া তৎকালীন কৌলীন্য প্রথারও প্রতিফলন ঘটেছে নাটকটিতে। শ্যামলাল তার পুত্র বিপিনকে তার স্ত্রী পদ্মগন্ধাকে ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়ে প্রলোভন দেখিয়েছেন এই বলে ঃ

'এই বৎসরের মধ্যে তোর পাঁচটা বিবাহ দিব, আমরা কুলীনের ছেলে, তার আবার ভাবনা কি ?' (পৃঃ ৯৭)

কুলীন পাত্র একাধিক বিবাহ করে যে বিবাহিত স্ত্রীদের দেখতনা, মঙ্গলার উক্তিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়—

'আমরা ত কুলীনের মেয়ে ভাতারে নিয়ে ঘর করে না বলিয়া কি আর বাঁচিয়া নাই।' (পৃঃ ৮৬)

ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্ক যে মোটেই মধুর ছিল না, সনাতন পন্থীরা ব্রাহ্মদের তথা নব্যপন্থীদের কি দৃষ্টিতে দেখতেন তারও পরিচয় নাটকে লভ্য। দীর্ঘদিনের প্রচলিত কবিরাজী চিকিৎসা ব্যবস্থা পাশ্চাত্য দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির সম্মুখীন হয়ে ক্রমেই শেষোক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার কারণে পিছু হটতে শুরু করেছিল তারও ইঙ্গিত নাটকটিতে রয়েছে। তখনকার অনেক শিক্ষার্থীই যে টোলে সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত থাকত, সে পরিচয়ও নাটকটিতে বিধৃত রয়েছে। পূজা উপলক্ষে সম্পন্ন গৃহস্থ যে বাড়ীতে নৃত্য গীতাদির আয়োজন করতেন, তাও জানা যায় নাটকটি থেকে। নাটকটির সমাপ্তিতে ধর্মের মাধ্যমে নীতি-শিক্ষা প্রদত্ত হয়েছে। বিশেষ উদ্দেশ্য প্রচারের অঙ্গ রূপেই যে নাটকটি রচিত হয়েছিল নাটকে তা স্পষ্টতঃই প্রকাশিত। নাট্যকার তাঁর অভিপ্রায়কে প্রচ্ছন্ন রাখেন নি। ধর্ম বলেছেন—

'যে কেহ ধর্মপথ অবলম্বন করিয়া থাকিবেক, সে ব্যক্তি পরিণামে সকল ক্লেশ ও দুঃখ অতিবাহিত করিয়া পরমসুখ লাভ করিবেক। ধৈর্যই এ সুখের হেতু-স্বরূপ, যাঁহার ধৈর্যগুণ আছে, তিনিই কেবল এই ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া অনায়াসে কালক্ষেপ ও অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারেন। কি বিদ্যা শিক্ষা, কি ধর্মানুশীলন, কি পরিবার-প্রতিপালন ধৈর্য গুণ না থাকিলে এ সকল কার্য্য কখনও কোন রূপে সম্পন্ন হয় না।' (পৃঃ ১৩৬)

পঞ্চমাঙ্ক বিশিষ্ট বিহারীলাল নন্দী রচিত **'মেঘমালা'** নাটকটি রচিত হয়েছে ১২৭৫ সালে।

বিজয়পুরাধিপতি চিত্রসেনের পুত্র চন্দ্রকেতু দৈত্যরাজ নিকুম্ভের হাত থেকে রতিকে উদ্ধার করায় রতি বর দেন চন্দ্রকেতু পরমাসুন্দরী স্ত্রী রত্নের অধিকারী হবেন। রতির কারণে চন্দ্রকেতু উজ্জয়িনী নগরের সম্রাট জয়সেনের কন্যা মেঘমালাকে দেখে তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়েছেন, অপরপক্ষে মেঘমালাও চন্দ্রকেতুকে পতিরূপে লাভ করতে লালায়িত। চন্দ্রকেতুর কারণে উপস্থিত মেঘমালার চিত্ত বৈকল্যে চিন্তিত রাজা ও রাণী তার বিবাহের জন্য প্রস্তুতি নিলেও চন্দ্রকেতুর সঙ্গে মেঘমালা গৃহত্যাগিনী হয়েছে। গভীর বন মধ্যে

চন্দ্রকেতুর অনুপস্থিতিতে নিকুম্ভ দৈত্য কর্তৃক মেঘমালা অপহৃতা হয়েছে। ঋষিকুমার দ্বয়ের কাছে অবহিত হয়ে রাজকন্যাকে চিত্রকূট পর্বত থেকে উদ্ধার করেছেন রাজা জয়সেন। রাজকন্যা গুরুতর রূপে পীড়িত হয়ে পড়লে ছদ্মবেশী চন্দ্রকেতু প্রদত্ত ঔষধেই তার নিরাময় ঘটেছে। শুধু তাই নয় রাজা বিক্রমরায়ের দ্বারা উজ্জয়িনী আক্রান্ত হলে চন্দ্রকেতু বন্দী উজ্জয়িনী সেনাপতি বীরবাহুকে যেমন মুক্ত করেছেন, তেমনি তারই কাছে বিক্রমরায়ের বাহিনী পর্যুদস্ত হয়েছে।

উজ্জয়িনী রাজ চন্দ্রকেতুর প্রকৃত পরিচয় অবহিত হয়ে এবং তার উপকারের বিনিময়ে মেঘমালার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছেন। রতির বর এইভাবে সার্থক হয়েছে।

নাটক হিসাবে মন্দ হয়নি 'মেঘমালা', কিন্তু বেশ কিছু ত্রুটিও লক্ষণীয়। মালিনীর অমিত্রাক্ষর ছন্দে চন্দ্রকেতুর পরিচয় জিজ্ঞাসা কিংবা মেঘমালার অনুপম সৌন্দর্যের বিবরণ দান অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট।

দ্বিতীয় কুলবালার প্রথম কুলবালার সঙ্গে কথোপকথনকালে রাজকুমারীর বিবাহ প্রসঙ্গে মন্তব্য, 'তুই দেখিস্ এই বিয়েতে একটা বিষম কাণ্ড উপস্থিত হবে' আকস্মিকতা দোষে দুষ্ট। পূর্ব থেকেই নাটকের জটিল পরিণতি সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করতেই যেন এরূপ ভবিষ্যৎবাণী সংযোজিত হয়েছে। এমনকি রাজমাতা যে তার কন্যার চিত্ত বৈকল্যের মূলে প্রেমকে অনুমান করেছেন, তাও যুক্তি সঙ্গত হয়নি।

রাজকন্যাকে নিয়ে চন্দ্রকেতুর বনগমনের কারণটি নাটকে উল্লিখিত হয়নি, কিংবা দৈত্যের কাছ থেকে রাজকন্যা কি ভাবে মুক্ত হল সে বিষয়েও নাট্যকার নীরব থেকেছেন। রতির কারণে চন্দ্রকেতুর উজ্জয়িনীর রাজকন্যা মেঘমালার শয়নকক্ষে সকলের অলক্ষ্যে উপস্থিত হওয়া, চন্দ্রকেতু রাজকন্যাকে স্পর্শ করা মাত্র তার অচৈতন্য হওয়া, জয়া-বিজয়ার অলক্ষিত ভাবে উপস্থিত হয়ে চন্দ্রকেতুকে স্পর্শ করে তাকে অচৈতন্য করার মত অনেকগুলি অলৌকিক ঘটনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

চন্দ্রকেতু ও মেঘমালার মধ্যে কে অধিকতর সুন্দর—এই নিয়ে জয়া-বিজয়ার কথোপকথনটি উপভোগ্য হয়েছে। মেঘমালা, চন্দ্রকেতু এবং তরলিকার নারী-পুরুষের প্রকৃতি নিয়ে পয়ার ছন্দে কৃত্রিম বিরোধের পরিকল্পনাটিও সুন্দর হয়েছে। ভট্টাচার্যের অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণে নাগরিকের পরিহাস আসলে মূর্খ হয়েও যারা ভট্টাচার্যের সম্মান লাভে সচেষ্ট, তাদের সমালোচনা। সংস্কৃত নাটকের আদলে সূত্রধারের মাধ্যমে নাটকটির সূত্রপাত। সংস্কৃত নাটকের অনুসরণেই বিদূষক চরিত্র পরিকল্পিত। আলোচ্য নাটকেও বিদূষককে দেখা গেছে ভোজনপ্রিয় ও রঙ্গ প্রিয় রূপে।

চন্দ্রকেতু কর্তৃক অপরূপ রূপ লাবণ্যযুক্তা মেঘমালাকে স্বপ্নে দর্শনের বৃত্তান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে বর্ণিত হয়েছে—

সুবর্ণ সলিল
আভা প্রকাশিত বিভাবসু কর জালে!

নিন্দি পূর্ণ-শশধর সে মুখের শোভা,
বেষ্টিত কুণ্ডল নব-জলধর-জালে।
নয়নের জ্যোতিঃ, জিনি হীরকের দ্যুতি,
কিংবা তারা-ভাতি অমা রজনীতে, কাম
শরাসন সম কিবা ভ্রূযুগল শোভে
তদুপরে। পক্ক বিম্ব সম ওষ্ঠাধর
মাঝে দশনের পাঁতি, অতি মনোলোভা,
প্রবালের হার কোলে যথা মতি মাল,
কিংবা কুন্দ কলি দাম করবীর মাঝে।

'ভ্রান্তিরহস্য' নাটকটির রচয়িতা বেণীমাধব ঘোষ দাস। নাটকটির প্রকাশকাল ১৮৬৮। নাট্যকার তাঁর নাটকটি রচনার কারণ সম্পর্কে জানিয়েছেন—

'শোভাবাজারস্থ গোপনীয় নাট্য সভায় ভূতপূর্বে দুইখানি নাটক সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব হয়, তদনুসারে আমি একখানি রচনা করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছিলাম,………অধুনা জগদীশ্বরের কৃপায় বঙ্গভাষালঙ্কৃত কোন প্রাচীন রহস্যাত্মক ইতিহাসের কতিপয়াংশের আভাসানুসারে ষোড়শ গর্ভাঙ্ক যোজিত পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত করিয়া ভ্রান্তি রহস্য আখ্যা প্রদান পূর্বক এই পুস্তকখানি রচনা করত প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হইলাম।'

নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরকে। সূত্রধার ও মঙ্গলাচরণ দিয়ে নাটকটির শুরু। নাটকটির কাহিনীটি হল নিম্নরূপ ঃ

লাবণ্যবতীর জন্য একটি পাখী কিনতে গিয়েছিল তার সখী সুলেখা, কিন্তু ধর্মপাল সওদাগরের পুত্র কন্দর্পমোহন ওপর পড়া হয়ে ঐ সামান্য পাখীটি হাজার টাকায় কিনে নেয়। একথা শুনে লাবণ্যবতী মন্তব্য করে যে এমন একজনকে যদি সে পায় তবে তাকে দিয়ে দিন রাত তামাক সাজিয়ে সে সুখে খায়।

এইকথা শুনে কন্দর্পমোহন প্রতিজ্ঞা করে লাবণ্যবতীর মত মেয়েকে সে স্ত্রী হিসাবে পেলে প্রত্যহ উঠতে বসতে তাকে দশ দশ জুতো প্রহার করে। শেষ পর্যন্ত লাবণ্যবতীর সঙ্গেই কন্দর্পমোহনের বিবাহ হয়। ফুলশয্যার দিন লাবণ্যবতী চিন্তিত হয় স্বামীর হাতে প্রহৃত হবার আশঙ্কায়। কিন্তু সুলেখা ও শশীমুখীর অনুরোধে কন্দর্পমোহন লাবণ্যবতীকে ফুলশয্যার দিন জুতো মারা থেকে বিরত থাকে। পরদিনই কন্দর্পমোহন বিদেশ যাত্রা করে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে।

লাবণ্যবতী তার সখীসহ ছদ্মবেশে কন্দর্পমোহন যে সব স্থানে যায় সেখানে পৌঁছে নানাভাবে কন্দর্পমোহনকে নাস্তানাবুদ করে। শেষ পর্যন্ত কন্দর্প-মোহনকে লাবণ্যবতীর কাছে হার স্বীকার করতে হয়। এইভাবেই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নাটকের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হল লাবণ্যবতীর সখীদের সহায়তায়

কন্দর্পমোহনকে প্রতি পদে পদে প্রতারিত করা। কন্দর্পমোহন প্রতিটি ক্ষেত্রেই লাবণ্যবতীদের চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়েছে এবং চরম শাস্তি লাভ করেছে। এইসব ঘটনা থেকে দেখা গেছে কন্দর্পমোহন কৌতূহলী, রহস্যালাপে সে পারদর্শী, অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটানোয় সে বিশ্বাসী। নারীর প্রতি সে আকৃষ্ট, এমনকি এই দুর্বলতার কারণে সে ধর্মান্তরিত হতেও ইতস্তত করেনি। অভিলষিত রমণীর দাসত্ব স্বীকারেও তার কোন আপত্তি নেই। পুরুষ বেশধারী লাবণ্যবতীর কাছে সে দাসত্ব স্বীকার করেছে। লাবণ্যবতী তাকে দিয়ে হুঁকো সাজিয়ে খেয়েছে। কন্দর্পমোহনের যত ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ তার বিবাহিত স্ত্রীর কাছে। দীর্ঘদিন পরে বাণিজ্য শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর স্ত্রীকে সন্তান সম্ভবা জেনে সে লাবণ্যবতী ও তার সখীদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু শশীমুখী জমাদারের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে কন্দর্পকে জিনিষ চুরির অপরাধে অভিযুক্ত করলে, লক্ষহীরার দাসীরূপী সুলেখা দু'লাখ টাকার খত নিয়ে হাজির হলে, লাবণ্যবতী হোসেন আলি মোঘলের স্ত্রী বেশে উপস্থিত হয়ে তাকে আশ্রয় দানের কথা বললে কন্দর্প একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। শেষ-পর্যন্ত সব সত্য প্রকাশ পেয়েছে। নাট্যকার কন্দর্পমোহনের চরিত্রটিকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছেন।

লাবণ্যবতী শুধু প্রতিজ্ঞাই করেনি, সে শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে তার অসামান্য সততার পরিচয় রেখেছে, অবশ্য এক্ষেত্রে কৃতিত্ব তার একার নয়, তার সখীদ্বয়কেও সেজন্য প্রশংসা করতে হয়। লাবণ্যবতী কাশীতে লক্ষহীরা নামে বারবনিতার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছে, আকৃষ্ট করেছে কন্দর্পকে, আবার মণিকর্ণিকার ঘাটে তাকে দেখা গেছে ভৈরবী বেশে। কাশ্মীর মুঘলনীর বেশে হোসেন আলি মোঘলের স্ত্রীর ভূমিকাতেও সে দিব্বি কন্দর্পকে ফাঁকি দিয়েছে।

কন্দর্পমোহন ও লক্ষহীরা রূপী লাবণ্যবতীর ছদ্ম আত্মপরিচয় দানটি উপভোগ্য হয়েছে। কন্দর্প নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রেখে লক্ষহীরাকে বলেছে—

'আমার নাম অঘোর পন্থী চৌধুরী, পিতার নাম মস্তরাম বাবাজি, পিতামহের নাম বেল্লিকচন্দ্র হোড়। আমার নিবাস সবলোট রাজার রাজ্য মধ্যে অধর্মচূড় নগরের কাজিপাড়ায়। শুনেছি আমার গর্ভধারিণী নাকি আমির উদ্দিন মোল্লার কন্যা, কিন্তু আমার মাতামহের নাম সকলে বলে কুলাঙ্গার দুর্লভ মিশ্র……।'

লক্ষহীরা রূপী লাবণ্যবতীও কোন অংশে কম যায়নি তার পরিচয় দানে—

'মদন রাজার রাজ্য মধ্যে প্রণয় শহরের সুখময় বাজারে অধিনীর নিবাস। আমার নাম হীরেমণি, তাই সকলে আমাকে হিরে হিরে বলে ডাকে। ভ্রষ্টকুলে কুলটা গোত্রে আমার জন্ম। মহাশয়ের তুল্য ব্যক্তির সঙ্গেই আমার সর্বদা সহবাস ও করণ কারণ। কলঙ্ক ও নির্লজ্জা নামে দুটি সহচরী নিয়ে সর্বদা কালযাপন করি।'

বলাই দত্ত ও অবনীনাথকে লক্ষহীরার কাছ থেকে সুলেখা ও শশীমুখী যেভাবে বিদায় করেছে তাতে তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে।

বিরূপাক্ষ নামক ব্রাহ্মণের চরিত্রটি উপভোগ্য হয়েছে। সে বৃদ্ধ বয়সে যুবতীকে বিবাহ করে সমস্যা জর্জরিত। দিবারাত্র যুবতী স্ত্রীর আজ্ঞানুবর্তী। সন্ধ্যাহ্নিক পরিত্যাগ করে তাকে যুবতী স্ত্রীর সেবায় নিযুক্ত থাকতে হয়। নানা শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের কথা সে বলে, আবার ঠিকমত প্রাপ্যের বিনিময়ে সেসব বাধা অতিক্রমণের ব্যবস্থাও সে করে দেয়। যজমানের বাড়ীতে প্রাপ্য বিষয়ে তাকে যে মন্তব্য করতে দেখা গেছে তাতে নির্বিশেষ ভাবে পুরোহিত সম্প্রদায়ের মানসিকতাই অভিব্যক্ত হয়েছে।

বটুবেহারী বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত '**হিন্দু মহিলা নাটক**'টির প্রকাশকাল ১৮৬৯ (১২৭৬)। নাটকটি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যকে উৎসর্গ করা হয়েছে। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট নাটকটির নামপত্রে লিখিত হয়েছে—

A Drama
on
Hindu Females,
Their Condition and Helplessness.

এই নামপত্র থেকেই বোঝা যায় নাটকটি নাট্যকারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত রচনা। আর এই উদ্দেশ্য নাটকে এমনই প্রকট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে যার ফলে নাটকটি প্রচার ধর্মিতা দোষে দুষ্ট হয়েছে। নাট্যকার যদিও এই নাটকে হিন্দু মহিলাদের করুণ অবস্থাকে প্রকাশ করে তাদের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে হিন্দু মহিলার সংকীর্ণতা, স্বার্থ-পরতা এমনকি চারিত্রিক শৈথিল্যের বিকট রূপ প্রকাশ করে প্রকারান্তরে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে ফেলেছেন।

হারাধন মুখোপাধ্যায়ের ছেলে কমল যেমন মদ্যপ, তেমনি বেশ্যাসক্ত। বিপরীতক্রমে তার স্ত্রী সুরমা সতী সাধ্বী রমণী। স্বামী পাছে দূষণীয় কর্মে লিপ্ত হয় তাই তাকে সে গৃহে বন্ধ করে রাখতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কমল দরজা ভেঙ্গে মনোমোহিনী নাম্নী বারবনিতার কাছে গিয়ে উপনীত হয়েছে। স্বামীর শত চারিত্রিক ত্রুটি সত্ত্বেও সুরমার পতিভক্তিতে এতটুকু ভাঁটা পড়েনি। সেই কারণেই তাকে বলতে শোনা গেছে ঃ

'তুমি অত্যন্ত ঘৃণাস্পদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও আমি যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন তোমার পদ সেবা করিব' (পৃঃ ৫৭)।

সুরমাকে হিন্দু মহিলাদের চরিত্র সমালোচনায় ব্রতী হতে দেখা গেছে। কিন্তু সে যখন বলে ঃ

'হিন্দু মহিলাগণের স্বভাব অতি বিচিত্র. যখন যাহার প্রতি সদয় হন তখন তাহার চিরদাসী', তখন মনে হয় সুরমা আত্মসমালোচনায় ব্রতী।

সুরমা আরও বলেছে—

(হিন্দু মহিলারা) 'শিষ্টালাপ কাহাকে বলে জানে না, আপনার সুখেই সন্তুষ্ট, পরের দুঃখে দুঃখী হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহাতে আমোদ প্রকাশ করেন, একে অজ্ঞ তাহে আবার রিপু পরতন্ত্র, না হবে কেন ? স্বামী যদি বিষয়াপন্ন হন তবে তাঁদের মনোনীত হয়, দীন হইলেই প্রমাদ, আমি কাহারও নিন্দা করিনা—হিন্দু মহিলা সুশীলা অতি বিরল, প্রণয় কাহাকে বলে জানে না,…অস্মদ্দেশীয় অবলাগণ নিরাশ্রয়ী, তাহাদের পশুগণের সহিত তুলনা করিলে অলঙ্কার দোষ জন্মে না, তাহাদের তিমিরাবৃত মন বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে আলোকিত নহে, এরূপ দেশাচার যে অল্পকাল মধ্যে লুপ্ত হবে তাহারও সম্ভাবনা নাই, কথায় বার্তায় যে উপদেশ প্রাপ্ত হবে তাহারই সুযোগ কই ; অন্তরঙ্গ যাহাদিগের নিকট অন্তঃস্থিত বেদনা প্রকাশ করবে, সে আরো ঘৃতাহুতি দিয়া বৃদ্ধি করিবে।'

সুরমার এই দীর্ঘ খেদোক্তির অব্যবহিত কারণ তার স্বামীর অনভিপ্রেত আচরণ, কিন্তু সেই উপলক্ষ্যে এই দীর্ঘ বক্তৃতা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। প্রায় ১২০ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত এই নাটকে সুরমার উক্তির মধ্য দিয়ে শুধু নারী সমাজের সমালোচনাই প্রকাশ পায়নি, সেই সঙ্গে নারীর অধঃপতনের কারণও উল্লিখিত হয়েছে। তবে সুরমার এই বক্তব্যের লক্ষ্য বিশেষভাবে যেন বিনোদের স্ত্রী ভগবতী।

বস্তুতঃপক্ষে ভগবতী চরিত্রটিতে নারী সুলভ কোমলতার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। তার দোসর যেন গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের 'জগমণি'। ভগবতীর মধ্যে কোন গুণের সন্ধানই মেলেনা। প্রকৃতপক্ষে এমন নির্গুণ চরিত্রের সন্ধান লাভ সুলভ নয়। অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করতে তার বিন্দুমাত্র বাধেনা। দাসীর আসতে বিলম্ব দেখে সে তাকে অবলীলা ক্রমে প্রশ্ন করেছে, গণেশ ভট্টাচার্যকে ডাকতে গিয়ে তার সঙ্গে শুয়েছিল কিনা। সে বিনোদকে এককথায় ভেড়ায় পরিণত করেছিল। তারই প্ররোচনায় বিনোদ তার গর্ভধারিণী, সহোদর ভগিনী প্রভৃতির ওপর অমানবিক আচরণ করেছে এমনকি গৃহ থেকে বহিষ্কৃত করেছে। সংসারের কোন কাজ সে করে না। দাসীর ভাষায় ভগবতীর কাজ হল—'আপনার গা ধোয়া, কাপড় ছাড়া, খাওয়া নাওয়া' (পৃঃ ১০), ভগবতী এর উত্তরে বলেছে, 'তাছাড়া আর ভাতারের মাগ কি করে থাকে'।

ভগবতী তার স্বামীর গায়েও হাত তোলে। সে নিজেই বলেছে, 'আমার গায়ে ও হাত তুলবে ? সময়ে সময়ে ও হাত তোলা খেয়ে যায়।' সর্বোপরি, ভগবতী চরিত্রহীনা, তার সঙ্গে গণেশ ভট্টাচার্যের অবৈধ সম্পর্ক। গণেশ ভট্টাচার্যকে চিরতরে পাবার জন্য সে বিনোদকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার চক্রান্তে পর্যন্ত লিপ্ত হয়েছে। দাসী গণেশকে ভগবতীর কাছে এনে দেবার অঙ্গীকার করায় ভগবতী তাকে সিন্দুকের চাবি পর্যন্ত অম্লান বদনে দিয়েছে। বিষ খাইয়ে বিনোদকে হত্যা করার চক্রান্ত ব্যর্থ হবার পর সে

দাসীর সাহায্যে উন্মাদ কমলকে দিয়ে বিনোদকে হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভগবতীর স্বরূপ বিনোদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে। ভগবতী গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

বিনোদ রাম বসুর ছেলে, ব্যক্তিত্বহীন, স্ত্রৈণ। মাকে কটু কথা বলতে তার বাধেনা। স্ত্রীর কাছে অপমানিত এমনকি মার খেয়েও সে বেমালুম হজম করে। মা একাদশী করলে সে বলে ওটা তার মার খিদে বাড়াবার একটা ছুতো মাত্র। বিনোদ মদ্যপায়ী, দিবারাত্র সে মদ্য পানে বিভোর থাকে। স্ত্রীর প্ররোচনায় সে তার মা, বোনকে পর্যন্ত ঘরছাড়া করেছে। অপরপক্ষে তার স্ত্রী তাকে হত্যার চক্রান্ত করে বেমালুম তার মা-বোনের ওপর তার দায় চাপিয়ে দিলে সে তাই বিশ্বাস করেছে।

চরিত্র চিত্রণ কিংবা নাটকীয় দ্বন্দ্বের বিচারে নাটকটির গুরুত্ব অকিঞ্চিৎকর হলেও সমসাময়িক সমাজজীবনের বিশ্বস্ত রূপায়ণে নাটকটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শতাধিক বৎসর পূর্বে স্ত্রীলোক লেখাপড়া করলে যে বিধবা হয় এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, ঘর জামাই থাকার প্রথা বিদ্যমান ছিল, কুলীনের মর্যাদা সমাজে ছিল অনেকখানি, বহুবিবাহ প্রথার সমাজে চল ছিল, তাছাড়া তুঁস তুঁসলী, সেঁজুতি, যমপুকুর প্রভৃতি বার ব্রতের যে প্রচলন ছিল সেই পরিচয় নাটকে লভ্য। সংলাপে প্রবাদের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। স্বগতোক্তির ব্যবহারও লক্ষিত হয়।

'প্রভাস মিলন' নাটকটির নাট্যকার ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। নাটকটির প্রকাশকাল ১২৭৭ বঙ্গাব্দ। নাটকটি সপ্তমাঙ্ক বিশিষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে যজ্ঞের আয়োজন করেছেন, নারদ কর্তৃক সেই যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়েছেন যশোমতী, নন্দ, শ্রীরাধা প্রমুখেরা। শেষ পর্যন্ত যজ্ঞস্থলে উপনীত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যেমন যশোমতীর সাক্ষাৎ ঘটেছে, তেমনি শ্রীরাধার সঙ্গে কৃষ্ণেরও মিলন ঘটেছে।

নাটকে শ্রীকৃষ্ণকে দেখান হয়েছে আত্ম বিস্মৃত রূপে। নাটকে মুখ্য চরিত্র নারদের। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার বিভিন্ন পর্যায় তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁকে প্রচলিত ভূমিকায় দেখা যায়নি, দেখা গেছে কৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্তরূপে, তাঁর বিরূপ সমালোচনা নিরসনে সক্রিয় ভূমিকায়।

দ্বারীর সঙ্গে যশোমতীর কথোপকথনটি দীর্ঘ হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে নন্দ, নারদ, শ্রীকৃষ্ণের ও যশোদার সংলাপ অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে প্রায় বক্তৃতার আকার নিয়েছে। নাটকে সঙ্গীতগুলি সুপ্রযুক্ত হয়েছে। স্বগতোক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়।

নাটকের প্রারম্ভে কৃষ্ণ আপন কৃত কর্মাদির জন্য যে বেদনা প্রকাশ করেছেন—যেমন পূতনাবধ, গোরূপী বৎসাসুর ও কংসাসুরবধ, যশোদা—নন্দকে পরিত্যাগ, শ্রীরাধাকে বিরহানলে নিক্ষেপ—সেগুলির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করলে ভাল হত। শ্রীকৃষ্ণের কারণে—রাধার মনোবেদনা, নন্দ ও যশোমতীর

বিলাপ স্বাভাবিক হয়েছে। পৌরাণিক নাটক হলেও অলৌকিকতা প্রায় অনুপস্থিত।

ধীরেশচন্দ্র দাস ঘোষ রচিত '**কুসুমকামিনী**' নাটকটির প্রকাশকাল ১২৭৭। নাটকটি চারটি অংক সম্বলিত, প্রতিটি অংক আবার চারটি গর্ভাংকে বিভক্ত। নাটকটিতে নাট্যকার স্বর্গ-মর্ত্যের মেল বন্ধন ঘটিয়েছেন। স্বর্গের বাসিন্দাদের বিরোধই নাটকে প্রধান হয়ে উঠেছে এবং নাটকের কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। স্বর্গের পাত্র-পাত্রীদের নাটকীয় ভূমিকায় দেখা গেছে বলে নাট্যকার অলৌকিকতাকেও নাটকে স্থান দিয়েছেন।

নাটকের ঘটনার সূত্রপাত গৌতম মুনির অভিশাপ থেকে। রতি ও মুরজা গৌতমের তপোবন থেকে ফুল তুলতে গিয়ে মুনির অভিশাপের কারণে বৃক্ষের শাখায় আবদ্ধ হয়েছেন। মগধ দেশের রাজা ইন্দ্রসেন মৃগয়া উপলক্ষে তপোবনে উপস্থিত হয়ে রতি-মুরজার অবস্থা দেখে তাদের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ তাদের বন্ধ দশা থেকে মুক্ত করেন। কৃতজ্ঞ রতি রাজাকে আশীর্বাদ করেন তিনি সর্বোৎকৃষ্ট স্ত্রী রত্ন লাভ করবেন। অপরপক্ষে মুরজা আশীর্বাদ করেন ইন্দ্রসেন অপরিমেয় বিত্তের অধিকারী হবেন।

গৌতম রতি ও মুরজার ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তিনি অভিশাপ দেন, মুরজা ও রতি যক্ষেশ্বর ও মন্মথের কুল কণ্টক হবেন। মদনদেব এবং কুবের গৌতমের ক্রোধ প্রশমনের জন্য সচেষ্ট হন। মদন বলেন তিনি পঞ্চশরের মাধ্যমে রতি ও মুরজার বরদানকে ব্যর্থ করবেন। ফলে উভয়ে দেবলোকে অপদস্থ হবেন। গৌতম সন্তুষ্ট হন।

মায়ার প্রভাবে মহীপাল রাজার কন্যা কুসুমকামিনী ইন্দ্রসেনের প্রেমাসক্ত হয়। বলাবাহুল্য এর পেছনে রতি-মুরজার ভূমিকা ছিল। বারংবার রতি-মুরজা মদন ও কুবেরের চক্রান্ত থেকে ইন্দ্রসেন ও কুসুমকামিনীকে রক্ষা করেছেন।

যক্ষরাজ ও মন্মথের নির্দেশে দুটি দৈত্য কুসুমকামিনীকে অপহরণ করলে রতি ও মুরজা ভৈরবী বেশে উপস্থিত হয়ে অচৈতন্য কুসুমের চেতনা আনয়নে সহায়তা করেছেন।

পুনরায়, চিত্রকূট পর্বতের ধারে দেবতাদের উপবনে চন্দ্রলেখা-চিত্রলেখার সঙ্গে অবস্থান কালে ইন্দ্রসেনের বিরহে কুসুম মূর্চ্ছা গেলে মেচুনির ছদ্মবেশে উপনীত হয়ে রতি ও মুরজা কুসুমকে নিরাময় করে তুলেছেন।

মন্মথ ও যক্ষরাজ কুসুমকে মৈনাক পর্বতে নিয়ে গেলে সেখান থেকে রতি ও মুরজা কুসুমকে নিয়ে আসেন চিত্রকূট পর্বতে। নিজেদের জেদ বজায় রাখতে মদন ও কুবের ইন্দ্রসেনকে শ্মশানে ভগবতীর কাছে বলিদানের চক্রান্ত করেছেন। নাটকীয় মুহূর্তে রতি মুরজা ও কলি আত্মপ্রকাশ করে ইন্দ্রসেন ও তার বিদূষক মীনকেতুকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। শেষ চেষ্টা হিসাবে কুবের ও গৌতম এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে কুসুমকামিনী সখীসহ অলকার বাইরে আসতে সক্ষম না হয়। কলির সাহায্যে কুসুমকামিনী

সখীসহ দেব-তপোবনে নীত হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত দেবলোকের অধিবাসীদের বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছে। কলি গৌতমকে ঋষি শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেছেন। মদন স্বীকার করেছেন রতি-মুরজার অসাধ্য বলে কিছু নেই। কুবের স্বয়ং ইন্দ্রসেনের হাতে কুসুমকামিনীকে সমর্পণ করে আশীর্বাদ করেছেন সুখে রাজ্য করার। মহীপালের সঙ্গে তার কন্যা-জামাতার মিলনে নাটকের পরিসমাপ্তি।

চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার তেমন নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। কুসুমকামিনীকে ইন্দ্রসেনের জন্য যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে তা আতিশয্য দোষে দুষ্ট। ইন্দ্রসেনও কুসুমকামিনীর বিচ্ছেদ বেদনায় যে বিহ্বলতা দেখিয়েছেন তা তার ব্যক্তিত্বকেই ম্লান করে দিয়েছে। একমাত্র বিদূষক চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার কিছুটা প্রশংসনীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। সংস্কৃত নাটকের মত বিদূষক মীনকেতুকে দেখা গেছে রহস্য প্রিয়, ঔদরিক। কিন্তু তার চরিত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তার আন্তরিক বন্ধুপ্রীতি। রাজা ইন্দ্রসেনকে মৃতজ্ঞানে সে নিজের গলদেশে লতা বেঁধে প্রাণত্যাগে প্রয়াসী হয়েছে। পরবর্তীকালেও দেখা গেছে শ্মশানে ভগবতীর সামনে চেতনা লাভের পর তার নিজের প্রাণের বিনিময়ে ইন্দ্রসেনের প্রাণ ভিক্ষা করেছে। মীনকেতুর নির্মল রসিকতা বেশ উপভোগ্য। বিশেষতঃ মাঝে মধ্যে তার পদ্য বন্ধ পদের সংলাপ তৃপ্তিদায়ক হয়েছে। যেমন—

যেমন বক পুষ্ট সরোবরে, চোর তুষ্ট অন্ধকারে
সুখে চুরি করে। হুট্‌কো মেরে তুষ্ট যেমন ভাতার পেলে পরে ।।
শিব তুষ্ট বিল্বদলে, ব্রাহ্মণ তুষ্ট ফলার পেলে, খাবে পেট্যা ভরে।
কাঙাল গরিব তুষ্ট বুড়ো ধনী মলে পরে ।।
ভ্রমর তুষ্ট পদ্মফুলে, চাতক তুষ্ট বৃষ্টি হলে, মীন তুষ্ট জলে।
ঘটক বামুন তুষ্ট যেমন বিয়ের লগ্ন পেলে ।।
পেঁচো তুষ্ট জ্যোৎস্নাতে, যম তুষ্ট পাতকিতে, পেটুক তুষ্ট খেতে।
তেমনি আমি তুষ্ট হলেম এই ফলটি পেয়ে হাতে ।।

নাটকের ৩য় অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্কে মদন ও রতির পদ্যে কথোপকথনটি খুবই চমৎকার হয়েছে। মদন যেখানে গৌতম মুনিকে অদ্বিতীয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, রতি সেখানে তা স্বীকার না করে গৌতম মুনি ক্রোধ ও লোভের শিকার হয়ে শ্রেষ্ঠত্বের স্থান থেকে বিচ্যুত তা বলেছেন। সংলাপে ছড়া ব্যবহৃত হয়েছে প্রায়শই। অনেকগুলি গান সংযোজিত হলেও তা বৈচিত্র্যহীন হয় নি, কেননা সঙ্গীতগুলি খুবই সীমিত পরিসরে ব্যবহৃত হওয়ায় তা সংলাপের বিকল্প হয়ে উঠেছে। সংলাপে ব্যবহৃত ভাষাকে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান করা হয়েছে। যেমন বল্যোন (বললেন), কচ্ছিলি (করছিলি), কোর্বো (করব), কিংবা, নৈলে (নইলে), সত্তি (সত্যি), শিগ্যির (শীগগির) ইত্যাদি। তাছাড়া সংলাপে প্রবাদের ব্যবহারও লক্ষণীয়। যেমন—সোনায় সোহাগা, একে মা মনসা তায় ধুনার গন্ধ, চালুনি বলেন ছুঁচকে তোমার পোঁদে কেন

ছেঁদা, ক অক্ষর গো মাংস, ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাপও টের পান না, মনের অগোচর পাপ নাই, মনের অগোচর বাপ নাই ইত্যাদি।

বেণীমাধব ঘোষের '**ভ্রমকৌতুক নাটক**'টির প্রকাশকাল ১২৭৯। গ্রন্থের বিজ্ঞাপন থেকেই জানা যায় নাটকটি রচনার সূত্র—

'ইংরাজী ভাষায় সেক্সপিয়র প্রণীত "কমিডি অফ্ এরর্স" অভিধেয় নাটক অতি কৌতুকাবহ এবং অপূর্ব হাস্য করুণ রসে পরিপূর্ণ। আমি সেই নাটকখানি অবলম্বন করিয়া এই বাঙ্গালা নাটক রচনা করিলাম।' আলোচ্য নাটকটি পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে নাট্যকার বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাসে'র দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সম্ভবত শেক্সপীয়রের, 'Comedy of Errors'-এ বর্ণিত চরিত্র ও ঘটনাস্থলকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের ও দর্শকের অধিকতর উপভোগ্য করে তোলার অভিপ্রায়ে এ দেশীয় রূপ দান করেছেন। শেক্সপীয়রের নাটকের যমজ সন্তানের জনক Syracuse-এর বণিক Aegeon আলোচ্য নাটকে হয়েছেন সুরপতি। Aegeon-এর স্ত্রী Aemilia হয়েছেন রত্নবতী, যমজ ছেলে Antipholus of Ephesus এবং Antipholus of Syracuse হয়েছেন জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ বসন্ত কুমার। 'Comedy of Errors'-এর যমজ ভৃত্যদ্বয় Dromio of Ephesus এবং Dromio of Syracuse নাটকে হয়েছে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কৃষ্ণদাস। শেক্সপীয়র Antipholus of Ephesus-এর স্ত্রী রূপে চিত্রিত করেছেন Adriana-কে আর তার কনিষ্ঠা ভগিনী হল Luciana। আমাদের আলোচ্য নাটকে এরা রূপান্তরিত হয়েছে যথাক্রমে পদ্মাবতী এবং লজ্জাবতীতে। নাট্যকার শেক্সপীয়রের অনুসরণেই যমজ দুই ভাইয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্য নিয়ে নানা উপভোগ্য সমস্যার সৃষ্টি করেছেন, নাটকীয় চমৎকারীত্ব সৃষ্টিতে যমজ ভৃত্যদ্বয়ের ভূমিকাও কম নয়। ঝড়ে নৌকাডুবি, নৌকাডুবির কারণে সুরপতির সঙ্গে তার স্ত্রী রত্নবতী এবং পুত্র ও ভৃত্যদ্বয়ের বিচ্ছেদ, সুরপতির অভিযুক্ত হওয়া, সব ঘটনাই নাট্যকার শেক্সপীয়রের অনুসরণেই চিত্রিত করেছেন। বলাবাহুল্য তবু শেক্সপীয়রের মত তা হয়ে উঠতে পারেনি। নাট্যকার মূলের অনুসরণেই নাটকটির পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

'**বঙ্গের সুখাবসান**' নাটকটির নাট্যকার হরলাল রায়। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১২৮১ বঙ্গাব্দে। নাটকটি পঞ্চম অঙ্ক বিশিষ্ট। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই নাট্যকার নাটকটি রচনা করেছিলেন। মুষ্টিমেয় সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয় সম্পর্কিত প্রচলিত কাহিনীটির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা নাটকে নাট্যকার উপস্থিত করেছেন।

বক্তিয়ার খিলজী বঙ্গ দেশ আক্রমণে উদ্যত হলে লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী মহেন্দ্র চক্রান্ত করেছেন বিনাযুদ্ধে যাতে বঙ্গদেশ বখতিয়ার কর্তৃক বিজিত হয় এবং তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি বঙ্গদেশে বখতিয়ারের প্রতিনিধি

স্বরূপ অধিষ্ঠিত হন। মহেন্দ্র তাই রাজা লক্ষ্মণ সেনকে যুদ্ধ করা থেকে নিবৃত্ত করতে প্রয়াসী, আর এ ব্যাপারে তার সহায়ক রাজগুরু গোবিন্দ ভট্টাচার্য। ভীরু গোবিন্দকে ভয় দেখিয়ে মহেন্দ্র লক্ষ্মণ সেনকে নির্দেশ দিইয়েছেন যাতে লক্ষ্মণ সেন যুদ্ধ না করেন। লক্ষ্মণ সেন একদিকে বৃদ্ধ, অপরদিকে শাস্ত্র অনুগামী, গুরু ভক্ত তাই রাজগুরুর নির্দেশে তিনি যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এদিকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ় সংকল্প হয়েছে লক্ষ্মণ সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র বিরাট সেন, মহেন্দ্রের জামাতা ও বিরাটের বন্ধু হরিপ্রসাদ, আনন্দময় প্রমুখেরা।

প্রায় বিনাযুদ্ধে বঙ্গভূমি অধিকার করে বখতিয়ার খিলজী বিশ্বাসঘাতক মহেন্দ্রকে কারারুদ্ধ করেছেন। কিন্তু বিরাট সেনকে স্বদেশ প্রেমিক, স্বাধীনতা-প্রিয় জেনেও তাকে মুক্তি দিয়েছেন যাতে সে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে বঙ্গদেশকে স্বাধীন করতে পারে। বখতিয়ার খিলজীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে নাট্যকার এই ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপকার করা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাসঘাতককে মার্জনা করেন নি। আবার শত্রুতা করা সত্ত্বেও স্বাধীনতা-প্রিয় স্বদেশ প্রেমিককে উপযুক্ত সম্মান দেখিয়েছেন। বিরাট সেনকে তিনি মিত্র জ্ঞান করেছেন।

বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেনের দোলাচল চিত্ততা প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে যুদ্ধ না করায় বিবেকের দংশন অনুভব করেছেন তিনি, অপরদিকে গুরু বাক্য অলঙ্ঘনীয় জ্ঞানে গুরুর অন্যায় নির্দেশ মেনে নিয়ে যুদ্ধ করা থেকে নিবৃত্ত থেকেছেন। এমনকি সৈন্যদেরও তিনি যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন না। অর্থাৎ নাট্যকার বখতিয়ার খিলজীর জয়লাভের কারণ স্বরূপ সেনাপতি মহেন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতা এবং লক্ষ্মণ সেনের গুরুভক্তিকে দায়ী করেছেন।

লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রীকে দেখান হয়েছে পরম পতিব্রতা রমণী রূপে। ব্রহ্মময়ী লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর সহমৃতা হতে চেয়েছেন।

সেনাপতি মহেন্দ্রই সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য চরিত্র। নাট্যকার ইঙ্গিত দিয়েছেন বঙ্গের স্বাধীনতা তথা সুখাবসানের মূলে মহেন্দ্রের মত স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতকরাই দায়ী।

মহেন্দ্রের স্ত্রী উন্মাদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। বিরাট সেনকে স্বদেশ প্রেমিক রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। তার আক্ষেপোক্তিতে আসলে নাট্যকারেরই কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে—'সমস্ত বাংলায় দশটি লোক পেলেম না যারা আমার কথায় অন্ততঃ একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। এরা যেন কোন কালে স্বাধীন ছিল না—স্বাধীনতা গেছে যেন পায়ের নখ মাথার চুল ফেলে দেওয়া হয়েছে। কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে দশ জন স্বদেশ উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত নয়। প্রাণে এত মমতা? দুদিনের নিশ্বাস প্রশ্বাস কি এত বড় হল, আর স্বাধীনতা কিছুই নয়! বাঙ্গালীরা কি জীবিত আছে?'

আসলে পরাধীনতার বিরুদ্ধে বাঙ্গালীকে জাগ্রত করতেই নাট্যকার এবংবিধ শ্লেষ পূর্ণ আহ্বান জানিয়েছেন বোঝা যায়।

'তুমি কার'? প্রহসনটির রচয়িতা বহরমপুর নিবাসী গগন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশকাল ১২৮১। প্রহসনটি উৎসর্গ করা হয়েছে পাতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়কে। চতুর্থ অঙ্কে প্রহসনটি সমাপ্ত। আলোচ্য প্রহসনটি অত্যন্ত সার্থক। চরিত্র চিত্রণে, সংলাপ রচনায় নাট্যকার যথার্থই মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবা ছোট বোন স্বর্ণলতা দাদার সংসারে কর্ত্রী হয়ে বসেছে এবং রাধাকৃষ্ণের স্ত্রী মোক্ষদাকে নানাভাবে নির্যাতিত করে তার জীবনকে বিষময় করে তুলেছে। রাধাকৃষ্ণ তার বোনের কথাতেই চলে। স্বর্ণলতার প্ররোচনাতেই সে স্ত্রীকে প্রহার পর্যন্ত করে, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণেও তার বাধে না।

নাট্যকার দেখিয়েছেন স্বর্ণলতা কর্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত। রাধাকৃষ্ণের ধারণায় 'স্বন্ন আমাদের কত্তাভজা দলের লোক, ও মিথ্যা কথা কয় না।' (১ম অঙ্ক)

স্বর্ণও দাদার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কথায় কথায় শপথ গ্রহণ করে, 'আমি সমাজ পিঁড়ি তুলসী ছুঁয়ে বলতে পারি, দাদা আমি নিজের চোকে দেখেছি—' (১ম অঙ্ক), বলাবাহুল্য সমাজের দোহাই দিয়ে সে অবিরত মিথ্যা বলে।

বালবিধবা স্বর্ণময়ীর অতৃপ্ত বাসনাই তাকে অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণে প্রবৃত্ত করেছিল এমন ইঙ্গিত নাট্যকার দিয়েছেন। সে বিবাহের জন্য উৎসুক, ব্রহ্মবৈষ্ণবীও তাকে সুপাত্রের লোভ দেখিয়েছে। ব্রহ্মবৈষ্ণবী বলেছে—

মচকানিতে চুন হলুদ,
পুড়লে দেবে ছাগল দুদ,
কাটলে চিতের পাতা চুর,
পচলে কেটে করবে দূর

ইঙ্গিত দিয়েছে মোক্ষদাকে মেরে ফেলে তার পথের কাঁটা দূর করার। পানের মধ্য দিয়ে বিষ মিশিয়ে খাওয়াবার পরামর্শ দিয়েছে সে মোক্ষদাকে। স্বর্ণও যাচা পানের এয়ো করে মোক্ষদাকে সেইমত বিষ মেশানো পান খাইয়ে মেরেছে। অবশ্য নাট্যকার স্বর্ণময়ীকে শেষে পাগল করে তার আচরণের শাস্তি দিয়েছেন।

রাধাকৃষ্ণ চরিত্রটি ব্যক্তিত্বহীন। বিধবা বোনের প্রতি দরদ দেখাতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণ যেভাবে স্ত্রীর ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে তা ক্ষমার অযোগ্য। ব্রহ্মবৈষ্ণবী রাধাকে পরামর্শ দিয়েছে মোক্ষদাকে ভাতের মার দিতে, কেননা, হাতের মার বড় মার নয়। তাছাড়া ব্রহ্মবৈষ্ণবীর পরামর্শে অর্থের লোভে সে তার বিবাহিতা কন্যাকে নিশ্চিন্তিপুরে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণপুরের তারাচাঁদ মুখুজ্যের সঙ্গে ৪০০ টাকার বিনিময়ে বিবাহ দিয়েছে। এইভাবে সে তার কন্যাকে পণ্য হিসাবে গণ্য করে প্রমাণ করেছে তার মধ্যে শুধু পত্নী প্রেমেরই অভাব ছিল না, অভাব ছিল অপত্য স্নেহেরও। রাধাকৃষ্ণের জামাতা তারাচাঁদ শ্বশুর সম্বন্ধে যথার্থই মন্তব্য করেছে, 'শ্বশুর বেটা ভেড়া, নিজের বুদ্ধি সুদ্ধি নেই, কেবল বোন যা বলে তাই'।

রাধাকৃষ্ণ প্রথমা স্ত্রী মোক্ষদার মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছে। তার দ্বিতীয়া স্ত্রী কালীমতী। বলাবাহল্য তার তুলনায় কালীমতী বয়সে

অনেক ছোট। রাধাকৃষ্ণ কালীমতীকে নানাভাবে সন্তুষ্ট করতে অবশ্য প্রয়াসী হয়েছে—

তুমি আমার কাঁচামিঠে,
তুমি আমার আস্কে পিঠে,
তুমি আমার দুধের বাটী,
তুমি আমার দেশলায়ের কাটি

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও কালীমতী ফাঁকি দিয়েছে রাধাকৃষ্ণকে, রাধাকৃষ্ণ উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে। ব্রহ্মবৈষ্ণবী চরিত্রটির জুড়ি মেলে গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে। তার মত সুযোগসন্ধানী এবং স্বার্থপর মহিলার সন্ধান সহজে মেলে না। গোপীপুরের কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরু সে। সে প্রচার করেছে শীতকালের রাতে হিম সাগরের পুকুরে ডুব দিয়ে অন্ধ চক্ষুষ্মান হয়েছে। কর্তাভজা ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করে সে বলেছে এমন ধর্ম আর নেই। তার এই প্রসঙ্গে উক্তি ঃ

কর্তা আউলে মহাপ্রভু !
তোমার মুখে চলি বলি,
যা বলাও তাই বলি,
যা খাওয়াও তাই খাই,
তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ নাই।

ব্রহ্মবৈষ্ণবীর পরামর্শেই মোক্ষদার অকালমৃত্যু, কেননা মোক্ষদা ব্রহ্মবৈষ্ণবীর নিন্দা করত। আবার রাধাকৃষ্ণকে তার বিবাহিত কন্যাকে আর এক পাত্রে বিবাহ দিয়ে অর্থোপার্জনের পরামর্শ দিয়েছে সে। তারাচাঁদ মুখুজ্যে রাধাকৃষ্ণের মেয়েকে ৪০০ টাকার বিনিময়ে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছে, তখন ব্রহ্মবৈষ্ণবী বলেছে—

ফুলের পাতা চিবায় পাঁটী, নুটনুটিয়ে ঘোরে,
খদ্দের যখন দেখা দেবে, তখনই দেবে তারে ॥
রাখলে বেঁধে বাঁধা পাঁটী, সদায় বাঁধা তুল,
হন্যে শ্যালে দাঁত ফুটুলে, হারাবে দুকুল ॥

অসুস্থ রুগীকে অপরাধ স্বীকার করাতে সচেষ্ট হয়েছে সে, তার কাছ থেকে সে জরিমানা বাবদ অর্থ আদায় করেছে। তারই কারণে রুগীটির অকাল মৃত্যু ঘটেছে। ব্রহ্মবৈষ্ণবী কথায় কথায় ছড়া কাটে। শেষ পর্যন্ত স্বর্ণের হাতে খুন হয়েছে সে।

প্রহসনটির পরিণতি খুবই উপভোগ্য। যে রাধাকৃষ্ণ মোক্ষদার মৃত্যুর পর অল্পবয়সী কালীমতীকে বিবাহ করেছিল, রাধাকৃষ্ণের জামাতা তারাচাঁদ ঘটনাচক্রে যখন জানতে পেরেছে তারই বিবাহিতা পত্নীকে তার অনুপস্থিতিতে তার শ্বশুর দ্বিতীয়বার বিবাহ দিয়ে অর্থোপার্জন করেছে, তখন তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য মাতৃশ্রাদ্ধের নাম করে নবোঢ়া কালীমতীকে নিজেদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছে। কালীমতী তারাচাঁদকে বলেছে ঃ

'বুড়ো যখন তোমার বিয়ে করা মাগ বিক্রী করে সেই টাকায় আমায় কিনেছিল, তখন আমি ভাই সত্যিকারের তোমারই—বুড়োর আমি পাপের ধন বলেই তার ভোগে লাগলাম না,' (৪র্থ অংক, ৩য় গর্ভাংক)। রাধাকৃষ্ণ জানতে চেয়েছে কালীমতী কার? তারাচাঁদও জিজ্ঞাসা করেছে, কালীমতী কার? কালীমতী বলেছে সে শুধু তারাচাঁদের। রাধাকৃষ্ণ বলেছে 'আর শুধাব না তুমি কার?'

প্রহসনটিতে ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারণা, কন্যাকে পণ্য রূপে গণ্য করা, অর্থের জোরে অসম বিবাহ প্রভৃতির সমালোচনা করা হয়েছে। সংলাপ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সাবলীল।

হরলাল রায় তাঁর **'রুদ্রপাল'** নাটকটি প্রকাশ করেছিলেন ১২৮১ বঙ্গাব্দে। পঞ্চমাংক বিশিষ্ট এই নাটকটি শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' অবলম্বনে রচিত। নাট্যকার এ দেশীয় পাঠক ও দর্শকদের কারণে মূল রচনায় উল্লিখিত চরিত্র ও ঘটনাস্থলকে এ দেশীয়তে রূপান্তরিত করেছেন। শেক্সপীয়রের নাটকে বর্ণিত স্কটল্যাণ্ডের রাজা Duncan আলোচ্য নাটকে হয়েছেন পঞ্চনদের রাজা সূর্যপাল। Duncan এর দুই সেনাপতি হলেন Macbeth এবং Banquo। আলোচ্য নাটকে এঁরা রূপান্তরিত হয়েছেন যথাক্রমে রুদ্রপাল ও বিনয় পালে। নাটকে মোটামুটিভাবে মূল গ্রন্থের কাহিনীই অনুসৃত হয়েছে। ম্যাকবেথের মত আলোচ্য নাটকে রুদ্রপাল ভৈরবীত্রয়ের কথায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়েছেন এবং লেডী ম্যাকবেথ যেমন ম্যাকবেথকে প্ররোচিত করেছিলেন ডানকানের হত্যায়, তেমনি চতুরিকাও রুদ্রপালকে উত্তেজিত করেছেন। সূর্যপালকে হত্যার ব্যাপারে রুদ্রপালের দ্বিধাগ্রস্ততা এবং প্রতিক্রিয়া মূলানুগত। ক্ষেত্রবিশেষে নাট্যকার শেক্সপীয়রের সংলাপের প্রতিও আনুগত্য দেখিয়েছেন। যেমন 'ম্যাকবেথে' First Witch Banquo-কে বলেছে 'Lesser than Macbeth, and greater'। আলোচ্য নাটকে ভৈরবী বিনয় পালকে বলেছে সে রুদ্রপাল অপেক্ষা ছোট থাকবে আবার বড়ও হবে।

রুদ্রপালের স্ত্রী চতুরিকা বলেছেঃ

'যা কিছু মন্দ ত্রিভুবনে আছে, আমার সহায় হও, আমার স্ত্রীত্ব নষ্ট কর, আমাকে আপাদমস্তক নিষ্ঠুরতাময় কর।' (পৃঃ ১০)

'ম্যাকবেথ' নাটকে লেডী ম্যাকবেথ বলেছে, Come, you spirits

That tend on mortal thoughts ! Unsex me here,
And fell me from the crown to the toe top full
of derest cruelty.

চতুরিকা রুদ্রপালকে পরামর্শ দিয়ে বলেছে—

'চক্ষু, হস্ত, মুখ মধুর শিষ্টাচারময় হবে। লোকে যেন ফুলটি দেখতে পায়, তার নীচের কাল সাপ যেন তাদের চোখে না পড়ে।' (পৃঃ ১১)

শেক্সপীয়র বর্ণনা করেছেন—

Look like the time : bear welcome in your eye,
Your hand, your tongue ; look like the innocent flower,
But be the serpent under't.

রুদ্রপাল স্বগতোক্তি করেছেন ঃ

'আপনার আত্মীয় ও প্রভু—তাতে অতিথি আমি কোথায় তাকে রক্ষা করব, না আমিই তার কাল হব। শাস্ত্র নিষেধ করেছেন, ধর্ম নিষেধ করেছেন, আমার অন্তর নিষেধ করছে, সমুদায় জগৎ 'নিষেধ করছে—এগুই কি পেছুই ;' শেক্সপীয়র ম্যাকবেথের দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—

He's here in double trust :
First, as I am his kinsman and his subject,
Strong both against the deed, then as his host,
Who should against his murderer shut the door.
... ...
Besides this Duncan
Hath borne his faculties so meek, hath been
So clear in his great office, that his virtues
Will plead like angels trumpet—tongu'd against
The deep damnation of his taking—off ;

রুদ্রপালের রাজাকে হত্যার পর প্রতিক্রিয়া—

'একজন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বলে উঠল খুন, একবার চোক মেলে দেখে তিন বার রাম নাম করে আবার ঘুমাল—আমি রাম নাম করতে গেলেম, জিব আড়িয়ে গেল, রাম নামে আমার বিশেষ প্রয়োজন, আমি রামনাম করতে পারলেন না'।

মূল নাটকে বর্ণিত হয়েছে—

Listening their fear, I could not say, 'Amen',
When they did say 'God bless us !'
... ...
I had most need of blessing, and Amen
Stuck in my throat.

বালিয়াটীর ব্রজেন্দ্রকুমার রায় রচিত **'প্রকৃত বন্ধু'** নাটকটির প্রকাশকাল ১২৮২ বঙ্গাব্দ। নাট্যকার নাটকে প্রকৃতবন্ধু বলতে মাধবচন্দ্রের বংশোদ্ভূত রাধামাধবকে বুঝিয়েছেন। আসলে নাট্যকার নাটকে দেখাতে চেয়েছেন প্রকৃত বন্ধুর কর্তব্য কি, প্রকৃত বন্ধু যে সে বন্ধুর কারণে কি পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করে।

নাট্যকার তাঁর উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে একটি কাহিনীর পরিকল্পনা করেছেন, বলাবাহুল্য কাহিনীটি কাল্পনিক।

অঙ্গনাধিপতি আশুতোষ সিংহের পুত্র কন্দর্পেশ্বর সিংহ। কন্দর্পেশ্বর একদা বনমধ্যে গোবিন্দ সিংহের কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং তাকে বিবাহের জন্য ব্যাকুল হয়। রাধামাধব কন্দর্পকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি-বন্ধ হয়েছে। এদিকে গোবিন সিংহের কন্যা কিন্তু আকৃষ্ট হয়েছে রাধামাধবের প্রতি। রাধামাধব বন্ধুর প্রতি পাছে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, তাই 'বনদেবী'র পাণিগ্রহণে অক্ষমতা জানিয়ে স্থানান্তরী হয়েছে। শেষপর্যন্ত অবশ্য কন্দর্পেশ্বরের পীড়াপীড়িতে রাধামাধব 'বনদেবী'র পাণিগ্রহণ করেছে। আলোচ্য নাটকের প্রধান আকর্ষণই হল রাধামাধব। রাধামাধবকেই নাট্যকার নাটকে 'প্রকৃত বন্ধু' রূপে উপস্থাপিত করেছেন, তাকে উপলক্ষ্য করেই নাটকটির নামকরণ করা হয়েছে। স্বভাবতঃই নাটকে রাধামাধবকে নাট্যকার আদর্শ ব্যক্তি রূপে চিত্রিত করেছেন। বন্ধুর বিবাহের ব্যাপারেই যে রাধামাধব সহায়তা দানে প্রতিশ্রুতিবন্ধ হয়েছে কিংবা কন্দর্পেশ্বরের কারণে বনদেবীর পাণিগ্রহণে অস্বীকৃত হয়ে বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা সে দেখিয়েছে তা নয়, উত্তর প্রদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীদের কল্যাণে কন্দর্পেশ্বরকে সে কর্তব্য পালনের পরামর্শ দিয়েও বন্ধুত্বের প্রমাণ রেখেছে। বন্ধুর প্রাণরক্ষার্থে সে কন্দর্পেশ্বরকে দস্যুদের আস্তানা থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে একাকী তাদের মোকাবিলা করতে চেয়েছে। আর এইভাবে তার সাহসিকতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছে।

দস্যুদের হত্যাসাধনের পর যে বৃদ্ধা রাধামাধবকে পূর্ব থেকে দস্যুদের সম্পর্কে অবহিত করেছিল তাকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানী যেতে চেয়ে রাধামাধব কৃতজ্ঞতা তথা কর্তব্য বোধেরও পরিচয় দিয়েছে। রাধামাধবকে দেখা গেছে সুশীল, সুবোধ ও শান্ত রূপে। রাজমাতা কমলা তার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছেন ঃ

'মাধব ছিল বলেই—রাজ্য রক্ষা হচ্ছে নচেৎ আমাদেরও যে কি দশা হতো তা বলা যায় না।'

রাধামাধবকে রাজনীতিজ্ঞ এবং গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী রূপেও আমরা দেখতে পাই। ভারতের দুর্দশার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে তাকে মন্তব্য করতে শোনা গেছে—'রাজ-পুরুষদিগকে ও প্রজাদিগকে সমশ্রেণীভুক্ত করে সকলকেই তুল্যরূপে স্বাধীনতা প্রদান, উচ্চ পদাভিষিক্ত করা এবং সকল কার্য বিভাগে তুল্যরূপে হস্তক্ষেপণ কর্তে দিয়ে প্রজাগণের উৎসাহ সম্বর্ধন করা উচিত। তা হলে রাজ্যে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। জাতি-ভেদ স্বরূপ কুসংস্কার দেশ হতে একেবারে উচ্ছেদ করা কর্তব্য। জাতিভেদে কেহ কেহ শ্রেষ্ঠত্ব ভোগ কর্তেন বলেই বর্তমানে ভারতবর্ষের এই দুর্দশার কথা শুনচি। নচেৎ ভারতভূমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীমার্জুন প্রভৃতি বীরগণের জননী হয়ে এখন পরাধীনতায় কেন রোদন করবেন। জাতি-ভেদই, এই অনর্থের মূল—

অনৈক্য তার ভিত্তি।' রাধামাধবের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল তার ঈশ্বর নির্ভরতা। বন্যপ্রাণীর প্রতি মমত্ব বশতঃ সে কন্দর্পেশ্বরকে শিকার করা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছে।

কন্দর্পেশ্বর চরিত্রটিতে তেমন সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। তাকে একদিকে মাতৃভক্ত রূপে দেখান হয়েছে, অথচ মাতার ইচ্ছামত কলিঙ্গরাজের কন্যার পাণি-গ্রহণে সে প্রথমে অসম্মতি জানিয়েছিল, কেননা গোবিন সিংহের কন্যার প্রতি সে আসক্ত হয়ে পড়েছিল। পরে অবশ্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে কলিঙ্গ-রাজকন্যাকেই বিবাহ করে। গোবিন সিংহের কন্যার কারণে সে রাজত্ব ত্যাগ করে বনবাসী হতে চেয়েছে। রাজ্যের ভার অর্পণ করতে চেয়েছে রাধামাধবের ওপর। সত্য কথা বলতে কি বনদেবীর জন্য কন্দর্পেশ্বরের ব্যাকুলতা উন্মত্ততার পর্যায়ে পৌঁচেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। তবে তার গুণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বন্ধুপ্রীতি। রাধামাধবের কথাতেই সে মৃগয়া ত্যাগ করার সংকল্প করেছে। যখনই জেনেছে বনদেবী রাধামাধবের প্রতি আকৃষ্ট, তখনই সে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করে বনদেবীর সঙ্গে রাধামাধবের বিবাহ দানে উদ্যোগী হয়েছে। কন্দর্পেশ্বর রাধামাধবকে অপর্ণা রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

নাটকে উৎসবানন্দ গোস্বামীর চরিত্রটি অভিনব রূপে উপস্থাপিত। সে কন্দর্পেশ্বরের সভাসদ্। অকারণে মিথ্যা তর্ক জুড়ে দেওয়া তার স্বভাব। নিজেকে উৎসবানন্দ বিজ্ঞান-সাধক বলে মনে করে, আর কারণে-অকারণে বিজ্ঞানের তত্ত্ব সম্পর্কিত বক্তৃতা দান করে সে। শাস্ত্র বাক্যে তার সীমাহীন আস্থা। আচরণ তার দার্শনিক সুলভ। কথায় কথায় তাকে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করতে দেখা যায়। আর্যজাতির অধঃপতনে তার সীমাহীন বেদনার কথা প্রকাশিত হয়েছে এইভাবে—

'কি আশ্চর্য, স্বাধীনতা রূপ অমূল্য রত্নও সামান্য অর্থের লালসায় বিক্রয় করতে হয়। অর্থই অনর্থের মূল। এর জন্য লোকে দাসত্ব স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হয় না, আবার সেই অর্থ অবহেলন পূর্বক অপব্যয় করতেও ত্রুটি করে না। যে আর্যজাতির ভয়ে পৃথিবী কম্পিত ছিল যে আর্য জাতি ভারত-ভূমিকে গৌরবান্বিত করেছিলেন, যে আর্য জাতির বেদ-প্রভাবে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতিও সশঙ্কিত থাকতেন, সেই আর্য জাতি এক্ষণে সামান্য অর্থের নিমিত্তে রাজ-কিংকর হয়েচে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যেখানে সেখানে যেতে হচ্ছে—যা করা অবিধি তা কত্তেও দ্বিরুক্তি করা যায় না।'

রাজমন্ত্রীকে দেখানো হয়েছে কুশলী, চক্রান্তকারী এবং পররাজ্য লোভী রূপে।

সন্ধিসূত্রে কলিঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে অপর্ণারাজ্য যুক্ত থাকা সত্ত্বেও এবং অপর্ণার রাজা শৈলসুত কলিঙ্গরাজের অনুগত থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রী পরিকল্পনা করেছে অপর্ণা রাজ্যকে গ্রাস করতে। ষড়যন্ত্র করেছে অপর্ণা রাজ্যের প্রধান কর্মচারীদের প্রলুব্ধ করে অপর্ণারাজের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে—তাকে কারারুদ্ধ করার। আরও মনস্থ করেছে বিচারের নামে প্রহসন বসিয়ে সাক্ষী-

গোপালকে কিছুদিনের জন্য অপর্ণারাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে ক্রমে ক্রমে রাজ্যটিকে গ্রাস করা হবে।

নরোত্তম দাসের চরিত্রটিও উপভোগ্য। বৈষ্ণবোচিত তার বিনয়। নিজের নাম পরিবর্তিত করে সে রেখেছে নরকোত্তম দাস। চৈতন্যদেবের ভক্ত সে।

নাট্যকার ছিলেন স্বাধীনতা প্রিয়। পরাধীন ভারতের বেদনায় তাঁকে ক্ষোভ প্রকাশ করে নাটকের মুখবন্ধে বলতে দেখা গেছে—

'নাটক কাব্য লিখিতে যে কয়েকটি বৃত্তির আবশ্যক হয়, তন্মধ্যে স্বাধীনতা বৃত্তিই সর্বপ্রধান ; তাহাই যখন ভারতে নাই, তখন কোন ক্রমেই 'সর্বাঙ্গ সুন্দর' নাটকের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। যদি আমাদের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও স্বাধীনতাবৃত্তি থাকিত, তবে দেখিতে পাইতেন, ভারতের সন্তান মধ্যে এখনও যে সকল লেখক বর্তমান আছেন, তাঁহারা কত শত সর্বাঙ্গ সুন্দর নাটক লিখিয়া পাঠকগণের চিত্ত-বিনোদন, দেশের মঙ্গল সাধন এবং আপনাদিগকেও ধন্য জ্ঞান করিতে পারিতেন।'

নাটকে রাধামাধব, উৎসবানন্দ গোস্বামীর উক্তির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাপ্রিয়তা তথা অধীনতাজনিত বেদনার কথা প্রকাশিত হয়েছে।

বনদেবীর রাধামাধবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সংবাদটি চমকপ্রদ। কারণ প্রথমাবধি পাঠকের ধারণা হয় বনদেবী বুঝিবা কন্দর্পেশ্বরের প্রতিই আসক্ত। বন থেকে রাধামাধবের সন্ধানে বনদেবীর রাজধানী উপস্থিতি কিছুটা আতিশয্য দোষে দুষ্ট। বনদেবীকে সরলতার প্রতিমূর্তি দেখাতে গিয়ে পাণিগ্রহণের অর্থ বিষয়ে তার অজ্ঞতা দেখানো হয়েছে, এও কিছুটা অতিরঞ্জিত। অপর্ণা রাজ্য অধিকার করার পরিকল্পনার কথা প্রকাশিত হলেও বাস্তবে তা কেমন করে অধিকৃত হল তা অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। নাটকের শেষে গোবিন সিংহই যে অপর্ণা রাজ্যের রাজা ছিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রের কুমন্ত্রণায় তিনি রাজ্যচ্যুত হন, এই ঘটনাটির প্রকাশ চমকপ্রদ হয়েছে, গোবিন সিংহ অপর্ণা রাজ্যের সিংহাসনে জামাতা রাধামাধবকে অধিষ্ঠিত দেখে স্বভাবতঃই সিংহাসন হারানোর বেদনা বিস্মৃত হয়েছেন! নাটকটি পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত '**প্রমথনাথ**' নাটকটির রচনাকাল ১২৮২ বঙ্গাব্দ। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট।

মগধের অধীশ্বর অংশুমানের বিরুদ্ধে কান্যকুব্জাধিপতির অভিযোগ তিনি মগধের সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী প্রমথনাথকে বঞ্চিত করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। তাই দূত মারফৎ তিনি জানিয়েছেন হয় প্রমথনাথকে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে হবে, নতুবা তিনি অংশুমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন। অংশুমান প্রমথনাথকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে অসম্মত হলেন। শুরু হ'ল যুদ্ধের প্রস্তুতি।

কান্যকুব্জাধিপতির সঙ্গে অংশুমানের সাক্ষাৎ ঘটলে কান্যকুব্জাধিপতি অংশুমানকে অন্যায় ভাবে প্রমথনাথকে রাজ্য লাভে বঞ্চিত করার অভিযোগে

অভিষুক্ত করলে রাজমাতা রোহিণী জানিয়েছেন বিদ্যাপতির সন্তান বলে পরিচিত প্রমথনাথ আসলে জারজ সন্তান। কিন্তু বিদ্যাবতী এই তথ্য অস্বীকার করলেন। তিনি জানালেন জ্ঞানতঃ তিনি কুপথে পদার্পণ করেন নি।

প্রতাপাদিত্যের পুত্র শশিশেখর দাবী করলেন অংশুমান যেন প্রমথনাথকে মগধ, কেতকীপুর, জম্বুদ্বীপ, গয়া এবং সমগ্র বিহার রাজ্য ছেড়ে দেন। কিন্তু এই প্রস্তাবে অংশুমান অসম্মত হলেন। তিনি প্রমথনাথকে তাঁর হাতে দেওয়ার জন্য বললেন। রোহিণী জানালেন রাজা ধীরেন্দ্র সিংহ স্বেচ্ছায় অংশুমানকে তাঁর রাজ্যের উত্তরাধিকারী করে গেছেন। অংশুমানের মধ্যে নাট্যকার কিছুটা দোলাচলতা সৃষ্টি করেছেন। একবার তাঁর মনে হয়েছে সিংহাসন ত্যাগ করে তিনি বনবাসী হবেন। বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত অংশুমান বলেছেন, 'আমি কেন রাজ্যলোভে অন্ধ হইয়া এই লোকবিগর্হিত ধর্মবর্জিত অপরিণাম-দর্শী মূর্খের ন্যায় ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্য হরণ করিলাম ? বিধাতা কেন আমার মনে এমন প্রায়শ্চিত্ত হীন পাপে প্রবৃত্তি প্রদান করিলেন ?'

কিন্তু পাছে তাঁকে সকলে যুদ্ধ-বিমুখ বলে মনে করে, তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে স্বয়ং প্রমথনাথকে তার প্রাপ্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন। আর যুদ্ধে যদি পরাজিতও হন, তবে সেক্ষেত্রে স্বর্গবাসী হবেন। কখনও বা ভেবেছেন প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে সন্ধি করবেন।

শেষে প্রজাবর্গ প্রস্তাব দিয়েছে বিদর্ভ নগরের রাজপুত্রী বিশ্বমোহিনীর সঙ্গে কান্যকুব্জাধিপতি প্রতাপাদিত্যের পুত্র শশিশেখরের বিবাহ দানের, যার ফলে দু' পক্ষেরই কল্যাণ সাধিত হবে। দু'পক্ষই যখন সন্ধির জন্য উন্মুখ, তখন বিদ্যাবতী এর বিরোধিতা করেছেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করাই স্থির হয়েছে।

যুদ্ধে প্রমথনাথ বন্দী হয়েছে আর বিদ্যাবতী হয়েছেন বিকলচিত্ত। অংশুমান প্রমথনাথকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছেন আর এ ব্যাপারে তিনি সাহায্য প্রার্থী হয়েছেন জয়শীলের। আসলে জয়শীল প্রমথনাথের প্রতি ছিলেন সহানুভূতি-শীল। তিনি সচেষ্ট ছিলেন প্রমথনাথকে কারাগার থেকে মুক্ত করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে।

বিদ্যাবতী যোগিনীর ছদ্মবেশে জয়শীলের কাছে উপস্থিত হয়ে দৈববাণীর মিথ্যা প্ররোচনায় অংশুমানকে রাজ্যচ্যুত করে প্রমথনাথকে সিংহাসনারূঢ় করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। পতিত পাবনের পরামর্শে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রমথনাথকে অংশুমান বলিদানের নির্দেশ দিয়েছেন। বধ্য ভূমিতে যোগিনী বেশে বিদ্যাবতী উপস্থিত হয়ে অংশুমানকে ছুরিকাঘাত করে তার মৃত্যু ঘটিয়েছেন। মৃত্যুকালে অংশুমান নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং প্রমথনাথকে সুখে রাজ্য করার আশীর্বাদ জানিয়ে গেছেন।

নাটকটির নামকরণ 'প্রমথনাথ' হলেও বালক প্রমথনাথের তেমন প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা নেই, কেবল তার অধিকার নিয়েই নাটকে দুই রাজার বিরোধ বর্ণিত

হয়েছে। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে প্রধান অংশুমান। অংশুমানের সিংহাসনকে অন্যায় ভাবে অধিকার করা নিয়ে নাট্যকার তার মধ্যে যে দোলাচলতা দেখিয়েছেন সেটি উপভোগ্য হয়েছে। নারী চরিত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিদ্যাবতী। অন্যায় ভাবে তার পুত্রকে সিংহাসন লাভে বঞ্চিত করা হয়েছে, সেজন্যেত বটেই তাছাড়া তার চরিত্রে যে অন্যায় ভাবে কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে, এই দুইয়ের বিরুদ্ধে তাকে সংগ্রামশীল দেখা গেছে। শেষ পর্যন্ত তারই বুদ্ধি কৌশলে অংশুমানের মৃত্যু এবং প্রমথনাথের সিংহাসন প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে। হাস্যরস সৃষ্টির জন্য নাট্যকার পতিত পাবন চরিত্রটির সৃষ্টি করেছেন। যুদ্ধ ভীত পতিতপাবনকে অবস্থার চাপে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে হলে তার মধ্যে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে, নাট্যকার তা চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকের সংলাপ সাধু ভাষায় রচিত।

বিহারীলাল ঘোষাল প্রণীত '**ইরাবতী নাটক**'টির প্রকাশকাল ১২৮৩ (১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)। নাটকটি ষষ্ঠাংক বিশিষ্ট, অবশ্য পঞ্চম অংকটি সংক্ষিপ্ততম। কল্পিত কাহিনী নির্ভর নাটকটি।

ছত্রপুর নগরের রাজা উদয় সিংহের দ্বিতীয়া মহিষী চন্দ্ররেখা রাজকুমার যশোবন্ত সিংহের প্রতি আসক্ত হওয়ায় যশোবন্ত গৃহত্যাগী হয় এবং কাম্বোজ নগরের রাজা দীর্ঘকুশের অধীন প্রজা অগ্নি উপাসকদের হাতে বন্দী হয়। বন্দী অবস্থায় যশোবন্ত যখন মৃত্যুর সম্মুখীন, এমন সময়ে গান্ধার রাজকুমারী ইরাবতী তাকে মুক্ত করে।

এদিকে দেশগড় নগরের রাজকুমার দৌলৎ রায় ইরাবতীর প্রিয় সখী ইন্দুমতীর প্রতি আসক্ত হয়। কিন্তু ইন্দুমতীর পিতাকে হত্যা করে তার রাজ্য জয় করে ইন্দুমতীকে নিয়ে এসে মানুষ করেছিলেন গান্ধার রাজ। গান্ধার রাজকুমার মহীপৎ সিংহ ইন্দুমতীকে ভালবাসতেন। কৌশলে দৌলৎ রায়, দেশগড়ের রাজকুমার, গান্ধার নগর আক্রমণ করে দৌলৎ রায়কে বন্দী করে।

দীর্ঘকুশ প্রজাদের প্রসঙ্গে ইরাবতী ও ইন্দুমতীর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ইরাবতী ও ইন্দুমতীকে যুদ্ধে আহ্বান জানালে রাজকুমার যশোবন্ত সিংহ রাজকুমারীদ্বয়ের পক্ষে যুদ্ধ করে দীর্ঘকুশকে হত্যা করে। ইরাবতী যশোবন্তের প্রণয়াসক্ত হয়।

পর্যটন শেষে ইরাবতী ও ইন্দুমতী গান্ধার নগরে ফিরে মহীপৎ সিংহের বন্দী অবস্থার বিষয়ে অবগত হয়। ক্ষুব্ধা ইন্দুমতী দৌলৎ রায়ের সঙ্গে প্রণয়ের অভিনয় করে দৌলৎ রায়কে হত্যা করে। শেষ পর্যন্ত যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে ইরাবতীর এবং মহীপৎ সিংহের সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহ হয়। রাজা উদয় সিংহ চন্দ্ররেখার চারিত্রিক শৈথিল্যের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেয়ে তাকে হত্যার আদেশ দেন।

নাটকে ইরাবতী ও ইন্দুমতী দুটি চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। সত্যকথা বলতে কি পুরুষ চরিত্রগুলি সে তুলনায় নিষ্প্রভ ও ম্রিয়মাণ ঠেকেছে। ইরাবতী যেমন যশোবন্ত সিংহকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে, ইন্দুমতীও

তেমনি মহীপৎকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করেছে। আর তার প্রতি আসক্ত দৌলৎ রায়কে হত্যা করেছে। অবশ্য ইরাবতী যেখানে যশোবন্ত সিংহকে রক্ষা করার পর তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, সেখানে পূর্ব থেকেই প্রণয় সূত্রে মহীপৎ সিংহের প্রতি আবদ্ধ ইন্দুমতী তার প্রেমিকের বন্ধন দশা মুক্ত করে পরিণয়ের অনিবার্য পথকে প্রশস্ত করেছে।

ইরাবতী স্বাধীন ভাবে শিক্ষালাভ করে বিরল ব্যক্তিত্ব সম্পন্না হয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে। অশ্বচালনা এবং অস্ত্রচালনাতেও তাকে পটু দেখা গেছে। তারই প্রয়াসে যশোবন্ত সিংহের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। শুধু কাঠিন্যই নয়, কোমলতার পরিচয়ও তার মধ্যে পাই। কাম্বোজ নগরের রাজা দীর্ঘকুশের জীবন রক্ষার জন্য যশোবন্তের কাছে সে আবেদন জানিয়েছে। প্রিয় সখী ইন্দুমতীকে সে প্রাণাধিক ভালবাসে।

ইন্দুমতীকে একজন আদর্শ প্রেমিকা রূপে উপস্থিত করা হয়েছে। সে মহীপৎ সিংহের প্রণয়াসক্ত। যখন শুনেছে দৌলৎ রায় চক্রান্ত করে মহীপৎকে বন্দী করেছে, তখন সেও প্রেমের অভিনয় করে কৌশলে দৌলৎ রায়কে হত্যা করেছে এবং প্রণয়ীকে উদ্ধার করেছে।

দৌলৎ রায়কে দেখান হয়েছে ব্যক্তিত্ব হীন পুরুষ রূপে। মহীপৎ চরিত্রটিও তেমন প্রস্ফুটিত হয়নি। বরং তুলনামূলক ভাবে যশোবন্ত সিংহের শৌর্য বীর্যের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।

নাটকটির সংলাপের ভাষা সাধু ও চলিতের মিশ্রণ। সংলাপে নাট্যকার প্রবাদের ব্যবহার করেছেন উল্লেখযোগ্য ভাবে। ব্যবহৃত প্রবাদগুলির কয়েকটি হ'ল চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে (পৃঃ ৬৪), পেটে খেলে পিটে সইতে হবে (পৃঃ ৬৫), শিব গড়তে বানর হলো নাকি ? (পৃঃ ১২২), মাকোড় মারলে ধোকড় হয় (পৃঃ ১২৩), তিনকাল গিয়েছে, এককাল আছে (পৃঃ ১২৩), একূল ওকূল দুকূল যাবে (পৃঃ ১২৩)। সংলাপে নাট্যকার বেশ কিছু অশুদ্ধ শব্দ ও ভাষার প্রয়োগ করেছেন। যেমন বৃদ্ধ দূতের বাচনিক শ্রবণ করেছিলাম (পৃঃ ৭), কষ্টে সৃষ্টে (পৃঃ ৯), প্রতিবন্ধকতাচরণ (পৃঃ ১২), সসব্যস্তে (পৃঃ ১২), নিগ্রহের ভাজন (পৃঃ ৩১), চিত্ত চাঞ্চল্যতা (পৃঃ ৩২), অবিলম্বে অবলীলাক্রমে তোমার মহারাজকে গিয়ে সংবাদ দাওগে…(পৃঃ ৩৬), বিদ্যাবান (পৃঃ ৫২)।

সবশেষে, নাট্যকার নাটকে যেসব ত্রুটি ঘটিয়েছেন, সেগুলির প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। দেশগড়ের রাজা দৌলৎ রায়ের দূত ইন্দুমতীকে দৌলৎ রায়ের কাছে প্রত্যর্পণের জন্য বলতে এসে গান্ধার নগরের রাজকুমার মহীপৎ সিংহের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলেছে, ঊদ্ধত্য প্রকাশ করেছে, তা দূতের উপযুক্ত হয়নি।

গান্ধারের রাজকুমার মহীপৎ সিংহের মন্ত্রী, দৌলৎ রায়ের প্রেরিত দূতের কাছে প্রকাশ্যে রাজকুমারী ইন্দুমতীকে দৌলৎ রায়ের হাতে প্রত্যর্পণের জন্য বলে অস্বাভাবিক আচরণের পরিচয় দিয়েছে। তাছাড়া যুদ্ধের সম্ভাবনায় মন্ত্রীবরকে যেমন ভীত দেখা গেছে তাও অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট।

২য় অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্কে অগ্নি পুত্র দীর্ঘকুশের ইরাবতী ও ইন্দুমতীকে উদ্দেশ করে লেখা পত্রের সম্বোধন 'শ্রদ্ধেয় শত্রুদ্বয় সমীপেষু' অনৌচিত্য দোষে দুষ্ট।

৩য় অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে দৌলৎ রায়ের দূত গান্ধারের রাজকুমার মহীপৎ সিংহের কাছ থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসে দৌলৎ রায়ের প্রশ্নের উত্তরে বলেছে, 'আপনার এক্ষণে শ্রবণ করার কোন বিশেষ ফল দেখা যাচ্ছে না'। বলা-বাহুল্য এক্ষেত্রে দূত তার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছে উৎকট রূপে।

হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় বিরচিত **'ভরত-মিলন'** নাটকটির প্রকাশকাল ১২৮৩। প্রকাশক বিশ্বম্ভর চন্দ্র। নাটকটি ষষ্ঠ অঙ্ক বিশিষ্ট। নাটকের নাম পত্রে নাটকের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

সকল কাব্যের মধ্যে নাটক প্রধান,
সর্বস্থলে নাটকের আদর সমান।
সভ্য কি অসভ্য জাতি পৃথিবী নিবাসী
এ রস দর্শনে হয় সবে অভিলাষী।

নাটকের বিষয় বস্তু হল বিকলচিত্ত ভরতের বশিষ্ঠের অনুমতি নিয়ে বনবাস প্রত্যাগত রামচন্দ্রকে চিত্রকূট পর্বত থেকে সসৈন্যে আনতে উপস্থিত হওয়া এবং ভরদ্বাজ মুনি ও ভরত সহ রামচন্দ্রের সদলবলে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন এবং অযোধ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া।

নাটক হিসাবে 'ভরত-মিলন' ব্যর্থ, এতে না আছে নাটকীয়তা, না আছে দ্বন্দ্ব। বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনার সংকলনে পর্যবসিত হয়েছে। বিবরণের মধ্য দিয়েই রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব প্রমুখাদির কার্যাবলী সম্পর্কে জানা যায়। কোনো চরিত্রই তেমন জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। কৈকেয়ীকে দেখা গেছে রামচন্দ্রের বন গমন, দশরথের মৃত্যু প্রভৃতির কারণে অনুতপ্ত। রামচন্দ্রের চরিত্র কৃতজ্ঞতাবোধের প্রকাশে এবং মৈত্রীর মর্যাদা রক্ষাতেই নিঃশেষিত। মন্থরাকে হাস্যাস্পদ চরিত্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে। রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণকে অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল রূপে দেখাতে তাকে ধৈর্যহীন করে চিত্রিত করা হয়েছে। গুহক রামচন্দ্রকে 'তুই' বলে সম্বোধন করায় ক্ষুব্ধ লক্ষ্মণ গুহককে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন।

নাটকটির উল্লেখযোগ্য গুণ হ'ল নির্মল হাস্যরসের অবতারণা। গজানন নামে পেটুক ব্রাহ্মণের ং, ঃ যোগে সংস্কৃত বাক্য গঠনের প্রয়াস নির্মল হাস্য রসের সৃষ্টি করেছে—

'আহাঃ, সন্দেশং দধি সংযুক্তং বহুদিনং ন খাদতি, উদরং কুক্কুরপ্রায়ং তজ্জন্যং ভবিতব্যতে।'

গজাননের ফলার সম্পর্কিত ছড়াটিও উপভোগ্য—

ফলারে মাত্‌বো এবার
দয়েতে কাট্‌বো সাঁতার,

ক্ষীরেতে হোয়ে পাথার
আঙট্ পাতা ভেসে যাবে ;
দেবে, যে যত খাবে
যত খাবে যত খাবে !!
সন্দেশের শিলে বৃষ্টি,
যেন যায় মজে সৃষ্টি,
মরি কি খেতে মিষ্টি
দৃষ্টিতে প্রাণ ঠাণ্ডা হবে।
এমন দিন আস্‌বে কবে,
আসবে কবে আস্‌বে কবে ?

গজাননের ত্রুটি যুক্ত পরিবেশনের সমালোচনাও বেশ উপভোগ্য—

এক-চোকো লোক হোলে ঘটে বড় দায়,
আমাদের পংক্তি দিয়ে যেতে নাহি চায়।
হাঁড়ী হাঁড়ী দিয়ে যায় স্বগণের পাতে,
আমাদের দিতে গেলে পোকা পড়ে হাতে !

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থলে গদা-রাধার কথোপকথনটিও উপভোগ্য, রাজকার্য উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের আশা উভয়েরই—

রাধা ঃ একে আমি রাধানাথ তায় তলব-চিঠি ট্যাঁকে,
ঠ্যাঙার চোটে কোর্‌বো সোজা রেওত যদি ব্যাঁকে।
যখন গিয়ে মারবো হাঁকার গোঁফে চাড়া দিয়ে,
কত রেওত পালিয়ে যাবে ছেলেপিলে নিয়ে।
নগদ পয়সা হাতে দিয়ে যদি ভাব করে,
তবে কি আর রাধানাথ সে রেওতকে ধরে ?

এখানে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে বাস্তব সমাজজীবনকেই প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ সংযোগস্থলে ঐলবিলা ও তিলোত্তমার যথাক্রমে রাজমন্ত্রী ভাল্লুক এবং সুগ্রীবরাজের সেবা করা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ, শিব লিঙ্গ জ্ঞানে বানরদের লুচির মধ্যস্থলে সন্দেশ স্থাপন করে আরাধনা, পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম সংযোগস্থলে পান খেয়ে গবাক্ষ, নল, নীল প্রভৃতিদের মুখ দিয়ে রক্ত নির্গত হচ্ছে ধারণায় ভীত হওয়া হাস্যরস সৃষ্টি করেছে।

পৌরাণিক নাটক হলেও মাত্র একটি ক্ষেত্রেই অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ভরদ্বাজ মুনি যোগবলের সাহায্যে পর্ণকুটির যুক্ত আশ্রমকে রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা অধিকতর রমণীয় করে তুলেছেন।

নাটকের সংলাপে গদ্য ও পদ্য দুইই ব্যবহৃত হয়েছে। সংলাপে প্রবাদের ব্যবহার লক্ষণীয়—বাড়া ভাতে ছাই (পৃঃ ১১), যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর (পৃঃ ১১), কৈ মাছের প্রাণ (পৃঃ ১৮), সতীনের কাঁটা আর কাঁঠালের আটা (পৃঃ ২৯), বাপ রাজা তো রাজার ঝি, ভাই রাজা তো বোনের কি

(পৃঃ ২৯), ভাতার মলো আপোদ গেল, দুই সতীনে পিরীত হোলো (পৃঃ ৩১), ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রী (পৃঃ ৪৭) ইত্যাদি।

সংলাপে ব্যবহৃত ক্রিয়া পদের বানান করা হয়েছে উচ্চারণের অনুরূপ—কোচ্চে্ন (করছেন), কোচ্চে (করছে), হোচ্চে (হচ্ছে), কোর্ব্বেন (করবেন), কোল্লেন (করলেন), পাচ্চিনা (পারছিনা), কোর্ত্তে (করতে), হোচ্চো (হচ্ছ), বোক্চ (বক্ছ), চোল্লাম (চললাম) ইত্যাদি।

বেণীমাধব ভট্টাচার্য প্রকাশিত **'হেমমালিনী'** নাটকটির প্রকাশকাল ১২৮৩। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট।

মহারাষ্ট্রের অধিপতি বাণীরাও ভরতপুর অধিপতি বলভদ্র সিংহের কাছে দূত পাঠিয়েছেন তাঁর কন্যা হেমমালিনীর সঙ্গে বাজীরাও-এর বিবাহের জন্য, বিনিময়ে বাজীরাও ভরতপুরের যে সব অঞ্চল তাঁর করতলগত হয়েছে, সেগুলি থেকে তাঁর অধিকার প্রত্যাহার করে নেবেন। বলভদ্র সিংহ বাজীরাও-এর প্রস্তাবে সম্মত না হলে বাজীরাও ভরতপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন এবং স্বয়ং ছদ্মবেশে ভরতপুরের সংবাদ সংগ্রহে বের হয়েছেন।

ছদ্মবেশে পর্যটনরত বাজীরাওকে ইতিপূর্বে রাজকুমারী স্বপ্নে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল, এখন ঘুমন্ত অবস্থায় বটগাছের তলায় এঁকে দেখে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়, যার পরিণতিতে হেমমালিনী বাজীরাওকে পতিরূপে বরণ করেছে এবং হেমমালিনীর পরামর্শমত বাজীরাও রাজকুমারীর জন্য নির্দিষ্ট উপবনে আত্মগোপন করে থেকেছেন। কিন্তু বাজীরাও এর সঙ্গে উপবনে রাজকুমারীকে বাক্যালাপরত দেখে বিদূষক গুণনিধি রাজকুমার নরেন্দ্র সিংহকে জানিয়েছে। তদনুযায়ী নরেন্দ্র সিংহ উপবন থেকে বাজীরাওকে বন্দী করে এনে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে।

বধ্যভূমি থেকে বাজীরাওকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে তারই ভ্রাতা গণপৎরাও।

সখী বিনোদিনীর সঙ্গে রাজকুমারী মনের দুঃখে গৃহত্যাগিনী হয়ে যখন এক ব্রহ্মচারীর কুটিরে মরণাপন্ন অবস্থায় আসীন তখন সেখানে বাজীরাও-এর সঙ্গে হেমমালিনীর সাক্ষাৎ ঘটেছে। রাজকন্যার মৃত্যু হয়েছে পরিণতিতে বাজীরাওয়েরও মৃত্যু হয়েছে এবং বিনোদিনী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়েছে। নাট্যকার নাটকটিকে ট্রাজেডি করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। নায়ক ও নায়িকার চরিত্র চিত্রণে সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেননি নাট্যকার। দীর্ঘদিন ধরে উপবনে বাজীরাও-এর আত্মগোপন করে থাকাটা অবিশ্বাস্য ঘটনা রূপেই বিবেচিত হবে।

ভরতপুরের অধিপতি সন্ধি করার পরামর্শ অগ্রাহ্য করলে তাঁরই মন্ত্রী বিজয় সেন ভরতপুর অধিপতিকে যে ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন তা মন্ত্রী চরিত্রের অনুপযুক্ত।

রাজপুরোহিত শঙ্করাচার্যের সংলাপকে উপভোগ্য করার জন্য নাট্যকার 'ন'

স্থানে 'ল' এবং 'ম' স্থানে 'ব'-এর যে ব্যবহার করেছেন, তা হাস্যকর হয়েছে। শঙ্কর সার্বভৌমের শিশুপুত্রের সংলাপেও হাস্যরস সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষণীয়। শঙ্কর সার্বভৌমের ক্রুদ্ধা স্ত্রীকে শান্ত করতে তার পদধারণ আতিশয্য দোষে দুষ্ট। কুলীন ব্রাহ্মণদের দীর্ঘ অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাদের স্ত্রীদের সন্তানবতী হওয়ার ঘটনার উল্লেখে তৎকালীন সমাজ জীবনের কলুষতা প্রকাশিত। দ্বিতীয় গুলিখোরের মাধ্যমে গুলিদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনাটি উপভোগ্য হয়েছে—'গুলির প্রভাবে রাজারা রাজ্য করে, প্রজারা শস্যশালিনী হয়, স্ত্রীলোকদের রন্ধন কার্য সমাপ্ত হয় ও বিপণীতে দ্রব্যজাত উত্তমরূপে সজ্জিত থাকে।...তোমার প্রভাবে অন্ধের চক্ষু যায়, কর্ণ বধির হয়, জলে বাঘ জন্মায়, মাগো সেই ভয়েই তোমার সেবকেরা প্রায় নির্জলাই থাকে।' (পৃঃ ৮৯)

রাজকৃষ্ণ দত্ত রচিত '**অরুন্ধতী**' নাটকটির প্রকাশকাল ১২৮৪ বঙ্গাব্দ। নাটকটি ঈশ্বর চন্দ্র মিত্রকে উৎসর্গ করা হয়েছে। নাট্যকার নাটকটিকে 'গীতি কাব্য' রূপে অভিহিত করেছেন, কিন্তু আসলে এ'টি চার অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটক।

সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে 'প্রস্তাবনা' দিয়ে নাটকের সূত্রপাত। মাড়বারের বন্দী রাজা মেদিনী রায়ের কন্যা অরুন্ধতী। তারই নামে নাটকটির নামকরণ করা হয়েছে। অরুন্ধতী বন্দিনী। একদিকে তার রূপ যৌবনে আকৃষ্ট মাড়বার রাজ ভীম সিংহ, অপরদিকে তার প্রতি আসক্ত ভীম সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার সিংহ। অরুন্ধতীর প্রতি ভীম সিংহের লোলুপতা কুমার সিংহ বরদাস্ত করতে রাজি নন, এমনকি রাজকুমারীর কারণে কুমার আজমীরের সিংহাসন ত্যাগেও প্রস্তুত। অরুন্ধতীও কুমার সিংহের প্রতি আসক্ত। ভীম সিংহ অরুন্ধতীকে প্রস্তাব দিয়েছেন হয় তার কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে, নতুবা তার বন্দী পিতা মেদিনী রায়ের মৃত্যু ঘটবে। অরুন্ধতী তীব্র সমস্যার সম্মুখীন।

কুমার সিংহের ভগ্নী ইন্দুপ্রভার সহায়তায় অরুন্ধতী বন্দী পিতার সমীপে উপস্থিত হয়েছে। পিতার অবস্থা দেখে সে মূর্চ্ছিত হয়েছে। অরুন্ধতীর অনুরোধে কুমার সিংহ প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও বন্দী মেদিনী রায়কে মুক্তি দিতে স্বীকৃত হয়েছে। রাজকুমার মেদিনী রায়কে মুক্তি দিয়ে নিজে বন্দী হয়েছে। কিন্তু আকস্মিকভাবে ভীম সিংহের মৃত্যুতে কুমার বন্দী দশা থেকে মুক্ত হয়ে আজমীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। মেদিনী রায়ের পুত্র প্রতাপ কুমার-সিংহকে শত্রু জ্ঞানে যুদ্ধে আহ্বান করলে, মেদিনী রায় প্রতাপকে যুদ্ধ করা থেকে নিবৃত্ত করেছেন। সব ঘটনা জানার পর কুমারের সঙ্গে প্রতাপের বন্ধুত্ব হয়েছে। অরুন্ধতীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে কুমার সিংহের, অপরপক্ষে ইন্দুপ্রভার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে প্রতাপের।

প্রতাপের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদে বিচলিত মেদিনী রায়ের উক্তিতে

হা প্রতাপ! বড় সাধ আছিল রে মনে,
মুদিব অন্তিমে আঁখি, নিরখি তোমারে,

আসীন রাজ-আসনে, রাজদণ্ড করে,
মুকুটে মণ্ডিত শির, ছত্র তদুপরি।
কিন্তু ভাগ্য দোষে, বাম হইল বিধাতা
সাধিতে এ বাদ, এ বিষম সমরাগ্নি
জ্বালিল পুরে আমার-পুড়িল কপাল,

—মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নবম সর্গে প্রকাশিত পুত্র শোকাতুর রাবণের আক্ষেপের ছায়াপাত ঘটেছে—

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে—
সঁপি রাজ্যভার পুত্র, তোমায় করিব
মহাযাত্রা!

কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী রচিত '**সতী প্রভাব নাটক**'টির রচনাকাল ১২৮৫। নাটকটি কয়েকটি দৃশ্যের সমষ্টি মাত্র। অঙ্কের পরিবর্তে পঞ্চম দৃশ্যে নাটকটি বিভক্ত।

হিন্দু নারী যাতে সতীত্বের অধিকারিণী হয়ে ভারতের পূর্ব গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই নাটকটি রচিত আর এই কারণেই নাট্যকার সাবিত্রী-সত্যবানের বহুল প্রচলিত কাহিনীকে নাটকে রূপায়িত করেছেন। নাটকটির মাধ্যমে সতীত্বের প্রচার ব্যতীত, ভাগ্যই সব—এই উপদেশও প্রদত্ত হয়েছে। অনিত্য পৃথিবীতে রাধা-শ্যামে আসক্ত হবারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অন্যায় কর্মে রত ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর যমরাজ কর্তৃক শাস্তিদানের দৃশ্যে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যের স্বাদ মেলে। ভাগ্যদেব, কর্মফল, ভীম মূর্তি, কঠোরকর্মা, পাপীতাড়ন প্রভৃতি চরিত্র কল্পনায় কিছুটা অভিনবত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

ঠানদিদি চরিত্রটি উপভোগ্য হয়েছে, বিশেষতঃ তাঁর কথায় কথায় ছড়া কাটা সে কালের প্রচলিত বাক্‌ রীতিকেই মনে করিয়ে দেয়। নাটকে দৈববাণীর মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনার পূর্বাভাস ঘোষিত হয়েছে। নাটকটিতে সঙ্গীতের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। সংলাপে কথ্য রূপ অনুসৃত হওয়ায় স্বাভাবিক হয়েছে। নাটকীয় দ্বন্দ্ব বলতে যা বোঝায়, তা কিন্তু নাটকটিতে অনুপস্থিত।

"**প্রণয় সরোবর বা মিলন**" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত গীতিনাট্য, এ'টির প্রকাশকালও ১২৮৫।

পঞ্চম দৃশ্য সম্বলিত রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণ ও বৃন্দার উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক কয়েকটি সঙ্গীতের সংকলনে পরিণত হয়েছে এ'টি। উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক সঙ্গীতের সমাবেশে কিছুটা নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে সত্য, কিংবা কয়েকটি দৃশ্যের অবতারণায় এবং দৃশ্যের পূর্বে কবির অভিনয়োপযোগী নির্দেশ দানে গীতিনাট্যের আপাত প্রয়াস লক্ষিত হলেও, কবি অভীষ্ট সার্থকতা লাভে ব্যর্থ হয়েছেন স্বীকার করতে হয়।

কৃষ্ণের বিরহে বেদনার্ত শ্রীরাধা শেষ পর্যন্ত দ্বারকাধীশের সমীপে উপস্থিত হয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কাছে প্রেম যাচঞা করেছেন, শ্রীরাধার অভিমান ভেঙ্গেছে

এবং কৃষ্ণের প্রস্তাবমত প্রণয় সরসীতে যে কনক কুসুম প্রস্ফুটিত, সেখানে সখী-বৃন্দ সহ রাধাকৃষ্ণ উপনীত হয়েছেন। 'প্রণয়-সরোবর' নামকরণের প্রসঙ্গটি কবি উপস্থাপিত করেছেন এইভাবে—

বৃন্দে! রচিয়াছি, প্রমোদ-উদ্যানে, অপরূপ সরোবর!
'প্রণয়-সরসী' রাখিয়াছি নাম, মুনিজন মনোহর
কনক-কমল তার মধ্যস্থানে,
শোভিতেছে এক, চল সেইখানে,
বিহরিব তথা লয়ে কিশোরীরে মন প্রাণ মুগ্ধকর
দেখাইব দৃশ্য, সাজাব প্রিয়ায়, হবো সখি! ব্রজেশ্বর।

পঞ্চম দৃশ্যটি অপ্রাসঙ্গিক। মহর্ষি নারদের কণ্ঠে যে সঙ্গীত যুক্ত হয়েছে তাতে অবশ্য দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি ঘটেছে। ভারতবাসীকে উদ্দেশ করে নারদ বলেছেন—

এই সে ভারত-ভূমি, বীর বংশ-প্রসবিনী,
অধীনতা পাশে কেন রয়েছ বন্ধন?
ধর শৌর্য পরাক্রম, প্রকাশ বীর-বিক্রম,
কীর্তি-সিংহাসনে মারে কর পুনঃ সংস্থাপন।

ব্রজলাল দাস রচিত তৃতীয় অঙ্কে সমাপ্ত **'বিজয় বিলাপ'** নাটকটির প্রকাশকাল ১২৮৬। প্রচলিত কাহিনী অনুসরণে নাট্যকার নাটকটি রচনা করেছেন। বিজয় ও বসন্তের জন্ম থেকে বনগমন ও তাদের বিলাপ নাটকে স্থান পেয়েছে।

সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে প্রথমেই প্রস্তাবনা সংযোজিত হয়েছে। নট রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়ে নটীকে আহ্বান জানিয়েছে নতুন বিষয়ের উল্লেখ করতে যা অবলম্বনে অভিনয় করা হবে। নটী নটেরই রচিত 'বিজয় বিলাপ' নাটকের কথা বলেছে।

প্রথমা পত্নীর মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত রাজাকে মন্ত্রীর প্রবোধ বচন অস্বাভাবিক দীর্ঘ। মন্ত্রী রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন যে এই সংসার নাট্যশালা। শেক্সপীয়রের বক্তব্যের প্রভাব এখানে লক্ষণীয়।

ধৌম্যের পরামর্শে রাজার দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণের সিদ্ধান্ত অতি দ্রুত হওয়ায় হাস্যকর হয়ে উঠেছে। মেঘনাদবধ কাব্যের অনুসরণে রাজা বলেছেন 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন' (পৃঃ ৩৬)।

সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে বিদূষক চরিত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই বিদূষক গতানুগতিকভাবেই উপস্থাপিত—রসিক, ব্রাহ্মণ এবং ভোজন প্রিয়। নাটকে স্বগতোক্তির ব্যবহার আছে। মোট সাতটি সঙ্গীত নাটকে স্থান পেয়েছে। সীমিত পরিসরে রচিত হওয়ায় নাটকের চরিত্রগুলির বিকাশ দেখান সম্ভব হয়নি। সংলাপে প্রবাদের ব্যবহার লক্ষণীয়—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত (পৃঃ ৪৪), বামন হয়ে চাঁদে হাত (পৃঃ ৪৫), কোথায় রাম রাজা হবেন, না বনবাসে গমন (পৃঃ ৫৪)।

'**স্বর্গোদ্ধার**' নাটকটির রচয়িতা পাইকপাড়ার মহীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটির প্রকাশকাল ১২৮৬ বঙ্গাব্দ (১৮৭৯)। নাটকটি নয়টি অঙ্ক সম্বলিত।

অসুরদের দ্বারা পরাস্ত দেবতারা করুণ অবস্থার সম্মুখীন হলে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার কাছে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করার উপায় জানতে উপস্থিত হন। ব্রহ্মা সনৎকুমারের সহায়তায় মহর্ষি দধীচির অস্থি সংগ্রহ করে বিশ্বকর্মার সাহায্যে সেই অস্থির সাহায্যে বজ্র নির্মাণ করে বৃত্রাসুরকে নিধন করার পরামর্শ দেন। সেইমত আয়োজনে বৃত্রাসুর নিহত হয়েছে, স্বর্গের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে।

নাটক হিসাবে অকিঞ্চিৎকর। নাটকের শেষে পরপর অনেকগুলি মৃত্যুর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে কিন্তু কোনটিই পাঠক চিত্তকে স্পর্শ করেনা। শেষ পর্যন্ত নাট্যকার নাটকটিকে মিলনান্ত করতে নবম অঙ্কে দেবরাজের সভায় রুদ্রপীড় ও ইন্দুবালাকে উপস্থিত করেছেন দেবরাজের আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে বর্ণিত স্বর্গের নন্দন কাননে রতি, ঐন্দ্রিলা, রম্ভার রহস্যালাপ কিছুটা উপভোগ্য হয়েছে। বৃত্রাসুরের মন্ত্রী বৃত্রাসুরকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করায় মন্ত্রীকে যে ভাষায় ভর্ৎসনা করেছে তা বৃত্রাসুরের উপযুক্ত নয়।

নাটকের মাঝে মাঝে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার লক্ষণীয়—বিশেষতঃ সমগ্র ষষ্ঠ সর্গটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

রুদ্রপীড়ের মৃত্যু বিবরণ দূত মুখে অবগত হয়ে বৃত্রাসুর যে বলেছে :

যে পামর বধিয়াছে মম রুদ্রপীড়ে,
গহন কানন মাঝে যদি সে পালায়,
দাবাগ্নি সমান ক্রোধে দহিব তাহায়।
অতল জলধি গর্ভে যদি সে লুকায়,
বাড়বাগ্নি সম ক্রোধে সংহারিব তায়।
নগরে, প্রান্তরে, কিম্বা পর্বত গহবরে,
গভীর সাগরে কিম্বা কানন মাঝারে,
পুরী মধ্যে—স্বর্গে মর্ত্যে, কিম্বা রসাতলে,
থাকুক যথায় আমি সংহারিব তায়।

এতে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণের হাতে আহত মৃত্যুপথযাত্রী ইন্দ্রজিতের সাবধান বাণীর প্রতিফলন লক্ষিত হয়—

এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম ? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস যদি তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ বাড়বাগ্নি রাশিসম তেজে !
দাবাগ্নি সদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে

সে রোষ, কাননে যদি পশিস, কুমতি !
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।

কালাপাহাড় বা **ধর্মদ্রোহী** নাটকটির রচয়িতা হরিশচন্দ্র হালদার। হরিশচন্দ্র হালদার ছিলেন Calcutta Government School of Art-এর ছাত্র। নাটকটির প্রকাশকাল ১২৮৮ বঙ্গাব্দ। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট।

নাটকটির মুখ্য আকর্ষণ কালাপাহাড়। বিপরীতভাবের দ্বন্দ্বে চরিত্রটি ক্ষতবিক্ষত। একদিকে বাদশাহকন্যা মতিয়ার প্রেমে সে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং মতিয়ার অনুরোধে ইসলাম ধর্মে সে ধর্মান্তরিত, অপরদিকে ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত কালাপাহাড়ের মধ্যে হিন্দু ধর্মের সংস্কারও বিদ্যমান।

কালাপাহাড়ের পতনকে অলৌকিকতায় মণ্ডিত করলেও আসলে নাট্যকার তার বিবেক দংশনকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন—

'সেই সমস্ত পাপ, হৃদয়ে একত্রিত হয়েছে। ওঃ! সেই সমস্ত পাপের জ্বলন্ত অগ্নি! নীল দ্রবময় ধাতুর অগ্নি তরঙ্গে বিপরীত কল্লোলে আমার হৃদয়ে তরঙ্গিত হচ্ছে। প্রতি শিরায় শিরায় সেই গলিত ধাতু স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। সেই অগ্নি! জ্বলন্ত অগ্নি! উঃ! কত শত সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা, পতিরতা, পতিপ্রাণা, কামিনীগণের সুকোমল-বক্ষ বিদ্ধ করিছি। কত শত সহস্র দেব প্রতিমা ভস্মসাৎ করিছি—কত দুর্ভাগা হৃদয় ছিঁড়ে ফেলিছি—এ সেই শাপাগ্নি'।

কালাপাহাড় শেষ পর্যন্ত আত্মহননের পথ অবলম্বন করেছে। বজ্রধ্বনিসহ জ্যোতির প্রকাশে কালাপাহাড়ের পতন অলৌকিকতা মণ্ডিত।

কালাপাহাড়ের পরই উল্লেখ করতে হয় মতিয়া বিবির চরিত্রটির। মতিয়ার আকর্ষণ কালাপাহাড়ের প্রতি সুতীব্র হওয়াতেই তাকে সরলার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন দেখা গেছে। মতিয়ার নির্দেশে সুরতিয়া ভৈরবীর ছদ্মবেশে রাত্রে সরলাকে শ্মশানে নিয়ে এসেছে—উদ্দেশ্য তাকে যবন করা। তাকে হত্যা করতে উদ্যত যবনদের হাত থেকে রক্ষা করেছে এক সৈনিক।

কালাপাহাড়ের আহ্বানে যোগিনীরূপী সরলার দোলাচলতা চমৎকার ফুটেছে। কালাপাহাড়ের আত্মহত্যায় সরলার সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে পড়া তার পতিপ্রেমেরই অভিব্যক্তি। বাস্তবিক নাট্যকার সরলা চরিত্রটি চিত্রণে মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন।

ফকিরণীর বেশে মতিয়া স্বীকার করেছে যে সে তার পাপের উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছে।

শৃঙ্গবাদকরূপী আচার্যকে দেখা গেছে যবনদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করতে। নাটকে পরিবর্তিত রূপে স্বদেশ প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে এবং তা ঘটেছে ধর্মরক্ষাকে কেন্দ্র করে

যায় যাক্ ছার প্রাণ—তৃণের সমান।
মাতৃভূমি রক্ষা তরে করিব তা দান!

কালাপাহাড়ের হাতে প্রহৃত ওড়িয়া পাণ্ডাদের দুঃখ ও ক্ষোভের প্রকাশ উপভোগ্য।

হরিশচন্দ্র হালদার রচিত **'বেদবতী বা পতিপ্রাণা'** নাটকটির রচনাকাল ১৮০৪ শকাব্দ। নাটকটি চতুর্থ অংক বিশিষ্ট। বেদবতী নাম্নী পতিপ্রাণা রমণীর অদ্বিতীয় পাতিব্রত্য নিয়েই এই নাটক।

নায়ক বেদশীরা, জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। কিন্তু তার মন পড়ে থাকে বারবিলাসিনীদের ওপর। যে বেদবতী বিনিদ্র রজনী যাপন করে, নির্জলা উপবাসে থেকে স্বামীর সেবা করে, তার প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই। স্বামীর আনন্দ লাভের কারণে বেদবতী সুরবালা নাম্নী এক দেহ ব্যবসায়িনীকে সম্মত করেছে তার অসুস্থ স্বামীকে সঙ্গদানে। তৃষ্ণার্ত বেদশীরা স্বর্ণ ভৃঙ্গারের তুলনায় মৃন্ময় পাত্রের জলপানে অধিকতর তৃপ্ত হয়ে উপলব্ধি করেছে বারাঙ্গনা অপেক্ষা পতিপ্রাণা বেদবতীই তাকে প্রকৃত তৃপ্তি দানে সক্ষম।

বেদবতীর ক্ষমতা দেখাতে নাটকে কিছু অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ ঘটান হয়েছে। ঝড়-জলে কাতর বেদশীরা ধ্যান মগ্ন মাণ্ডব্যের কাছে আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা জানালে ক্ষিপ্ত মাণ্ডব্য অভিশাপ দিয়েছেন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান-ভঙ্গকারী বেদশীরার মৃত্যু হবে। বেদবতীও সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে—

সতী যদি হই এ জগতে !
বলিতেছি উচ্চকণ্ঠে নভ নিরুখিয়া ;
চির-অন্ধতম-ঘোর-নিবিড়-আঁধারে
ঘেরিবে এ পৃথ্বীমাঝ, নিবিড় নীলিমা
যথা পাতালের গাঢ়তম ধূমে।
না উঠিবে দিনমণি, নিষ্প্রভ হইবে
যত সৌর কর রাশি।

শেষপর্যন্ত বেদবতীই জয়ী হয়েছে, সাতদিন ঘনান্ধকারে অতিবাহিত হবার পর নারদের অনুরোধে বেদবতী সূর্যোদয়ের অনুমতি দিয়েছে, বিনিময়ে যাচঞা করে নিয়েছে স্বামীর নীরোগ সুন্দর জীবন।

নারদের আশীর্বাদে বেদশীরা এবং বেদবতী কন্দর্প ও রতির ন্যায় দেহ-কান্তি নিয়ে ভগবতীর ইচ্ছায় অমরাবতীতে যাবার সুযোগ পেয়েছে। এইভাবে ঋষির ধ্যান লব্ধ শক্তির তুলনায় পাতিব্রত্যের শক্তিকে অধিকতর বলে নাট্যকার দেখিয়েছেন। নাটকে সঙ্গীতের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। ১ম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সংযোজিত—

আয় সবে মিলি জুলি, চোকে চোকে খেলি খেলি,
নাচিব হেলি দুলি, খুলিবে প্রাণ।
জ্বর জ্বর কামিনী, মদন বাণেতে স্থির নহে প্রাণ।
কল কল তটিনী, খল খল যামিনী,

সুনীল অম্বর মাঝে শোভে চারু শশধর।
লাজ ভয় তেজিয়া—, প্রমোদ নীরে হও নিমগন।

এই গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের—

আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি, গাহিবি গান।

গানটির গভীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের গানেও শশধরের উল্লেখ আছে, এমনকি 'উলসিত তটিনী'রও উল্লেখ রয়েছে।

আলোচ্য নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত **'জয়দ্রথ-বধ'** নাটকটির প্রকাশকাল ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ। নাটকটি সপ্তাঙ্ক বিশিষ্ট। নাটকটির মুখ্য আকর্ষণ জয়দ্রথ। নাটকের প্রারম্ভে জয়দ্রথকে ঘোষণা করতে দেখা গেছে—

ক্ষত্র বীর মোরা
বিপদে না ডরি কভু—
জানিও নিশ্চয় ;

যে জয়দ্রথ গণকের কথিত প্রতিকূল পরিণাম সম্পর্কিত ঘোষণাকে পরিহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিল, সেই জয়দ্রথকেই দেখা গেছে অভিমন্যুর বধের পর একেবারে ভীত সন্ত্রস্ত ও সম্পূর্ণ পবিবর্তিত রূপে—

না পারি বারিতে যদি বীর ধনঞ্জয়ে
ত্যজি লোকালয় কাপুরুষ মত
বীরকার্য, বীর বীর্য ভুলি
লুকায়ে আঁধারে রক্ষা করি নরদেহ।
নাহি কাজ পাণ্ডব সংহারি,
কাপুরুষ আমি তস্কর সদৃশ
থাকিগে লুকায়ে আঁধারে।

দ্রোণাচার্যের কাছে জয়দ্রথ মিনতি জানিয়েছে—

পড়িয়াছি দুরন্ত সাগর গর্ভে
হে কর্ণধার !
রক্ষা কর ক্ষুদ্র জীবনের তরী ;
রক্ষা কর জয়দ্রথে।

শেষ পর্যন্ত দ্রোণাচার্যের উৎসাহে অবশ্য জয়দ্রথ যুদ্ধ করার ব্যাপারে কিছুটা উৎসাহিত হলেও কর্মফলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বলেছে ঃ

বধিয়াছি অভিমন্যু—
অবশ্য ভোগিতে হবে ফল তার ;
কর্মফল প্রাক্তনের লিপি।

অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণে জয়দ্রথের ছিন্ন মুণ্ড গিয়ে পড়েছে তার পিতা সিন্ধু মুনির ক্রোড়ে।

একের পর এক বিপর্যয়ে দুর্যোধন বিপর্যস্ত হয়ে মনস্থ করেছে পঞ্চ-পান্ডবের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার। কিন্তু দুষ্টমতির প্রভাবে তার সেই সংকল্প পরিবর্তিত হয়েছে। 'দুষ্টমতি' চরিত্রটির কল্পনা প্রশংসনীয়।

অর্জুন দৃঢ় পণ করেছেন পুত্র হত্যাকারী জয়দ্রথকে বধ করবেন সূর্যাস্তের পূর্বেই, নতুবা নিজেই আত্মহননের পথ নেবেন। বলাবাহুল্য অপত্য স্নেহই তাকে এবংবিধ প্রতিজ্ঞা করতে প্ররোচিত করেছে। কৃষ্ণের সহায়তায় অর্জুন তার প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সক্ষম হয়েছেন। অভিমন্যুর অকাল মৃত্যুতে অর্জুন সহ পঞ্চ পান্ডবের অন্যান্যদের প্রতিক্রিয়াটি সুচিত্রিত। নাটকে অলৌকিকতার বাহুল্য না থাকলেও অলৌকিকতা মুক্ত নয়। কৃষ্ণ কর্তৃক সূর্যকে আচ্ছন্ন করার ঘটনাটিই তার প্রমাণ।

জয়দ্রথ বধে দেবতাদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে দেখা গেছে। কৃষ্ণত বটেই মহাদেব অর্জুনকে দিয়েছেন দিব্য ধনুর্বাণ যা অসুরঘাতী।

নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির পূর্বাভাস নাট্যকার কখনও গণকের গণনার মাধ্যমে কখনও আবার স্বপ্নের মাধ্যমে দিয়েছেন। যদিও পরিচিত পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে নাটকটি রচিত তবু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারাজির পূর্বাভাসদান নাটকের আকর্ষণকে হ্রাস করেছে। নাটকটির সংলাপ পদ্য ছন্দে রচিত।

'**অভিমন্যুবধ নাটক**'টির রচয়িতা নরেন্দ্র কুমার শীল। প্রকাশকাল ১২৯৩। নাটকটি ষষ্ঠাংক বিশিষ্ট। নাটকের সূত্রপাত ভীষ্মের শরশয্যার সংবাদে দুর্যোধনের হতাশায়। শকুনি আশাহত দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দিয়ে নূতন সেনাপতি প্রেরণের পরামর্শ দিয়েছে, সে বলেছে দ্রোণাচার্যকে পাঠাতে, কারণ সেক্ষেত্রে পান্ডবেরা অস্ত্রগুরুকে নিধন করতে পারবেনা।

দ্রোণাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন ভীষ্মের শরশয্যায় শায়িত হওয়ার কারণ—

'ভীষ্মদেব একে বৃদ্ধ তাতে পান্ডবের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ, তজ্জন্য তিনি স্নেহবশতঃ আপনি ইচ্ছাধীন মৃত্যু হয়েও শিশুরণে প্রাণত্যাগ করে সকল দায় হতে পরিত্রাণ লাভ করেছেন।'

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের মৃত্যুর জন্য অনুশোচনা করেছেন, অনুশোচনা করেছেন জ্ঞাতিবধে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছেন বলে। যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন কৃষ্ণ, অর্জুন। কৃষ্ণ বলেছেন যুধিষ্ঠির নিরপরাধ। অর্জুন বলেছেন, 'ধার্মিক ব্যক্তি যদি পাপাত্মাদিগের সংশ্রবে অবস্থিতি করে, তজ্জন্য ভীষ্মদেব অকালে কাল সমরে শর শয্যায় শায়িত হয়েছেন'।

কর্ণ দ্রোণাচার্যকে উত্তেজিত করেছেন বারংবার। শেষে চিন্তিত দুর্যোধনকে কথা দিয়েছেন দ্রোণ যে তিনি পান্ডবপক্ষের এক বীরকে নিহত করবেন। এমনকি তিনি তাঁর ব্যূহ রচনার প্রণালীও ব্যাখ্যা করেছেন সবিস্তারে।

নাটকের মূল বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তৃতীয় অঙ্কে। মাতৃভক্ত এবং পত্নীপ্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অভিমন্যু স্বীয় বংশ মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন।

স্ত্রী ও জননীর সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও অভিমন্যু জ্যেষ্ঠ তাতের নির্দেশে যুদ্ধে গেছে। দ্রোণাচার্য নির্মিত এবং জয়দ্রথ রক্ষিত ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করে একাকী কৌরবদের বিপক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় অভিমন্যুর মৃত্যু হয়েছে। অতুলনীয় তার বীর্যবত্তা। তবে ক্রুদ্ধ অভিমন্যু বয়স্ক কৌরবদের সম্বোধনে যে অবজ্ঞা দেখিয়েছে তা অশোভন।

দ্রোণাচার্য প্রথমে অভিমন্যুকে অন্যায় রণে বধ করতে অনিচ্ছুক হয়েও পরিবেশের চাপে সম্মত হয়েছেন অভিমন্যু নিধনে। অভিমন্যুর মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত অর্জুনের পুত্রঘাতীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের শপথে নাটকের সমাপ্তি।

শকুনি চরিত্র চিত্রণে প্রচলিত সংস্কারকে লেখক অনুসরণ করেছেন। তবে তার নিজেকে নিয়ে যে পরিহাস তা কিছুটা উপভোগ্য হয়েছে—

'আজকার রণস্থলে ভীমে ছোড়াটা আমার দেখা পেয়েছিল, সে বেটা আমাকে দেখেই একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে আমার কাছে এলো, এসেই কোন কথাবার্তা নাই, আমার রথ ধরে পাক দিতে লাগলো, আমি রথ থেকে বিশ হাত দূরে মরার গাদার উপরে পড়লেম, মরার গাদার ওপর পড়েই অজ্ঞান হলেম, পরে সন্ধ্যার সময় যখন রণস্থল পরিষ্কার করবার জন্য মুদ্দফরাস এলো তখন তাদের সহায়ে চৈতন্য লাভ করি, পরে সেই রণস্থল থেকে আস্তে আস্তে আসছি' (পৃঃ ১৭-১৮)।

'**বিমুক্ত বেণী বন্ধন or Binding of the Braid**' পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক এই নাটকটির রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। নাটকটির প্রকাশকাল ১৮৮৬। প্রস্তাবনা দিয়ে নাটকটির শুরু এবং নাটকটি পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট।

নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র দ্রৌপদী। এই চরিত্রচিত্রণে নাট্যকার বাঞ্ছিত সাফল্য লাভ করেছেন। তার অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। প্রতিজ্ঞায় তিনি অটল। ক্ষাত্র বীর্যের প্রকাশ তাঁতে। অর্জুন যখন জানিয়েছেন পাণ্ডবদের সুখ-সূর্য শীঘ্রই উদিত হতে চলেছে, তখন দ্রৌপদী প্রতিবাদ করে বলেছেন—

সমুদিত সুখ-সূর্য অদৃষ্ট আকাশে ?
হস্তিনার সিংহাসনে আজ (ও) অধিষ্ঠিত
দুঃশাসন দুর্মতির সুতপ্ত শোণিতে
বাঁধেনি বিমুক্ত বেণী এখন (ও) পাঞ্চালী
পিতৃপিতামহাগত
অর্দ্ধেক সাম্রাজ্য এই পাণ্ডবের প্রাপ্য—
কোন লাজে কহ তবে
দূতমুখে দুর্যোধনে করিয়া মিনতি
পঞ্চখানি গ্রাম ভিক্ষা চাও পুনঃপুনঃ ?

দ্রৌপদী ভীমকে উত্তেজিত করেছেন কৌরবদের বিপক্ষে, স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন

দুঃশাসনের রক্তে তাঁর কবরী বন্ধনের প্রতিজ্ঞা। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে সমালোচনা করেছেন তাঁর নিষ্ক্রিয়তার জন্য—

শ্রবণ বধির ঘোর অশনি সম্পাতে
পর্বত পতন শব্দে যেজন জাগেনা
হায়! কোলাহলে তারে জাগাইতে চাও?

দ্রৌপদী শৌর্যের পূজারী। তাই আহত যুধিষ্ঠিরকে তার নিদারুণ ভর্ৎসনা ও ব্যঙ্গোক্তি—

স্বামীর শুশ্রূষা করে পান্ডব প্রেয়সী!
সরমে সরেনা কথা।
পান্ডব পতির পৃষ্ঠে অস্ত্রের আঘাত!

দুঃশাসনের বুকের রক্তে দ্রৌপদীর কেশ বন্ধনে নাটকের পরিসমাপ্তি। এইভাবেই দ্রৌপদী তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন।

নাটকের একেবারে প্রারম্ভে ভানুমতী ও দ্রৌপদীর বিরোধটি উপভোগ্য। ভানুমতীকে দ্রৌপদী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন একবার তিনি কাম্যবনে বন্দী হয়েছিলেন, তাই যেন তিনি সাবধানে কাননে বিচরণ করেন, নতুবা বারংবার বন্দিনী হলে ভানুমতীর পক্ষে লোকালয়ে মুখ দেখান ভার হবে। ভানুমতীও ছেড়ে কথা বলার পাত্রী নন, তিনি দ্রৌপদীর দুর্বলতম স্থানে আঘাত হেনে প্রতিশোধ স্পৃহার চরিতার্থতা ঘটিয়েছেন—

কুলের কাহিনী-হায়! কহিতে সরম,
কামিনী কুলের তুমি লজ্জা স্বরূপিনী,
প্রকাশ্য সভার মাঝে বিবসনা হয়ে
কেমনে দেখাও মুখ না পারি বুঝিতে

একদিকে ভানুমতী দ্রৌপদীকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন

পাঞ্চালি! পান্ডব এবে সন্ধিতে সম্মত
ও বিমুক্ত বেণী তবে নাহি বাঁধ কেন?

অপর দিকে দুর্যোধনকে অজানা আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে অনুরোধ করেছেন—

সম্প্রীতি স্থাপহ পান্ডুসুত সনে
প্রদানিয়া প্রাপ্য অংশ।

ভানুমতীর এই পরস্পর বিপরীতমুখী আচরণ তার চরিত্রকে জীবন্ত করেছে। নাটকে যুধিষ্ঠির চরিত্রটি প্রথমাবধি বড়ই দুর্বল ও কোমল প্রকৃতির করে চিত্রিত। কৌরবদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে তিনি নারাজ। রক্তের সম্পর্কের দোহাই দিয়ে তিনি বলেছেন 'ভ্রাতৃভাব ভুলি কেমনে কৌরবে বিনাশিব বল?' যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়োচিত আচরণের পরিবর্তে শেষপর্যন্ত ধর্মের জয় অনিবার্য—এই বিশ্বাসে অটল থেকে যুদ্ধ বিমুখ হয়ে থাকতে চেয়েছেন—

ধর্মবিনা জয়লাভ হয় না কখন।
যথা ধর্ম তথা জয় বেদের বচন।

পরবর্তীকালে তার যুদ্ধবিমুখতার অন্যবিধ কারণ অবশ্য অভিব্যক্ত হয়েছে—

ধনুর্দ্ধারী অগ্রগণ্য ভীষ্ম কর্ণ আদি
মহা মহা বীরগণ কৌরব সহায়
কেমনে জিনিব দেব ধার্ত রাষ্ট্রকুলে ?

শ্রীকৃষ্ণ তখন যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দিয়েছেন—

ক্ষত্র হয়ে হবে নাক অতি ক্ষমাশীল
তেজকালে কর তেজ ক্ষমা ফেল দূরে।

বলাবাহুল্য যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা দুর্বলতা প্রসূত, তা যথার্থ ক্ষমার মর্যাদা দাবী করতে পারেনা। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ কর্তৃক আশ্বস্ত হয়ে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন কিন্তু আহত হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন। অথচ তিনিই আবার অর্জুন কর্ণকে বধ না করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করায় তাকে বর্বর, গাণ্ডীবের অযোগ্য বলে ভর্ৎসনা করেছেন।

যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুন ও কর্ণের বাক্ যুদ্ধ নাটকীয় রসের সৃষ্টি করেছে। নাটকটি পদ্য সংলাপে রচিত।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত '**ভণ্ড দলপতি দণ্ড**' প্রহসনটির প্রকাশকাল ১২৯৪ বঙ্গাব্দ। বীণা রঙ্গমঞ্চে প্রহসনটি অভিনীত হয়েছিল। ষষ্ঠ দৃশ্যে প্রহসনটি সমাপ্ত।

হিন্দুসমাজের তথাকথিত রক্ষকেরা শতাব্দীকাল পূর্বে কি পরিমাণে ভণ্ড ছিল, আলোচ্য প্রহসনে সেই ভণ্ডামির মুখোস খুলে দেওয়া হয়েছে।

হরিহর জমিদার এবং এই সূবাদে হিন্দু সমাজের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। হাতে তার জপের মালা, মুখে শ্রীহরির নাম, সন্ধ্যাহ্নিক করায় তার আগ্রহ। কিন্তু এসবই তার লোক দেখানো ব্যাপার। আসলে সে বেশ্যাসক্ত, মদাপ এবং নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণে পটু। অথচ এ হেন হরিহর নন্দ মুখুজ্যেকে একঘরে করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিলেত ফেরৎ এক বন্ধুকে তার গৃহে ভোজন করানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হরিহরের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে গোবর্ধন, নন্দ মুখুজ্যে এবং অন্যান্য প্রতিবেশীদের কাছে। নন্দ মন্তব্য করেছে, 'সমাজে হিঁদুয়ানির ভান করে থাকেন, আর গোপনে হিন্দুধর্মের শ্রাদ্ধ করেন'। প্রহসন হিসাবে এ'টি সার্থক। হাস্যরস সৃষ্টিতে নাট্যকার যথার্থ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। এই হাস্যরসের পরিচয় মেলে করিমের সঙ্গে হরিহর ও তার মোসাহেব কেনারামের বিচিত্র হিন্দী কথনে। সমাজের মাতব্বরদের সামনে করিম হরিহরের নিষিদ্ধ খাদ্যগ্রহণের বিষয় উত্থাপন করায় ক্ষুব্ধ হরিহর করিমের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বলেছে, 'ব্যাটা নেড়ে! পাজি, ছুঁচো, তোম্ জানতা নেই হ্যায় যে ভট্টাচার্যি মহাশয়ের সামনে ওরূপ বাত মৎ বল্নে পারতা হ্যায়! তোম মানী লোকের মান নেহি জানতা হ্যায় শূয়ার'।

কথায় বলে 'বাবু যত বলে পারিষদ দল বলে তার শতগুণ'। কেনারামও একই কারণে করিমকে ভর্ৎসনা করে বলেছে, 'ব্যাটা হারামজাদা, শূয়ার, তোম্

বড় অসভ্য হ্যায়; তোম হাটের মাঝখানে হাঁড়ি ভাঙতা হ্যায়; তোমকো এক কিলে যমালয়ে পাঠাতা হ্যায়। পাঁচশো দিন মানা কর দিয়া হ্যায়, তবু হারামজাদা, খানা খাবার বাত যার তার সম্মুখে বলতা হ্যায়।'

হরিহরের রক্ষিতা লুসির ইচ্ছানুযায়ী তার গৃহে যে কার্তিক পূজো অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে পৌরোহিত্য করেছে কেনারাম। কেনারাম উচ্চারিত সঙ্কল্প মন্ত্রেও হাস্যরসের উদ্রেক হয়।—'বিষ্ণু বিষ্ণু রৈ ও ঁ স্বৎসৎ অদ্য উচ্ছিন্ন মাসে অধপেতে পক্ষে চূড়ামণি গোত্রে শ্রীযুত হরিহরবাবু ব্যভিচারিণী গোত্রে শ্রীমতী লুসি বিব্যা আনন্দ পান কামনায় কার্তিক পূজা কর্মণং করণ যৎকিঞ্চিৎ গেলাস মেকং সুরা যথাসম্ভব লম্পটায় সুন্দরায় মাতালায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।' কার্তিক পূজায় চন্দনের অভাবে প্রদত্ত হয়েছে অডিকোলন, আর নৈবেদ্যের মাঝখানে রক্ষিত হয়েছে পাঁউরুটি। শুধু তাই নয়, কেনারাম দক্ষিণা স্বরূপ পেয়েছে এক গ্লাস ব্রাণ্ডি। চরিত্র চিত্রণেও নাট্যকারের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। হরিহরের ভণ্ডামি চমৎকার ভাবে ফুটেছে। এমনকি তার রক্ষিতা লুসি পর্যন্ত তাকে এজন্য ব্যঙ্গ করেছে—'Fie! Fie! to your hypocrisy! তুমি নাকি ঠেকুর পূজো কর! আবার নাকি কিসের মাটি এই নাকে কানে পরো। আর একখানা হিজিবিজি ছবি দেওয়া ন্যাংড়া গায়ে দিয়ে আর হয়ত একটা কিসের ঝুলি নিয়ে যেন বাঁদর সাজ নয়?'

কেনারাম উপযুক্ত মোসাহেব। সে সব সময় হরিহরের সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকে, তার উচ্ছিষ্ট কিছু প্রসাদ পায়, আর বিনিময়ে হরিহরকে অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে সে উদ্ধার করে। করিমের প্রশ্নজনিত অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে সে উদ্ধার না করলে হরিহরের স্বরূপ অনেক আগেই ধরা পড়ে যেত।

ধনদাস ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ, তার অভাবে স্বভাব নষ্ট। নামের সঙ্গে তার আচরণের গভীর সাদৃশ্য। ধনলাভের আশায় সে নন্দ মুখুজ্যেকে একঘরে করতে যেমন হরিহরকে উত্তেজিত করেছে, তেমনি নন্দকে বাঁচাতে তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের কথা বলে তার কাছ থেকে পঁচিশটি টাকা আদায় করেছে। ধনদাস তার স্ত্রীকে খোশামোদ করে চলে। তার ভাষায়, 'তোমার কাছে থাকলে আমি পর্বতের আড়ালে থাকি'। নন্দ মুখুজ্যে যুক্তিবাদী কিন্তু সেইসঙ্গে সে আবার সমাজের অত্যাচারের ভয়ে কিছুটা ভীত, দুর্বল চিত্ত, তা না হলে ধনদাসকে সে পঁচিশটি টাকা দিত না।

নন্দ মুখুজ্যের ভৃত্য গোপালের চরিত্রটি খুবই জীবন্ত হয়েছে। অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় বলে সে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, রেমোকে সে হিংসা করে। কেননা রেমো মাতালের বাড়ী কাজ করে বলে তাকে বেশি পরিশ্রম করতে হয় না, উপরন্তু তার অতিরিক্ত আয়ও হয়। বাবুর বাড়ী বিছানা করে তার সেই বিছানায় বাবু সেজে বসা, তার দীর্ঘদিনের অবদমিত বাসনার প্রকাশ মাত্র।

তবে সে যেভাবে তার পায়ের ধুলোর ছাপকে বেমালুম ধনদাসের বলে চালিয়েছে, তাতে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে।

প্রহসনটির মূল বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে এতে সংযোজিত গানটিতে—

'ঘোর কলিকাল, হায়রে হায়রে সব মেকি।
পাকাপাকি জিবের গোড়ায়, মনের গোড়ায় সব ফাঁকি ॥
যত সব ভন্ড মিলে, ধর্ম ভুলে, কর্‌চে কেবল ঠক্‌ঠকি।
কুঁড়জালি, নামাবলী, দিনের বেলা সার—
রেতের বেলায় বেতের ছড়ি ফুল বাবুর বাহার—'

বৈকুণ্ঠনাথ বসুর **'পৌরাণিক পঞ্চরং বা The Eighth wonder of the world'** প্রহসনটির গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ১২৯৮। রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে প্রহসনটি প্রথম অভিনীত হয় ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৯০ (১২ই পৌষ, ১২৯৭)। অর্থাৎ রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হবার পরে প্রহসনটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রহসনটির পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে প্রধান হল সিংহল রাজ্যের সেনাপতি রণবীর সিংহ, সিংহল রাজ্যের বিচারপতি ভাস্কর ও রণবীর সিংহের ভৃত্য শশী; রণবীর বেশী মদন ও শশী বেশী বসন্ত। অপরপক্ষে স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রণবীরের পত্নী মেঘমালা, মেঘমালার দাসী চাঁপা ও কাতি (কাত্যায়নী)। কাতি আবার রণবীরের ভৃত্য শশীর স্ত্রী।

প্রহসনটি পঞ্চরং-এ সমাপ্ত। তাছাড়াও 'পট পরিবর্তনে' সংযোজিত হয়েছে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ, কমল-কাননে সন্ন্যাসীর গীত সঙ্গীত, নন্দন-কাননে অপ্সরাদের সম্মিলিতভাবে গীত সঙ্গীত ইত্যাদি। মূল প্রহসনের সঙ্গে 'পট পরিবর্তনে'র সংযোজন সম্পর্ক রহিত। স্পষ্টতঃই দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য এই অংশের অবতারণা বোঝা যায়। তথাপি লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ উপভোগ্য।

মূল প্রহসনটির পরিকল্পনা অভিনব। দেবরাজের আদেশে মদন ও বসন্ত মর্ত্যে রণবীর ও শশীর ছদ্মবেশে উপস্থিত হলে প্রকৃত রণবীর ও শশী অকল্পনীয় সমস্যার সম্মুখীন হয়। সৃষ্টি হয় ভুল বোঝাবুঝির। রণবীর মেঘমালার চরিত্রে সন্দিহান হয়ে পড়ে। বেচারী শশী বসন্তের কারণে নানা নির্যাতন ভোগ করে বিশেষত রণবীরের কাছে। শেষ পর্যন্ত প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হয়। প্রহসনটিতে শেক্সপীয়রের 'Comedy of errors' এর ছাপ সুস্পষ্ট।

তেমন কোনো সামাজিক সমস্যা প্রহসনটির বিষয় না হলেও কিছু কিছু মন্তব্যে সামাজিক নানা বিষয়ে আলোকপাত লক্ষণীয়। যেমন বসন্তের অনুরোধে সূর্যদেব একদিন আত্মপ্রকাশে বিরত থাকতে অসম্মতি জানালে বসন্ত তাকে বুঝিয়েছে, 'আদালতের অপূর্ব বিচার আর দোকানদারের ঠকান আর মিউনিসিপ্যালিটির অত্যাচার এগুলো তো একদিনের জন্যও বন্ধ থাকবে ?' (পৃঃ ২)

বসন্ত 'রজনী'কে অস্ত যেতে নিষেধ করলে 'রজনী' আশঙ্কা প্রকাশ করেছে এতে শুঁড়ীদের অভিশাপ লাগবে। উত্তরে বসন্ত জানিয়েছে—'লুকিয়ে মদ

বেচা যে রকম চলছে, তাতে দিনের বেলার চেয়ে রাত্রিতে তাদের অধিক লাভ' (পৃঃ ৩)।

নাট্যকার শশীর চরিত্র চিত্রণে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

যুদ্ধের সংবাদ দান প্রসঙ্গে শশীর সঙ্গে সেনাপতি-পত্নীর কিরূপ কথোপকথন হতে পারে, শশীর নিজের মনে তার রিহার্সাল দিয়ে নেওয়া এবং নিজের নৈপুণ্যে নিজেকে তারিফ করা, বিশেষত রণবীরের কাছে শশীরূপী বসন্তের প্রসঙ্গে সে যে বিবরণ দিয়েছে তা অতিশয় উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

'আমি তো পোঁছুলেম ; এসে দেখি যে আর এক বেটা আমি আমার আগের থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে। যে আমি এখন দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছি, তার খুব পরিশ্রম হয়েছে, আর আর এক বেটা যে আমি সে বেশ তাজা আছে। এই আমির খুব ঠাণ্ডা মূর্তি, আর সেই আমির-ও বাবা, তার কাছে ঘেঁসে কে ?' (পৃঃ ২০)

১২৯৮ সালে প্রকাশিত হয় বৈকুণ্ঠনাথ বসুর '**রামপ্রসাদ**' নাটিকাটি। নাটিকাটি রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়েছিল ১২৯৮ সালের ৩রা শ্রাবণ।

সাধক রামপ্রসাদের জীবন সম্পর্কিত বহুল প্রচলিত ঘটনাগুলি অবলম্বনে বর্তমান নাটিকাটি রচিত। নাট্যকার কর্তৃক নাটকে জমিদারী সেরেস্তায় রামপ্রসাদের চাকরী করা, দুর্গাচরণের মহানুভবতায় রামপ্রসাদের মাসিক বৃত্তি লাভ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক সাধকের 'কবিরঞ্জন' উপাধি লাভ, নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার—রামপ্রসাদের সঙ্গীতে নবাবের আত্মপ্রসাদ লাভ, অযোধ্যারাম গোস্বামীর সঙ্গে রামপ্রসাদের তাৎক্ষণিক রচনার মাধ্যমে কবির লড়াই, রামপ্রসাদের কন্যা জগদীশ্বরীর ছদ্মবেশে স্বয়ং কালিকা কর্তৃক রামপ্রসাদকে বেড়া বাঁধার কাজে সহায়তা করা, গঙ্গায় রামপ্রসাদের দেবীর ঘটসহ আত্মবিসর্জন সবই বর্ণিত হয়েছে। এমনকি রামপ্রসাদের প্রথম রচনা বলে পরিচিত 'আমায় দাও মা তবিলদারী' সঙ্গীত দিয়েই নাটকটির সূত্রপাত ঘটান হয়েছে। নাটিকাটি দুইটি অঙ্ক বিশিষ্ট এবং বেশ কয়েকটি রামপ্রসাদী সঙ্গীত নাটকটিতে স্থান পেয়েছে।

'**অম্বা নাটক**'টির রচয়িতা বিপিন বিহারী ঘোষ। নাটকটির প্রকাশকাল ১৮৯৩। প্রস্তাবনা দিয়ে নাটকটির শুরু।

শৌভপতি তাঁর 'কামচারী' নামক বায়ুযানে দেশ পর্যটনে রত হয়ে উপনীত হয়েছেন কাশীরাজের পুষ্প বনে। এখানে শাল্বরাজ কাশীরাজ দুহিতা অম্বাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, অম্বাও মুগ্ধ হয়েছে শাল্বরাজকে দেখে। শাল্বরাজ সংকল্প নিয়েছেন বীর্য শুল্কেই অম্বাকে সন্তুষ্ট করবেন।

সত্যবতী অম্বার শাল্বের প্রতি আসক্তির কথা শুনে তাকে শাল্বের কাছে প্রেরণ করার আশ্বাস দিয়েছেন—

ধন্য কাশী পুণ্য ভূমি জন্মভূমি তব।
সাবিত্রী সমান তুমি নারীর গৌরব ।।
তীব্রতর নহে বজ্র যথা সাধ্বী-স্থান।
পাঠাব সত্বর তোমা স্বামীর সকাশ ।।

মহিষী শাল্বকে বিভ্রান্ত করেছেন, বুঝিয়েছেন অম্বা তাঁকে হত্যার অভিপ্রায়ে এসেছে। শাল্বও তা বিশ্বাস করেছেন এবং অম্বাকে গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছেন। অম্বা বনবাসিনী হয়েছে। কাশীরাজ ক্ষুব্ধ হয়েছেন শাল্বের প্রতি। অম্বা আত্মঘাতিনী হবার সংকল্প করেছে। ভীষ্মের বিরুদ্ধে অম্বার খেদোক্তি প্রকাশিত হয়েছে—

বাহু বলে মত্ত হয়ে হরিলে আমায়
পৌরুষ দেখালে বধি অবলা বালায় ।।
জ্বলিলাম বিনা দোষে আমি তব তরে
লভিলাম মর্মব্যথা কোন ক্ষতি করে?
কহ শাস্ত্র, গড় নীতি, ধর বাহুবল
সহিতে জন্মেছি সহি রমণী মণ্ডল ।।

ভীষ্মের কারণেই অম্বার জীবন ব্যর্থ হয়েছে তাই তার এই খেদোক্তি। লক্ষণীয় খেদোক্তিটি একই সঙ্গে ভীষ্মের বিরুদ্ধে অম্বার ব্যক্তিগত অভিযোগ হয়েও পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে নারী সমাজের প্রতিবাদে রূপান্তরিত হয়েছে।

অম্বার কারণে ভীষ্মকেও দুঃখ প্রকাশ করতে হয়েছে, অনুতাপ প্রকাশ করতে হয়েছে—

এরূপ পরমা সতী আমি তুচ্ছ করি
ফেলিয়া অমিশ্র পুণ্যে পাপ বক্ষে ধরি ।।
জ্বলিছ প্রেয়সি, তুমি তীব্র হুতাশনে
সংক্ষেপে সমাপ্ত করি ললিত জীবনে ।।

পুরুষ শাসিত সমাজের হাত থেকে অত্যাচারিত অবলাদের মুক্তির প্রার্থনার মধ্য দিয়ে নাটকটির সমাপ্তি ঘটেছে।

নাটকটির মধ্যে সমসাময়িক কালের সতীন প্রথার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। অম্বিকা বলেছে. 'তিন বোনে এক ঘরে? সবাই জ্বলে পুড়ে মরব?' সুলোচনা বলেছে, 'সতীনের কথা আর বলো না। অমন কালনাগিনী গৃহ-তাপিনী সর্বনাশিনী ধরণীতে আর নাই।...যে মেয়ে সতীনের ঘরে যায় সে কেন জন্মেই মরে না।' মালতী অম্বাকে ভয় দেখিয়েছে, 'সেখানে হয়ত শত সতীনের মধ্যে জ্বলবে। সোনার অঙ্গ কালি হবে।'

শাল্বের মহিষী ও তার সঙ্গিনীর মুখে ধর্মঘটের প্রসঙ্গ কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের **'প্রবীর-পতন বা জনা'** নাটকটির প্রকাশকাল ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ। গিরিশ চন্দ্রের সুবিখ্যাত পৌরাণিক নাটক 'জনা' প্রকাশের (১৮৯৪)

এক বৎসর পরেই হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাট্যকার তাঁর নাটকটি গিরিশচন্দ্রকেই উৎসর্গ করেছেন। উভয়ের নাটকের বিষয় বস্তু মূলতঃ এক হলেও স্বীকার করতে হয় যে গিরিশচন্দ্রের 'জনা' আমাদের আলোচ্য নাটকের তুলনায় অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং অনেক বেশি সার্থক। গিরিশ-চন্দ্রের 'জনা' নাটকটি যেমন ভক্তি ভাবনার আধারে পরিণত হওয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর ভক্তি রত্নাকরে পরিণত হয়েছে, আমাদের আলোচ্য নাটকটি কিন্তু তেমন হতে পারেনি, যদিও ভক্তি ভাবনার প্রকাশ এ নাটকেও ঘটেছে। দ্বিতীয়ত গিরিশচন্দ্রের নাটকের প্রধান আকর্ষণ 'জনা' চরিত্রটি। তার গঙ্গা ভক্তি, অপত্য স্নেহ, বীর্যবত্তা, কৃষ্ণ-বিরোধিতা, পুত্রের হত্যাকারীর বিরুদ্ধে তার তীব্র জেহাদ এবং প্রতিহিংসা পরায়ণতা আলোচ্য নাটকে অনুপস্থিত। সত্য কথা বলতে কি আলোচ্য নাটকে আমরা যেন ভিন্নতর এক জনাকে লাভ করি।

নাট্যকার নাটকে যে জনা চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন তার প্রধান পরিচয় প্রবীরের জননী রূপে তিনি প্রবীরকে যুদ্ধে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, উত্তেজিত করেছেন। তার বীরাঙ্গনা রূপই নাটকে মুখ্য হয়ে উঠেছে। প্রবীরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

লভিয়াছি দিব্য শস্ত্র জ্ঞান,
পাল এবে বীরধর্ম,
ধর অশ্ব
অপাণ্ডবা করিয়া পৃথিবী
রাখ কীর্তি এই ভূমণ্ডলে।

ক্ষত্রিয়ের জননী রূপে তিনি পুত্রকে বীর রূপে অধিষ্ঠিত দেখতেই বিশেষ আগ্রহী। প্রবীর যুদ্ধ ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হলে জনা তাকে প্রবোধ দিয়েছেন, উৎসাহিত করে মাতৃ কর্তব্য পালন করেছেন—

ক্ষত্রিয়ের রণ মোক্ষের ভবন,
ক্ষত্রিয়ের রণ জীবন-রতন,
ক্ষত্রিয়-তনয় কোথা রণ ভয়ে হয় অচেতন?
এ কথা শুনিলে লোকে,
দিবে গালি শত মুখে,
সে কলঙ্ক-মহাভার হবে না মোচন।

নীলধবজ প্রবীরকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করায় নীলধবজকে জনা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ক্ষত্রিয়-জনকের কর্তব্য—

পুত্র ধায় বীরত্ব কারণ,
তুমি তায় কর নিবারণ,
নরনারায়ণ ভাবি অর্জুনেরে।
হেন শিক্ষা দেয় কিহে কভু,
ক্ষত্রিয়-জনক হয়ে, আপন পুত্রেরে!

গিরিশচন্দ্রের নাটকে জনার যে তীব্র জ্বালা প্রকাশিত হয়েছে, আলোচ্য নাটকে তা একটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, নিদ্রামগ্ন প্রবীরকে দেখে জনা ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন।

ধিক! হেন পুত্রে ধিক্!
মরি! গর্ভ কেন মোর নাহি নষ্ট হলো,
মানিতাম বুঝিতাম সৌভাগ্য তাহলে।

নাটকে একবার জনাকে বীরাঙ্গনারূপে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গেছে—

পশিব সমরে, দেখাব সবায়,
হয় কিনা হয় শত্রু পরাজয়,
বীরের নন্দিনী বীরা তো বটি।

এইবার প্রবীরের প্রসঙ্গ। গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রবীরকে বিশেষভাবে মাতৃভক্ত রূপে চিত্রিত করা হয়েছে, কিন্তু আলোচ্য নাটকে সে তুলনায় তাকে যেন অধিকতর পিতৃভক্ত রূপেই দেখা গেছে। এই প্রসঙ্গে নীলধ্বজের বাণপ্রস্থে যাবার সিদ্ধান্তে প্রবীরের ক্রন্দন ও ব্যাকুল চিত্তে পিতাকে রাখার অনুরোধ উল্লেখযোগ্য। নাটকের প্রারম্ভেই তাকে বৃদ্ধ সেনাপতির বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত করে নাট্যকার প্রবীরকে যুদ্ধপ্রিয় রূপে দেখাতে চেয়েছেন। স্ত্রী মদন মঞ্জরীও স্বাহার কাছে প্রবীরের যুদ্ধ-প্রিয়তার কথা বলে তার আশংকার কথা জানিয়েছে। অথচ প্রকৃত যুদ্ধের সময় তাকে দেখা গেছে ভীত সন্ত্রস্ত রূপে—

সমরে দুর্জয় শুনি মা অর্জুন,
দুর্ধর্ষ সে ভীম অতি ভয়ংকর!
আপনি গোলোকপতি নররূপ ধরি,
প্রিয় ভেবে অর্জুনের রথের সারথি।
হাঁ মা, এবে তো গো বাধিবে সমর,
কেমনে বিজয় লাভ করিব সে রণে?

প্রবীরের ভীত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

ভয়ে মোর আকুল পরাণ।
বাক্য নাহি সরে, না বুঝি অন্তরে,
কেন কাল বিষধরে করিনু প্রহার,

শেষে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বলেছে ঃ

কি চিন্তা আরেরে মন,
কি চিন্তারে তোর,
নিশ্চিন্ত হইয়া থাক্ হবে ফল লাভ।
আপনি কৈবল্য পতি
আসিবেন রণে ভকতের হেতু,
ভক্তি-যুদ্ধ দেখাব তাঁহায়।

দুর্গার কারণে মায়া পুরুষ ও মায়া স্ত্রী আবির্ভূত হলে প্রবীর তাদের দ্বারা

প্রলুব্ধ হয়ে তত্ত্বজ্ঞান শূন্য হয়ে কৃষ্ণ প্রদত্ত দৈব অস্ত্রাদি হারিয়েছে। দৈব চক্রান্তের শিকার হলেও এক্ষেত্রে প্রবীরের চারিত্রিক শৈথিল্য প্রকাশ পেয়েছে স্বীকার করতে হয়। নাটকে প্রবীরকে অবশ্য প্রথমাবধি কৃষ্ণ ভক্ত রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। গুরু প্রবীরকে গুপ্তভাবে কৃষ্ণ আরাধনায় পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু প্রবীর ভক্তির আতিশয্যে সেই গুপ্তভাব রক্ষা করতে পারেনি। কৃষ্ণের আগমন বার্তায় সে উচ্ছ্বসিত। অর্জুন তাকে 'দ্বিতীয় হরিভক্ত 'প্রহলাদ' বলে স্বীকার করেছে। আর উপলব্ধি করেছে প্রবীরের আবাহনে হরির সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। কৃষ্ণকে সারথি করায় অর্জুনকে সে তীব্রভাবে যে ভর্ৎসনা করেছে তাতেও তার কৃষ্ণ ভক্তির পরিচয় প্রকাশিত।

'তৃতীয় পান্ডব অর্জুন নামে একজন এমনি কাপুরুষ কুলাঙ্গার আছে যে, সে স্বার্থের জন্য সেই দুরারাধ্য জগৎ পূজ্য গোলোকবিহারী শ্রীহরিকে আপন রথের সারথি করে রেখেছে। যে ধন মহাযোগীরা কত যোগ, জপ, তপ করে সহজে প্রাপ্ত হন নাই, সেই অসাধ্য-সাধন, অমূল্য ধন কিনা তার কাছে হতাদর হয়ে কালযাপন করছে।' প্রবীর যে ভাষায় বৃদ্ধ সেনাপতিকে ভর্ৎসনা করেছে, তা তার চরিত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করেনি। অপমানিত সেনাপতির প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে এইভাবে—

'মহারাজ নীলধ্বজ আমার পরামর্শের কত সুখ্যাতি করতেন। তাঁরি পুত্রের কথা শুনলে বাঁচতে আর ইচ্ছা হয় না।' প্রবীর অর্জুনকেও জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করেছে। কৃষ্ণের সঙ্গে ভীমের দীর্ঘ বিবাদ অপ্রাসঙ্গিক, কৃষ্ণের দর্শন লাভে ইচ্ছুক স্বাহা এবং মদন মঞ্জরীর সঙ্গে বাধাদানকারী শিবের কথোপকথনটিও অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ হয়েছে। হরিভক্ত প্রবীরের পক্ষাবলম্বন করবেন কৃষ্ণ, পরিণামে অর্জুনের নিশ্চিত মৃত্যু এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অর্জুনের ক্রন্দন তার বীর্যবত্তার পরিপন্থী হয়েছে। গঙ্গার সঙ্গে ভগবতীর বিরোধটি উপভোগ্য—এই বিরোধ সপত্নী বিরোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রবীরের জবানীতে ভারতের পরাধীনতায় নাট্যকার দুঃখ প্রকাশ করেছেন ঃ

অধীনতা মহাপাপ শান্তির আলয়।
তানা হলে ভারতের দুর্দশা এমন !
হায় ! চির-কাঙ্গালিনী ভারত-মাতার
লুকায়েছে সে গৌরব, রাহুগ্রস্ত শশী।
ভয়ঙ্কর নিদারুণ অধীনতা-পাশে,
মৃতপ্রায় জর্জরিত দেশ-বাসিগণ।
পেটে অন্ন দুই বেলা, পায় না সময়ে।
মরি মরি জীর্ণ শীর্ণ চরণ-প্রহারে ;
পরিণাম তার কি ভেবেছ তোমরা।
স্বাধীনতা মহারত্ন লইবে কাড়িয়া।
যায় রাজ্য যায় মান, যায় সিংহাসন,
ভেক আসি নৃত্য করে ভুজঙ্গের শিরে।

নীলধ্বজের মাধ্যমে নাট্যকার স্ত্রী স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন—

নারী-স্বাধীনতা !
কোন্ মূর্খে বলে উন্নতি সোপান ?
কোন্ মূর্খে করে তায় সম্মতি প্রদান ?
চিরাবৃত স্থানে যাদের আবাস,
সূর্য মুখ যারা করেনা দর্শন,
…সে হৃদয়ে স্বাধীনতা হলে পরকাশ,
সর্বনাশ বিনে আর কি ঘটিবে, বল।

নাটকের শেষে ক্রোড় অঙ্ক সংযোজিত হয়েছে, নিত্যধামে প্রবীর ও মদন মঞ্জরীকে অবস্থান রত দেখান হয়েছে।

কৃষ্ণলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত **'ঊষা'** নাটকটির প্রকাশকাল ১৩০৩। নাটকটি এমোরাস থিয়েটারে অভিনীত। নাটকটি শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ বিশেষ অবলম্বনে রচিত। নাট্যকার মূল গ্রন্থের কিছু অংশ যেমন আলোচ্য নাটকে পরিত্যাগ করেছেন, তেমনি নূতন কিছু কিছু বিষয়ের সংযোজনও ঘটিয়েছেন। চতুর্থ অংকে নাটকটি সমাপ্ত। সংলাপ মূলতঃ পদ্য ছন্দে রচিত। বাণরাজার দুহিতা ঊষার সঙ্গে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গান্ধর্ব মতে বিবাহের কারণে বাণ রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে অনিরুদ্ধকে বন্দী করলে কৃষ্ণ সসৈন্যে উপস্থিত হন পৌত্রকে মুক্ত করার জন্য। যুদ্ধে কৃষ্ণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন বাণকে প্রহলাদ বংশের উত্তরাধিকারী বলে। বাণ রাজা শেষ পর্যন্ত ঊষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ মেনে নিয়েছেন। এইভাবেই ঘটেছে নাটকের পরিসমাপ্তি। মহাদেব ১ম অংশের ৩য় দৃশ্যে ঊষার সঙ্গে অনিরুদ্ধের বিবাহ উপলক্ষ্যে বাণরাজার সঙ্গে কৃষ্ণের বিরোধ ঘটবে বলে ভবিষ্যৎ বাণী করায় নাটকের পরিণতি সম্পর্কিত কৌতূহল অনেকটাই অন্তর্হিত হয়ে যায়। কোন চরিত্রই পরিস্ফুট হয়নি। তবু গন্ধর্বরাজ চিত্র সেনের বহু বল্লভ হওয়ার প্রসঙ্গে উচ্চারিত সংলাপটি মন্দ হয় নি—

এক স্তম্ভে বাঁধা থাকে অনেক তরণী,
এক চন্দ্রের দেখ কত নক্ষত্র গৃহিণী।
অনেক পথিক থাকে এক তরুতল,
বহু প্রাণী খায় এক সরোবর জল।
সেমত আমার প্রিয়ে ! অনেক রূপসী,
তত্রচ তোমরা মোর প্রাণের প্রেয়সী।

বাণের সঙ্গে কৃষ্ণের বিরোধটি উপভোগ্য হয়েছে। বাণ অভিযোগ করেছেন পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে কৃষ্ণ চুরি বিদ্যা শিখিয়েছেন। অপর পক্ষে কৃষ্ণ বলেছেন—

চোর বংশে মান বৃদ্ধি করেছে তোমার ;
ছি ! ছি ! এরূপ অবাধ্য
দুহিতা যাহার,

হাড়ি দাড়ি সম্বল করি,
সাগর জলে বাস করা উচিত তাহার।

'গয়াসুরের হরি পাদপদ্ম লাভ' সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত। নাটকটির প্রকাশ কাল ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ। সুরেন্দ্র নাথ ছিলেন হুগলী জেলার অন্তর্গত পায়রা গাছা-জনাইয়ের বাসিন্দা। আলোচ্য নাটকটি পঞ্চদশ দৃশ্যে সমাপ্ত। নাটকটির সংলাপ মাঝে মাঝে দীর্ঘ হয়েছে এবং তা সংস্কৃতানুগ। নাটকের ১ম দৃশ্যটিকে অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ করা হয়েছে। ত্রিপুরাসুরের বধের পর দেবতারা যে তাত্ত্বিক আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন তা কিঞ্চিৎ বিরক্তির সৃষ্টি করে, গয়াসুরের পাঠশালার বিবরণ উপভোগ্য ও বাস্তবানুগ হলেও এই বিবরণে কিঞ্চিৎ আতিশয্য দোষ ঘটেছে। পাঠশালার পড়ুয়ারা গুরুপত্নীকে গুরুকন্যা বলেছে, গুরুকেও বিদ্রূপ করেছে, এমন কি সর্দার পড়ুয়া গুরুর কান মুলে দিয়েছে। গুরুও ছাত্রকে চুরি করতে শিখিয়েছেন। তবে গুরুর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পার্বণী আদায় ইত্যাদি বিষয়গুলি বাস্তবানুগ।

গয়াসুরের জননী প্রভাবতী চরিত্রটি বেশ স্বাভাবিক হয়েছে। অপত্যস্নেহের প্রকাশ ঘটেছে প্রভাবতীর মধ্যে খুব স্বাভাবিক ভাবে। রাজবধূ হয়েও এবং রাজ দুহিতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি পিতৃগৃহে দীনা-হীনা রমণীর ন্যায় জীবন যাপন করেছেন। তার একমাত্র উদ্দেশ্য পুত্র যেন সৎপথে বিচরণ করে, পিতা-পিতামহের জন্মসুলভ তমোগুণের অধীন হয়ে অকাল মৃত্যুর শিকার না হয়।

নাটকটির প্রধান চরিত্র গয়াসুর। সে হরিভক্ত। গয়াসুর মরণোত্তর-জাতক। নিজেকে সে মায়ের সন্তান বলে পরিচয় দেয়। তার পিতৃপরিচয় নিয়ে পাঠশালায় ব্যঙ্গোক্তি করা হলে সে মায়ের কাছে পিতৃপরিচয় জানতে চেয়েছে, আর এই সূত্রেই সে দেবতাদের বিরোধী হয়ে উঠেছে। হরির সাধনায় রত হয়েছে সে। স্বয়ং নারদ প্রভাবতীর কাছে স্বীকার করেছেন, 'তোমার পুত্র নিজের বিমল একাগ্র চিত্ত সুলভ যে ভক্তিমার্গ প্রাপ্ত হোয়েছে, তা বোধহয় কার কখন তা হয়নি, এমনকি আমি, যে একজন মহা হরিভক্ত বোধে গরিমা করতেম, সে দর্পও আজ আমার চূর্ণ হলো…'(৭ম দৃশ্য)।

গয়াসুরের বীর্যবত্তা নাটকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ইন্দ্র পরাজিত হয়েছেন গয়াসুরের কাছে। গয়াসুরের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছেন দেবতারা। স্বয়ং নারায়ণ পর্যুদস্ত হয়েছেন ; শেষে নারায়ণের আহ্বানে গয়াসুর পাষাণত্ব স্বীকার করেছে, নারায়ণ তার মাথায় পা দিয়েছেন। স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক হয়েছে।

গয়াসুরের আক্রমণে বিপর্যস্ত দেবতাদের আর্তি উপভোগ্য। ইন্দ্রের ইচ্ছানুযায়ী মাতলী যদিও গয়াসুরকে কৌশলে স্বর্গে নিয়ে এসেছে, কিন্তু ইন্দ্রের প্রস্তাবমত তার হত্যার বিরোধী সে। গয়াসুরের প্রতি তার যে দুর্বলতার প্রকাশ ঘটেছে, তা মাতলী চরিত্রটির মর্যাদাকেই বৃদ্ধি করেছে।

গয়াসুরের প্রতি শচীর অপত্যস্নেহ এবং তার কারণে ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিরোধটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে—

কোন প্রাণে সুকুমার ত্রিপুর-তনয়ে,
বধিতে উদ্যত তুমি, অসি ধরি করে,
যেজন আত্ম-রক্ষণে, অক্ষম সর্বথা,
তারে কি উচিত তব অসিঘাত করা ?

শচীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দ্রের অমানবিক আচরণ ইন্দ্র চরিত্রটিকে অশ্রদ্ধেয় করে তুলেছে। নাটকটির সংলাপ গদ্য ও পদ্যে রচিত।

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের **'রাঙ্গা বৌ বা শিক্ষিতা মহিলা'** প্রহসনটির প্রকাশকাল ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ। নাটকটি চতুর্থ অঙ্কে সমাপ্ত। ফুলেশ্বর নিবাসী আশুবাবুর যাত্রাদলে এ'টি বহুবার অভিনীত হয়েছিল। মুখ্যতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, এদেশীয় রীতি-নীতি এবং ঐতিহ্যে অবিশ্বাসী বধূদের সমালোচনার উদ্দেশ্যেই প্রহসনটি রচিত। বলাবাহুল্য শিক্ষিতা মহিলাদের ব্যঙ্গ করতে নাট্যকার কিঞ্চিৎ আতিশয্যের আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু তাতে প্রহসনটির নাট্যরস ক্ষুন্ন তো হয়ই নি, বরং অধিকতর উপভোগ্য হয়েছে।

আলোচ্য প্রহসনে মুখ্য চরিত্র গোপাল বসুর নব পরিণীতা স্ত্রী। বিকেলে গাড়ী ভাড়া করে ইডেন উদ্যানে বেড়াতে যাবার জন্য সে বাড়ীর পুরনো চাকর সাধুকে নির্দেশ দিয়েছে। রাত নয়টায় তার ইডেন থেকে বেড়িয়ে ফেরা অভ্যাস। সে হিন্দু সধবা রমণীর চিহ্ন লোহা এবং সিঁদুর পরতে নারাজ। শাশুড়ীকে সে এই প্রসঙ্গে জানিয়েছে, 'লোকে রং মাখে সং সাজবার জন্য, আপনারা কি আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সেই সং সাজিয়ে রাখতে চান ? বিবাহ করলে স্ত্রী পুরুষে যে আংটি বিনিময় করে, সেই আংটিই হলো প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাহের চিহ্ন'। রাঙ্গা বৌ সোসাইটি লেডী, সে Emancipation Society, Sunday সমাজ, Music party, Supper party ইত্যাদিতে যেতে অভ্যস্ত। এমনকি তার অনেক পুরুষ বন্ধুও আছে। শ্বশুর বাড়ীতে তার সঙ্গে দেখা করতে আসা দু'জন অবাঙ্গালী পুরুষ বন্ধুকে অন্দর মহলে ঢুকতে দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় পুরনো চাকর সাধু প্রহৃত হয়েছে তার হাতে। সে শ্বশুর সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছে, 'আমি যাকে বিবাহ করেছি আপনি বোধহয় সেই গোপাল বাবুর পিতা সিদ্ধেশ্বর বাঁড়ুজ্যে'।

প্রতিবেশীরা তাকে প্রণাম করতে এলে সে তাদের বাধা দিয়েছে, বলেছে, 'বহুকাল হইতে পুতুল পূজা করিয়া আপনাদের কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে, আমি আপনাদের ভগ্নী আমাকে প্রণাম করিবেন না'। সে স্ত্রী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তার বক্তব্য, 'ইংলণ্ডে এখন স্ত্রীলোক সব কাজ করছে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, কৌন্সেল আর সৈন্যদলেও স্ত্রীলোক হা! হা! হা!

এখন আর ঘর নিকতে গোবর ঘাঁটতে পুরুষের পা টিপতে স্ত্রীলোক জন্মাবে না'।

নবপরিণীতা বধূর শ্বশুর বাড়ীতে প্রথম উপস্থিতি সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর বাইশ বছরের পুরনো ভৃত্য সাধুর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, নাট্যকার তা চমৎকার ভাবে ফুটিয়েছেন, 'হিঁদুর ঘরে বৌ আসে চেলির কাপড় পরে, ঘোমটা দিয়ে, এ বৌ এলো মাথা খোলা, গায়ে জামা জোড়া আঁটা, পায়ে আবার ইস্টিসান জুতো। ঘরে ঢুকে শ্বশুর শাশুড়ীকে একটা গড় করা নাই, ঠাকুর দেবতাকে একটা নমস্কার করা নাই, এসেই বল্লে কিনা, 'এই আমার চা এর জল গরম কর'।

গোপালকে চিত্রিত করা হয়েছে একেবারে বিপরীত কোটির করে। আদর্শে সে প্রাচীন পন্থী, উগ্র স্ত্রী স্বাধীনতায় তার আস্থা নেই। সে বিশ্বাস করে লজ্জাশীলতাই নারীর ভূষণ, তার পছন্দ অন্তঃপুর বাসিনী স্ত্রী। আদর্শ স্ত্রী বলতে তার ধারণা যে নাকি 'ঘর নিকুবে, ঘুঁটে দেবে, গো সেবা করবে, তাদের মাথায় কি বিলাতী শিক্ষার তীব্র তেজ ধরে?' ইংরেজদের অনুচিকীর্ষায় তার প্রবল আপত্তি। তার বক্তব্য 'পুরুষ পুরুষানুক্রমে যারা দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ তারা কোন মুখে দুটো কোট পেনটুলনের সাহায্যে ভুবন বিজয়ী ইংরাজের সমকক্ষ হতে চায় এবং আসৃষ্টিকাল চির অবরোধ বাসিনী অবলা জাতিকে বাইরে বার করে গৌরবের কীর্তি স্তম্ভ স্থাপন করতে বাসনা করে?' প্রহসনে অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে গোপালের সঙ্গে তার শিক্ষিতা স্ত্রীর বিরোধ দেখান হয়নি।

বেশ বোঝা যায় নাট্যকার নিজে ছিলেন গোপাল-পন্থী।

প্রহসনটিতে শিক্ষিতা মহিলাদের উগ্র স্বাধীনতা ব্যতীত অপর যে বিষয়টি সমালোচিত হয়েছে, তা হল বৈষ্ণবের ভেক নেওয়ার প্রথা। বৈষ্ণবী বৈষ্ণবকে জানিয়েছে, '(গৌরাঙ্গের) তাঁর চরণ কৃপায় আমরা বৈধব্য যন্ত্রণা জানিনা'।

নারীর সকল ভাবনা ঘুচেছে,
দুঃখের দিন গেছে।

*　　　*　　　*

গোরা চাঁদের কি খেলা, কলির বৃন্দাবনলীলা,
প্রেমিকের আনন্দ মেলা,
সবার ঘরে ঘরে নিকুঞ্জ বন, ভাইরে,
নাগর চাঁদ প্রেমেতে বাঁধা আছে।

বৈষ্ণবী জাতে কলু। তার বরের মৃত্যু হয় যখন তার বয়স ১৪। মায়ের যুক্তিতে সে গৌরাঙ্গের পথে এসে দাঁড়ায়। এক ধোপা ধুমধামের সঙ্গে ভেক নিয়ে মোচ্ছ দেয়। ছ'মাস পরে তার অর্থ নিঃশেষিত হওয়ায় সে আত্মহত্যা করে। তখন মন্ত্র পড়ে বৈষ্ণবী এক চন্ডালকে ভেক নেওয়ায়। কিন্তু ঘটি চুরির অপরাধে তার জেল হলে এক কাওরাকে সে ভেক নেওয়ায়। সেও জুতো চুরি করে ধরা পড়ে। বৈষ্ণবও জানিয়েছে সে নোট জাল করার অপরাধে দশ

বছরের জন্য জেল খাটতে যায়। কিন্তু তিন মাসের মাথায় জেল থেকে বেরিয়ে এসে বৈষ্ণবের ভেক নেয়।

বৈষ্ণবী জাতিভেদ প্রথার বিরোধী, 'জাতি ভেদ থাকলে কি আর পাঁচসিকায় বৈষ্ণবী লাভ হয় ? যে দেশের জাতি বিচার নাই, তারাই মহৎ কার্য করে, তারাই জগতে মান্য গণ্য শ্রেষ্ঠ, অসন, বসন, শয়ন যাদের সকলেরই এক, তারাই প্রধান। জাতি বিচার তো মানুষের করা, গৌরাঙ্গ সবজীবে সমভাবে দয়াবান, সকল জাতিতে তার সমান প্রেম বিতরণ…।'

চৈতন্যদেবের ধর্ম নিয়ে সে সময়ে বাংলাদেশে যে চূড়ান্ত চারিত্রিক শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল, নেড়া নেড়ীদেব নক্কারজনক কান্ড সমাজকে কলুষিত করে তুলেছিল তারই পরিচয় প্রহসনটিতে বিধৃত। এমন কি বৈষ্ণবীকে দেখা গেছে বোম্বাই বাসী শোভাজীর এক কথাতেই তার হোটেলের উদ্দেশে যাত্রা করতে।

নিমন্ত্রণ বাড়ী প্রত্যাগত মাতাল নকুলেশ্বরের পুলিশের সঙ্গে বিচিত্র হিন্দী কথন হাস্যরস সৃষ্টি করেছে, 'গিয়াথা বাবা হাম সাধি বাড়ীমে। ঐ যে সিদ্ধেশ্বর বাঁড়ুজ্যে, ওস্‌কা লেড়কা গোপাল, ঐ গোপালকা সাধি হ্যায় ঐ চাটুজ্যে বাড়ী, যাঁহা উলু উলু হোতা হ্যায়'।

ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত '**আক্কেল-সেলামী**' প্রহসনটির প্রকাশকাল ১৩০৭। প্রস্তাবনা দিয়ে প্রহসনটির সূত্রপাত। প্রহসনের মুখ্য চরিত্রটি হল মিঃ বসুর। বিলেত থেকে সদ্য ব্যারিষ্টারী পাশ করে ফিরেছে। একদিকে তাই তার মুখে বিকৃত বাংলা অপরদিকে তার পূর্বের বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি তীব্র অনীহা, মেম সাহেবকে বিয়ে করে উপস্থিত হয়েছে সে। মিঃ বসু সেকালের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণকারীদের প্রতিনিধি। তার কাছে এ দেশ হল নেটিভ, বাবা হল 'old man', নিজেকে সে 'European' ভাবে, এমনকি এদেশের দেবতা নিয়েও তার পরিহাস। মাকে সম্বোধন করেছে 'good old lady' বলে। মাকে প্রণামের পরিবর্তে সে হ্যান্ড শেক করেছে। ভগ্নী প্রমদাকে বলেছে, 'kiss me, kiss your beloved brother,, and allow me to kiss your sweet face.' প্রমদাকে চুম্বনে প্রসন্ন অসন্তোষ প্রকাশ করলে মিঃ বসু বলেছে, 'টুমি এমন কঠা বলিটেছেন কেন ? হামাডের বিলাটে sister-কে kiss করিলে ট কোনও ডোষ ডেকা যায় না ; টোমাডের dam native system হামি মানে না'।

তার পূর্ব পরিণীতা স্ত্রী বিমলাকে ত্যাগ করার কারণ ব্যাখ্যা করে জানিয়েছে, 'হামি এখন enlightened হইয়াছে, টুমি native, টোমার সাঠে হামার মিল হইটে পারে না। এখন হামার ওয়াইফ মিসেস এলেন বাসু'।

বাবাকে মিঃ বসু জানিয়েছে তার পক্ষে তাদের সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়, কেননা সে এখন 'respectable gentleman', একসঙ্গে থাকলে তার খাতির হবে না। কিন্তু এহেন মিঃ বসু ব্যারিষ্টারিতে তেমন পসার করতে না পারায় তার বিদেশী পত্নী তাকে ত্যাগ করে চলে যাবার কথা বলেছে। কেননা, এলেন

বাসুর ভাষায় 'It is an insult to me and to my nationality to insinuate that I ever loved you. I did for a long time take a fancy to you, but it was not so much for your ownself as for your money, which now your have none. So I want to separate as soon as possible.'

মিঃ বসুর জ্ঞান চক্ষু খুলেছে, কোর্ট প্যাণ্ট ছেড়ে ধুতি-চাদর পরেছে, বিমলার কাছে ফিরে গিয়ে সে ক্ষমা চেয়েছে, আক্কেল সেলামী দিয়ে তবেই তার চেতনা ফিরেছে। নাট্যকার ইংরেজ-প্রিয় ও ইংরেজদের অনুকরণকারী মিঃ বসুকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

কাক হয়ে চাও কোকিল হতে,
সইবে কেন তোমার ধাতে,
মিছে কেবল রীতের দোষে পেলে বেদনা।
ফুলের মতন দেখে বদন, অমনি তারে কর যতন,
জানত শিমুল ফুলের নাইক কিছু রূপটি বিনা॥

স্পষ্টতঃই ইংরেজদের নকলনবিসদের সাবধান করে দিতেই প্রহসনটি রচিত।

গুলিখোরদের চরিত্র চিত্রণে নাট্যকার মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। ২য় গুলিখোরের প্রতি কথার শেষে 'কেমন কিনা', ১ম গুলিখোরের প্রতি কথায় 'বুঝেছ' বলা, রামকমলের মুদ্রাদোষ 'ওর নাম কি' হাস্যরসের উদ্রেককারী। গুলিখোরদের দেখিয়ে শিবনাথ ও সিদ্ধেশ্বরের দড়ি পাকানোর অভিনয়, গুলিখোরদের অনুরোধে কাল্পনিক দড়িটি নিচুতে ধরা, তারপর তাদের ডিঙোবার সময় উঁচু করে ধরার ভঙ্গী করলে গুলিখোরদের পতনের বর্ণনাটি উপভোগ্য।

কেদারনাথ দাস রচিত **'আমারই'** প্রহসনটির প্রকাশকাল ১৩০৮। প্রথমে প্রহসনটির নাম ছিল 'মাইরি'। পরে কলকাতার পুলিশ কমিশনারের অনুমতি নিয়ে প্রহসনটির নাম পরিবর্তিত করা হয়। প্রহসনটি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। এ'টি অষ্টম চিত্র সম্বলিত। 'প্রস্তাবনা' দিয়ে প্রহসনটির শুরু। প্রস্তাবনা থেকেই বোঝা যায় যে নাট্যকার তথাকথিত দেশপ্রেমিকদের স্বরূপ উদ্ঘাটনে এবং বারবিলাসিনীদের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপনের তাদিগে প্রহসনটি রচনা করেছেন। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে—

হোঃ হোঃ হোঃ ডিফাই করি সেই নিগার।
মুখে মধু প্রাণ বঁধু ছবিখানি ছলনার॥
দেখতে বাবু প্যাট্রিয়ট, চলন ধরণ গ্যাট্ গট্,
ট্যাঁকটি কিন্তু গড়ের মাঠ, মালসাট অনিবার॥
দেশোদ্ধারে বলি হারি, কথায় কেবল জারিজুরি,
ধন্য এদের কারিকুরি কারসাজির কি বাহার॥

এরা সব বড়ই চতুর, ছবি এদের বড়ই মধুর,
দেখাব এই নব-যুগে নবীন বাবু অবতার ॥

দেশোদ্ধারে ব্রতী নব-যুগের নবীন অবতার রূপে চিত্রিত হয়েছে সচল চাঁদ। তার কাজ অন্যের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎ, দেশোদ্ধারের জন্য সভার আয়োজন সংবাদ পত্রের প্রকাশ ইত্যাদি। মুখে তার ইংরেজি-বাংলা মেশানো কথা। সচল চাঁদ বেশ্যালয়ে যায়, তাছাড়া তার মদ্যপানের ব্যাপার ত আছেই। একাদশীর পরদিন তার মা চালতা সুন্দরী তার কাছে বাতাসা কেনার জন্য দুটি পয়সা চাইলে সচলচাঁদ বলেছে, 'দেখ ওল্ড লেডী! তুমি যদি আমার পেপারের কিছু সাবস্‌ক্রাইবার করে দিতে পার, তাহলে তোমার রিফ্রেসমেণ্টের জন্যে থ্রি পাইস দ্যাট ইজ্‌ ওয়ান্‌ পাইস স্যাংসান কত্তে পারি—আদারওয়াইজ্‌ নট্‌ এ কৌড়ি।'

যে স্ত্রী কালিন্দীকে সে মাথায় তুলেছিল এবং মাকে হতচ্ছেদ্দা করেছিল শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সেই কালিন্দী অনায়াসে সচলচাঁদকে ত্যাগ করে চলে গেছে; অপর পক্ষে তার মা লাঠি হাতে ভিক্ষে করে ছেলেকে খাইয়েছে। উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রীকে নিয়ে মাথায় তুললে যে তার পরিণাম ভাল হয় না, মা'র মতন যে সন্তানের হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ হয় না, এই সত্য নাট্যকার প্রকাশ করেছেন। সচলচাঁদের ভুল ভেঙেছে শেষ পর্যন্ত।

কালিন্দী সচলচাঁদের স্ত্রী, কথায় সে স্বামীকে ছাড়িয়ে গেছে। স্বামীকে সে সম্বোধন করে 'মাই ডিয়ার' বলে। নিজেকে সে অভিহিত করে 'Lady of the Lake' বলে। সকালে সে চায়ের সঙ্গে ব্রাণ্ডি খায়—Not only tea dear, tea with three ounces of Vinum-Gallici।

অধরচাঁদ বেশ্যাসক্ত। মদ্যপ তো বটেই। যে আবিরাকে হাত করতে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করেছে, সেই আবিরা দশ হাজার টাকার লোভে অধরের দাদার কাছে চলে গেছিল। শেষে দশটি কড়ি পর্যন্ত আদায় করতে না পেরে পুনরায় ফিরে এসেছে অধরের কাছে, আর জানিয়েছে সে অধরেরই।

বৈকুণ্ঠনাথ বসু রচিত **'ঘোর বিকার'** বা (Histronies in Hysteries) প্রহসনটির প্রকাশ কাল ১৩০৯। এটি ক্লাসিক রঙ্গ মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। এই ব্যঙ্গনাট্যের মূল চরিত্রের সংখ্যা সাত। তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা চার এবং স্ত্রী-চরিত্রের সংখ্যা তিন। এছাড়া চুড়িওয়ালী, গোয়ালিনী ইত্যাদি কয়েকটি অপ্রধান চরিত্রও আছে। প্রহসনটির বিষয় বস্তু হ'ল হরিশ নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা রাসমণি নাটক নভেল পড়ে এবং অভিনয় দেখে নিজেকে নায়িকা রূপে কল্পনা করে বসে। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তার নায়িকা সুলভ আচরণে যে বিপত্তির উৎপত্তি শেষ পর্যন্ত তার স্বামী পাঁচকড়ির বন্ধু রমেন্দ্রমোহনের প্রয়াসে রাসমণির পুনরায় বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তন এবং তাকে নিয়ে উদ্ভূত সমস্যার অবসান। নাট্যকার এই প্রহসনের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন, 'নভেল পড়া কি থিয়েটার দেখায় কোন দোষ নাই, কিন্তু অসার কিম্বা কুরুচিপূর্ণ পুস্তক পাঠে অনিষ্ট অনেক।'

রাসমণি এবং মোশান মাস্টাররূপী (Motion-master) রমেন্দ্রমোহনের চরিত্র চিত্রণে নাট্যকার প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তবে ভৃত্য দিগম্বরের চরিত্র চিত্রণে কিঞ্চিৎ আতিশয্য দোষ ঘটেছে। দিগম্বর বিশেষত রাসমণির মুখে বিভিন্ন নাটকের জনপ্রিয় সঙ্গীতের পংক্তি বিশেষকে সংলাপ রূপে ব্যবহারের দ্বারা নাট্যকার বাস্তবিক চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিরচিত চারটি সঙ্গীত প্রহসনটির আকর্ষণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। সঙ্গীতগুলি যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দৃশ্যের পর ক্রোড় দৃশ্যে সংযোজিত হয়েছে। সর্বমোট দশটি দৃশ্যে প্রহসনটি সমাপ্ত। নাট্যকার প্রহসনটির নামকরণের ক্ষেত্রে অস্থির চিত্ততার পরিচয় দিয়েছেন। নামপত্রে 'ঘোর বিকার' বলে মুদ্রিত হলেও অন্যত্র সবক্ষেত্রেই 'নাট্য-বিকার' নামটি মুদ্রিত হয়েছে। বলাবাহুল্য বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে শেষোক্ত নামটি তাৎপর্য মণ্ডিত হয়েছে।

'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ বা হরিনামের মাহাত্ম্য' নাটকটির রচয়িতা পাতুল নিবাসী নাট্যবিনোদ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল। নাটকটির প্রকাশকাল ১৯০২ খ্রীস্টাব্দ। নাটকটি পাঁচকড়ি দে'কে উৎসর্গ করা হয়েছে। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকটির শুরু প্রস্তাবনা দিয়ে। প্রস্তাবনায় সংশয়াচ্ছন্ন নারদকে বিষ্ণু স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে জানিয়েছেন, 'নামে মহামোক্ষ মিলে নাম মুক্তির নিদান।' আলোচ্য নাটকটিকে নাট্যকার নারায়ণের উক্তির যাথার্থ্য পরীক্ষার জন্য নারদের প্রয়াসরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

নাটকের মুখ্য আকর্ষণ অজামিল। পিতৃ-মাতৃভক্ত কর্তব্য পরায়ণ এবং অনাড়ম্বর জীবনের পূজারী অজামিল নারদের কৌশলে মহাপাপী দুরাচারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। নাটকে তার এই পরিবর্তনটাই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। নারদের চক্রান্তের শরিক হয়েছেন দেবরাজ ইন্দ্র। মুখ্যতঃ নারদের পরামর্শমতই ইন্দ্রকে অজামিলের অধঃপতনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা গেছে।

নারদ ইন্দ্রকে জানিয়েছেন কান্যকুব্জের সিদ্ধারণ্যস্থিত সিদ্ধদম্পতি অলোক-অলোকার সপ্তদিবস ব্যাপী হরি আরাধনায় নিযুক্ত থেকে পুত্র অজামিলকে বর দানের প্রস্তুতির কথা। ইন্দ্র ভীত হয়েছেন, কেননা অজামিল যদি ইন্দ্রত্ব প্রার্থনা করে বসে, তবে তাঁর স্বার্থ হানি ঘটার সম্ভাবনা।

ইন্দ্র অজামিলকে বজ্রাঘাত করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁর হাত কিছুদূর উঠে অবশ হয়ে গেছে। এরপর ব্যাঘ্ররূপী ইন্দ্র আশ্রম মৃগটিকে আক্রমণ করলে অজামিল তাকে বাঁচাতে গেছে। ইন্দ্র নারদের পরামর্শে অজামিলের দৈহিক কোন ক্ষতি না করে তার মন থেকে পিতৃ-মাতৃভক্তি দূর করতে অপ্সরাদের নির্দ্দেশ দিয়েছেন, যাতে অলোক-অলোকা অজামিলের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে ইন্দ্রত্ব লাভের বর দান না করেন। সেইমত অপ্সরাগণ প্রলুব্ধ করতে

চেষ্টা করেছে অজামিলকে পরিবর্তিত করতে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে অজামিলের অদ্বিতীয় চারিত্রিক বলের কাছে।

মোহ, লোভ, মদিরা প্রভৃতিদের চক্রান্তে অজামিল শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বাধ্য হয়ে মদ্যপান করেছে এবং মদনের প্রভাবে অনুরাগ রূপিনী মেনকার প্রতি আসক্ত হয়েছে।

বয়স্য লম্বোদর, পুণ্ডরীক কিংবা সুদামা প্রভৃতিরা অজামিলকে ইন্দ্রত্ব, রাজ্য প্রভৃতি প্রার্থনা করতে বললে যে অজামিল বলেছিল—

'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাজ্য বা ইন্দ্রত্ব নিয়ে কি করব।' যে অজামিল জানিয়েছিল, 'সিদ্ধারণ্যের এই জীর্ণ কুটীরই আমার রাজত্ব। অন্ধ মাতা পিতার সেবাতেই আমার ইন্দ্রত্ব-সুখ। কাজ কি আমার রাজ্যে, কাজ কি আমার ইন্দ্রত্বে।'

—সেই অজামিলকেই দেখা গেল মাতা-পিতাকে বিস্মৃত হয়ে মেনকার মোহান্ধে পড়েছে সে এবং পরিণত হয়েছে দস্যুতে। একটি ক্ষুদ্র রূপার আংটির জন্য সে অনায়াসে ব্রহ্ম হত্যা করেছে। সামান্য কয়েকটি মাদুলির জন্য সে একটি পাঁচ বছরের শিশুকে বৃক্ষে আছড়ে মেরেছে। নারায়ণের পৈতার জন্য অনায়াসে দুটি স্ত্রীলোককে হত্যা করেছে। শেষে পুরঞ্জন নামে এক পিতৃদায়-গ্রস্ত ব্রাহ্মণ কুমারের সান্নিধ্যে অজামিলের মনে পড়েছে অন্ধ পিতা-মাতার কথা। উপলব্ধি করেছে অনুরাগের মোহান্ধতাকে। অনুতপ্ত হয়েছে সে নিজের আচরণে। নরক দর্শনে সে শিহরিত হয়েছে। শেষে মৃত্যু ঘটেছে তার। অজামিলের পরিবর্তনের ব্যাপারটি নারদের এবং ইন্দ্রের চক্রান্তে ঘটায় এবং চক্রান্তের পরিকল্পনাটি পূর্বেই প্রকাশ হয়ে পড়ায় নাটকীয় কৌতূহল অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। অজামিলের যেন কোন দায়ই থাকে না তার অধঃ-পতনে। অজামিল তার পিতৃ-মাতৃভক্তির যে কারণ বিবৃত করেছে, তা যেমন যুক্তিপূর্ণ তেমনই তার পিতৃ-মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা রূপে গৃহীত হবার যোগ্য। সে বলেছে, 'তিনি (ঈশ্বর) সাকার কি নিরাকার তার স্থিরতা নাই। যদি তিনি সাকার হন, তাহলে বল দেখি, নিরাকারের সেবা করি কিরূপে? যদি তিনি সাকার হন, তা হলেও তাঁর রূপের স্থিরতা নাই কারণ তিনি বহুরূপী। সুতরাং বহুরূপের উপাসনা করি কি রূপে?… কিন্তু দেখ, আমার মাতাপিতা সাক্ষাৎ এমন প্রত্যক্ষ দেবতা ছেড়ে নিরাকারের সেবা করতে যাব কেন?'

অজামিলের পত্নী রেণুকাকে সতী সাধ্বী রমণী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। স্বামী পরিত্যক্তা হয়েও সে কিন্তু স্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেনি। বরং পতির পাপ স্খালনের পথ করে দিয়েছে সে। নারায়ণের কাছে সে বর প্রার্থনা করেছে, পতির বামে উপবিষ্টা থেকে সে যেন বৈকুণ্ঠে নারায়ণ-লক্ষ্মীর যুগল মূর্তি দর্শন করার সুযোগ পায়।

প্রমোদার প্রেমে অন্ধ কান্যকুব্জাধিপতির রাজকর্তব্যে অবহেলা এবং অবশেষে অজামিলের অনুচরদের হাতে কুশীর মৃত্যু ঘটলে কুশীর পিতার মৃত সন্তানের

দেহ নিয়ে উপস্থিত হয়ে কান্যকুব্জাধিপতিকে তীব্র ভৎসনা, এতে তাঁর কর্তব্য বোধের উন্মেষ কিছুটা নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছে।

অজামিল কান্যকুব্জাধিপতিকে তার তুলনায় যে তিনি নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছে, প্রকারান্তরে তা কর্তব্য বিচ্যুত অত্যাচারী রাজশক্তির সমালোচনায় পর্যবসিত হয়েছে। অজামিল বলেছে, 'আমি অর্থলোভে কয়েকটা প্রজার প্রাণবধ করি, তুমি রাজ্যলোভে অসংখ্য প্রাণীর প্রাণবধ কর। আমি দু'চারজন পথিকের সর্বনাশ করি, তুমি কত কত ভূপতির সর্বনাশ কর। আমি দু'চারজন অনুচরদের নিয়ে কয়েকখানা গৃহস্থের গৃহ নষ্ট করি, তুমি অসংখ্য সৈন্য নিয়ে কত কত সমৃদ্ধিশালী রাজ্য নষ্ট কর। তবে বল দেখি আমি যদি দস্যু হই, তাহলে তুমি কি সাধু?' (৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

রাজার পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে রাজবাড়ীতে গমনরত ব্রাহ্মণরা বন অতিক্রম কালে শ্মশান ভূমি দেখে দেহ বন্ধন করে নিয়েছেন—

গা বন্ধন পা বন্ধন আর বন্ধন মুড়ী
ষোল শাঁখ চূর্ণী বন্ধন দিয়ে লোহার বেড়ী ॥
ভূত মোর পুত, পেত্নী মোর ঝি।
ব্রহ্মদৈত্তি বড় কুটুম করবে সে মোর কি ॥

আসলে সমসাময়িক কালের সংস্কারের প্রতিফলন।

মৃত অজামিলকে নিয়ে যম ও বিষ্ণুর বিরোধ এবং মহাদেবের হস্তক্ষেপে বিরোধের অবসানে কিছুটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। নাটকের শেষে সংযোজিত ক্রোড়াঙ্কে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল মূর্তির একপাশে অলোক অলোকা এবং অপর পাশে অজামিল ও রেণুকাকে স্থাপন করে নাট্যকার প্রচার ধর্মিতাকে শিল্পগুণের তুলনায় অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন।

'অর্জুনবিজয়' পৌরাণিক নাটকটির রচয়িতা কালীকিঙ্কর যশ। নাটকটির প্রকাশকাল ১৯০২। সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে। নাটকটি ষষ্ঠাঙ্ক বিশিষ্ট।

পুত্রশোকে আকুলা জাহ্নবী অভিশাপ দিয়েছিলেন অর্জুনের জীবনাবসান হবে তার পুত্রের শরে। সত্য সত্যই চিত্রাঙ্গদা পুত্র বভ্রুবাহনের হাতে অর্জুন কিভাবে মৃত্যু বরণ করলেন নাটকে তাই প্রদর্শিত হয়েছে। তবে নাটকটির মুখ্য আকর্ষণ প্রধান চরিত্র বভ্রুবাহন। বভ্রুবাহনের আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল যেহেতু সে অর্জুন পুত্র। তাই তার অনুচরেরা যুধিষ্ঠির আয়োজিত অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরে তাকে সংবাদ দিলে বভ্রুবাহন খুব খুশী হয়েছে কেননা এই সূত্রে তার বহু অভিলষিত পিতা অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে। জননী চিত্রাঙ্গদা তাকে পরামর্শ দিয়েছেন—

বিবিধ সাজনে সাজিয়া কুমার,
সঙ্গে লয়ে মিষ্টভাষী পাত্র মিত্রগণ,

সঙ্গে লয়ে যজ্ঞ তুরঙ্গম
অগ্রসর হও মুখে পিতৃ সম্ভাষণে।

কিন্তু বভ্রুবাহন এই প্রস্তাবে সম্মত নয়। কেননা—

হেন হীন কার্য কভু কি অর্জুন নন্দনে সাজে?
বীর মাতা তুমি, বীর পুত্র আমি
বীর কার্যে সন্তোষিব বীরেন্দ্র অর্জুনে।

বভ্রুবাহনের ভয় মাতার প্রস্তাবমত অশ্ব প্রত্যর্পণ করলে রটবে—

ক্ষত্রিয় কলঙ্ক এই পাপিষ্ঠ পামর,
ভয়ে আসি পার্থে করে পিতা সম্বোধন।

তাছাড়া যেহেতু অশ্বের ভালে দম্ভভরে লিখিত হয়েছে—

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এই ত্রিভুবন মাঝে
যদি কেহ থাক বীর বীরেন্দ্র নন্দন
অশ্ব ধরি পাণ্ডবে সে চাহিবেক রণ।

অতএব এই পরিপ্রেক্ষিতে বভ্রুবাহনের দৃঢ় সিদ্ধান্ত—

রণ বিনা কভু নাহি দিব যজ্ঞ হয়,

চিত্রাঙ্গদা শেষ অস্ত্র স্বরূপ আত্মহননের ভয় দেখিয়েছেন। মাতৃভক্ত বভ্রুবাহন এবারে পর্যুদস্ত হয়েছে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতৃ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে অর্জুনকে যজ্ঞের অশ্ব প্রত্যর্পণ করতে গেছে। সে অর্জুনকে পিতৃ সম্বোধন করায় অর্জুন দৃঢ়ভাবে তার পিতৃত্ব অস্বীকার করেছে, শুধু তাই নয় তার মাতৃ-চরিত্রেও কলঙ্ক লেপন করেছে, পদাঘাত করেছে বভ্রুবাহনকে—

পিতা তোর শত শত জন
দূর হরে বেশ্যার নন্দন।

অর্জুন বভ্রুবাহনকে আরও আঘাত হেনেছে যখন মন্তব্য করেছে—

প্রাণ ভয়ে নাহি আসে ঘোড়া ফিরে দিতে,
অর্জুন-তনয়

বলা বাহুল্য এই চরম অসম্মানে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তার মধ্যে। অভিমান বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে বভ্রুবাহন গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দিতে গিয়ে গঙ্গার কাছ থেকে লাভ করেছে মহাকালের করস্থিত শূল। গঙ্গা পরামর্শ দিয়েছেন উলপীর পরামর্শমত চলতে, তাহলেই অর্জুনের পতন অবশ্যম্ভাবী। চিত্রাঙ্গদা ক্ষুব্ধ বভ্রুবাহনকে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও বভ্রুবাহন তার সিদ্ধান্তে অটল, সে তার যুক্তিতে স্থির

মাতৃভক্ত বড় এ কিংকর।
তেঁই মাগো
পিতৃহত্যা করিয়াছি পণ।

অর্থাৎ অর্জুন বিরোধিতার মূলে কাজ করেছে অর্জুন কর্তৃক তার মাতৃ নিন্দা। তার ভাষায়—

মাতৃ নিন্দুক
নহে পূজ্য মাতৃভক্ত পাশে।

বভ্রুবাহনের কৃষ্ণভক্তিও তার চরিত্রকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ভক্তিতেই যে ভগবান বশীভূত হন, এই দৃঢ় বিশ্বাস তার।

প্রণতি চন্দন, প্রেম রত্ন ধন,
দাও ঢালি মাধবের পায়,
প্রেমময় হরি রাসবিহারী
প্রেমের ভিখারী হয়ে আপনি দিবেন ধরা।

বভ্রুবাহনের পরই নাটকটির আকর্ষণ দুটি নারী চরিত্র—উলপী ও চিত্রাঙ্গদা। উলপী বভ্রুবাহনের সৎ মা, অপরপক্ষে চিত্রাঙ্গদা বভ্রুবাহনের গর্ভধারিণী। উভয়েই অর্জুন-পত্নী। উভয়েই অর্জুন পরিত্যক্তা। উলপী নাগনন্দিনী তাঁর মধ্যে ক্ষাত্র বীর্যের প্রকাশ ঘটেছে। তিনি চেয়েছেন বভ্রুবাহন যেন অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তিনি এমনকি তাঁর পুত্র ইলাবন্তকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। কেন?

কর্তব্যের হেতু পুত্রে দেছি বিসর্জন
কর্তব্যের হেতু পুনঃ পতিধনে করাব নিধন।

কিন্তু চিত্রাঙ্গদার দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র—

পতি পুত্রের অমঙ্গলে যে কর্তব্য কাজ,
তেমন কর্তব্য শিরে পড়ুক সহস্র বাজ।

অর্জুন-বিদ্বেষী উলপীর একটিই পণ—

পতিহন্ত্রী নাম কিনিব ধরায়
অর্জুন শোনিতে
করাইব স্নান প্রিয় পুত্রবরে।

অপরদিকে চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন অশ্লীল বিশেষণে বিশেষিত করলেও চিত্রাঙ্গদার অর্জুনের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সীমাহীন। অর্জুনের নিন্দা শুনতেও তিনি নারাজ

কেন নিন্দ ধনঞ্জয়ে, গুণী কেবা তাঁর সম?
লোকপূজ্য নরশ্রেষ্ঠ রথী,
দেবপূজ্য কেশব আপনি
বাঁধা যার প্রণয় বন্ধনে।
সাগরের কূল যদি দেখিবারে পাই,
অগণ্য তারকা মালা—
যদি গুণা যায়,
তথাপি পার্থের গুণ শতাংশ করিয়া
এক অংশ তার কে পারে বর্ণিতে?

পুত্রকে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিরত করতে তাকে রাজ্যের তরফে কোন

সহায়তা দেওয়া হবে না বলে চিত্রাঙ্গদা জানিয়েছেন। অপরপক্ষে উলপী স্বয়ং যুদ্ধরত সৈন্যদের উত্তেজিত করেছেন। উলপী এবং চিত্রাঙ্গদার এই আচরণগত বৈপরীত্য নেহাৎই আপাত, প্রকৃতিতে উভয়েই যে এক, উভয়েই অর্জুনের শুভাকাঙ্ক্ষী উলপীর একটি আচরণেই তা প্রমাণিত। অর্জুনের মৃত্যু সম্ভাবনায় কাতর উলপী ধ্যানমগ্না হয়েছেন এবং জননী গঙ্গার নির্দ্দেশমত বভ্রুবাহন নিক্ষিপ্ত ব্রহ্ম অস্ত্রে অর্জুনের মৃত্যুকে প্রতিহত করেছেন এবং গঙ্গা অস্ত্র নিক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছেন, যেহেতু গঙ্গা অস্ত্রে অর্জুনের মৃত্যু হলে তাঁর পুনর্জীবন লাভ আর ঘটবেনা।

নাটকের সূচনায় নাট্যকার যদি উলপীর ধ্যানলব্ধ নির্দেশের উল্লেখ না করতেন, তবে তাঁর অর্জুন বিরোধিতা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হত। কৃষ্ণকেও দেখা গেছে স্বামীর মঙ্গলের জন্য উলপীর ভূমিকা গ্রহণকে প্রশংসা করতে।

কৃষ্ণ যে পান্ডব সখা নন, তিনি ধর্মাচরণকারীর সমর্থনকারী মাত্র, সেই সত্য তাঁর বক্তব্যে পরিস্ফুট।

পান্ডবের সখা বলি যে ভাবে আমারে
মূর্খ নাই তার সম ভুবন ভিতরে।
পান্ডবের কি সখা আমি ?
পান্ডবের যাহা ধর্ম আচরণ,
তারি সখা আমি।
পান্ডবের সখা হলে,
কেন তারা পাইবে দুর্গতি ?

বভ্রুবাহন পত্নী অরুণাকে বভ্রুবাহনের উপযুক্ত স্ত্রী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। সে পাতিব্রত্যে অটল, তাই বলে যুদ্ধে গমনরত পতিকে সে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করেনা কারণ সে ক্ষত্রিয় কন্যা, সে জানে পতির মর্যাদা রক্ষিত হয় যুদ্ধে, বীর্যবত্তায়—

পতি মম কায়া
আর যাহা দেখি সব ছায়া।
... ...
ক্ষত্রিয় বালা কে কোথায়
পতিরে নিবারে রণে ?

যুদ্ধে স্বামীর জয়-পরাজয়কে সে খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের সঙ্গে গ্রহণ করার অভিলাষের কথা জানিয়েছে—যুদ্ধে পতির মৃত্যু হলে সে অগ্নিতে দেহ বিসর্জন দেবার সংকল্প করেছে। অপর পক্ষে পতি বিজয়ী হলে—

আনিয়া মন্দিরে পূজিব চরণ,
দিব পবিত্র প্রণয় পুষ্পের হার উপহার গলে।

স্বামীকে সে রণসজ্জায় সজ্জিত করার অভিলাষও জানিয়েছে। এমনকি সে যুদ্ধরত পতির সারথি হবার ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছে—

আমি চালাইব রথ, কি চিন্তা কি ভয় ?
তুমি রথী
সারথী হে আমি।

'অহল্যা-উদ্ধার বা হরধনুভঙ্গ' গীতাভিনয় কালীকিঙ্কর যশ প্রণীত। নাটকটি 'সমুন্নত-সাহিত্য প্রকাশ কার্যালয়' থেকে প্রকাশিত। প্রকাশকাল ১৯০২। আলোচ্য নাটকে বর্ণিত দুটি মুখ্য ঘটনা অবলম্বনেই নাটকের নামকরণ করা হয়েছে, তবে উল্লেখযোগ্য যে বর্ণিত ঘটনা দুটিতেই নাটকটি শেষ হয়নি।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে তাঁর তপোবনে নিয়ে যেতে এসেছেন, উদ্দেশ্য রামচন্দ্রের সহায়তায় নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করা। দশরথ ও কৌশল্যা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে বিশ্বামিত্রের অনুরোধে সম্মত হয়েছেন। লক্ষ্মণ স্বেচ্ছায় রামচন্দ্রের অনুগামী হয়েছেন। যাত্রার প্রাক্কালে অপত্য স্নেহে অন্ধ কৌশল্যা কর্তৃক রামচন্দ্রের রক্ষা-বন্ধন কৌতূহলের উদ্রেক করে—

রক্ষ রক্ষ রক্ষা কালী তুমি রণে বনে।
বিরূপাক্ষ রক্ষা করো মস্তক যতনে ॥
বক্ষস্থল রক্ষা করো সৃষ্টির ঈশ্বর।
বাম-ভাগ রক্ষা করো তুমি পুরন্দর ॥

২য় অঙ্কে রামচন্দ্রের প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লক্ষ্মণের পাদপূরণ বেশ উপভোগ্য হয়েছে—

রাম—হের ভাই রঙ্গে কিবা তরঙ্গ খেলায়।
লক্ষ্মণ—রাম দেক্তে রাম ভক্ত যেন নিচে যায় ॥
রাম—মরি মরি চমৎকার কিবা তৃণগুলি।
লক্ষ্মণ—রামে দেখায় রূপ আনন্দে উথলি ॥
রাম—নবলতা উঠে কিবা তরুবর পেয়ে।
লক্ষ্মণ—জ্ঞানবৃক্ষে উঠে যেন রাম-তত্ত্ব পেয়ে।
রাম—কি সুন্দর পক্ষিগণ করিতেছে গান।
লক্ষ্মণ—রাম গুণগানে সব মাতায়েছে প্রাণ ॥

মারীচ, সুবাহু ও তাড়কার পদ্য ছন্দে কথোপকথনটিও বেশ উপভোগ্য হয়েছে। ক্ষুধা নিবৃত্তি নিয়ে তাদের কথোপকথন।

রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে নৌকা মনুষ্যরূপ প্রাপ্ত হবে 'এই ভয়ে নাবিক—নাবিক পত্নীর ভীত হওয়ার বিবরণ চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে। বেশ কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ নাটকটিতে ঘটেছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে ধ্যানে বিশ্বামিত্রের প্রজাপতি কৃশাশ্বের মানসপ্রসূত বাণসমূহের আনয়ন, তাড়কার যুগলমূর্তি দর্শন, শ্রীরামচন্দ্রের অহল্যা উদ্ধার। মূলতঃ গদ্য সংলাপে রচিত হলেও মাঝে মাঝে পদ্য সংলাপও ব্যবহৃত হয়েছে নাটকটিতে। সমগ্র নাটকটি তিনটি অঙ্কে বিভক্ত।

মহেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত **'শুকদেব'** নাটকটির রচনাকাল ১৩১০। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট এ'টি একটি পৌরাণিক নাটক। নাটকটি সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু। প্রতিটি অঙ্কের প্রথমেই S. T. Coleridge, Wordsworth, P. B. Shelley প্রমুখ ইংলন্ডের কবিদের বিখ্যাত কাব্য-পংক্তির উদ্ধৃতি লক্ষণীয়। নাট্যকার নাটকে চরিত্র চিত্রণ অপেক্ষা বিশেষ একটি বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারেই উৎসাহী ছিলেন—সেই বক্তব্য হ'ল প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়ে নিবৃত্তি মার্গের সাধনা ব্যর্থ। মহাত্মা শুকদেব নিবৃত্তি মার্গের পথিক ছিলেন। কৌশলে কিভাবে তাঁকে প্রবৃত্তি মার্গের পথিক করা হল নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্য হল তাই। শুকদেবের চরিত্রটি তেমন পরিস্ফুট হয় নি। কিন্তু রাজর্ষি জনকের বিদূষক চরিত্রটি চিত্রণে নাট্যকারের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্ষেত্রবিশেষে নাট্যকার অলৌকিকতার বিবরণ দিয়েছেন। নাটকটি সঙ্গীত বহুল। তাছাড়া পয়ার ও ত্রিপদীতে রচিত বেশ কয়েকটি কবিতারও সংযোজন ঘটেছে নাটকটিতে।

ভক্তি ও আদি রসের মধ্যেকার পদ্য ছন্দে রচিত কথোপকথনে কিংবা রম্ভার ও শুকদেবের ত্রিপদীতে রচিত সঙ্গীতে নাট্যকার মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত শুকদেব রম্ভার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, নিবৃত্তি মার্গ ত্যাগ করে তিনি প্রবৃত্তির শিকার হয়েছেন। কিন্তু নাট্যকার কৌশলে এর উল্লেখ করেছেন, বিস্তারিত বিবরণ দানে বিরত থেকে তাঁর সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। সীমিত পরিসরে হলেও সমসাময়িক সমাজজীবনের আংশিক প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন নাটকে লক্ষিত হয়। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে নাবিক ও নাবিকপত্নীর কথোপকথনে তাদের দারিদ্র্য বিড়ম্বিত জীবনের করুণ চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। নাবিক পত্নী এই বলে দুঃখ করেছেঃ 'দুচার কাহন কড়ি মাসে, তিনটে পেট কি চলে?' (পৃঃ ১১৬); কিংবা উভয়ে মিলে যে গান গেয়েছে, তাতেও তাদের বিড়ম্বিত জীবনের প্রতিফলন ঘটেছেঃ

> নদীর জল সব শুকিয়ে গেলে, পার হবে কে আর?
> পেটের জ্বালায় মরবো ঘুরে, থাকবো পড়ে বহুৎ দূরে.
> কাঁদবে না ক শ্যাল, কুকুরে, দেখলে মোদের বইতে দুঃখের ভার,
> (পৃঃ ১১৭)

সংলাপ রচনায় নাট্যকার দক্ষতা দেখিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারণ অনুযায়ী পদের বানান করা হয়েছে।

মহাতাপচন্দ্র ঘোষ প্রণীত **'দেলজান'** নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে।

নাট্যকার তাঁর 'পিতৃ-তুল্য গুরু' বঙ্গনাট্য রত্নাকর গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নাটকটি রচনা করেছেন আর উৎসর্গ করেছেন রাজশাহীর অন্তর্গত তালন্দের জমিদার ললিতমোহন মৈত্রকে।

'দেলজান' পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট। চতুর্থ অঙ্ক ব্যতিরেকে প্রতিটি অঙ্ক সাতটি করে দৃশ্যে বিভক্ত। মূলতঃ গদ্য সংলাপে আদ্যন্ত নাটকটি রচিত। তবে ক্ষেত্র বিশেষে পদ্য সংলাপের ব্যবহার লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য গৈরিশছন্দে পদ্য সংলাপ রচিত। মোট পনেরটি সঙ্গীত নাটকটিতে স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি গান হিন্দীতে রচিত। তবে বৈশিষ্ট্য হল কোন সঙ্গীতই দীর্ঘ নয়।

'দেলজান' নাটকটিকে নাট্যকার 'অত্যাশ্চর্য রহস্যপূর্ণ' নাটক বলে অভিহিত করেছেন। বলাবাহুল্য এই বিশেষণ ব্যবহারে আতিশয্য আছে। তবে নাটকের কাহিনী রচনায় লেখক কিঞ্চিৎ অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

'দেলজান' আসলে ট্রাজেডি। ঘটনাস্থল সুদূর পারস্য। পারস্যের সম্রাট খসরুশাকে তাঁর প্রধান উজীর আজেদ্ বক্ত গণনা করে জানান যে সম্রাটের একমাত্র কন্যার এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু ঘটবে, বিদেশী বণিকের প্রতি আসক্ত হয়ে তিনি আত্ম হননের পথ নেবেন। আর সম্রাট যাঁকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করতে চান তাঁর সেই ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদের সঙ্গে উজীর কন্যা ফুলজানের বিবাহ হবে। সম্রাট এই গণনায় অবিশ্বাসী হন। আজেদ্‌বক্তকে অন্তরীণ করেন কারাগারে। একমাত্র কন্যা দেলজানকেও অন্তরীণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আজেদ্‌বক্তের গণনাই সত্যে পরিণত হয়। একদিকে মহম্মদ এবং দেলজান পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। অপরদিকে মহম্মদের ছদ্মবেশী বন্ধু স্বাদেক খাঁ পারস্যের সম্রাটের বিরুদ্ধে সংবাদ সংগ্রহ উপলক্ষ্যে এসে বাদশাজাদী দেলজানকে দেখে তার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। বলপূর্বক দেলজানকে অপহরণ করতে গেলে দেলজান আত্মহননের প্রয়াস করে। মৃতজ্ঞানে তাকে স্বাদেক সিন্দুকে করে ফেলে পালিয়ে যায়। তুরস্ক দেশীয় সদাগর রহমন খাঁর আন্তরিক প্রযত্নে দেলজান নিরাময় হয়ে ওঠে। কিন্তু রহমন রাজদুহিতার প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহননের পথ নেয়। প্রথমে কুলমর্যাদা রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেলজান রহমনের প্রেমকে অস্বীকার করলেও শেষে তারই কারণে সেও মৃত্যু-বরণ করে।

দেলজান নাটকের নায়িকা। তারই নামে নাটকের নামকরণ। প্রথমে তাকে পুরুষ বিদ্বেষী রূপে চিত্রিত করা হলেও শেষ পর্যন্ত তার সেই বিদ্বেষ অন্তর্হিত হয়েছে। দেলজান পিতৃভক্ত, কুলমর্যাদা সম্পর্কেও সচেতন। এই কারণেই প্রথমে বিদেশী বণিকের প্রেমকে স্বীকৃতিদানে তার অসম্মতি ছিল। দেলজানের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ও নাটকে প্রকাশিত। প্রধানতঃ তারই অবলম্বিত কৌশলে বিদেশী গুপ্তচর স্বাদেক খাঁ মৃত্যুবরণ করেছে। দেলজানের কৃতজ্ঞতা বোধেরও অভাব ছিল না।

রহমনকে ব্যর্থ প্রেমে উন্মত্তবৎ আচরণ করতে দেখা গেছে। এমনকি সে দেলজানের শেষ সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ হয়ে স্বহস্তে কবর খনন করে তার মধ্যে প্রবেশ করেছে।

মহম্মদ শা'কে আপাতভাবে রমণী ও বিলাস প্রিয় রূপে উপস্থাপিত করা হলেও প্রকৃত পক্ষে বিলাসের মধ্যে থেকে তাকে কঠিন সংযমের শিক্ষা নিতে দেখা

গেছে। ফুলজানকে ব্যক্তিত্বময়ী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। দীর্ঘ এক বৎসর না হওয়া পর্যন্ত সে পিতার নির্দেশমত রাজকুমার মহম্মদের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে নি। বাদশাহ খসরুশাকে অপত্যস্নেহে অন্ধ করে চিত্রিত করলেও তাঁকে কর্তব্য পরায়ণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রূপে দেখা গেছে। তবে তিনি বড় বেশি সন্দিগ্ধ পরায়ণ। তাই নিজের প্রধান মন্ত্রীকেও বন্দী করতে তাঁর বাধেনি, ওমরাহদেরও তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখেছেন। মহম্মদ যদিও তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করে তাঁর বিরাগ ভাজন হয়েছে, তথাপি বাদশাহ তাঁর কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হন নি পারস্যের ভাবী সম্রাট রূপে মহম্মদকেই নির্দিষ্ট করেছেন।

নাট্যকার সংলাপের ভাষাকে অনাবশ্যক ভাবে অলংকৃত করেন নি। তবে দেলজান ও রহমনের মৃত্যুর পর প্রেম রাজ্যে তাদের আলিঙ্গনাবদ্ধ রূপে উপস্থাপিত করে এবং পরীদের দ্বারা গীত প্রেম গীতের সংযোজনায় নাট্যকার বাংলা নাটকের বৈশিষ্ট্য 'মেলটা'র প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন। বলাবাহুল্য ট্রাজেডিকে এই ভাবে তিনি কৃত্রিম উপায়ে মিলনান্ত করে নাট্যরীতিকে ক্ষুণ্ণ করেছেন।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায় রচিত '**কন্যাদায়**' নাটকটির প্রকাশকাল যদিও ১৩১০ বঙ্গাব্দ, কিন্তু প্রকাশকালের অন্ততঃপক্ষে ১৭।১৮ বৎসর পূর্বেই নাটকটি রচিত হয়েছিল। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার তাঁর নাটকটি রচনার উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেছেন—

'বিবাহে বরপক্ষীয়দিগের অর্থলাভেচ্ছা বলবতী হওয়াতে ভদ্রসমাজে যে কি বিষম আঘাত লাগিতেছে তাহা তৎকালে যেরূপ অনুভূত হইয়াছিল প্রধানতঃ তাহারই প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল এবং প্রসঙ্গ ক্রমে ইহাও দেখাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল যে আমাদিগের সংস্কার চেষ্টা অধিকাংশ স্থলে অকিঞ্চিৎকর ও আন্তরিকতা শূন্য'।

নাটকে নাট্যকার স্বভাবতঃই দুটি পক্ষের সৃষ্টি করেছেন—একপক্ষ পুত্রের বিবাহে পণ নেওয়ার পক্ষে অন্য পক্ষ এর বিরুদ্ধে। নবীন, নবীনের পিতা প্রভৃতিরা বরপণ নেওয়ার পক্ষে, কিন্তু গোপাল, নৌকার ১ম ভদ্রলোক এরা সব পণ নেওয়ার বিপক্ষে।

নবীন, নবীনের পিতা প্রভৃতিরা বরপণের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছে, 'Hindu Law-তে কন্যা ত পিতার বিষয়ের কোন ভাগই পায় না। এক বিবাহের সময় কন্যা যাহা কিছু আদায় করিল তাহাই তাহার চূড়ান্ত লাভ!' (২য় অঙ্ক)

নবীন নিজের বিবাহেও আদায় করেছে নগদ হাজার এক টাকা এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী। পণ আদায়কারীদের অমানবিকতা দেখাতে নাট্যকার দেখিয়েছেন নবীনকে সভাস্থ করার পূর্বেই তার পিতা নগদ টাকা ও অন্যান্য দান সামগ্রী যাচাই করে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এরপরে আবার পাত্রের মায়ের ইচ্ছামত কয়েকটি রূপার দান সামগ্রী দেবার কথা বলেছেন। বিবাহের পর নবীনের পিতার সংশয় প্রকাশিত হয়েছে বিবাহে দেওয়া সোনার গয়নাগুলির

ওজন এবং যাথার্থ সম্পর্কে। নবীনের মামা মন্তব্য করেছে বরযাত্রীরূপে একজন স্যাকরাকে সঙ্গে আনলেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হত। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও নবীনকে শেষে দুঃখ করতে হয়েছে এই বলে—

'আমরা পোড়ার মুখোরা যে বড় মানুষ কুটুম করবার আহ্লাদেই মোরেছি। তখন মনে কোল্লুম বড় মানুষের বাড়ী বে হোচ্ছে না জানি কি সুখেই ভাসবো! বেশ হোয়েচে! যেমন কর্ম তেমনি ফল!' নবীন শ্বশুর বাড়ী গেলে তার আপ্যায়ন হয় না, ঝি তাকে আপ্যায়ন করে, এমনকি তার খাওয়ার সময় শাশুড়ী বা আর কেউ উপস্থিত থাকেনা। তার স্ত্রীটিও যেমন ন্যাকা তেমনি নির্লজ্জ ভাবে অলস।

গোপাল নবীনেরই বন্ধু। সে পণ নেওয়ার বিরুদ্ধে। তার বক্তব্য হল—'বিবাহে বরের কর্তৃপক্ষীয়েরা ভ্রমেও একবার দেখিবেন না যে যাহাকে গৃহে বধূটি করিয়া লইয়া যাইবে সে গৃহলক্ষ্মী, সংসারের স্ত্রী হইবার উপযুক্ত কি না। কেবল এক অর্থ তৃষ্ণাতেই সকলে অস্থির।' গোপাল তার মাকে বলেছে, 'কুটুম্বর ধনে কে কোথায় মা বড় মানুষ হয়েচে? লোকে বে কোর্তে যায় কি টাকা আনতে না বৌ আনতে?'

সত্য সত্যই গোপাল বিনা পণে বিবাহ করেছে এবং নবীনের তুলনায় তার সাংসারিক জীবনকে সুখী দেখিয়ে নাট্যকার পণপ্রথার বিরোধিতা করেছেন। নাটকে ঘটক চরিত্রটি খুব বাস্তব হয়েছে। পণপ্রথা ব্যতীত তৎকালীন দেশ সেবকদের ইংরেজিতে বক্তৃতাদান, ইংরেজ বিরোধিতায় কিছু মানুষের মধ্যে যে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল নাট্যকার তারও পরিচয় দিয়েছেন। উদ্দেশ্য প্রকটিত হওয়ায় নাটকের শিল্পগুণ ব্যাহত হয়েছে।

বৈকুণ্ঠনাথ বসুর '**কৃষ্ণাষ্টমী**' নাট্যগীতিকাটির প্রকাশকাল ১৩১৯ (?) এ'টি নানা পুরাণ ও মহাজন পদাবলী অবলম্বনে রচিত। নাট্যগীতিকাটি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল।

বহুল পরিচিত বিষয় নাট্যগীতিকাটিতে স্থান পেয়েছে। বিপন্ন বসুমতীকে উদ্ধারকল্পে কৃষ্ণের ব্রজধামে অবতীর্ণ হওয়ার বিবরণই নাট্যগীতিকাটির মুখ্য বিষয়। কিন্তু স্বীকার করতে হয় কি কাহিনী নির্বাচনে, কি সংলাপ রচনায় কোন ক্ষেত্রেই নাট্যকার নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখতে পারেননি। সত্যকথা বলতে কি, প্রহসন রচনায় লেখকের যে পারদর্শিতা আলোচ্য নাট্যগীতিকায় তা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

'**বলি রাজার পাতালে গমন বা বামন-ভিক্ষা**' নাটকটির রচয়িতা বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। পঞ্চদশ দৃশ্যে নাটকটি সমাপ্ত। নাটকে 'বামন-ভিক্ষা' নামটিই অধিক ব্যবহৃত।

পয়োব্রতের অনুষ্ঠান করায় কৃষ্ণ অদিতির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে কশ্যপকে পিতা ও অদিতিকে মাতা বলে সম্বোধন করেন। শুধু তাই নয়, এ'দের সন্তান হবেন

বলেও অঙ্গীকার করেন। সেইমত বামন রূপে তিনি জন্ম নিয়েছেন অদিতির গর্ভে। বামনরূপী উপেন্দ্রের সকল বিষয়ে কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা শিশুসুলভ হওয়ায় তা উপভোগ্য হয়েছে। উপেন্দ্রের আশীর্বাদে নৌকার পার্টনি বৈকুণ্ঠ-ধামে গেছে। বলিরাজ দান যজ্ঞের আয়োজন করলে বামন রূপী কৃষ্ণ বলির কাছে উপস্থিত হয়ে ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি যাচঞা করেছেন। বলিরাজ তা দিতে স্বীকৃত হলে বামন বিশ্বরূপ গ্রহণ করে এক পদে ভূলোক, আর এক পদে স্বর্গ অধিকার করে তৃতীয় পদের স্থান যাচঞা করেছেন। বলি কৃষ্ণের বিরোধিতা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হওয়ায় কৃষ্ণ বলির স্থান নির্দিষ্ট করেছেন নরকে। নাট্যকার কৃষ্ণকে ভক্ত বৎসল রূপে উপস্থিত করেছেন। কৃষ্ণের ভক্তের প্রতি আকর্ষণের পরিচয় প্রথম পাওয়া গেছে কশ্যপ ও অদিতির ক্ষেত্রে, বলিকে আঘাত হেনেও তাঁকে কাতর হতে দেখা গেছে। শুধু তাই নয় সুতল নামক পবিত্র রমণীয় পুরীতে পত্নীসহ বলিকে রেখে স্বয়ং কৃষ্ণ এদের দ্বার রক্ষক রূপে অবস্থান করবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

নাটকটি আদ্যন্ত হরিভক্তির কথায় পূর্ণ। কশ্যপ অদিতিকে পরামর্শ দিয়েছেন, 'উপাসনা দ্বারা হরিকে সন্তুষ্ট করতে যত্ন কর। তিনি সুখ মোক্ষদাতা, জন্ম-মৃত্যু-ভয় ত্রাতা। তাঁর উপাসনা ব্যতীত শান্তিলাভের উপায়ন্তর নাই।'

বলিরাজের বাসনা, গুরু বলে ভক্তি পাশে কৃষ্ণকে আবদ্ধ করে নিজ বাসে নিয়ে যাবেন। বলিরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে কার্তিকেয় বলেছেন ঃ

দেহ সবে জয় ধ্বনি, শ্রীহরি স্মরিয়া।
বল জয় চক্রধর হরি।

ভীতা শচীকে তাঁর সখীরা পরামর্শ দিয়েছেন, এইখানে পূজার সব আয়োজন করে দি, তুমি সর্বভয় হারী হরির পূজা কর।' ব্রহ্মা বলেছেন ঃ

জপ অবিরাম হরিনাম. পূরিবে হে মনস্কাম,
গুণধাম হরিনামে রবে না দুর্গতি।

দুটি ক্ষেত্রে লেখক বাস্তবতার পরিচয় রেখেছেন—হিজড়েদের নবজাতক বামনের কারণে পাওনা আদায়ের জন্য কথাবার্তা ও গানে এবং বামনের উপনয়নে আর্থিক কারণে কশ্যপের দেবতাদের নিমন্ত্রণ করার অক্ষমতা জ্ঞাপনে। কশ্যপের আচরণ অসচ্ছল পিতার আচরণের তুল্য হয়েছে—

'যজ্ঞোপবীত প্রদানের কথা কারও কাছে প্রকাশ করে কাজ নাই। এমন নয় যে দুটী পাঁচটীকে নিমন্ত্রণ করলেই কার্য সম্পন্ন হবে। তবেই ভেবে দেখ, আমরা নির্ধন হয়ে ধনবানের যা অসাধ্য, তাতে কোন্ সাহসে হস্তক্ষেপ করি ?'

বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়ের **'গৌরী-মিলন'** নাটকটির প্রকাশকাল ১৩১১ বঙ্গাব্দ। নাটকটি নারায়ণ চন্দ্র দাস ঘোষের খিদিরপুর নাট্য-সম্প্রদায়ে অভিনীত হয়েছে।

সতীর দেহত্যাগে বিচলিত শিবকে শান্ত করতে সতীর দেহ কৃষ্ণ চক্রের সাহায্যে ছিন্ন ভিন্ন করেছেন। ব্রহ্মা শিবকে সান্ত্বনা দিয়েছেন তাঁর পুনরায় সতী লাভ ঘটবে। শিব ধ্যানমগ্ন হয়েছেন, মদনের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে

শিবের ধ্যান ভঙ্গের। শিবের ঘটকালিতে শেষ পর্যন্ত শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

নাটকটির সংলাপ রচিত হয়েছে গদ্যে ও পদ্যে। শিবের শোকে নন্দী-ভৃঙ্গী এবং সতীর শোকে জয়া-বিজয়ার কাতরতা বাস্তবানুগ। গঙ্গাকে নাটকে সতীন রূপে উপস্থিত করা হয়েছে। গঙ্গার জয়া-বিজয়াকে ভর্ৎসনা, বিশেষত বিজয়ার সঙ্গে বিরোধটি উপভোগ্য হয়েছে।

মদনের ওপর শিবের ধ্যান ভঙ্গের দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ায় রতি স্বভাবতঃই চিন্তিত হয়েছে এবং বলেছে মদনের যাত্রার পূর্বে সে চিতানলে দেহ বিসর্জন দেবে যাতে তার শব দেখে মদন গমন করতে পারে। রতির এই ইচ্ছা প্রকাশে কেবল তার অভিমান কিংবা পতির সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় তার চিত্ত ব্যাকুলতাই প্রকাশিত হয়নি, সেই সঙ্গে তৎকালীন প্রচলিত সংস্কারেরও প্রতিফলন লক্ষিত হয় এই বক্তব্যে। রতির উক্তিতে তৎকালীন স্ত্রী জাতির মানসিকতার প্রতিফলন অন্যত্রও ঘটেছে—

'স্ত্রীলোকের তিনটী মাত্র গতি। প্রথম গতি পিতা, দ্বিতীয় গতি পতি, এবং তৃতীয় গতি পুত্রাদি!...স্বামীর তুল্য পরম দেবতা, পরম ধন, পরম গুরু, পরম স্বর্গ আর নাই।'

কন্যার বিবাহ নিয়ে মেনকা ও গিরিরাজের বিরোধটি স্বাভাবিক। মেনকাকে গৃহস্থ বধূ রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রতিবেশিনীদের প্রতি তাঁর অনুরোধঃ

'তোমাদের বাড়ীর বৌ ঝিগুলিকে এনে কি কি কাজ করলে ভাল হয়, তা দেখে শুনে নিয়ে কর। আমার বাড়ীতে লোকের অভাব নাই বটে, কিন্তু কাজের লোক ক জন, তা তো তোমার জানতে বাকি নাই মা।'

মেনকা ও গিরিরাজ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী দম্পতি। বাড়ীতে কোন বৃহৎ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাড়ীর কর্তা-গিন্নীর মধ্যে যেমন নানা বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তেমনি পার্বতীর বিবাহকে কেন্দ্র করে বিরোধ দেখা দিয়েছে মেনকা ও গিরিরাজের মধ্যে।

মেনকা শিবের কাছে অভিযোগ করেছেন—'আমি স্ত্রীলোক, কোমর বেঁধে হাটবাজারে গিয়ে, যা যা চাই সব যোগাড় করে আনব, আর তুমি পুরুষ, তুমি তার কিছুই জান না, তুমি নাকে খাঁটি সর্ষের তেল দিয়ে বসে থাক গে, আর কর্তা গিরি কর গে।'

গিরিরাজ বিরোধকে আর বাড়াতে চাননি যতই হোক বাড়ীতে আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের সামনে সেটাত আর ভাল দেখায় না। তাই তাঁর বক্তব্য—'তোমাকে কোমর বেঁধে হাটে বাজারেও যেতে বলি নি, আর আমি কিছুই করবো না তাও বলিনি। লোকজনেরও অভাব নাই, যা চাই মুখের কথা খসালেই সব তারা এনে যোগাড় করে দেবে, এইমাত্র আমার উদ্দেশ্য।'

মেনকা শিবকে বৃদ্ধ, গাঁজাখোর, শ্মশানবাসী, দিগম্বর ইত্যাদি বলে গিরিরাজের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করলে গিরিরাজ প্রতিটি অভিযোগের চমৎকার জবাব দিয়েছেন। কৃষ্ণের আদেশে চক্রধারী এবং শিবের আদেশে

শূলবীরের আবির্ভাব, উমা কর্তৃক নারদকে সিংহবাহিনী মূর্তি প্রদর্শন, মদনের সঙ্গে রতির পুনর্মিলন প্রসঙ্গে দৈববাণী ইত্যাদি অলৌকিক ঘটনাগুলি নাটকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় প্রণীত **'পরামুক্তি বা রাধিকার গোলোক-মিলন'** ১৩১১ সনে প্রকাশিত। কলকাতার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী দ্বারা প্রকাশিত। 'রাধিকার গোলোক-মিলন' পৌরাণিক যাত্রা। এ'টি অভয়চরণ দাসের যাত্রা-সম্প্রদায়ের দ্বারা অভিনীত হয়েছিল। নাটকের যে প্রাণ দ্বন্দ্ব, তা এটিতে অনুপস্থিত। পৌরাণিক কয়েকটি ঘটনাকে লেখক মোট আটটি দৃশ্যে উপস্থাপিত করেছেন। অঙ্কবিভাগ যেমন অনুপস্থিত, তেমনি সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে নান্দীমুখ কিংবা প্রস্তাবনাও এতে নেই। মূলতঃ সংলাপ এবং সঙ্গীত নির্ভর পালা এ'টি। দ্বিবিধ সংলাপ সংযোজিত হয়েছে—গদ্য ও পদ্য। গদ্য সংলাপ বহু স্থানেই দীর্ঘ। বক্তৃতার ঢঙে উপস্থাপিত। গদ্য সংলাপ কখনও সাধু ভাষায় কখনও বা চলিত ছাঁদে রচিত। তবে তুলনা মূলকভাবে চলতি ছাঁদ অপেক্ষা সাধু গদ্যের প্রতিই ঝোঁক অধিক। সাধু গদ্য অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃতানুসারী হয়ে উঠেছে। কিছু নিদর্শন নেওয়া যেতে পারে।

মাতঃ বিষ্ণুপদ-রজো-বিহারিণী! শঙ্কর-শিববাসিনি! লোক ত্রয়-ত্রিতাপ নাশিনি! সুখ-মোক্ষ-প্রদায়িনি গঙ্গে! আপনি জীবের গতিমুক্তি বিধায়িনী!...তরুণ-অরুণ-সদৃশ লোহিত-বর্ণের দ্বাদশ দল-পদ্ম-কর্ণিকায় শতকোটী সূর্য-প্রভাবিনিন্দিত অনুপম দীপ্তিময় মণ্ডল মধ্যে একটী অপূর্ব মনোমোহন জ্যোতির্ময় নীল-মূর্তি, নিরতিশয় আনন্দে বদন মণ্ডল সুপ্রসন্ন, তড়িৎসম দীপ্তিমান্ মকর-কুণ্ডল দ্বয় শ্রুতি যুগলে দোদুল্য মান, সুপ্রশস্ত ললাটে নক্ষত্রপুঞ্জবৎ অলকাবলী সুশোভিত, খগ-চঞ্চু গঞ্জিত নাসিকায় মনোহর তিলক, কণ্ঠে মুক্তাহার বনমালা, বক্ষে কৌস্তুভ, ভৃগুপদ চিহ্ন এবং শ্রীবৎস-বিরাজিত, পৃষ্ঠে বিদ্যুৎ-প্রভ বস্ত্র এবং কটীতটে পীতাম্বর ; চারু চতুষ্করে শঙ্খ, গদা পদ্মধৃত, কোকনদ তুল্য চরণদ্বয়ে মণি-মাণিক্য-ঘটিত দিব্য জ্যোতির্ময় নূপুর, পদতলে ধ্বজ বজ্র-অঙ্কুশ-চিহ্ন!' (পৃঃ ১১০)

অপরপক্ষে চলিত রীতির নিদর্শন হ'ল—

'শ্রীদাম রে! ঠিক্ বলেছিস্ ভাই! ছেলেবেলা না বুঝে আমরা যে তাঁকে এ'টো খাইয়েছি, ওরে হাঁরে বলে ডেকেছি, খেলার সময় তার কাঁধে উঠেছি, আরো কত অন্যায় করেছি, তার জন্যে আমারও মনের ভয়ের উদয় হচ্চে'! (পৃ ১১৭)

পদ্য সংলাপের মধ্যে আছে গৈরিশ ছন্দে রচিত অংশ, তাছাড়া পয়ার ও ত্রিপদীরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। মোট ত্রিশটি সঙ্গীত পালাটিতে সংযোজিত হয়েছে। সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য হ'ল যুক্তাক্ষরের বাহুল্য এবং অন্ত্যানুপ্রাস নির্ভরতা।

বেশ কয়েকটি চরিত্রের উপস্থিতি ঘটেছে। তবে উল্লেখযোগ্য হল যশোদার চরিত্রটি। বাৎসল্য রসের আধার করে এই চরিত্রটিকে চিত্রিত করা হয়েছে। শত প্রলোভন সত্ত্বেও তিনি বাৎসল্য ভাবকে পরিত্যাগ করেন নি। শ্রীকৃষ্ণ যে সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পালাটিতে তাই প্রতিপন্ন করা হয়েছে। নারদ, ব্রহ্মা, শিব সকলকেই হরি বন্দনায় রত দেখা গেছে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা তত্ত্বও ব্যাখ্যাত হয়েছে। সত্যকথা বলতে কি তত্ত্বকথার আধিক্য পালাটির স্বাভাবিক গতিকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করেছে স্বীকার করতে হয়। নামাশ্রয়ী ভক্তিভাব, বিশেষতঃ দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের উপাসনার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য পালাটিতে উপস্থাপিত।

মতিলাল ঘোষ রচিত '**প্রভাস-মিলন**' নামক পৌরাণিক নাটকটির প্রকাশকাল ১৯০৫। নাটকটি অভয়চন্দ্র দাসের যাত্রায় অভিনীত হয়েছিল। যাত্রার জন্য রচিত বলে এই পঞ্চাঙ্ক নাটকটি সঙ্গীত বহুল। মোট ৩৫টি গান নাটকটিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

সংলাপগুলি প্রায়ই দীর্ঘ এবং গুরু গম্ভীর। কখনও কখনও বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্য সংলাপও সংযোজিত হয়েছে গদ্য সংলাপের সঙ্গে। চরিত্র চিত্রণ কিংবা নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি—কোন ব্যাপারেই নাট্যকারের সাফল্য লক্ষিত হয় না। বৃন্দাবন ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে তাঁর বিরহে বৃন্দাবনের কি করুণ অবস্থা হয়েছিল এবং শেষে বিরহ-ব্যাকুল নন্দ, যশোদা, শ্রীরাধা, শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম প্রমুখাদির প্রভাসে উপস্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার কাহিনী নাটকে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে সুদাম ও শ্রীদামের কথোপকথনটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। তাছাড়া নারদ কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র ও দ্বারাবতী এই তিনটি লীলাস্থলের তাৎপর্য ব্যাখ্যা, চৌরাশি ক্রোশ পরিমিত বৃন্দাবনের ব্যাখ্যা, বৃন্দাবন কুঞ্জ বিহারিণী রাধিকার প্রকৃত পরিচয় দান, ললিতা-বিশাখা প্রভৃতি অষ্ট সখীর স্বরূপ বিশ্লেষণ, রাধা-কৃষ্ণের মিলনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, নন্দ-যশোদার, জটিলা-কুটিলার তাত্ত্বিক পরিচয়, বস্ত্রহরণের ভাবার্থ, অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণের গভীর সম্পর্কের কারণ বিশ্লেষণ ভক্ত পাঠকের মনস্তুষ্টির কারণ হয়েছে।

বর্ধমান জেলার খাঁড় গ্রামের অধিবাসী ধনকৃষ্ণ সেন (১২৭১-১৩০৯) যেমন ছাত্রাবস্থায় নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হন, তেমনি অল্পবয়সেই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। মাত্র ৩৮ বৎসরের জীবনে তিনি কিন্তু বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে সতীমালাবতী (১৩০৯), অনুধ্বজের হরি সাধনা (১৩১১) হংসধ্বজের মহামুক্তি (১৩১৪), বিল্বমঙ্গল (১৩১৪), উমাতারা (১৩১৫) ইত্যাদি। ধনকৃষ্ণ সেন পৌরাণিক নাটক

রচনায় ব্রতী ছিলেন। তাঁর রচিত এবং এ পর্যন্ত অনালোচিত আর একটি পৌরাণিক নাটক হল 'মানস-মিলন' (১৯০৫)। নাটকটি বলাবাহুল্য ধনকৃষ্ণের মৃত্যুর পর প্রকাশিত। মানস-মিলন ত্রৈলোক্য পানের যাত্রায় অভিনীত হয়েছিল।

নাটকটি দীর্ঘ এবং মোট দ্বাদশ দৃশ্যে সমাপ্ত। পাশ্চাত্য নাটকের অনুসরণে নাট্যকার আলোচ্য নাটকে অঙ্ক বিভাগ করেন নি। যাত্রার অভিনয়োপযোগী করে রচনা করায় আলোচ্য নাটকে বহু সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সঙ্গীত রচনায় নাট্যকারের নৈপুণ্য প্রকাশিত। কোনো কোনো সঙ্গীতে 'ব্রজবুলি'র ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন ঃ

আবহিঁ তুঁহি সখি কাহেঁ দুঃখ ভেল,
বঁধুয়া পরিহরি যদি বা গেল,
ব্রজেন্দ্র নন্দন, গোপী কি জীবন,
রাই কো পরাণ পুতলি,
যদি মরিবি গো সখি, কারে দিয়ে যাবি
তুয়া ধন বনমালী। (পৃঃ ৮৪)

কিংবা,

সখি! হামসে অবলা তায়
সুখের সাগর, বুঝি শুকায়ল,
পিয়াসে পরাণ যায়! (পৃঃ ৬৩)

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ধনকৃষ্ণ সেনের সঙ্গীতে অনুপ্রাস ব্যবহারের প্রাচুর্য লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু শুধু অনুপ্রাসই নয়, যমক অলঙ্কার প্রয়োগেরও প্রাচুর্য আলোচ্য নাটকে লক্ষণীয় এবং নাট্যকারের অলঙ্কার প্রয়োগে মুন্সীয়ানাও পরিস্ফুট। যেমন ঃ

(ক) বলে তার কি করবি রে বল, সকল বলের সেই যে রে বল (পৃঃ ৫৩)
(খ) কাল ভালবেসে রাধে তোর, কালে এই হ'লো।
কাল ভেবে কোন্ কালে কার সুখে বা কাল কাটিল। (পৃঃ ৬৪)
কিংবা, (গ) তবে হরি হরি বল সই
কালিন্দীর জলে, পশি গো এখনি
এ জ্বালা কত বা সই? (পৃঃ ৭৯)

আলোচ্য নাটকের সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রেও নাট্যকারের অনুপ্রাস ব্যবহার লক্ষণীয়—

(ক) অঙ্গ যার ত্রিভঙ্গ বাঁকা, কি সঙ্গ প্রসঙ্গ বাঁকা, (পৃঃ ৬৫)
(খ) ধর্ ধর্ ধর্ বিনে গিরিধর, হেমধরাধর ধরায় পড়লো
হেমাঙ্গ হিমাঙ্গী, বিনে শ্যাম অঙ্গ, ছিল অন্তরঙ্গ, হল বৈরঙ্গ,
(পৃঃ ৭৯)

নাটকে নাট্যকার স্বগতোক্তির ব্যবহার করেছেন। হাস্যরস সৃষ্টিতেও নাট্যকার ব্যর্থ হন নি। কৃষ্ণের কৃপায় গুরু সান্দীপণির পর্ণকুটীর বিশালাকৃতির

প্রাসাদে রূপান্তরিত হলে সান্দীপণি ব্যাপারটিকে ভৌতিক বলেই মনে করেছেন। এমনকি শিষ্য শান্তশীলকে পর্যন্ত তিনি ভূত মনে করে অনুরোধ করেছেন 'বাবা কৈলাসের ভূত, আমাকে মের না বাবা, আমি গরীব ব্রাহ্মণ বাবা—দোহাই বাবা !' (পৃঃ ৯৪)

নিজের স্ত্রীকেও সান্দীপণি সন্দেহের চোখে দেখেছেন, বলেছেন ঃ 'তোমাকে চিনতে পেরেছি, তুমি ভূতের মা, কৈলাসের ভূত শিবের ভূত নারদে ভূত ! দোহাই ভূতের মা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আধখানা মরে গেচি গো !' (পৃঃ ৯৫)

নাটকে নাম মাহাত্ম্যের কথা বিস্তৃত পরিসরে স্থান পেয়েছে। স্বয়ং মহাদেবকে হরি ভক্ত রূপে দেখা গেছে। নন্দী মহাদেবের নামাসক্তি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছে—

পঞ্চানন অনুরক্ত সদা হরিনাম গানে !
চিরকাল হরিনাম বই, না শুনি আর নাম কিছু,
শঙ্করের মুখে !

যমকে বলতে শোনা গেছে হরিনামের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে—

'হরিনামের যে এত মাহাত্ম্য, তা ত কখন জানি না ! অসংখ্য পাপী চলে গেচে, অসংখ্য নরক পাপী শূন্য হয়ে পড়েছে !' (পৃঃ ৫১)

কিংবা একটি সঙ্গীতেও নাম মাহাত্ম্য প্রচার করে বলা হয়েছে—

শমনের বল হয় রে দুর্বল, নামের বল স্মরণে তারি। (পৃঃ ৫৩)

মানস-মিলন নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণের মাধ্যমে কর্মফলের কথা ঘোষিত হয়েছে। ব্রজবাসীদের কৃষ্ণের বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হবার কারণ স্বরূপ কৃষ্ণ তাদের কর্মফল ভোগের কথা বলেছেন ঃ

'কর্মফল কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না ; তারা যে আপনার দোষে আপনি কষ্ট পাচ্ছে হায় !' (পৃঃ ৫৫)

পুনরায়, 'সে দোষ তাদের নয়, তাদের পূর্বকৃত কর্মের দোষ।' (পৃঃ ৫৬)

মানস-মিলন একে পৌরাণিক নাটক, তদুপরি লেখকের উদ্দেশ্য যেহেতু কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার, তার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাটক অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট হয়েছে। যে সান্দীপণি এবং তাঁর স্ত্রী তাঁদের একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে শোক গ্রস্ত ছিলেন, বর্ণিত হয়েছে নাটকে যে কৃষ্ণের অনুগ্রহে সেই মৃত পুত্রকে লাভ করেও তাঁরা আনন্দিত হন নি। বরং সান্দীপণি দুঃখিত চিত্তে স্ত্রীকে বলেছেন ঃ

'মুক্তা-মালার বিনিময়ে লোহ ময় বন্ধন-শৃঙ্খল ক্রয় করে বসলেম—মণি ফেলে দিয়ে ফণী ধরলেম ! যেমন কর্ম তেমনি ফল,—যেমন সাধনা তেমনি সিদ্ধি ! পুত্র চেয়েছিলে, ধন চেয়েছিলে, পোড়া কপালে তাই পেয়েছ ;' (পৃঃ ৯৮)

কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ কাতরা যশোদা নন্দের কাছে কৃষ্ণকে প্রার্থনা করে যে বক্তব্য

প্রকাশ করেছেন, মেঘনাদ বধ কাব্যের ১ম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুর পর শোকাতুরা চিত্রাঙ্গদার রাবণের প্রতি উক্তির সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে।

দাও এ কাঙ্গালিনীর ধন,
তোমারই করেতে তারে করেছি অর্পণ !
কারে দিয়ে এলে তারে,
বল, বল, বল সত্য করে,
কাঙ্গালিনীর ধন আজ করিয়া হরণ,
কারে সুখী করে এলে করি বিতরণ ? (পৃঃ ৭৩)

নাটকে নাট্যকার মূলতঃ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের দৃষ্টান্তের অবতারণা করেছেন। নন্দ-যশোদার বাৎসল্য, ব্রজের রাখালদের সখ্য, রাধিকার মধুর রসের আরাধনার বিবরণ নাটকে মুখ্য হয়ে উঠেছে। মূলতঃ ভক্তি ভাবনার আধিক্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়ায় চরিত্র চিত্রণে কিংবা কাহিনী রচনায় তেমন দৃষ্টি দেন নি নাট্যকার। তবু শিক্ষা গুরু সান্দীপণি ও তাঁর স্ত্রীকে গুরুদক্ষিণা দিতে কৃষ্ণের আন্তরিক প্রয়াসের বিবরণ নাটকে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যের স্বাদ এনেছে। কৃষ্ণ বিরহে বৃন্দাবনের করুণ অবস্থার বিবরণই নাটকে দীর্ঘ স্থান অধিকার করে আছে। নাট্যকার মাঝে মাঝে কৃষ্ণ, রাধা ও ব্রজধাম সম্পর্কিত তত্ত্ব কথা ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছেন। 'ব্রজলীলা সেই লীলাময়ের নিত্যলীলা ! জীব হৃদয়ে যে লীলার অহর্নিশি অনুষ্ঠান হচ্চে, সেই লীলাই এখন লোক দৃষ্টির বিষয়ীভূত করে, বৃন্দাবনে তার অবতারণা ! বৃন্দাবন সত্য, রাধা-কৃষ্ণ সত্য, গোপ-গোপী সত্য,···সেই সত্য সনাতনই এখন কৃষ্ণরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ, এবং তাঁর গোলোক সেই নিত্যলীলার আদর্শ লয়েই এখন বৃন্দাবনে সেই প্রেমলীলার সমাবেশ ! বৃন্দাবন-লীলা কৃষ্ণ ভক্তির পরাকাষ্ঠা : রাধিকা ভক্ত মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা !' (পৃঃ ৪৭) সংলাপ স্থানে স্থানে দীর্ঘ হলেও সংলাপ রচনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। গদ্য ও পদ্য উভয় বিধ সংলাপেরই ব্যবহার লক্ষণীয়। গৈরিশ ছন্দের ব্যবহার করেছেন লেখক।

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'অদৃষ্ট'** নাটকটি ১৩১২ সালে প্রকাশিত। এটি ন্যাশানাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। নাটকটি 'East Lynne' উপন্যাসের ভাবানুলম্বনে রচিত। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকের নায়িকা হল রমা, নায়ক আইনজীবী নীলাম্বর।

নীলাম্বর প্রথমে বিবাহ করবেনা বলে স্থির করলেও পরবর্তীকালে দক্ষিণ-পাড়ার বড়বাবুর একমাত্র কন্যা রমাকে বিবাহ করে। কিন্তু রমার দাম্পত্য-জীবন সুখের হয় না। ধনী ব্যক্তির একমাত্র কন্যা হয়ে এবং অপরিমেয় ভোগ বিলাসিতায় মানুষ হয়েও তাকে বিবাহিত জীবন চরম দুঃখে কাটাতে হয়। এর প্রত্যক্ষ কারণ হরিশবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী নীলাম্বরের মাসী। এই মাসীই মানুষ করেছিল নীলাম্বরকে। মাসী কোনমতেই রমার সঙ্গে নীলাম্বরের বিবাহকে মেনে নিতে পারেনি। তাই নীলাম্বরের সংসারে কর্ত্রী

হয়ে সে রমাকে নানাভাবে পীড়ন করতে থাকে, এমন কি দৈহিক আঘাত করতেও বাধেনি। কিন্তু রমার জীবনে দুঃখের পরোক্ষ কারণ তার স্বামী নীলাম্বর। ব্যক্তিত্বহীন এই মানুষটি নিজের কাজেই সদা মত্ত থেকেছে, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালনে তাকে পরাঙ্মুখ দেখা গেছে। সত্যি কথা বলতে কি নাটকটি যে ট্রাজেডি হয়েছে তারও প্রত্যক্ষ কারণ মাসী হলেও পরোক্ষ কারণ নীলাম্বরের নিষ্ক্রিয়তা। তারই প্রশ্রয়ে মাসী ক্রমান্বয়ে রমার প্রতি অত্যাচারের মাত্রা দিনদিন বৃদ্ধি করেছে।

তবু রমা নীরবে মাসীর অত্যাচার সহ্য করে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু হরিশ-বাবুর বিধবা কন্যা ভাবিনীর প্রতি নীলাম্বরকে আসক্ত মনে করে দক্ষিণপাড়ার বড়বাবুর প্রথম পক্ষের সম্বন্ধীয় পুত্র বনওয়ারীলালের প্ররোচনায় রমা গৃহত্যাগিনী হয়। অবশ্য পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত হবার পূর্বেই সে বনওয়ারী-লালের সংসর্গ ত্যাগ করে। কাশীধামের উদ্দেশে যাত্রা করে পথিমধ্যে ট্রেন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। ভ্রমবশতঃ তার মৃত্যু হয়েছে এই সংবাদ রটে যায়। নীলাম্বর ভাবিনীর কনিষ্ঠা ভগিনী কামিনীকে বিবাহ করে। প্রকারান্তরে নীলাম্বরের সংসারের কর্ত্রী হয় ভাবিনী। সমাজে রমা কুলত্যাগিনী ঘৃণ্য রমণী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে কাশীধামে বাস করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টের পরিহাসে পরিচারিকা রূপে সে ফিরে আসে নীলাম্বরের বাড়ী। তার নিজের পুত্র কালী এবং কন্যা মন্দার পরিচর্যার ভার ন্যস্ত হয় তার ওপর। কালী অসুখে মারা যায়। রমা পুত্রশোকে অধীর হয়ে উন্মাদ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তার চেতনা ফিরলেও অল্পদিনের ব্যবধানে তার মৃত্যু হয়। অবশ্য তার পূর্বে তার প্রকৃত পরিচয় জানাজানি হয়ে যায়, স্বামী নীলাম্বর সম্পর্কে তার যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তার অপনোদন ঘটে। অপর দিকে নীলাম্বরও রমার চারিত্রিক সততা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়।

এইভাবে অদৃষ্টের পরিহাসে নীলাম্বরের সুখের সংসার কি পরিমাণে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল তারই কাহিনী নিয়ে নাটকটি গড়ে উঠেছে। কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে নাটকটির নামকরণ যথার্থ হয়েছে। নাট্যকার নাটকের কাহিনী পরিকল্পনায় মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষতঃ ভাবিনী ও নীলাম্বরকে নিয়ে রমার মধ্যে যে সংশয়ের বীজ উপ্ত হয়েছিল, অত্যন্ত কৌশলে নাট্যকার ভাবিনী ও নীলাম্বর জনিত সেই ঘটনাকে রমার গৃহত্যাগের কারণে পর্যবসিত করেছেন। রমা চরিত্রটিকে নাট্যকার সর্বংসহা করে তুলেছেন। চরম অপমান ও নির্যাতন সত্ত্বেও তাকে নীরবে সবকিছু সহ্য করতে দেখা গেছে। আর এই সহনশীলতাই তার ট্রাজেডিকে ত্বরান্বিত করেছে। পরিবর্তে সে যদি অন্ততঃ একটু প্রতিবাদে সোচ্চার হত, তবে অনেক অবাঞ্ছিত দুঃখভোগ এড়ানো যেত।

নীলাম্বর শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত উকিল, কিন্তু স্বামী হিসাবে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালনে তাকে ব্যর্থ দেখা গেছে। সাংসারিক ব্যাপারে তার নীরবতাই মাসীকে রমার প্রতি চরম অত্যাচারী হবার সুযোগ করে দিয়েছিল। মাসী

চরিত্রটিকে লেখক দর্জাল রূপে উপস্থাপিত করেছেন। তার কর্তৃত্বের স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি ছিল নীলাম্বরকে মানুষ করা। তার কাছে নীলাম্বরের বাড়ীর ঝি-চাকর কিংবা রমার মধ্যে যেন কোন পার্থক্য ছিল না। তার অত্যাচারে সকলকেই অতিষ্ঠ দেখা গেছে।

ভিলেন চরিত্র রূপে চিহ্নিত হয়েছে বনওয়ারীলাল। সে কামুক, লম্পট। অদ্বৈতের কন্যাকে নিয়ে সে অপহরণ করেছিল, হত্যা করেছিল অদ্বৈতকে। অথচ তার কৃতকর্মের জন্য দীর্ঘদিন ফলভোগ করতে হয়েছে হরিশবাবুর পুত্র বেচারী কমলকে। কৌশলে সে রমাকে গৃহত্যাগী করেছিল, বাড়ীর ঝি'র প্রতি আসক্ত হতেও তার বাধেনি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়েছে। শুধু তাই নয়, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। তাকে ফাঁসীতে লটকানো হয়েছে। ঠাকুরদাদা চরিত্রটিকে বাতিকগ্রস্ত এবং সন্দিগ্ধ পরায়ণ করে দেখানো হয়েছে। তার আচরণ হাস্যরসের উদ্রেক করেছে। তবে রমার নিজের গৃহে পরিচারিকা রূপে নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যে তার স্বামী এবং অন্যান্যরা কেউ তাকে চিনতে পারেনি, এতে কিছুটা যেন বাস্তবতার সীমাকে অতিক্রম করা হয়েছে স্বীকার করতে হয়। সংলাপ রচনাতে লেখক নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

সবশেষে নাটকটিতে উল্লিখিত দুটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। এর একটি হল আগেকার দিনে ইংরেজদের সঙ্গে এখনকার মানুষ কিভাবে কথা বলত, বক্তব্য বিষয়কে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অসম্পূর্ণ ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিত তার কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় দান। কল্যাণপুরের সাব ইনস্পেকটর যখন বনোয়ারীলালের সন্ধান করেছেন, তখন তাকে বনোয়ারীলাল সম্পর্কে এইভাবে হদিস দিয়েছেন সেখানে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি।

'Roy Bahadoor's belly's unhappiness, all day to day, sir. No eating wine, rice eating no, no eating nothing—but coming here must certain just now. This municipality is a farmer's municipality and if free fight doing, you will die for us, therefore we invite Policeinspector and give him bribe' (পৃঃ ১৪০)।

দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভোটদাতাদের প্রলুব্ধ করার বিষয়টি। মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী বনওয়ারীলালের তাঁবুর গায়ে ভোটদাতাদের আকৃষ্ট করে নানা কিছু লেখা ছিল। বনওয়ারী-বাবুর তাঁবুতে লেখা ছিল 'রায় বাহাদুরের জয় জয়কার,' 'দেশের মঙ্গল চাও তো রায় বাহাদুরকে ভোট দাও,' 'আসুন, গয়ার তামাক তাওয়ার কল্কেয় টানুন,' 'বরফ দেওয়া গোলাপী সরবত এই তাঁবুতে,' 'একটি ভোট বিনিময়ে মটন অর্থাৎ মেষ মাংসের চপ্, কাটলেট্ কারি, পোলাও' 'ভেবে দেখুন কি সুবর্ণ সুযোগ' ইত্যাদি।

ভোটদাতাদের যেন তেন প্রকারেণ প্রলুব্ধ করে নির্বাচন বৈতরণী উত্তীর্ণ হওয়ার ট্রাডিশন এদেশে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এ তারই প্রতিফলন।

নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন প্রণীত **'প্রেমের পাথার'** নাটকটির প্রকাশকাল ১৩১৪ (২য় সংস্করণ)। নাটকটি ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। মোট তিনটি অঙ্কে নাটকটি সমাপ্ত। লুরিস্থানের নবাব শা-আলম নাটকটির প্রধান চরিত্র। শা-আলম ছিলেন দানবীর। প্রার্থী কখনও তাঁর কাছ থেকে বিমুখ হয়ে ফিরত না। একদা এক ফকির এই দানশীলতার সুযোগ নিয়ে শা-আলমের রাজ্যের অধিকারী হয়ে বসে। শা-আলম তাঁর পত্নী মহাতাব এবং দুই পুত্র মওলা ও মহবুবকে নিয়ে পথে এসে নামেন। নানা প্রতিকূলতার পর শা-আলম পারস্যের সিংহাসনে যেমন অধিষ্ঠিত হন, তেমনি লাভ করেন তাঁর নিজের রাজ্যও। যে ফকির শা-আলমের রাজ্য গ্রহণ করেছিল, সেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে লুরিস্থানের নবাবকে তাঁর রাজ্য প্রত্যর্পণ করে পুনরায় ধর্মপথে নিজেকে উৎসর্গ করার বাসনা প্রকাশ করে।

শা-আলমের পরোপচিকীর্ষা, মহানুভবতা তাঁকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে। মহাতাবকেও সুযোগ্য নবাবের উপযুক্ত পত্নী রূপে দেখা গেছে।

গীতিনাট্য বলে বেশ কিছু সঙ্গীত নাটকটিতে সংযোজিত হয়েছে।

পারস্য রাজ্যের সিংহাসনে শা-আলমকে অধিষ্ঠিত করার পরে তাঁর যোগ্যতার যে পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে তা একই সঙ্গে নাটকীয় এবং চমকপ্রদ। মাঝে মাঝে নাট্যকার কিছু হাস্যরস সৃষ্টির চমৎকার প্রয়াস করেছেন। যেমন ১ম নাগরিক চুরি বন্ধের জন্য ওমরাহদের চালাকির ব্যাখ্যা করে বলেছে যেহেতু রাত্রেই চুরি বেশি হয় তাই দরবারের লোকেরা দিনের বেলা সকলকে ঘুমুতে এবং রাত্রে সকলকে জেগে থাকতে হুকুম দিয়েছে। নাগরিক উত্তরে বলেছে সকলে দিনের বেলায় ঘুমোয় জেনে চোরেরা যদি দিনে চুরি করে তাহলে কি হবে? উত্তরে ১ম নাগরিক জানিয়েছে—'চোর ত আর বাপু তোমার মতন পণ্ডিত নয়, চোরেরা জানে রাত্তিরেই চুরি কত্তে হয়।'

১ম নাগরিক বুদ্ধি চর্চার যে ইতিহাস শুনিয়েছে তাও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

'আগে মন-মাটীকে বেশ করে খোঁড়ো, তারপর ভালভাল কেতাবের বীজ পোঁত, তবে না আমাদের মতন আক্কেল পাবে।' (পৃঃ ৭৩)

নাটকের নানা স্থানেই বেশ ভাল ভাল কিছু উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে। যেমন —'প্রেমময়ের প্রেমের সংসারে, সকলে যেন, শা-আলমের মতন প্রেমের জিনিস সওদা করে। বুঝে চলতে পাল্লে, সকলের কাছেই সংসার মরুভূমি নয়, এ শান্তিময় প্রেমের পাথার।'

শ্রীমতী অনুকূলা বালা দেবী প্রণীত **বীণাপাণি** নাটকটির প্রকাশকাল ১৩২৬। তবে নাটকটি প্রকাশের অন্ততঃপক্ষে ১৫।১৬ বৎসর পূর্বেই রচিত হয়েছিল।

নাটকটির একেবারে প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরমে'র অনুসরণে দীর্ঘ ভারত বন্দনা সংযোজিত হয়েছে।

জয় জ্যোতির্ময়ী ভারতলক্ষ্মী জগৎ-জনমোহিনী
নীল সিন্ধু জলে নীলপদ্ম রূপিনী
সুনির্মল প্রভাকর উজল-রশ্মি মালিনী,
নীল নভঃতলে ফুল্ল শশিকর-সুহাসিনী।

নাটকটি পঞ্চাংক বিশিষ্ট। মহিলা রচিত নাটকে শুধু যে মহিলা চরিত্রের নামানুসারে নাটকের নামকরণ লক্ষণীয় তাই নয়, মহিলা চরিত্রগুলিকেও লেখিকা আদর্শ পরায়ণা, সতী সাধ্বীরূপে চিত্রিত করেছেন। মূলতঃ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আদর্শই এইসব চরিত্রে মূর্ত হয়েছে। নাটকটির নায়িকা লক্ষ্মীপুরের রাজকন্যা বীণাপাণি। এই চরিত্রে ত বটেই, তাছাড়া প্রসাদ কুমারের পত্নী ঊষাবতী, গঙ্গাধরের পত্নী অপর্ণা এদের মধ্যেও লেখিকা আদর্শ পরায়ণাতাকেই উজ্জ্বল করে তুলেছেন। বিপথগামী একাধিক পুরুষ চরিত্র নারীদের প্রভাবে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। এদের মধ্যে রয়েছে শ্রেষ্ঠী প্রসাদ কুমার, কাপালিক গঙ্গাধর স্বামী, দস্যুপতি রঘুপতি। নাটকটি কাল্পনিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। সংলাপ, নাটকীয় দ্বন্দ্ব অথবা চরিত্র চিত্রণে লেখিকা নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখতে পারেননি। সংলাপ মাঝে মাঝে শুধু অকারণে দীর্ঘই হয়নি, কখনও সাধু আবার কখনও তা চলিতে রচিত হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম অংকে মাঝে মাঝে আবার পদ্যে রচিত সংলাপ সংযোজিত হয়েছে। নাটকে সঙ্গীতের আধিক্য চোখে পড়ার মত। মোট ষোলটি সঙ্গীত সংযোজিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'দুইটি হৃদয়ে একটি আসন' এবং 'সুখে থেকো আর সুখী করো সবে এই গান দু'টি রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে নেওয়া।

নাটকে সমসাময়িক কালের নানা সামাজিক প্রথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন বাল্যবিবাহ, বধূবরণ সংক্রান্ত নানা লোকাচার ইত্যাদি স্থান পাওয়ায় নাটকটির অন্যবিধ গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখিকা নাটকের একটি ক্ষেত্রে অলৌকিকত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। শ্বশুরালয়ে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে কাপালিক গঙ্গাধর স্বামী নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীরে রাজকুমার কুশল সিংহের মৃত্যু হলে বেহুলার অনুসরণে বীণাপাণি মৃত স্বামীর দেহ সাতদিন ব্যাপী অনাহারে অনিদ্রায় ক্রোড়ে ধারণ করে দেবীর কাছ থেকে সতীত্বের কারণে মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ লাভ করে তাই সেবন করিয়ে কুশল সিংহকে বাঁচিয়ে তুলেছে।

লেখিকার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয়ও নাটকটিতে পাওয়া যায়। বেশ কিছু প্রবাদ বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ সংলাপে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। যেমন মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন (পৃঃ ২০), ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির (পৃঃ ৩২), ঘরের শত্রু বিভীষণ (৩৫), হরিষে বিষাদ (৮৭), বিনা মেঘে বজ্রপাত (৮৯), কোথায় রাম রাজা হবে না কোথায় বনবাস (১০৫)।

তৃতীয় অধ্যায়

মনীষী রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'চরিত-কথা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করে বলেছেন, 'বঙ্কিমবাবুর পূর্বেও অনেকে বাঙলা নবেল লিখিয়াছিলেন ; তাহাতে কিসের যেন অভাব ছিল। ইংরাজী-নবীশ অনেক লেখক ইংরাজী নবেলের অনুকরণে বাঙলা নবেল লিখিয়াছিলেন ; কিন্তু কি একটা অভাবের জন্য সেগুলি বাঙলা সাহিত্যে লাগে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র নবেল লিখিলেন, আর একদিনেই বাঙলায় সাহিত্যের একটা নূতন শাখার সৃষ্টি হইল।'

বস্তুতঃ প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস রচয়িতা হিসাবে বঙ্কিমের কৃতিত্ব যেমন সর্বজন স্বীকৃত সত্য, তেমনিই সত্য প্রাক্ বঙ্কিম ও বঙ্কিম সমসাময়িক কালে অধিকাংশ উপন্যাস রচয়িতারই সাহিত্যের এই আধুনিক মাধ্যমটির সার্থক ব্যবহারে নিদারুণ ব্যর্থতা। প্রাক্ বঙ্কিম পর্বে ত বটেই, এমনকি বঙ্কিমের সমসাময়িক কালেও যাঁরা বঙ্কিমের সাফল্যে আকৃষ্ট হয়ে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্যে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ এঁদের অধিকাংশেরই উপন্যাস সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না, ছিল না উপযুক্ত প্রতিভা। কেউবা উপন্যাসকে নিজেদের বিশেষ ধর্ম বিশ্বাস প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। কেউবা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার প্রাধান্য সম্বলিত গতানুগতিক কাহিনীকে উপস্থাপিত করেছেন। উপন্যাসের অবলম্বিত বিষয় বলতে আদিরসাত্মক রোমাণ্টিক কিংবা নীতি-মূলক কাহিনীর একাধিপত্য। তবে একটা বৈশিষ্ট্য উপন্যাস রচয়িতাদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়—দেবদেবীর প্রসঙ্গকে এঁরা সযত্নে পরিহার করে মানুষকে এঁদের কাহিনীতে স্থান দিয়েছেন। এইসব মানুষদের সিংহ ভাগ অধিকার করেছে অবশ্য বিভিন্ন রাজকুমার, রাজকুমারী, মন্ত্রীপুত্র প্রমুখেরা। আর অধিকাংশ উপন্যাসেই লেখকেরা দেখাতে চেয়েছেন নায়ক-নায়িকার প্রেম। এত দ্রুততায় সেই প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং নায়ক নায়িকা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্যক রূপে পরিচিত হবার পূর্বেই মিলনের জন্য যে তীব্র বাসনা প্রকাশ করেছেন তাতে এইসব লেখকদের আধিভৌতিক কার্যকারণে আস্থাশীলতা অস্বীকৃত হয়েছে। রূপকথায় যেমন রচয়িতাদের অভিজ্ঞতার কার্যকারণ সম্বন্ধ শিথিলভাবে প্রকাশিত, তেমনি আলোচিতব্য উপন্যাসগুলিতেও সেই শৈথিল্য প্রকাশিত। ফলে এগুলির অধিকাংশই রূপকথা ধর্মী রচনায় পর্যবসিত। বেশ কয়েকটি উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার আচরণে এমনই সাদৃশ্য, যে তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিহার করে যেন শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিনিধিত্ব করেছে। গার্হস্থ্য জীবন চিত্রের দিকে লেখকেরা তেমন দৃক্‌পাত করেন নি। কোনক্রমে নায়ক-নায়িকার মিলনের স্বপ্নকে ফলবতী করাতেই তাঁরা তাঁদের কর্তব্যকে নিঃশেষিত করে যেন মুক্তির আনন্দ লাভ করতে চেয়েছেন।

অবশ্য এর যে ব্যতিক্রম ঘটেনি তা নয়। তবে অবশ্যই সে সব উল্লেখযোগ্য

উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্তই আঙ্গুলে গোনার মত। এমনকি কেউ কেউ ত কাহিনীকে আনুপূর্বিক গদ্যে বর্ণনা না করে পদ্যেরও আশ্রয় নিয়েছেন। এক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের প্রচলিত মাধ্যমটিকে একেবারে ত্যাগ করতে লেখকেরা অনেক ক্ষেত্রেই যে দ্বিধান্বিত ছিলেন তার পরিচয় মেলে। আবার নূতনত্ব সৃষ্টির মানসিকতাও এক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে থাকবে। তবু বাংলা উপন্যাসের ধারাটিকে বোঝার জন্য এইসব অকিঞ্চিৎকর আখ্যান এবং উপন্যাসগুলি আলোচনারও প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আমরা এইসব অবহেলিত বিস্মৃত অথচ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে লেখকদের যে পর্যবেক্ষণ শক্তি, পরিবেশিত গার্হস্থ্য জীবন চিত্র তথা সমাজজীবন, ঘটনা পরম্পরার যেটুকু পরিচয় লাভ করেছি সেই সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। বর্তমান অধ্যায়ে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে রচিত উপন্যাস ছাড়া কুড়িটির মত শুধু শতাব্দীকালের প্রাচীন উপন্যাসের আলোচনাই স্থান পেয়েছে, যেগুলি এপর্যন্ত প্রায় অনালোচিত থেকে গেছে। তাছাড়া কয়েকটি গল্প গ্রন্থও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কেদারনাথ দত্ত প্রণীত '**নলিনীকান্ত**' উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১২৬৬। লেখক উপন্যাসটির উৎপত্তি কিংবা রচনারীতি সম্পর্কে 'আভাষে' যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে লেখকের নিজের উপন্যাস রচনার ব্যাপারে যেমন পূর্ণ আস্থা ছিল, তেমনি 'নলিনীকান্তে'র রসোত্তীর্ণতা বিষয়েও তাঁর কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হয় যে লেখক আমাদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন। অতিরিক্ত প্রেমাসক্তি মানুষকে কিভাবে অমানুষ করে তোলে, বিচার বুদ্ধি কর্তব্য হীন করে মানুষকে অধঃপতনের অতল গর্ভে নিমজ্জিত করে, সেই বিষয়ে পাঠককে প্রকারান্তরে সাবধান করার উদ্দেশ্যেই যেন উপন্যাসটি রচিত। ফলে লেখকের উদ্দেশ্যই শেষ পর্যন্ত প্রকটরূপে আত্মপ্রকাশ করে 'নলিনীকান্ত'কে ব্যর্থ করে দিয়েছে। লেখক উপন্যাসটিকে 'করুণ রসাশ্রিত উপাখ্যান' বলে অভিহিত করলেও পাঠকচিত্ত করুণ রসে দ্রবীভূত ত হয়ই না, বরং নলিনীকান্তের পরিণতিতে খুশী হয়, এর নির্লজ্জ আচরণের পরিসমাপ্তিতে পাঠক হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বিন্দুমাত্র সহানুভূতি এদের জন্য উদ্রিক্ত হয় না। আর এইখানেই লেখকের ব্যর্থতা।

লেখক উপন্যাসটি রচনার সূত্রের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এই পুস্তকের উৎপত্তির কারণ বড় চমৎকার। ১২৬৩ সালে আমি ভারতবর্ষের এক বিস্তীর্ণ ইতিহাস রচনারম্ভ করি এবং ঐ মহৎ দুষ্কর ব্যাপারে কিয়ৎকাল নিযুক্ত থাবি, ইতিমধ্যে আমি একদা ফরাসী হইতে ইংরাজীতে অনুবাদিত ফিলাজাফর ও আকট্রেশেশ (Philosopher and Actresses) নামক বিবিধ উপাখ্যান সংঘটিত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগস্থ প্রসিদ্ধ চিত্রকর করনিলিয়স স্কটের (Cornelious Schut) মনোরম্য উপাখ্যান পড়িতেছিলাম, পড়িতে পড়িতে আমার মন

এরূপ অলৌকিক রূপে উৎসাহিত হইল, যে আমি তৎক্ষণে এই উপাখ্যান রচনারম্ভ করিলাম।'

উপন্যাসের কাহিনীটির প্রেক্ষাপট সুদূর কাশ্মীর। কাশ্মীরে চন্দ্রভীম নামক রাজার পুত্র নলিনীকান্ত। নলিনীকান্তের বিবাহ হয় ভূপাল রাজের কন্যার সঙ্গে। বিবাহিত নলিনীকান্ত কাশ্মীরের এক উপবনে ভ্রমণকালে সুলোচনা নাম্নী এক রমণীর দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে কুরঙ্গিনী নাম্নী এক বারবিলাসিনীর অট্টালিকায় উপনীত হয়। কুরঙ্গিনীর প্রেমে আসক্ত হয়ে নলিনীকান্ত সব কিছুই বিস্মৃত হল—বিস্মৃত হল তার পদগৌরব, কর্তব্যবোধ, স্ত্রী, পিতা-মাতার কথা, বিস্মৃত হ'ল লাজ-লজ্জার কথা। সুলোচনার পরামর্শে কুরঙ্গিনীর গৃহে আমন্ত্রিত হল চিত্ররথ নামক গন্ধর্বের কন্যাগণ—কাদম্বিনী সুবর্ধনী, পদ্মিনীরা। এদের সকলের সঙ্গে নলিনীকান্ত মদ্যপান করল, প্রেমক্রীড়ায় মত্ত হল। শেষে তার মধ্যে দেখা দিল অনুশোচনা, বোধ করল বিবেক দংশন। কুরঙ্গিনীর কাছ থেকে যখন সে পলায়নের পরিকল্পনা করছে, তখনই একদিন রাত্রে বন্দী হিমসাগরের কাছে কুরঙ্গিনীকে নির্লজ্জভাবে প্রেম নিবেদনে রত দেখে নলিনীকান্ত কৌশলে পালাল। পলায়নের সময় শৈল কারাগারে বন্দী রাজকুমার রসিকরঞ্জনকে মুক্তি দিল। কিছুকাল কাশ্মীরে অতিবাহিত করে রসিকরঞ্জন স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করল। কিন্তু নলিনীকান্ত কুরঙ্গিনীকে বিস্মৃত হতে পারল না। সে পালাল এবং কুরঙ্গিনীর প্রাসাদের কাছে এসে অচৈতন্য হয়ে পড়ল এবং মৃত্যু বরণ করল।

রসিকরঞ্জন নেপালের রাজকুমার, প্রেমে পড়াই যেন তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভুটানে বেড়াতে গিয়ে সে রাজকন্যার সহচরীর প্রেমে পড়েছে। ভুটান-রাজ রসিকরঞ্জনকে তার কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করে দিলে সে নেপালে ফিরে গেছে। কিন্তু মনে তার অতৃপ্তি। ছুটে গেছে কামাখ্যায়। কামাখ্যায় পরিচারিকাদের প্রতিও সে প্রেমাসক্ত হয়েছে। পিতার সঙ্গে শিকারে গিয়ে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং নানাস্থান পর্যটন করে উপস্থিত হয়েছে কুরঙ্গিনীর কাছে। অপর ব্যক্তির সঙ্গে কুরঙ্গিনীকে প্রেমলীলা করতে দেখে রসিকরঞ্জন চলে যেতে চাইলে সে বন্দী হয়েছে। মুক্তি পেয়েছে সে নলিনীকান্তের সাহায্যে। শুধু বন্দীদশা থেকেই নয়, সেইসঙ্গে কুরঙ্গিনীর মোহপাশ থেকেও, যা তার মুক্তিদাতাও পায়নি।

কুরঙ্গিনী শুধু প্রেমক্রীড়াতেই পারদর্শিনী নয়, লেখক দেখিয়েছেন সে সূচিকার্যেও নিপুণা সাজ-সজ্জাতেও অতুলনীয়া। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সর্প দংশনে সে মৃত্যু বরণ করেছে।

উপন্যাসটির আকর্ষণীয় অংশ হল কুরঙ্গিনীর সজাগ প্রহরা সত্ত্বেও কৌশলে নলিনীকান্তের পলায়ন এবং বন্দী রসিকরঞ্জনকে মুক্তিদান। এই অংশে কিছুটা রূপকথার আমেজ পাওয়া যায়। প্রেমে মত্ত হওয়ার পরিণতি প্রসঙ্গে নলিনী-কান্তের সঙ্গে রসিকরঞ্জনের কবিতায় কথোপকথনটিও উপভোগ্য। লেখক দৈববাণীর বিষয়ে যা বলেছেন আসলে তা নলিনীকান্তের বিবেক দংশন।

লেখক সগর্বে জানিয়েছেন, 'ইহা নাটকভাবে রচিত, কাব্যভাবে বর্ণিত এবং উপাখ্যানাশ্রিত।' কিন্তু দুঃখের বিষয় এর যে কোন একটিতে সার্থকতা লাভ করলেই পাঠক তৃপ্ত হতে পারত। বাস্তবে কিন্তু তা ঘটেনি।

ব্রাহ্মধর্মই যে শ্রেষ্ঠ এবং এই ধর্মের প্রতি আস্থা স্থাপনকারীরা একদিকে যেমন ঈশ্বরের করুণায় সর্বপ্রকার দৈব দুর্বিপাক অথবা প্রতিকূলতা থেকে মুক্তিলাভ করে, তেমনি এই ধর্মের প্রতি আস্থা স্থাপনকারীরা চারিত্রিক মহিমাতেও ভাস্বর হন—এই বক্তব্য প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই হালিশহর কুমারহট্টের কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়ের '**কুমুদিনী**' উপাখ্যানটি রচিত। 'কুমুদিনী'র প্রকাশকাল ১২৬৯ বঙ্গাব্দ। বলাবাহুল্য লেখক নিজেও নিশ্চয়ই ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন, নতুবা ব্রাহ্মধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে তাঁকে এবংবিধ আখ্যান পরিকল্পনায় মনোযোগী হতে দেখা যেতনা।

আলোচ্য আখ্যানের ঘটনাস্থল ভারতবর্ষের অন্তর্গত শিখর নামক জনপদ আর আখ্যানের নায়ক শিখর অধিপতির কনিষ্ঠপুত্র শশধর, নায়িকা অমাত্য দুহিতা কুমুদিনী। শিখর অধিপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র অরুণের সঙ্গে অমাত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র তরুণের গভীর সম্প্রীতি। অপরদিকে শশধরের সঙ্গে গভীর ভাব কুমুদিনীর। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক গভীরতার কারণ কুমুদিনীর বিদ্যাচর্চার প্রতি মনোযোগ। শশধর কুমুদিনীকে তার অধীত জ্ঞান নিয়মিত দান করেছে, কুমুদিনীরই তাগিদে। উভয়ে খ্রীষ্টানদের যথেচ্ছাচার ও হিন্দুদের মূর্তি পূজায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মধর্মে আস্থা স্থাপন করেছে। গান্ধর্ব মতে উভয়ের বিবাহও হয়েছে।

অরুণ ও তরুণ বিপথগামী হয়েছে। তাদের যত রাগ শশধরের প্রতি। তাই চক্রান্ত করেছে তারা শশধরের সর্বনাশের। প্রস্তাব দিয়েছে শশধরকে দেশ পর্যটনের। কুমুদিনীর নিষেধ সত্ত্বেও শশধর সরল বিশ্বাসে অরুণ ও তরুণের অনুগামী হয়েছে। কিন্তু জলযান থেকে নিদ্রিত শশধরকে তারা জলমধ্যে নিক্ষেপ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। ঈশ্বর করুণায় শশধর কিন্তু বিস্ময়করভাবে রক্ষা পেয়েছে।

শিখর অধিপতির মৃত্যুতে অরুণ সিংহাসনে আরোহণ করল, তার সচিব হল তরুণ। একদিন অরুণ কুমুদিনীকে কু-প্রস্তাব দিলে, সে তাতে সম্মত না হওয়ায় স্বভাবতঃই অরুণ কুমুদিনীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তার চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করে তরুণকে প্ররোচিত করল তাকে নির্বাসন দিতে। বলপ্রয়োগে কুমুদিনীকে নিয়ে যাওয়া হল বনবাসে। এখানে সে দস্যুদের কবলে পড়ল। কিন্তু কে তার অধিকারী হবে এই নিয়ে দস্যুরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে প্রাণ দিল। কেবল একজন দস্যু বেঁচে রইল। সে বলপূর্বক তার সতীত্ব হরণ করতে গেলে একটি বিক্ষ কর্তৃক সে অপহৃত হল। শেষ পর্যন্ত উপবন মধ্যে কুমুদিনীর সঙ্গে শশধরের সাক্ষাৎ হ'ল। দীর্ঘদিন পরে উভয়ের মিলন ঘটায় উভয়ে 'জগৎপিতার মহিমা বর্ণন ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া একবার একত্র হইয়া

সেইস্থানেই ভক্তিভরে উপাসনায় আসীন হইলেন।' (পৃঃ ৬৬)

অরণ্যমধ্যে দুজনের সাক্ষাৎ লাভ ঘটল এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। ইনি প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্বিতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়া স্ত্রীকে অসচ্চরিত্র জেনে তাকে হত্যা করে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। এই সন্ন্যাসী কুমুদিনী ও শশধরকে ব্রাহ্মধর্মের আচার্যের ন্যায় উপদেশ দিয়েছেন —'ইনি হস্তপদ অথবা অন্য কোন সামান্য অঙ্গ বিশিষ্ট নহেন সুতরাং ইঁহার সৌসাদৃশ্যে বস্তুত জগতে আর দুর্লভ।' শেষ পর্যন্ত অরুণ ও তরুণের দুষ্কর্ম ধরা পড়ে গেছে। শিখর রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা উভয়কে শাস্তিদানের জন্য দ্বীপে নিয়ে এলে শশধর ও কুমুদিনীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে। উভয়ের অনুরোধে অরুণ ও তরুণ নিষ্কৃতি পেয়েছে। সকলে একসঙ্গে উপাসনা করেছে। শশধর দেশে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেছে, কুমুদিনী আত্মনিয়োগ করেছে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে। ব্রাহ্ম আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায় সমবেত উপাসনায় ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপে এবং ঈশ্বরের নিরাকার বর্ণনায়। তাছাড়া ব্রাহ্ম ধর্মের অনুকরণকারীদের উন্নত চরিত্রের বলে দেখান হয়েছে। কাহিনী পরিকল্পনায় তেমন কিছু অভিনবত্ব নেই। চরিত্র চিত্রণেও তেমন মুন্সীয়ানার স্বাক্ষর লেখক রাখতে পারেননি। গ্রন্থে গদ্য ও পদ্য দুইই ব্যবহৃত হয়েছে। পদ্যে পয়ার, দীর্ঘ ত্রিপদী, একাবলী, লঘু ত্রিপদী ব্যবহৃত হয়েছে। গদ্যের ভাষা সংস্কৃতানুগ। যেমন—'গম্ভীর প্রকৃতি ধারণ করিলে জগজ্জনক জগদাত্মার দূত স্বরূপ শশঙ্ক স্বীয় অনীকিনী তারকামালা সমভিব্যাহারে নভোমণ্ডল মধ্যস্থলে আসীন হইয়া প্রাণিপুঞ্জের অবস্থা সন্দর্শন করিতে আরম্ভ করিলে কুমুদিনী ও শশধর নিজ হর্ম্যের পার্শ্ববর্তী উপবনে আগমন পূর্বক স্বভাব সন্দর্শন করিতে করিতে ও তথায় ঈশ্বরোপাসনা সমাধানান্তর হর্ষবিষাদ গ্রস্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করত সুষুপ্ত্যাবস্থায় বিভাবরী যাপন করিলেন।' (পৃঃ ২৪)

গোপীমোহন ঘোষের '**বিজয়বল্লভ**' উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে। এটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় কুড়ি বছর পরে। লেখক গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন—

'ইংলণ্ডীয় ভাষায় নবল নামে মনোহর প্রসিদ্ধ উপাখ্যান গ্রন্থ সকল যে প্রণালীতে সঙ্কলিত হইয়া থাকে, সেই প্রণালী অনুসারে এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে।' অবশ্য লেখক পরে স্বীকার করেছেন—

'......এতদ্দেশীয় লোকের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজি নবলের ন্যায় প্রবন্ধ রচনা করা সুকঠিন।'

আমরা প্রথমে উপন্যাসটিতে বর্ণিত কাহিনীটির পরিচয় নিতে পারি। বিশারদ নামে এক ধীবর এবং তার পত্নী সর্পাঘাতে মৃতপ্রায় এক বালকের জীবনদান করে। ধীবরটি সর্পবিদ্যা জানত। এক ধনবান ব্যক্তি সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে বালকটিকে ধীবরদের কাছ থেকে নিয়ে যায়। এই বালকটিকে ধনপতি মানুষ করে এবং এরই নাম হয় বিজয়বল্লভ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে

ধনপতির কোনো সন্তান ছিল না।

মগধ-অধিপতি বীরসিংহ বিজয় বল্লভের সঙ্গে রাজপুত্র শান্তশীলের বন্ধুত্ব করিয়ে দিতে আগ্রহী হলেন, কারণ তাঁর মনে হল রাজপুত্র শান্তশীল বিজয়-বল্লভের কাছ থেকে সৎ উপদেশ প্রাপ্ত হবে।

ধনপতির পরামর্শে বিজয় বল্লভ মনোরথ নামক অশ্বে আরোহণ করে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করল। মগধ অধিপতি বিজয়কে সমাদরপূর্বক গ্রহণ করলেন। অপরাহ্নে স্বর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ এক সারিকা উড়ে বিজয় বল্লভের সামনে এলে বিজয় সেটি রাজবাটীর বিবেচনায় ধরে এবং রাজকুমারী চম্পক-লতার সহচরী সুলোচনার হাতে দেয়। আসলে সারিকাটি ছিল রাজকন্যার।

বীরসিংহ উত্তর প্রদেশ থেকে যে ব্যাঘ্র ধরে এনেছিলেন সেটি আকস্মিকভাবে খাঁচা খুলে বেরিয়ে পড়ে এবং রাজকন্যাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে বিজয় বল্লভ তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। বীরসিংহ এজন্য বিজয় বল্লভকে প্রভূত অর্থদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলে বিজয় তা গ্রহণে অসম্মত হয়, সে জানায় সে তার কর্তব্য সম্পাদন করেছে মাত্র।

বিজয় বল্লভ বীরবাহুর সুনজরে থাকায় বিজয়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে সোমদত্ত। সোমদত্তের প্রকৃত নাম পাতঙ্গী। সে পেশায় বৈদ্য। তার আদি নিবাস ছিল অযোধ্যা নগর। দুষ্কর্মের জন সে অযোধ্যাপতি জয়ধ্বজ কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছিল। সোমদত্ত এরপর বীরসিংহের আশ্রয় লাভ করে। সে বীরসিংহকে মিথ্যা করে বলে যে রাজার ধনুর্দ্ধর অনুচরের শরাঘাতে তার একমাত্র পুত্র শরবিদ্ধ হয় এবং হিংস্র জন্তু কর্তৃক সে অপহৃত হয়। পুত্র বিনা তার পক্ষে জীবনধারণ করাই অসম্ভব। বীরবাহু করুণাপরবশ হয়ে সোমদত্তকে নিজের কাছে আশ্রয় দেন। এ হেন সোমদত্ত বিজয় বল্লভের বিরুদ্ধে রাজপুরোহিত কপিঞ্জলের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

কপিঞ্জল একদিন গভীর রাত্রে ক্রন্দনের দ্বারা বীরসিংহকে আকৃষ্ট করল। জানাল সে রাজমহিষীর আদেশে রাজকন্যার স্বস্ত্যয়ন করতে গিয়ে দৈববাণী শুনেছে যে বীরসিংহ জারজ চণ্ডাল পুত্রের সহবাসে ধর্মভ্রষ্ট, আর তারই কন্যার কল্যাণে কিনা কপিঞ্জল দৈবক্রিয়ায় রত। কপিঞ্জলও এ কারণে দোষী এবং তার গৃহ হোমাগ্নিতে ভস্মীভূত হবে। সত্যসত্যই তার গৃহদাহ হয়েছে। কপিঞ্জল রাজাকে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিজয়কে পরিত্যাগ করার কথা বলেছে। রাজা বীরসিংহ কপিঞ্জল প্রদত্ত বিজয়-এর পরিচয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন।

এদিকে বিজয় তার পিতা-মাতার সন্ধানে প্রবৃত্ত। এক ব্রাহ্মণ তাকে পরামর্শ দিয়েছে বিন্ধ্যাচলে গিয়ে কাত্যায়নীর আরাধনায় ব্রতী হয়ে নিরুদ্দিষ্ট পিতা-মাতার সংবাদ অবহিত হতে। সেইমত সে বিন্ধ্যাচলে উপনীত হয়েছে। তিন মাস ব্যাপী সে এখানে অবস্থান করেছে কাত্যায়নীর কাছ থেকে মাতা-পিতার সংবাদ লাভের প্রত্যাশায়। এখানেই আকস্মিকভাবে তার জীবনদাতা ধীবরের সঙ্গে পরিচয় হয়, সে জানতে পারে আগামী কার্তিকী অমাবস্যায় তাকে বলি দেওয়া হবে। বিজয় পলায়ন করে। কিন্তু অকারণে বন্দী হয়ে সে আনীত

হয় কোশলাধিপতি জয়ধ্বজের কাছে।

জয়ধ্বজ রাজা বীরসিংহকে সংবাদ দিয়েছেন বিংশ স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে বন্দী বিজয়বল্লভকে তিনি ছাড়িয়ে নিতে পারেন অথবা যুদ্ধ করে তাকে মুক্ত করতে পারেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই অনুষ্ঠিত হল। যুবরাজ শান্তশীল পর্যুদস্ত হল। এদিকে বিজয়বল্লভকে হত্যার আদেশ দেওয়া হল। বিজয় পাঁচটি স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে ছাড়া পেল। বিজয় এক জলমগ্ন বৃদ্ধাকে বাঁচাল। তারপর মিলিত হল শান্তশীলের সঙ্গে। একদিন রাত্রে যে বৃদ্ধাকে সে বাঁচিয়েছিল তার কাছে যাবার সময় সোমদত্তের চক্রান্তে সে বন্দী হয়ে অযোধ্যায় আনীত হল। তার মৃত্যুদণ্ড হল। ঘাতকেরা তাকে আঘাত করার পূর্বেই রাজার আদেশে বিজয়ের দণ্ড রহিত করা হল।

ধীবরের মাধ্যমে বৃদ্ধা বিরজা এবং রাজকুমারের দাসী রেবতী বিজয়ের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারে। তারা রাজসমীপে উপনীত হয়ে বিজয়ের পরিচয় দেয়। জানা যায় সে জয়ধ্বজ এবং চন্দ্রাবলীর সন্তান। জ্যেষ্ঠারানী পদ্মাবতীর প্ররোচনায় পাতঙ্গী ওরফে সোমদত্ত সর্পাঘাতে বিজয়ের মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছিল। আত্মহত্যা করে পাতঙ্গী। চম্পকলতার সঙ্গে বিজয়ের বিবাহ হয়। বিজয় পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হল।

আচার্য সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,'...কি প্লটে কি চরিত্র চিত্রণে কোথাও বিলাতি উপন্যাসের স্বাদ গন্ধ পাওয়া যায় না।' আচার্য সেন গোপী মোহন ঘোষ অবলম্বিত বিদ্যাসাগরীয় রচনা রীতিকেই উপন্যাস রচনার পক্ষে একেবারে অচল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তবে সেই সঙ্গে বঙ্কিমের একাধিক উপন্যাসে আলোচ্য উপন্যাসটির ছায়াপাত তিনি লক্ষ্য করেছেন বলে জানিয়েছেন।

একথা ঠিকই যে পাশ্চাত্য উপন্যাসের সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসটির তুলনা চলে না। গুণগত উৎকর্ষে পাশ্চাত্য উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও আলোচ্য উপন্যাসটিকে একেবারে অচ্ছুত বলে মনে করারও কোন যুক্তি নেই। লেখক ছদ্ম ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার একটা প্রয়াস করেছিলেন। দীর্ঘ ১২৫ বৎসর পূর্বে রচিত উপন্যাসটিতে লেখক যে আখ্যান পরিকল্পনা করেছিলেন ত্রুটি যুক্ত হলেও তা উপভোগ্য এবং বিশেষত উপন্যাসটির সমাপ্তি যে নাটকীয় তা অনস্বীকার্য। যে জয়ধ্বজের নির্দেশে বিজয়বল্লভের প্রাণ দণ্ড হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বিজয়বল্লভ সেই জয়ধ্বজেরই সন্তান। যেভাবে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিজয়বল্লভের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠককে আকৃষ্ট করে।

জ্যেষ্ঠারানী পদ্মাবতীর প্ররোচনায় বিজয়বল্লভের জীবন বিপন্ন হওয়া, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয়বল্লভের জীবন রক্ষা এবং রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনায় লোক কথার **'Successful youngest son'** অভিপ্রায়টিই যেন মূর্ত হয়েছে। তাছাড়া পদ্মাবতীর আচরণ আমাদের সমাজের দীর্ঘকালের প্রচলিত সতীন বিদ্বেষের পরিচায়ক। পাতঙ্গী চরিত্রটি যেন আমাদের খুব পরিচিত। বৃত্তিতে সে বৈদ্য তার কাজ মানুষের জীবন রক্ষা, কিন্তু জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীর

প্ররোচনায় সে অবলীলাক্রমে কনিষ্ঠা রানীর সন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সে যেভাবে রাজার আশ্রয় লাভ করেছে, তাতে তার কূট কৌশলী বুদ্ধির পরিচয় মেলে। কিন্তু সে যেভাবে বিজয় বল্লভের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে, উপন্যাসে তার কারণ বর্ণিত হয়নি। তার এই আচরণ অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট। ঔপন্যাসিক যদি দেখাতেন যে সে বিজয়ের প্রকৃত পরিচয় পূর্বেই পেয়েছিল তাহলে বিজয়বল্লভের বিরোধিতার একটা অর্থ পাওয়া যেত। কিন্তু ঔপন্যাসিক সে সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত দেন নি। অবশ্য সোমদত্তের আত্মহত্যার মাধ্যমে **Poetic Justice** রক্ষিত হয়েছে স্বীকার করতে হয়।

বিজয়বল্লভ চরিত্রটিকে মোটামুটি ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। তার কর্তব্য পরায়ণতা, নির্লোভ আচরণ, শক্তিমত্তা, বন্ধু প্রীতি তাকে উপন্যাসের নায়ক-উপযোগী করেছে।

উপন্যাসটির সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র হল কপিঞ্জল, রাজ পুরোহিত। সোমদত্তের প্ররোচনায় সে যে ভাবে গভীর রাত্রে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, নিজের গৃহ ভস্মীভূত করে রাজাকে বিজয়ের প্রতি বিমুখ করে তুলেছে, তার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে ধর্মের সহায়তায় তথাকথিত ধর্ম কর্মের সঙ্গে যুক্ত পুরোহিত সম্প্রদায় সমাজকে ও প্রশাসনকে নিজেদের ইচ্ছামত চালিত করে এসেছে, প্রভাবিত করেছে।

বিন্ধ্যাচলের যে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে তা বেশ উপভোগ্য, লেখকের প্রকৃতি বর্ণনা তাঁর শক্তিমত্তারই পরিচায়ক—

'উপত্যকার ভূভাগ সকল অতিশয় রমণীয়; তদূর্ধ্বে গৈরিক শৈলোপরি নিবিড় বনরাশি কটক প্রদেশ পর্যন্ত মনোহর শোভা বিস্তার করিয়াছে; স্থানে স্থানে মঞ্জুল লতা নিচয় বিপুল তরু মূলোবলম্বন পূর্বক ঊর্ধ্বস্থিত শাখা সমূহের সহিত মিলিত হইয়াছে; কোনও স্থানে বিশাল শাল দ্রুম অশনি পাতে ও অতিবাতে ভগ্নস্কন্ধ হইয়া নিম্নে নিপতিত হইয়া রহিয়াছে; কোথাও বা তরুণ পাদপগণ উত্থিত হইয়া পার্শ্বস্থিত জীর্ণ তরুকে অপনীত করিতেছে; স্থানে স্থানে বিবিধ বনকুসুম বিকশিত এবং তদীয় সুরভি মকরন্দ গন্ধ মন্দ মন্দ গন্ধ বহ সহকারে সঞ্চারিত হইয়া চতুর্দিক আমোদিত করিতেছে…' (পৃঃ ৮৭)।

বিজয়বল্লভের দৃষ্ট স্বপ্ন বৃত্তান্তটি উপন্যাসের অতিরিক্ত আকর্ষণ। এই স্বপ্নের কারণেই বিজয় একদিকে তার মাতৃ-পিতৃ পরিচয়ের জন্য ব্যাকুল হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সত্য সত্যই সে তার প্রকৃত পরিচয় অবগত হয়েছে, অন্যদিকে স্বপ্নের মাধ্যমে তার ভবিষ্যৎ পরিণতিও সূচিত হয়েছে।

বাংলা উপন্যাসের প্রতি পাঠকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার অভিপ্রায়ে এবং অপেক্ষাকৃত এই নূতন সাহিত্য মাধ্যমটির জনপ্রিয়তায় আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই শত বর্ষ কিংবা তারও পূর্বে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

দেখা গেছে এদের না ছিল কাহিনী পরিকল্পনার দক্ষতা, না ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা, চরিত্র চিত্রণেও এঁরা তেমন পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি, পরিচয় রাখতে পারেন নি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির। খিদিরপুর নিবাসী আশুতোষ বিশ্বাসও ছিলেন এমনই একজন সাহিত্য যশঃপ্রার্থী। তাঁর রচিত '**বীরজয় উপাখ্যানে**'র প্রকাশকাল ১২৭৬। আলোচ্য উপন্যাসটি একান্ত ভাবেই অকিঞ্চিৎকর। উপন্যাসে বর্ণিত উপাখ্যানটি কাল্পনিক। উপাখ্যানের নায়ক গান্ধার অধিপতি রমাপতির পুত্র বীরজয়। বীরজয়ের একদা মনে হল দেশ পর্যটনে বহুবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। সেই মত দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় এক ঋষি-কুমারের। এরপর এক ধূর্ত বণিকের পাল্লায় পড়ে তার যথাসর্বস্ব যায়। এমনকি নদীর জলে সে নিক্ষিপ্তও হয়। স্রোতে বাহিত রাজপুত্র রক্ষা পায় এক মালিনীর প্রয়াসে।

মালিনী সর্ণাট দেশের অধিপতি সুবাহুর প্রাসাদে ফুল যোগাত। সুবাহুর কন্যাকে একদিন কুঞ্জবনে দেখে একদিকে বীরজয় যেমন রাজকন্যার প্রতি আসক্ত হল, তেমনি রাজকন্যাও আসক্ত হল বীরজয়ের প্রতি। যথা সময়ে সর্ণাট অধিপতি সব অবহিত হলেন। তিনি সমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন। তারপর বীরজয়কে নিজের সিংহাসনে বসিয়ে তিনি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। বীরজয়ের একটি পুত্র হল নাম রমণীমোহন।

কিছুদিন বাদে বীরজয়ের ইচ্ছা হ'ল সুখান্বেষণে বের হবে। সেইমত সে ছদ্মবেশে ধনী দরিদ্র সব ধরণের মানুষের সান্নিধ্যে এল। কিন্তু কোথাও সুখের সন্ধান মিলন না। উপলব্ধি করল সবকিছুই অসার। সর্ণাট রাজ্যে ফিরে গেল সে। এতদিনে তার মনে পড়ল মা-বাবাকে। যাত্রা করল গান্ধার দেশে। মাতা-পিতা-বন্ধু সকলকে নিয়ে সর্ণাট রাজ্যে পৌঁছে জানতে পারল তার স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে বীরজয় বনগমন করল।

জগতের অনিত্যতা প্রচারের উদ্দেশ্যেই উপন্যাসটি রচিত। লেখক মাঝে মাঝে পয়ার, ত্রিপদী, সমাক্ষর চৌপদীর সাহায্য নিয়েছেন বর্ণনায়। বীরজয় চরিত্রটি তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। সুবাহু তার কন্যার বিবাহে নানা রাজা-রাজড়াকে নিমন্ত্রণ করলেও গান্ধার অধিপতিকে তাঁর মনে পড়ে নি। তবে সমসাময়িক জীবনের কিছু কিছু ছাপ উপন্যাসটিতে পড়েছে লক্ষিত হয়। সেকালে বাবুয়ানি বলতে জুড়ি চড়ে বেড়ানকে যে বোঝাত লেখক তা জানিয়েছেন। তখনকার দিনে পাল্কী, ঘোড়া ইত্যাদি যে প্রচলিত যানবাহনের মধ্যে ছিল তাও জানা যায়। ঘড়ি ট্যাঁকে 'গো টু হেল' বলে অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষের ভর্ৎসনা করার রীতির সঙ্গেও আমরা পরিচিত হই। দুঃখী মানুষের দুঃখ ভোগের বিবরণটি কিছু পরিমাণে বাস্তব হয়েছে। আমরা জানতে পারি ধনী ব্যক্তিদের পরের সম্পদে লোভ, অসত্য বাক্য ব্যবহারে পটুত্ব, অন্যের জমির প্রতি তাদের আকর্ষণের কথা, আকর্ষণ তাদের অন্যের সুন্দরী গৃহস্থ বধূর প্রতিও। পরের যুবতী কন্যাকে বিপথগামী করতেও

এদের প্রয়াস নিযুক্ত হত, বেশ্যালয়ে গমন, মদ, গাঁজা, চরস ইত্যাদি নেশার দ্রব্যে এদের আকর্ষণের বিষয়ও জানতে পারা যায়।

তেলিনী পাড়ার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত '**চিত্তরঞ্জন উপন্যাস**'টির প্রকাশ-কাল ১২৭৭। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য কর্তৃক গ্রন্থটি সংশোধিত। হিন্দী ও বাংলা গ্রন্থ অবলম্বনে বর্তমান গ্রন্থটি রচিত।

খোতন রাজ্যের রাজা ফিরজবক্তের যখন ষাট বছর বয়স, তখন তাঁর প্রধান মহিষী খোজেস্তা বানুর গর্ভে জান আলমের জন্ম। গণকদের কাছ থেকে ফিরজবক্ত জানতে পারলেন পনের বছর বয়সে রাজকুমার জান আলম এক পাখীর কথায় রাজ্য ত্যাগ করবে। প্রাণে না মারা গেলেও রাজ্য ত্যাগ করে দেশ পর্যটনের সময় সে প্রভূত কষ্ট পাবে। চোদ্দ বছর বয়সে কুমারের বিবাহ দেওয়া হ'ল মাহ তেলাত নাম্নী রাজকুমারীর সঙ্গে। একদা কুমার শত সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে একটি তোতা পাখী কিনল। পাখীটি কথা বলায় পটু। মাহ তেলাত একদিন যখন গর্ব করে তার সখীদের জানাল যে পৃথিবীতে তার মত সুন্দরী আর কেউ নেই, তখন তার সেই কথার প্রতিবাদ জানিয়ে পাখী জানাল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী জরনেগার রাজ্যের রাজকন্যা আঞ্জামন। রাজকুমার একথা শুনে সচিব পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আঞ্জামনের সন্ধানে। তারপর নানা বিপর্যয়, নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কুমার কিভাবে আঞ্জামন আরাকে লাভ করল, লাভ করল মেহেরনেগারকে, তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, বর্ণিত হয়েছে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দুই বধূকে নিয়ে দীর্ঘকাল পরে কুমারের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের বিবরণ।

বর্ণিত কাহিনীতে রূপকথার আমেজ পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান রয়েছে। রূপকথার নানা অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হয়েছে—যেমন কথা বলা পাখি, আত্মার দেহ পরিবর্তন ইত্যাদি। ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য রচনায়। ফলে কাহিনীর সঙ্গে বাস্তবতার যোগ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে। নানা অস্বাভাবিক কান্ড-কারখানার কথাতেই 'চিত্তরঞ্জন উপন্যাস'টি পূর্ণ হয়েছে, যা নাকি বুদ্ধির অগম্য, যুক্তি তর্কের অতীত।

অভিজাত পরিবারে স্ত্রী-পুরুষে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় যত অস্বাভাবিক দ্রুততায় তেমনি অস্বাভাবিক দ্রুততায় তাদের দৈহিক মিলনও ঘটে—শতাধিক বৎসরের প্রাচীন আখ্যানগুলিতে প্রায় অনুরূপ ঘটনার সন্ধান মেলে নানা জনের রচনায়। নগেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত '**রজনীচন্দ্র উপাখ্যান**'টিও (১৮৭২)-এর ব্যতিক্রম নয়। উল্লেখযোগ্য, লেখকের আলোচ্য গ্রন্থটিই তাঁর প্রথম রচনা। উপাখ্যানটির শুরু হয়েছে রূপকথার আদলে। কলিঙ্গ অধিপতি বীরকেশের বড় দুঃখ তিনি সন্তানহীন। অবশেষে পরাসর মুনি প্রদত্ত ফল ভক্ষণে মহিষী চারুচিত্রার সন্তান হয়েছে, নাম চন্দ্রসেন। বড় হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সে দেশ পর্যটনে বেরিয়েছে। সৌরাষ্ট্র, দ্রাবিড় রাজ্য ঘুরে তারা উপস্থিত

হয়েছে কৌশাম্বীতে।

কৌশাম্বীতে রাজা শ্বেতবাহুর কন্যাকে দেখে চন্দ্রসেন ত গভীরভাবে আকৃষ্ট, আকৃষ্ট তার প্রতি রাজকন্যা রজনীও। সখী চিত্ররেখার মাধ্যমে সে চন্দ্রসেনের কাছে প্রেমপত্র প্রেরণ করেছে—'আপনার অদর্শন হুতাশন আমাকে কিরূপ দগ্ধ করিতেছে তাহা আপনি অনুভব করুন, আর নাই করুন, কিন্তু আমার অন্তরাত্মাই জানিতেছেন। আমি লজ্জা ভয় জলাঞ্জলি দিয়া আপনার শরণাগত হইলাম। এখন আপনি ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। পঞ্চশর আমার প্রতি যেরূপ শরক্ষেপ করিতেছেন তাহা মাদৃশ অবলা জনের পক্ষে নিতান্ত অসহ্য, শরণাগতকে পরিত্রাণ করা মহানুভবের কার্য্য' (পৃঃ ১৯)।

চন্দ্রসেনও নিরুত্তর থাকেনি, সেও জবাব পাঠিয়েছে—

আহা প্রিয়ে তব জন্য কাঁদিয়াছি যত।
আহা প্রিয়ে তব জন্য ভাবিয়াছি তত॥
কহিতে সে সব দুঃখ বিদরয়ে হিয়া।
বিধি যদি দিন দেন কহিব হাসিয়া॥

বিধি দিন দিয়েছেন। উভয়ের গান্ধর্ব মতে বিবাহ হয়েছে, তারপর ঘটেছে অবাধে দৈহিক মিলন।

রাজ্ঞী কন্যার বিবাহের জন্য রাজা শ্বেতবাহুকে ধরে পড়লেন। মন্ত্রী সম্বন্ধ দিলেন সীতাপুর নগরের ভীমকেশ নাম্নীয় নরপতির পুত্র জিতকেতুর। কিন্তু চন্দ্রসেনের পরামর্শে রজনী তার পিতা মাতাকে জানাল ব্রতের কারণে সে আগামী এক বৎসর কোন পুরুষকে দর্শন করবে না। ভেঙ্গে গেল জিতকেতুর সঙ্গে বিবাহের সম্পর্ক। এদিকে একদিন রাজ্ঞী ধরে ফেললেন কন্যার পুরুষ সংসর্গ। রাজাকে সংবাদ দেওয়া হলে কোটাল এসে রাজকন্যার দরজা ভেঙ্গে চন্দ্রসেনকে বেঁধে আনল। শ্বেতবাহুর কিন্তু চন্দ্রসেনকে দেখে খুব পছন্দ হল। চন্দ্রসেনের পরিচয় পেয়ে শ্বেতবাহু কলিঙ্গ রাজের কাছে বার্তাবহ পাঠালেন। কলিঙ্গরাজ শ্বেতবাহুর কাছে প্রেরণ করলেন তাঁর মন্ত্রীকে। শ্বেতবাহুর ইচ্ছামত রজনীর সঙ্গে চন্দ্রসেনের বিবাহ হল। আখ্যানের একমাত্র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নায়কের পরিবর্তে নায়িকা কর্তৃক নায়কের কাছে প্রথম বিবাহের প্রস্তাব দান।

স্থানে স্থানে লেখক ইচ্ছাকৃত ভাবে সংস্কৃতানুগ ভাষার ব্যবহার করেছেন—'রাজ্ঞী ক্রোধোদ্দীপিকা রাজ্যবাণী আকর্ণন মাত্র আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা বায়ু বিক্ষোভিত সমুদ্র নিভ ও দাবানল প্রজ্বলিত হুতাসন সদৃশ প্রলয় কালোদিত বারিদ তুল্য ক্রোধ পরিপূর্ণ কলেবর হইয়া দ্বার পালকে আহবান করিলেন।' (পৃঃ ৫০)

'মধুমতী' আখ্যানটির রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২২)। এ'টির প্রকাশকাল ১৮৭৪। চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী করালীপ্রসন্ন এক গভীর রাত্রে মধুমতী নদীর তীরে

শায়িতা এক অচৈতন্যা নারীকে অনেক কষ্টে বাঁচায়। রমণীটির অসাধারণ রূপ-লাবণ্য। কিন্তু পূর্ব স্মৃতি সে সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃতা। যাইহোক, করালী তাকে নিজের কাছে রাখে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়। মধুমতীকে বিধবা জ্ঞানে করালী তাকে বিবাহ করে। বেশ সুখেই তাদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু এক গভীর রাত্রে একটি পরিচিত সঙ্গীত শ্রবণে মধুমতীর পূর্বস্মৃতি ফিরে আসে। গায়ক আর কেউ নয়, মধুমতীর পূর্ব স্বামী লাল গোপাল দত্ত। লাল গোপাল মধুমতীর সন্ধান পেয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তার সঙ্গে যাবার জন্য বলে। মধুমতীর আসল নাম আদরিণী। আদরিণী সমস্যার সম্মুখীন হয়। একদিকে তার প্রাণদাতা করালী প্রসন্নের প্রতি কর্তব্য বোধ, অপর দিকে লালমোহনের প্রতি তার দুর্বলতা। শেষ পর্যন্ত লালমোহন ও আদরিণী একসঙ্গে জলে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে।

করালীর চরিত্র চিত্রণ মন্দ নয়। সে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। সে ব্রাহ্ম তাই বিধবা বিবাহে অসম্মতি ছিল না। মধুমতীকে বিধবা জ্ঞানে তাকেই সে বিবাহ করে। করালীর কবিত্বময় মানসিকতার পরিচয় পাই আদরিণীর 'মধুমতী' নামকরণে। সে ভাল চিকিৎসক, তার পরিচয় মেলে নিশ্চিত ভাবে মৃত্যু পথের পথিক আদরিণীকে সুস্থ করে তোলার মধ্যে। করালীর কর্তব্য-বোধের পরিচয় পাই অজ্ঞাত কুলশীল আদরিণীকে আশ্রয়দানের মধ্যে এবং তার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন পরিচারিকাকে নিযুক্ত করায়। তার ধর্মবোধও ছিল তীব্র। যে মুহূর্তে সে শুনেছে তার মধুমতী বিবাহিতা, সে পরস্ত্রী, সঙ্গে সঙ্গে করালী নিজেকে দোষী বিবেচনা করেছে এবং মধুমতীর সংস্রব থেকে দূরে থেকেছে।

মধুমতীর চরিত্র চিত্রণেও লেখক নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। স্মৃতি বিস্মৃতা রমণী রূপে আদরিণীর বালিকাসুলভ আচরণ, করালীর বিচ্ছেদ বেদনায় তার কাতরতা, পূর্বতন স্বামী লালগোপালের সাক্ষাৎ লাভের পর তার চিত্তের দোলাচলতা চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। আখ্যানটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পূর্ব পরিচয় বিস্মৃতা মধুমতীর একটি পরিচিত সঙ্গীত শুনে বিস্মৃত পরিচয় পুনর্লাভ। সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ভাবে লেখক এই রূপান্তরটির বর্ণনা দিয়েছেন। মধুমতীর পুনরায় আদরিণীতে রূপান্তরিত হওয়াই তার জীবনের চরম ট্রাজেডি। বরং তার বিস্মৃতিই ছিল এক্ষেত্রে ভাল। স্মৃতি ফিরে আসাতে সংস্কারাচ্ছন্ন আদরিণী কোন মতেই তার পূর্বের জীবনকে স্বাভাবিক ভাবে স্বীকার করে নিতে পারে নি। তাই তাকে মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে। তার কৃতজ্ঞতাবোধও যেমন বিরল, তার প্রেমও তেমনি অতুলনীয়।

লালগোপালের পত্নীপ্রেমও অনবদ্য। পত্নীর বিচ্ছেদ বেদনায় সে প্রায় উন্মাদের জীবন যাপন করেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে আদরিণীর সাক্ষাতে। শেষ পর্যন্ত আদরিণীর কারণে সে মৃত্যু বরণ করেছে। অচৈতন্য

মধুমতীকে শিবিকার কাছে পড়ে থাকতে দেখে করালীর মিশ্র প্রতিক্রিয়াটি চমৎকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আখ্যান পরিকল্পনায় লেখকের প্রশংসা করতে হয়। আচার্য সুকুমার সেন মধুমতীর পরিকল্পনায় বঙ্কিমের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।

'নির্মল নলিনী' উপন্যাসটির রচয়িতা বাওয়ালী ২৪ পরগণা নিবাসী রাধাকৃষ্ণ মণ্ডল। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৮৭৫ (১২৮১ সন)। উপন্যাসের নায়ক ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশের রাজা কেশরীবীর্যের সন্তান বিজয়কিশোর। নায়িকা মালবদেশের রাজকুমারী হেমনলিনী।

লেখক উপন্যাসটির কাহিনী রচনায় কোনো অভিনবত্ব দেখাতে পারেন নি, কাহিনী অত্যন্ত গতানুগতিক। রূপকথার আদলে কাহিনীর শুরু। তবে রূপকথায় সন্ন্যাসী প্রদত্ত শিকড় বা অন্য কোনো দ্রব্যগুণে বন্ধ্যা মহিষী সন্তানবতী হয়, আলোচ্য উপন্যাসে সেক্ষেত্রে ঋষি সন্তানহীন কেশরীবীর্যকে সদাচরণের পরামর্শ দিয়েছেন। রাজ্ঞী চন্দ্রপ্রভা গর্ভবতী হবার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর প্রয়োজনে মন্ত্রী পত্নী কুমুদ্বতীও গর্ভবতী হয়েছে। উভয়েই যথাসময়ে পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। রাজপুত্রের নাম হয়েছে বিজয়কিশোর, মন্ত্রী পুত্রের নাম হয়েছে প্রিয়ব্রত। দুজনে একই সঙ্গে মানুষ হয়েছে, দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও স্থাপিত হয়েছে।

রাজপুত্র বিজয়কিশোর স্বপ্নে রাজকন্যা হেমনলিনীকে দেখে তার প্রেমে উন্মত্ত হয়েছে। দেবব্রত বন্ধুর প্রেমাগ্নি নির্বাপনের জন্য বিজয়কিশোরের সঙ্গে হেমনলিনীর সন্ধানে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুই বন্ধু ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কেননা তা না হলে মন্ত্রীপুত্র দেবব্রত তার ভাবী পত্নীর সন্ধান লাভে বঞ্চিত হয়! যাইহোক বিজয়কিশোরের সন্ধানে বেরিয়ে প্রিয়ব্রত উপনীত হয়েছে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী প্রতাপগড়ে। এখানে পঞ্চদশী রাজকন্যা প্রভাবতী তারই উদ্যানস্থিত বকুলতলায় শায়িত প্রিয়ব্রতকে দেখে প্রেমাসক্ত হয়েছে এবং লাজ লজ্জা বিসর্জন দিয়ে তার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। প্রিয়ব্রত প্রভাবতীর বাসনা অবহিত হয়েও তার সংযম রক্ষা করেছে, জানিয়েছে বন্ধুর সন্ধান লাভই তার প্রধান কর্তব্য, সেই কর্তব্য সম্পন্ন হলে তখন প্রভাবতীর ইচ্ছা পূরণ করবে। যাইহোক, প্রিয়ব্রতের ইচ্ছানুযায়ী প্রভাবতী প্রিয়ব্রতকে যোগীর বেশে সাজিয়ে দিয়েছে। প্রিয়ব্রত যোগীর ছদ্মবেশে মালবের উদ্দেশে যাত্রা করেছে।

এদিকে বিজয়কিশোরও কোন অংশে কম যায় না। সে বন্ধুর বিচ্ছেদে এবং হেমনলিনীর কারণে বিকলচিত্ত অবস্থায় ভূপাল রাজবাটীর অদূরবর্তী অরণ্যে উপস্থিত হয়ে ভূপালরাজ চন্দ্রশেখরের কন্যা হিরণ্ময়ীকে এক দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করেছে। চন্দ্রশেখর বিজয় কিশোরের সঙ্গে তার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দিলে বিজয়কিশোর সে প্রস্তাবে অসম্মত হয়েছে এবং হিরণ্ময়ীর সঙ্গে প্রিয়ব্রতের বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। এইরূপে সে একদিকে

যেমন হেমনলিনীর প্রতি তার প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, তেমনি বন্ধুর প্রতি তার কর্তব্যও পালন করেছে।

মালব দেশে যোগী বেশে প্রথমে প্রিয়ব্রত উপস্থিত হয়েছে, পরে উপস্থিত হয়েছে বিজয়কিশোর। বিজয়কিশোর তার দীর্ঘদিনের অভিলষিত হেমনলিনীকে লাভ করেছে জীবনসঙ্গিনী রূপে। প্রিয়ব্রত হেমনলিনীর সখীদ্বয়কে বলেছে, 'হেমে কঠিনতা আছে বলিয়া কুমার কুমারী নাম নির্মল নলিনী রক্ষা করিয়াছেন। অদ্য হইতে তোমরা কুমারীকে নির্মল নলিনী বলিয়া আহ্বান করিও'।

অতঃপর বিজয়কিশোর-নির্বাচিত রাজকুমারী হিরণ্ময়ীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে প্রিয়ব্রতের। এতদ্ব্যতীত প্রিয়ব্রত প্রভাবতীকেও নিরাশ করে নি, তাকেও জীবন সঙ্গিনীর মর্যাদা দিল। অর্থাৎ প্রিয়ব্রত প্রথম বিবাহ করল বন্ধুর খাতিরে, দ্বিতীয় বিবাহ তার নিজের পছন্দে।

প্রভাবতীর সতীন বিদ্বেষ ছিলনা, তাই সে যখন জানতে পারল হিরণ্ময়ীর কথা, তখন সে মোটেই ক্ষুব্ধ হল না, কিংবা চোখের জল ফেলল না তার প্রেমের একজন অংশীদার হয়েছে শুনে, বরং সে বললে, 'ভবাদৃশ বুদ্ধিজীবী বিবেক ব্যক্তি, বহু বিবাহ করিলেই কি, অবলা জাতির ক্ষতি অনাদর করিয়া থাকেন? প্রিয়তম! দেখুন দেখি, নিশানাথ কি চির প্রণয়িনী রোহিনী ও কুমুদিনীর প্রতি সমান স্নেহ ও সমান আনন্দ প্রকাশ করেন না?' পরোক্ষে এক্ষেত্রে বহুবিবাহের প্রতি লেখকের সমর্থনের পরিচয় মেলে। দুই বন্ধু সস্ত্রীক স্বরাজ্যে ফিরল।

লেখকের উপন্যাস রচনার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাহিনী নির্বাচনের কারণে আলোচ্য উপন্যাসটি বাঞ্ছিত সাফল্য লাভ করতে পারেনি স্বীকার করতে হয়। মুখ্য চরিত্রগুলি আতিশয্য দোষে দুষ্ট হয়েছে, আচরণে কার্য-কারণ সম্পর্কও অস্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু চরিত্র বিশেষের বিবরণ দানে লেখকের সাফল্য স্বীকার করতে হয়। যেমন ব্রহ্মানন্দের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক—

'ঋষির বয়ঃক্রম অন্যূন সার্দ্ধশত, প্রতপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, পৃষ্ঠদেশে সুপক্ক জটাভার পতিত, সুপক্ক শ্মশ্রুরাজি হৃদয় পর্যন্ত লম্ববান, পরিষ্কৃত ও সুললিত; নাসিকা উন্নত, ভ্রূদ্বয় অতি দীর্ঘ ও সুবক্র ছিল, কিন্তু এক্ষণে লোলিতমাংস হওয়ায় আর সে ভাব নাই। নয়ন যুগল কোটরস্থ, হৃদয়ে লোমাবলী বিরাজিত, পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, নাভিস্থল পর্যন্ত পতিত। করে অক্ষমালা, স্বর অতি গম্ভীর অথচ মধুরতাময়। সবিতার ন্যায় শরীরের জ্যোতিঃ, মুখমণ্ডল সাক্ষাৎ ধর্ম ও শান্তির নিকেতন। তাহাকে দর্শন করিলেই ভক্তি হয়।'

উপমা প্রয়োগে লেখক যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, অবশ্যই তা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবজাত। যেমন—'আমাদের জ্ঞান হয় আপনি অবনিমণ্ডলে কুমারের তপস্যারূপে আশ্চর্য কল্পবৃক্ষ তুল্য হইয়া জন্মধারণ করিয়াছেন। আপনার মনোহর করাগ্রবর্তী নখরেখা তাহার অঙ্কুর, সুবঙ্কিম ভ্রূযুগ্ম তাহার দ্বিপত্র

আপনার রমণীয় অধর তাহার পত্রাঙ্কুর, করযুগল তাহার পল্লব, আপনার ঈষৎ হাস্য তাহার মুকুল, সুকুমার অঙ্গ তাহার কুসুম এবং আপনার কমল কুটিল বিনিন্দিত কুচদ্বয় তাহার ফলস্বরূপ হইয়াছে।' (পৃঃ ১৩০) ভাষা প্রয়োগ সাবলীল কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তা বড় বেশি সংস্কৃতানুগ। যেমন নিম্নোদ্ধৃতাংশটি—

'কুমার অখণ্ড ভূমণ্ডলের রত্নভূতা কুসুমশরের অমোঘ মোহন অস্ত্রস্বরূপ অসামান্যা রূপলাবণ্যময়ী অবগুণ্ঠনবতী নবীনা নলিনীকে দর্শন করিয়া অপার সুখসিন্ধুতে ভাসিলেন। উল্লসিত মহানন্দ লহরী হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অন্তরস্থ বিরহানল কুমারীদর্শন রূপ সুখ সলিলে নির্বাপিত হইল। স্বপ্নদর্শন দিবসাবধি যে চন্দ্রাস্য হাস্যরহিত হইয়াছিল, অদ্য সে আনন স্মিতানন হইল।' (পৃঃ ১৩৩)

'হেমোপাখ্যান' উপন্যাসটির রচয়িতা চন্দননগরের কনুইবাঁকার মধুমাধব চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১২৮৪। পঞ্চম পরিচ্ছেদে উপন্যাসটি সমাপ্ত। লেখক নিজেই উপন্যাসটিকে 'কল্পিত' বলে স্বীকার করেছেন।

উপন্যাস রচনায় লেখকের একমাত্র কৃতিত্ব যে তিনি বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে একটি ধারাবাহিক কাহিনী উপস্থাপিত করেছেন।

কাশ্মীর দেশের বায়ু কোণে অবস্থিত শঙ্করবাস নামক পর্বতের অধিত্যকায় শূরপাল নামে যে গন্ধর্ব বাস করতেন, তাঁর কন্যা হেমাঙ্গী একদা শূন্যমার্গে বিচরণ অবস্থায় চন্দ্রভাগা নদীর তীরে ধ্যানমগ্ন বিশ্বামিত্র ঋষির পিছনে একটি সর্পকে বিচরণরত অবস্থায় দেখতে পেল। হেমাঙ্গী লোষ্ট্র খণ্ডের দ্বারা সাপটিকে আঘাত করলে আহত সাপটি ঋষির গায়ে গিয়ে পড়ে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করে। ঋষি হেমাঙ্গীকে অভিশাপ দেন সে পাতালে নাগালয়ে অবস্থান করবে। হেমাঙ্গীর পিতা শূরপাল বিশ্বামিত্রকে অনুরোধ করেন অভিশাপ প্রত্যাহারের জন্য, ঋষি কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, তবে জানান হেমাঙ্গী নাগভবনে অষ্টবিংশতি বৎসর অবস্থান করার পর বহুগুণান্বিত এক মানুষের সাক্ষাৎ লাভে শাপমুক্ত হবে। যথা সময়ে হেমাঙ্গী শাপ মুক্ত হয়ে গন্ধর্বলোকে উপস্থিত হলে গন্ধর্বলোকে দুন্দুভি ধ্বনি উত্থিত হয়। মন্দার পর্বতে ভীষণ দানবের পত্নী চন্দ্রকলা দুন্দুভি বাজার কারণ জানতে চাইলে ভীষণ-দানব পত্নীর কৌতূহল নিবারণার্থে যে বিবরণ দান করে সেই সূত্রেই উপন্যাসটির মুখ্য কাহিনীটি অর্থাৎ শাপগ্রস্ত হেমাঙ্গীর মুক্তি লাভের বিবরণটি উপস্থাপিত।

কবিধ্বজ রাজার পুত্র বীরধ্বজের সঙ্গে শূরসেনের ছিল গভীর বন্ধুত্ব। একদা দুই বন্ধুতে মৃগয়া উপলক্ষ্যে বনমধ্যে উপস্থিত হয়ে একটি জনশূন্য বাড়ী দেখে তার মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং একটি রমণীর প্রতিকৃতি দেখতে পায়। বীরধ্বজ প্রতিকৃতি যে রমণীর তার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। তখন শূরসেন রমণীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। বাড়ীটির উত্তরাংশে যেঅভিনব

কানন, সেখানে উপস্থিত হয়ে শূরসেন সাক্ষাৎ লাভ করে মহর্ষি কৌণ্ডিন্যের। মহর্ষির কাছ থেকে সে জানতে পারে ভূষৎ সর্পের কথা, একে হত্যা করলে তবেই কাদম্বিনীর সন্ধান মিলবে। কাদম্বিনী চিত্রের প্রকৃত চরিত্র। সেইমত শূরসেন সাপটিকে হত্যা করে, সর্পমণি সংগ্রহ করে সরোবরের তীরে উপস্থিত হয়ে পাতালে হাজির হয়। উপস্থিত হয় কাদম্বিনীর কাছে। কাদম্বিনী শূরসেনের পাণিগ্রহণের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। কিন্তু সে জানায় বীরধ্বজের কথা। উভয়ে পাতালপুরী থেকে যাত্রা করে। পথিমধ্যে কাদম্বিনী দেহত্যাগ করে গন্ধর্বলোকে যাত্রা করে। শূরসেনেরও মৃত্যু হয়। এদিকে রাজ-কুমার বীরধ্বজ বন্ধুর সন্ধানে গিয়ে দু'জনের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে সে দুটি নিয়ে যাত্রা করলে পথিমধ্যে দস্যুদলের দ্বারা সে আক্রান্ত হয়, কিন্তু রক্ষা পায় শক্তির ঋষির দ্বারা। ঋষি জানান কাদম্বিনীকে রাত্রিমধ্যে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে দু'জনকেই তিনি বাঁচাবেন। ঋষির দ্বাদশ বৎসরের তপস্যার পুণ্য ফল নিয়ে বীরধ্বজ যাত্রা করে সমুদ্রের উদ্দেশে। বনমধ্যস্থিত একটি কূপে অবস্থান-কারী হেমাঙ্গীর সহচরী ইন্দ্রের অভিশাপে অভিশপ্ত সর্বতোভদ্রা হেমাঙ্গী তথা কাদম্বিনীর মৃতদেহ দেখে মুক্তি লাভ করে। সর্বতোভদ্রার পরামর্শমত বীরধ্বজ হেমাঙ্গিনীর আঙ্গুলের অঙ্গুরীয়টি নিজের হাতে পরে নেয়। এই অঙ্গুরীয় ব্যতিরেকে হেমাঙ্গীর স্বর্গরাজের সভায় প্রবেশাধিকার ছিল না। সত্য সত্যই হেমাঙ্গী অঙ্গুরীয়টি নেবার জন্য বীরধ্বজকে অনুরোধ করতে লাগল। রাজকুমারের কথামত হেমাঙ্গী সম্মত হল মৃত শূরসেনকে পুনরুজ্জীবিত করতে, তবে কাদম্বিনীকে ত্যাগ করতে হবে তাকে। সত্য সত্যই শূরসেন বেঁচে উঠল। হেমাঙ্গী তথা কাদম্বিনীর সঙ্গে বিবাহ হল বীরধ্বজের, আর শূরসেনের সঙ্গে বিবাহ হল হেমাঙ্গী-সহচরী সর্বতোভদ্রার। কাহিনীতে রূপকথার আমেজ পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান।

'বিরাজমোহিনী বা মনোরম উপন্যাস'টির রচয়িতা অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১২৮৪ বঙ্গাব্দ। উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয়েছে উমাচরণ মিত্রকে। মোট তিনটি অধ্যায়ে আলোচ্য উপন্যাসটি বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় বিভক্ত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, দ্বিতীয় অধ্যায়টিতেও আছে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, তৃতীয় অধ্যায় নবম পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রতিটি পরিচ্ছেদের পৃথক পৃথক নামকরণ করা হয়েছে।

পঞ্চকোট পাহাড়ের অনতিদূরে দেবরূগড় নামে সুন্দর নগরী, রাজা বীরবল সিংহের এ'টি. রাজধানী। বীরবল রাজপুত, অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতি তার। নরহত্যাই তার ধর্ম। বহু হতভাগ্য পথিক বীরবলের কারাগারে অন্তরীণ, এমন কি শৈলদা ও বিরাজ মোহিনী নাম্নী দুজন স্ত্রীলোকও অন্তরীণ।

হুগলী জেলার শ্রীমানপুর গ্রামের অধিবাসী রাজেন্দ্রনাথ শর্মার পুত্র নরেন্দ্রনাথ তার গৃহত্যাগী পিতার সন্ধানে বেরিয়ে বনমধ্যে অবস্থানকালে বিরাজমোহিনীর কারণে দস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। শৈলদা

নরেন্দ্রনাথের ভগিনী। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে তার বিক্রমপুরে বিবাহ হয়েছিল। শ্বশুরালয় থেকে পিত্রালয়ে আসার পথে সে দস্যুদ্বারা আক্রান্ত ও অপহৃতা হয়। তার অপহৃত হওয়ার সংবাদেই রাজেন্দ্রনাথের, নরেন্দ্রনাথের পিতার গৃহত্যাগ।

বিরাজমোহিনী অধ্যাপকের কন্যা। দস্যুদের হাতে তার মাতার মৃত্যু ঘটে। পিতা পলায়ন করে কিন্তু বিরাজ দস্যুদের দ্বারা ধৃত হয়। শৈলদা চায় নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিরাজমোহিনীর বিবাহ দিতে। বীরবল সিংহের পত্নী বিনোদিনী যখন শৈলদাকে জানায় বীরবল তাদের ওপর অত্যাচার করতে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন কারাধ্যক্ষের সহায়তায় শৈলদা এবং বিরাজমোহিনী পলায়ন করে, তারা তাপসীর বেশ ধারণ করে ঘুরতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে, শৈলদা বিরাজমোহিনীকে তার হাতে সমর্পণ করে। বিরাজমোহিনীর পিতা ভারত শিরোমণি বিমল সরোবরের তীরে সন্ন্যাস নিয়ে বাস করছিলেন। তিনিই বিরাজকে নরেন্দ্রনাথের হাতে সম্প্রদান করেন। পিতা-পুত্রীর মিলন হয়।

কারাবাসিনী শৈলদা পত্র লিখেছিল তার স্বামী শরৎসুন্দরকে। সে স্ত্রীর সন্ধান নিতে এসে দস্যুদলের দ্বারা আক্রান্ত হয়। আহত শরৎ কারাধ্যক্ষ সিংজীর সহায়তায় নিরাময় হয়। পতি বিয়োগে কাতরা শৈলদা যখন অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত, এমন সময়ে শরতের আবির্ভাব ঘটে। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটে।

বিজয় নগরের রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহের হাতে বীরবল সিংহের মৃত্যু হয়। কিন্তু প্রতাপ বীরবলের রাজ্য অধিকার না করে বীরবলের কারাধ্যক্ষ সিংজীর তত্ত্বাবধানে বীরবলের বিধবা পত্নী ও নাবালক পুত্রকে রাজ্যের অধিকার রক্ষায় রেখে যান।

এইভাবে শেষ পর্যন্ত অন্যায়কারীর দণ্ডবিধান করে লেখক Poetic Justice রক্ষা করেছেন।

লেখক কাহিনী গঠনে সমসাময়িককালের দস্যুদলের অত্যাচারের পটভূমিকে গ্রহণ করে কাল সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন স্বীকার করতে হয়। চরিত্র চিত্রণে তেমন কোন সূক্ষ্মতার পরিচয় না মিললেও, দস্যুপত্নী বিনোদিনী যে শৈলদা ও বিরাজ মোহিনীর প্রতি আনুকূল্য দেখিয়ে স্ত্রীসুলভ কোমলতার পরিচয় দিয়েছে তা অনস্বীকার্য। নরেন্দ্রনাথকে দেখান হয়েছে পিতৃভক্ত সন্তান রূপে। শৈলদা নিজেকে সতী সাধ্বী রমণীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। প্রতাপ চন্দ্রকে চিত্রিত করা হয়েছে নির্লোভ রাজা রূপে। কারাধ্যক্ষ সিংজীর চরিত্রটিও মন্দ হয়নি। অত্যাচারী বীরবল সিংহের কারাধ্যক্ষ হয়েও সে অবলা রমণীদের প্রতি অত্যাচার করার পরিবর্তে তাদের পলায়নে সহায়তা করে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে, তার কর্তব্যবোধ ও মানবিকতাবোধের পরিচয় মেলে আহত শরতের নিরাময়ে সহায়তা দানেও। উপন্যাসটিতে লেখকের উপদেশ দানের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সে কালে যে অল্পবয়সী কন্যাদের

বিবাহ দানের রীতি ছিল, তারও পরিচয় মেলে শৈলদার মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহের ঘটনায়।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের **'সুরুচির-কুটীর'** (১ম ভাগ) গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৮০ (১২৮৬)। জাতীয় ভারতসভার স্থাপয়িত্রী মেরী কার্পেণ্টার লোকান্তরিত হলে তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে বঙ্গীয় মহিলাদের পাঠোপযোগী গ্রন্থাদি প্রচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমান গ্রন্থটি সেই সূত্রেই রচিত। গ্রন্থটি পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রতিটি পরিচ্ছেদের পৃথক পৃথক নামকরণ করা হয়েছে। ড. সুকুমার সেন আলোচ্য গ্রন্থটিকে 'বিশুদ্ধ শিক্ষাত্মক কাহিনী' বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত কাহিনী হিসাবে 'সুরুচির কুটীরে'র তেমন আকর্ষণীয় অভিনবত্ব না থাকলেও, ঘটনা তেমন ঘাত-প্রতিঘাত বহুল না হলেও একটি কাহিনীর মাধ্যমে লেখক নারী সমাজকে পুরুষের সমপর্যায়ভুক্ত হবার প্রেরণা যুগিয়েছেন, নারীকে পুরুষের উপযুক্ত সহধর্মিণী হবার, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ং স্বাবলম্বী হবার প্রেরণা দান করেছেন।

কালীঘাট নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্যের কন্যা সুরুচি। সুরুচির যখন তিন বৎসর বয়স, তখন তার পিতা পাঁচশত টাকা পণের বিনিময়ে স্বগ্রামস্থিত মুকুন্দমোহন রায় নামীয় চল্লিশ বৎসরের এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহ দেন। বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই মুকুন্দমোহনের যক্ষ্মায় মৃত্যু হয়। সুরুচি পতিহীনা হয়। সুরুচির যখন বার বৎসর বয়স, তখন তার পিতার মৃত্যু হয়। তার মাতার মৃত্যু পূর্বেই হয়েছিল। সুরুচিদের গৃহ চিকিৎসক ধর্মদাসবাবু অনাথা সুরুচিকে অপত্য স্নেহে নিজের পরিবারে আশ্রয় দেন। শুধু আশ্রয় দানই নয়, সেইসঙ্গে তিনি সুরুচিকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। সুরুচি যেমন বেহালা, হারমোনিয়াম বাজাতে শেখে, তেমনি সে আধ্যাত্মিক ও দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করতে শেখে। রন্ধন ক্রিয়া, সূচিকর্ম, গৃহধর্ম, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শরীর পালন শুশ্রূষাতত্ত্ব কোন কিছুই তার শিখতে বাদ থাকে না। এমন কি মিতাচারী, সঞ্চয়ী হবাব শিক্ষাও সে প্রাপ্ত হয়। সুরুচি ইংরেজী শিক্ষাও লাভ করে। এ হেন সুরুচির সঙ্গে বিবাহ হয় সুরেশচন্দ্রের। সুরেশ কায়স্থ হয়েও ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করে। লেখক এইভাবে বিধবা বিবাহের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন, সমর্থন জানিয়েছেন অসবর্ণ বিবাহকে।

শুধু সমর্থন জানানোই নয়, লেখক দেখিয়েছেন কিভাবে সুরুচি ও সুরেশের দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠেছে সুখের, স্বাচ্ছন্দ্যের। যদিও সুরেশ ভালই উপার্জন করত, তথাপি সুরুচি সূচিকর্মের মাধ্যমে একদিকে নিজে উপার্জন করেছে, অপরদিকে পল্লীর স্ত্রীলোকদেরও উপার্জনক্ষম করে তুলেছে। সুরুচিকে দেখা গেছে নারী শিক্ষার জন্যও সচেষ্ট হতে। শিশুদের জন্যও সে বিদ্যালয় স্থাপন করেছে।

সুরেশও কেবল নিজের পরিবারের উন্নতি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেনি, বয়স্কদের

শিক্ষিত করে তুলতে তাকে প্রয়াসী হতে দেখা গেছে। এমনকি পল্লীর পুরুষ-মানুষদের বদভ্যাস দূর করার ক্ষেত্রে তার সুচিন্তিত প্রয়াস ফলবতী হয়েছে। স্বামী স্ত্রীর যুগ্ম প্রয়াসে একটি সুখী উপনিবেশে পরিণত হয়েছে তাদের পল্লীটি। লেখক নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার ওপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। গুরুত্ব দিয়েছেন সঞ্চয়ের ওপর। ব্রাহ্মদের প্রতি লেখকের সমর্থন প্রচ্ছন্ন থাকেনি। লেখক প্রকারান্তরে দেখাতে চেয়েছেন ব্রাহ্মরা কতখানি উদারচেতা ও মনুষ্যত্ববোধের দ্বারা পরিচালিত হয়। অল্প বয়সে বিবাহ দানের বিরোধিতা করা হয়েছে। লেখকের মন্তব্য সংযোজনের মানসিকতা এবং নীতি ও আদর্শ প্রচারের বাহুল্য প্রকট রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী রচিত **'মধুযামিনী ও কৃষ্ণা'র** প্রকাশকাল ১২৯২। 'মধুযামিনী' উপন্যাস। উপন্যাসটি পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত।

উপন্যাসটির নায়িকা হিঙ্গনা, সে গুণ্ডকন্যা। সে তাদের সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী উদয়গিরির কাছ থেকে চুড়ি নিয়ে উদয়গিরির প্রেমের প্রতি সম্মতি জানিয়েছিল। কিন্ত পরবর্তীকালে সে চুড়ি খুলে ফেলে দেয়, আকৃষ্ট হয় রাজপুত যুবক কুমারের প্রতি। অবিবাহিতা হিঙ্গনার দাসের কার্য কুমার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে হিঙ্গনার প্রতি তার প্রণয় প্রদর্শন করে।

হিঙ্গনার সঙ্গী অরুণা উদয়গিরির প্রতি আসক্ত হয়। আর এই কারণেই সে হিঙ্গনার প্রতি বিরূপ হয়, পাছে উদয় হিঙ্গনাকেই লাভ করতে ইচ্ছুক হয়। অরুণা হিঙ্গনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'ল। সে অরুণাকে ডাইন বলে ধরিয়ে দিতে মনস্থ করল। আর এই ব্যাপারে তার সহায়তায় এগিয়ে এল ঘনশ্যাম দেবের আচার্য। বিনিময়ে অরুণা আচার্যকে চুম্বন করতে দিতে স্বীকৃত হল।

হিঙ্গনার বিচারের সময় কুমার সৈন্যসহ উপস্থিত হয়ে হিঙ্গনাকে উদ্ধার করল, আচার্যের সঙ্গে অরুণার অবৈধ সম্পর্ক প্রকাশ করে দিল। যথাসময়ে কুমারের সঙ্গে হিঙ্গনার বিবাহ হল।

স্বল্পাবয়বের এই উপন্যাসটির গুরুত্ব নানা কারণেই। লেখক উপন্যাসটির পটভূমি নির্বাচন করেছেন মধ্যভারতকে। মাণ্ডালা প্রদেশের গুণ্ডজাতির কন্যাকে নায়িকা করার সূত্রে লেখক গুণ্ডজাতির জাতিগত নানা বৈশিষ্ট্য, এদের সমাজে প্রচলিত আচার-আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদির বিস্তারিত পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন। বিশেষত গুণ্ডজাতির বিবাহ প্রথা সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্যাদির সংযোজন উপন্যাসটির আকর্ষণকে বৃদ্ধি করেছে, উপন্যাসটির নৃতাত্ত্বিক গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা জানতে পারি গুণ্ডজাতির দুটি বিভাগের কথা, জানতে পারি এদের গৃহদেবতা ঘনশ্যামদেব, মাতাদেবী প্রভৃতিদের ভূমিকা সম্পর্কে। সকলের মনস্কামনা পূরণ করেন ঘনশ্যামদেব। মাতাদেবী রক্ষা করেন বসন্ত রোগ থেকে। গুণ্ডদের সমাজে সচরাচর ভগিনীর পুত্র-কন্যা আদর্শ পাত্র-পাত্রীরূপে বিবেচিত হয়। এদের সমাজের অনূঢ়া কন্যা জীবন সঙ্গীরূপে ইচ্ছামত পুরুষকে নির্বাচন করার অধিকারী।

বিবাহের পূর্বে ভাবী বর তার অবস্থানুসারে কন্যাকে চুড়ি উপহার দেয় ও গ্রামের কর্তৃপক্ষ স্থানীয়দের ভোজন করায়।

ডাইনী প্রথা নিয়ে রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাসের গৌরবও আলোচ্য উপন্যাসটির প্রাপ্য। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য ডাইনী প্রথাকে যে সমাজে বাঁচিয়ে রেখেছে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত লেখক উপন্যাসটিতে দিয়েছেন। অরুণা নিশ্চিতভাবে উদয়গিরিকে পেতে হিঙ্গনাকে, তার কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিরতরে সরিয়ে দিতে তাকে ডাইন বলে ধরিয়ে দেবার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে! ঘনশ্যামদেবের আচার্য অরুণাকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে অরুণার সঙ্গে দৈহিক মিলনের সুযোগ লাভের শর্তে। এমনকি আচার্য দেবের দৃষ্টি ছিল হিঙ্গনার প্রতিও। হিঙ্গনাকে সে এক মধ্যাহ্নে তার কাছে উপস্থিত হতে বলেছিল, বলাবাহুল্য সদ্য যুবতী হিঙ্গনার সর্বনাশের জন্য। কিন্তু হিঙ্গনা অনুপস্থিত থাকায় আচার্যদেবের আক্রোশ বৃদ্ধি পায়। সে অরুণার প্রস্তাবমত হিঙ্গনাকে ডাইন বলে ঘোষণা করে তার জীবনকে বিপন্ন করে তোলে।

হিঙ্গনার সঙ্গে অরুণার পার্থক্য, বিশেষতঃ হিঙ্গনার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন অরুণার চক্রান্ত ও নিজেরই সেই চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়ার ঘটনাটি লেখক চমৎকার ভাবে ফুটিয়েছেন। হিঙ্গনার বিচারের সময় তার প্রেমিক কুমারের সৈন্য-সহ উপস্থিত হয়ে হিঙ্গনাকে উদ্ধার করা এবং আচার্য ও অরুণার অবৈধ সম্পর্কের ওপর আলোকপাতের ঘটনাটি নাটকীয় হয়েছে।

কৃষ্ণা বা কলিকাতা শতাব্দী পূর্বে পৃথক রচনা, এটি অসম্পূর্ণ।

'ভজহরি' উপন্যাসটির রচয়িতা পথিকচন্দ্র কবিরত্ন। লেখক নিজেকে 'বিষ্ণু শর্মা জুনিয়ার' রূপে পরিচিত করেছেন। মোট পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত উপন্যাসটির রচনাকাল ১২৯৩। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে লেখক প্রতিটি পরিচ্ছেদেরই পৃথক পৃথক নামকরণ করেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে ভাষা ব্যবহারেও বঙ্কিমের প্রভাব সুস্পষ্ট। যেমন—'সুকুমারি তর্কস্থলে সহজেই হারি মানেন, ...' (পৃঃ ১৩৬)।

লেখক যে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এবং উপন্যাস রচনার পটুত্ব তাঁর করায়ত্ত, সে পরিচয় বর্তমান গ্রন্থে বিদ্যমান। কিন্তু তথাপি বর্তমান গ্রন্থটি উপন্যাস পদবাচ্য হতে পারেনি। লেখক স্বয়ং গ্রন্থটিকে 'সমাজচিত্র উপন্যাস' নামে অভিহিত করলেও সমাজচিত্রের আনুপূর্বিক বিবরণদানেই তাঁর ব্যগ্রতা, উপন্যাস রচনার ব্যাপারে কিন্তু তেমন মনোযোগ তিনি দেননি। সমসাময়িক বাঙালী সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, সীমাবদ্ধতার তীব্র সমালোচনাই লেখকের মূল উদ্দেশ্যে পরিণত, ফলতঃ অবলম্বিত কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষার ব্যাপারে তাঁকে দৃষ্টিকটু রূপে অমনোযোগী দেখা গেছে। উপন্যাসের নায়ক ভজহরি ওরফে প্রমোদ চন্দ্রের প্রসঙ্গ নিতান্ত সীমিত পরিসরেই শুধু উপস্থাপিত হয়নি, সেই সঙ্গে নায়কের প্রসঙ্গ অসমাপ্তও রয়ে গেছে। লেখক নিজেও তাঁর

অসম্পূর্ণতা বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তাই উপন্যাসের শেষে উপসংহারে তাঁকে মন্তব্য করতে দেখা গেছে—

'আমাদিগের অনেক কথা বলিবার বাকী আছে ; আমরা নায়ক মহাশয়কে দেশত্যাগী করিয়া রাখিয়াছি। পরে তাঁহার কি হইল, তাহার সঙ্গে আরও অনেক সমাজচিত্র লইয়া বর্দ্ধিতাকারে……পুস্তক সত্বর পুনঃপ্রচারিত হইবে' (পৃঃ ১৭৬)।

বেশ কয়েকটি মৃত্যুর বিবরণ দানে লেখক অনভিপ্রেত ভাবে আতিশয্য দোষে দুষ্ট হয়েছেন। প্রসঙ্গত সুলোচনার মাতার আত্মঘাতী হওয়া, রামফল নামক ভৃত্যের মৃত্যুবরণ, রায়বাহাদুরের দ্বিতীয়া পত্নীর সন্তান বসন্ত কুমারের হত্যাসাধন, বিশাখা নাম্নী দাসীর সিঁড়ির উপর থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু বরণ উল্লেখযোগ্য। চরিত্র চিত্রণে লেখকের ব্যুৎপত্তি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঢাকার খাজাঞ্চি, ডিরোজিও'র শিষ্য শম্ভুনাথ রায়কে দেখা গেছে সাহসী, পরোপকারী, স্বাধীন ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরূপে। এক সাহেব কালেক্টরের অপমানজনক উক্তির প্রতিবাদে শম্ভুনাথ তাকে প্রহার করেন। উক্ত সাহেব কালেক্টর প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত শম্ভুনাথের বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপের অভিযোগ আনেন। শম্ভুনাথ গৃহত্যাগী হন। শম্ভুনাথের স্ত্রী ছিলেন উপযুক্ত সহধর্মিনী। ইনি স্বর্ণালঙ্কার গ্রহণ করেননি, কেননা স্বামীই ছিলেন এঁর স্বর্ণালঙ্কার। নিজের হাতের তৈরী রুমাল বিক্রয় করে ইনি অনাথ আশ্রম এবং দরিদ্র বিদ্যালয়ে আর্থিক সহায়তা করেছেন। শম্ভুনাথ ও তাঁর স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের পরিচয়টিও চমৎকার। সীমিত পরিসরে সনাতন ধর্মের প্রচারক বক্কেশ্বর পণ্ডিতের চরিত্রটিও বেশ উপভোগ্য। তাছাড়া রায়বাহাদুরের জ্ঞাতিভাই গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক পরেশবাবু, হৌসের কেরাণী নকুড় বাবু, মফঃস্বলের মুন্সেফ বলদেব বাবু, জমিদার নন্দবাবু প্রমুখাদির চরিত্র চিত্রণও উল্লেখযোগ্য, যদিও উপন্যাসের মূল কাহিনীর কাঠামোর সঙ্গে এদের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ।

লেখকের বর্ণনা দানের নৈপুণ্যের পরিচয় গ্রহণ উপলক্ষে রায়বাহাদুরের নায়েবের বিবরণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হল—

'নায়েবের ভিতর বাহির সমান ছিল। লঙ্কা মরিচ অনেক দিন ঘরে থাকিলে যেরূপ হয়, তাহার চেহারাটি সেইরূপ ; চক্ষু দুটি সর্পের চক্ষুর মত, গাল দুখানি পুরানো চটি জুতার মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ; নাকের উপরে দড়ি বাঁধা চশমা, তাহার আবার একখানি কাঁচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নায়েবের বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর। কেশে ও গোঁপে কলপ দেওয়া। কলপ উঠিয়া অর্দ্ধেক চুল সাদা বাহির হইয়া রহিয়াছে।' (পৃ ৬৮)

লেখকের আলোচ্য গ্রন্থটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ তুলনাদানের বিরল নৈপুণ্য এবং সেই সঙ্গে ভাষা প্রয়োগে বিরল কৃতিত্ব—

(ক) 'একখানি বড় রকমের মাল বোঝাই মহাজনের নৌকা জমিদারীর পুরাতন কর্মচারীর মত যমে না নেওয়া পর্যন্ত সেরেস্তায় নঙর করিয়া বসিয়া আছে'। (পৃঃ ২৪)

(খ) 'শ্রাদ্ধ বাড়ী হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ যেমন অনিচ্ছায় উঠিয়া যায়, কুকুর যেমন অনিচ্ছায় আস্তাকুড় হইতে চলিয়া যায়, গহনার নৌকা অনিচ্ছায় সেইরূপ গজেন্দ্র গমনে চলিল'। (পৃঃ ২৬)

(গ) 'গো-মড়কে শকুনির পালের মত ফলাহারে ব্রাহ্মণেরা রায়বাহাদুরের প্রশস্ত চত্বরে পাতা সম্মুখে করিয়া সারি সারি হইয়া বসিয়া, ঈষদুষ্ণ লুচির দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।' (পৃঃ ৯২)

সমাজচিত্রের অনবদ্য আধার রূপে বর্তমান গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। সমসাময়িক সমাজজীবনের নির্ভরযোগ্য দলিলে রূপান্তরিত হয়েছে 'ভজহরি'। লেখক নিজেও যে এই ব্যাপারে অধিক উৎসাহী ছিলেন তা তাঁর স্বীকারোক্তিতেই মেলে—

'বঙ্গ সমাজের যেখানে যাহা আছে, তাহার যথাযথ চিত্র দেখাতেই আমরা প্রতিশ্রুত হইয়াছি' (পৃঃ ১১৯)।

গ্রন্থে বর্ণিত সমাজচিত্রগুলি যে লেখকের নিছক কল্পনা-প্রসূত নয়, তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত লেখক তা অকপটে স্বীকার করেছেন একাধিকবার।

'রুষ্ট হও আর তুষ্ট হও, আমি স্বরূপ কথা বলিব, কিছুই কল্পনা করিব না' (পৃঃ ১৪৪)। অন্যত্র লেখকের উক্তি—

'আমাদের শেষ কথা এই যে, এই গ্রন্থের মধ্যে অনেকগুলি সত্য ঘটনার রূপান্তর বর্ণনা আছে। বঙ্গ সমাজের নানাস্থানে যে সকল সত্য ঘটনা বিক্ষিপ্ত রূপে ঘটিয়াছে, তাহারই কতকগুলি উপন্যাসের আকারে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া এক এক অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে' (পৃঃ ১৭৮—১৭৯)।

লেখক গ্রন্থমধ্যে কৌলীন্য প্রথা ও পণপ্রথার বিষময় ফল দেখিয়েছেন, বর্ণনা করেছেন বালবিধবাদের দুঃখ—

'সকলেরই মনে আশা আছে, সুখ দুঃখ বলিবার সহানুভূতি পাইবার স্থান আছে, নাই কেবল দুঃখিনী বালিকা বিধবার, আর ততোধিক দুঃখিনী যুবতী বিধবার। বহু যুবতী রমণীয় পুষ্প, কিন্তু সমাজরূপ শ্বাপদের নিষ্ঠুর নখরাঘাতে সে পুষ্প বৃন্তচ্যুত, ধূলায় লুণ্ঠিত। দীর্ঘ নিশ্বাস, নিরাশা আর অশ্রুজল, এই তিন মাত্র তাহার অবলম্বন'; (পৃঃ ৮৬-৮৭)। স্পষ্টতঃই বিদ্যাসাগরের প্রভাব এখানে প্রতিফলিত। অল্প বয়সে বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে লেখকের তীব্র ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশিত হয়েছে—'উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত অবস্থায় উপযুক্ত পাত্র বিবাহ করিতে পারিলে যাহারা সংসারে কত সুখ পাইত, সংসারকে সৎকার্য ও আনন্দ দ্বারা কত সুন্দর করিতে পারিত, সমাজের কুপ্রথার দোষে অকালে অপাত্রে বিবাহিত হইয়া তাহারা অস্থানে রোপিত বৃক্ষের মত মৃতবৎ থাকিয়া, আপনাকে ও সংসারকে দুঃখের আলয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। কেহ বা পাপের বোঝা মাথায় করিয়া নিষ্ঠুর সমাজের কলঙ্কভার বৃদ্ধি করিতেছে। ধিক্ বাঙ্গালায় অধঃপতিত সামাজিকদিগকে'! (পৃঃ ৮৪-৮৫)

দেশীয় জমিদারদের জমিদারী লাভের নেপথ্য রহস্য এবং প্রজাদের উপর পীড়নের সাহায্যে অর্থ আদায়ের ঘৃণ্য প্রয়াস, নায়েবের চক্রান্তে নির্দোষ প্রজার

মৃত্যুবরণ এবং ঘুষের বিনিময়ে দারোগার অনুকূল রিপোর্টে নায়েবের বিপন্মুক্তি, ইংরেজ আসামীর বিচারে ইংরেজ বিচারপতি ও জুরিদের ঘৃণ্য পক্ষপাতিত্ব, অশিক্ষিত প্রায় মূর্খ ব্যক্তির সংবাদপত্র প্রকাশ ও তথাকথিত সাংবাদিকতা, ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিকটু ভোজনলোলুপতা, বিভাগীয় কমিশনারকে 'বাবা' সম্বোধনপূর্বক, সাহেবদের বিলিয়ার্ড খেলার জন্য অট্টালিকা নির্মাণ, মহারাণীর জন্মদিন উপলক্ষে নিজ বাটীতে সভা ও মেলার আয়োজন পূর্বক সর্বোপরি জেলার বিদেশী ম্যাজিস্ট্রেটের স্মৃতি রক্ষার্থে বৃহৎ অঙ্কের অর্থদানের মাধ্যমে 'রায়বাহাদুর' খেতাব অর্জনের বিষয়ে লেখক বলেছেন।

'কুমুদনাথ' উপাখ্যানটির (১২৯৩) লেখকের নাম অনুল্লিখিত থাকলে' বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এ'টির রচয়িতা ছিলেন ব্রাহ্ম। গ্রন্থটি সপ্তপঞ্চাশতম মাঘোৎসব উপলক্ষে রচিত। ষষ্ট পরিচ্ছেদে সমাপ্ত এই উপাখ্যানটি 'ধর্মবন্ধু কার্যালয় থেকে প্রকাশিত। বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধনের জন্য নীতি ও ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের যে পরিকল্পনা 'ধর্মবন্ধু' সংস্থাটি গ্রহণ করেছিল, তারই অঙ্গ স্বরূপ বর্তমান গ্রন্থটি রচিত।

আলোচ্য উপাখ্যানটির কাহিনী জটিলতা মুক্ত। মুখ্যতঃ ধর্মের প্রতি আস্থাস্থাপন করলে যে মানুষ সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত হয়ে অভীষ্ট শান্তি ও আনন্দের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে, সেই তত্ত্বই বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আবার ধর্ম বলতে সাধারণভাবে ধর্মের কথা বলা হয়নি, বিশেষভাবে ব্রাহ্ম ধর্মের কথাই বলা হয়েছে। প্রকারান্তরে লেখক ব্রাহ্ম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, পাঠককে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আস্থাশীল করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

ডফ সাহেবের স্কুলে পাঠরত বি. এ. ক্লাসের ছাত্র কুমুদনাথের অল্প বয়সে বিবাহ হয়েছিল। সে কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। কুটুম্বিতা নিয়ে মনান্তর হওয়ায় কুমুদনাথের পিতা কন্যাকে তার শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করা থেকে বিরত হলে কুমুদনাথের পিতা পুনরায় পুত্রের বিবাহ দেবার জন্য প্রয়াসী হলেন। দ্বিতীয় বার বিবাহে অনিচ্ছুক পুত্র কুমুদনাথকে কৌশলে এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকিল তারাপদবাবুর সুশ্রী কন্যাকে দেখিয়ে তাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেন। কুমুদনাথ দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। একপত্নী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বার সে দার পরিগ্রহ করবে কিনা। শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করে সে সিদ্ধান্ত নেয় দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করবেনা। দেখা গেল কুমুদনাথের প্রার্থনা সফল হয়েছে। তার প্রথমা স্ত্রী গোপালের মা'র সঙ্গে শ্বশুর বাড়ীতে হাজির হয়েছে, আর কুমুদনাথের পিতা-মাতাও তাকে সস্নেহে টেনে নিয়েছেন। লেখক ঈশ্বরের অপার করুণা দেখাতে রাজকুমারী ও গোপালের মা'র শ্বশুর বাড়ী আসার পথে এক কুলী সংগ্রাহকের দ্বারা প্রতারিত হয়ে কুলী ডিপোয় বন্দিনী হয়েও শেষ পর্যন্ত যাদবপুরের গোপীনাথ সর্দারের সহায়তায় মুক্তি লাভের বিবরণ দিয়েছেন। কুমুদনাথকে

ঈশ্বরের প্রতি আস্থা স্থাপনে অনুপ্রাণিত করেছিল তার ব্রাহ্ম বন্ধু বিনোদকুমার। ঈশ্বর তত্ত্ব, প্রার্থনার উদ্দেশ্য ও সফলতা ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ তাত্ত্বিক আলোচনা উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে এবং কাহিনীর স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করেছে। 'ধর্মবিষয়ক উপন্যাস' বলে উপন্যাসটিকে যে অভিহিত করা হয়েছে, এর থেকেই তার কারণ বোঝা যায়।

প্রার্থনা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সংসার মরুভূমিতে ঘুরিতে ঘুরিতে যখনই আমরা ক্লান্ত ও নিরুপায় হইয়া সেই কৃপাবারির জন্য লালায়িত হই, তখনই দয়াময়ের আশ্চর্য নিয়মে আমাদের অন্ধতা বিদূরিত হয়, এবং আমরা তাঁহার সেই কৃপাস্রোতে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হই।' (পৃঃ ১৬)

প্রার্থনার ফল সম্পর্কে বলা হয়েছে, '...প্রার্থনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ফল লাভের জন্য অধীর হওয়া উচিত নহে। প্রার্থনা ঠিক যেরূপ ভাবে করা কর্তব্য, তাহা করা হইয়াছে কিনা, আমাদিগকে কেবল সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহার পর তাহা পূর্ণ করা তাঁহার ভার।' (পৃঃ ১৮)

কুমুদনাথ ও বিনোদের কথোপকথন দিয়ে উপন্যাসটির সূচনা হওয়ায় তাতে নাটকীয়তা সঞ্চারিত। রাজকুমারী ও গোপালের মা'র বন্দী হওয়া ও মুক্তি লাভের ঘটনা কিছুটা রোমাঞ্চের সৃষ্টি করেছে।

বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত '**জীবন প্রদীপ**' উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১২৯৪। উপন্যাসটি দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই বিশাল উপন্যাসটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত। পরিশিষ্ট সহ গ্রন্থে সংযোজিত পরিচ্ছেদের সংখ্যা ৭১।

উপন্যাসটির মূল ঘটনা তুলসীগ্রামের জমিদার হরগোবিন্দ রায়ের সঙ্গে তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতুষ্পুত্র ভবানীশঙ্করের বিষয় সংক্রান্ত বিরোধ ও তার পরিণাম। উপন্যাসে উপকাহিনীরূপে গ্রথিত হয়েছে বিলাসপুরের রাজপরিবারের মধ্যেকার চক্রান্ত। নানাবিধ ঘটনা ও নানা চরিত্রের সমাবেশে উপন্যাসটি বেশ জটিল আকার নিয়েছে। শতাধিক বৎসর পূর্বে রচিত এই উপন্যাসটি রচনায় লেখক যথার্থই মুন্সীয়ানার স্বাক্ষর রেখেছেন স্বীকার করতে হয়। ঘটনা অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট হয়নি, চরিত্র চিত্রণেও লেখক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, বিশেষতঃ চরিত্রের বিবর্তন উপন্যাসের দাবীকে মিটিয়েছে। লেখকের যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বাস্তবতা বোধ ছিল তার প্রমাণ মেলে আলোচ্য উপন্যাসটিতে।

হরগোবিন্দের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন ঃ

'হরগোবিন্দের দেহের সম্পত্তির মধ্যে প্রধান সম্পত্তি একখানি খুব বড় কপালযুক্ত একটি প্রকাণ্ড মাথা। মাথার চুলগুলি খাট খাট, একটুকু খাড়া খাড়া। হরগোবিন্দ দাড়ি গোঁফ কখনও রাখেন নাই। পালানুসারে রীতিমত দাড়ি গোঁফ কামাইয়া ফেলেন। এ বয়সেও হরগোবিন্দের দেহটি খুব সুস্থ, শক্ত এবং বলিষ্ঠ।'

হরগোবিন্দের পিতা ছিলেন কৃষ্ণগোপাল রায়বাহাদুর। হরগোবিন্দের স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী। হরগোবিন্দ তাঁর একমাত্র কন্যার মৃত্যুর পর দৌহিত্রী কুন্তলাকে মনের মতন করে মানুষ করার কাজে ব্রতী আছেন। তিনি নিজে সুপণ্ডিত, রুচিবান, গ্রন্থপ্রেমিক এবং পরোপকারী। তাঁর সমস্ত বাড়ীটি নানাবিধ গ্রন্থাদিতে পূর্ণ। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা, পারসিক কবি হাফেজের কবিতা, ইমার্সন, কার্লাইল প্রভৃতির রচনা তাঁর প্রিয়। তবে তাঁর প্রিয়তম গ্রন্থ হ'ল উপনিষদ। হরগোবিন্দ বিত্তবান হয়েও বিলাসী নন। তিনি বিনয়ী। সাহায্য প্রার্থীকে তিনি কখনও বিমুখ করেন না তাই বলে আবেগের দ্বারা চালিত হওয়াও তাঁর স্বভাব নয়। সাহায্য প্রার্থী সত্য সত্যই সাহায্য লাভের উপযুক্ত কিনা সেই বিষয়ে অবগত না হয়ে তিনি সাহায্য করেন না। জনগণের শিক্ষা ও চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত তিনি করেছেন। স্থাপিত হয়েছে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠী, বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, দাতব্য চিকিৎসালয়, অতিথিশালা—সব তাঁরই উৎসাহে ও অর্থে। তাঁর জীবনদর্শন হ'ল, 'পরিবারের ঋণে, মাতৃভূমির ঋণে, জগতের ঋণে আমি ডুবিয়া আছি। জীবন দিয়া যদি জগতেরই উপকার না হইল, তবে এ জীবন-ভার বহিয়া দরকার কি কিছুই বুঝিনা।'

হরগোবিন্দ অত্যন্ত নীতি পরায়ণ, অধর্মাচরণকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেন। ভবানীশঙ্কর তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করলে তিনি ভবানীর সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির তালিকা বিচারপতির হাতে তুলে দিয়েছেন এমনকি নিজের হাতের আংটিটি পর্যন্ত। আরও স্বীকার করেছেন এতেও ঋণ শোধ না হলে তিনি তা ক্রমে শোধ করবেন। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় (১২৯৪) এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে, 'আদালতের হস্তে এরূপ ক্ষমতা দিবার এবং আদালতের লইবার কোন ক্ষমতা বা বিধি নাই' (পৃঃ ৪৮৫)। মণিরামপুরের দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রশমনেও হরগোবিন্দকে প্রয়াসী হতে দেখা গেছে।

ভবানীশঙ্কর বি. এ. পাশ ; বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ধর্ম গ্রন্থ তার পড়া। ভাল ফ্লুট বাজায়। কিন্তু এসব তো গেল তার গুণের দিক, তার চারিত্রিক ত্রুটিও কম ছিল না। সে ছিল মদ্যপ এবং লম্পট। সরমা তার স্ত্রী, রূপে গুণে সে লক্ষ্মী হওয়া সত্ত্বেও গোলাপ বাইজীকে সে বাড়ীতে এনেছে। হরিধন চাটুজ্যে এবং গোপাল বাঁড়ুজ্যেকে এজন্য সে মোট পাঁচটি হাজার টাকা দিয়েছে।

গোলাপ বাইজী এবং ভবানী যে ভাবে সরমা ও বিধবা মধুবতীর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে, তা বর্ণনার অতীত। সরমা ও মধুবতী দুজনেরই মৃত্যু ঘটেছে ভবানীর হাতে।

অর্থের জোরে ভবানী আর্য সম্মিলনীর সভাপতি পদে বৃত হয়েছে। তার কথায় 'টাকা বাঁচিয়া থাকিলে জাত মারে কে ?' ভবানীশঙ্করের 'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ বড়ই বিচিত্র। কলকাতার সাহেবদের বৈকালিক ভ্রমণের সুবিধার

জন্য একটি প্রমোদ উদ্যান নির্মাণে এক লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য দিতে হয়েছে তাকে এজন্য। হরগোবিন্দের নামে মিথ্যা নালিশ করে সে তার যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করেছে। এহেন নরপিশাচ ভবানীশঙ্করের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। মূলতঃ তার রক্ষিতা সুখদার মৃত্যু এবং হরগোবিন্দের স্বেচ্ছায় সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ তার মনে বৈরাগ্য এনেছে। দেখা গেছে ভবানীশঙ্কর তার স্ত্রী সরমা এবং বিধবা ভগ্নী মধুবতী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা নির্মলের অকাল মৃত্যুর জন্য চোখের জল ফেলেছে। তার প্রমোদ ভবন রূপান্তরিত হয়েছে ধর্মগ্রন্থের পুস্তকালয়ে। শুধু তাই নয় প্রমোদ উদ্যানে হরি সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। ভবানীশঙ্কর তার সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র করে দিয়েছে কুন্তলার নামে। তারই প্রয়াসে শশাঙ্ক, সন্ন্যাসী প্রভৃতিরা ইংরেজ-কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেছে। বরিশাল জেলার অন্তর্গত বীরখালির কাছারি ঘাটে মৃত প্রায় কুন্তলাকে সে উদ্ধার করেছে। হরগোবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে সে। নবজন্মলাভ ঘটেছে তার।

বিলাসপুরের রাজপরিবারের অভ্যন্তরীণ ঘটনা কিভাবে বিলাসপুরকে ইংরেজ শাসনাধীন করল তা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি উপন্যাসটির আকর্ষণ বৃদ্ধির অন্যতম উপাদান। বিলাসপুরাধিপতি বড়রাণী ও মেজরাণীকে পরিত্যাগ করায় এবং ছোটরাণীকে পাটরাণীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করায় স্বভাবতঃই দুইরাণী ছোটরাণীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছে। তদুপরি ছোটরাণী সুরমার সন্তান শশাঙ্কশেখরের বিলাসপুরের ভাবী অধিপতি হবার সম্ভাবনায় বড় ও মেজরাণীর ক্রোধ শশাঙ্কশেখরের অনিষ্ট করার ব্যাপারেও সক্রিয় হয়েছে। ইংরেজ প্রশাসনের নির্দেশে বিলাস অধিপতিকে যখন লুসাই কুলীদের বিদ্রোহ দমনে ডেপুটি কমিশনার কাপ্তেন হেনরিকে সহায়তা করতে বিলাসপুরের সীমানার পাহাড়ে যেতে হয়েছে, তখন সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারে সক্রিয় হয়েছে মেজরাণী কুন্তী। কুন্তীর সহায়তায় এগিয়ে এসেছে তার অঘোর পন্থী পিতা নন্দন গিরি। বড়রাণী ও মেজরাণী সুরমাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করতে গিয়েছিল। বিষের কারণে এবং তরবারির আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে। কুন্তী বড়রাণীকে উদ্বন্ধনে হত্যা করেছে তারপর অলঙ্কারাদিসহ সিপাহীর ছদ্মবেশে সে নিজের মহল ত্যাগ করেছে। সতীন বিদ্বেষ বশতঃ এবং নিজ ক্ষমতাকে অটুট রাখতে কুন্তী যে প্রতিহিংসা পরায়ণতার পরিচয় দিয়েছে, তা আমাদের শিহরিত করে। প্রতিহিংসা বোধ তার নারীত্বকে গ্রাস করেছিল। কেবলমাত্র মহল ত্যাগের পূর্বে তার চোখের জল পড়ায় তার হৃদয়ের কোমল দিকটি ধরা পড়েছে।

কুন্তী কাপ্তেন হেনরীকে মদের মধ্যে ঔষধ দিয়ে অচৈতন্য করে হত্যা করেছে এবং হত্যার দায় রহমতের ওপর কৌশলে চাপিয়ে দিয়ে নিজে সরে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত তাকে উন্মাদিনী হতে দেখা গেছে।

বিলাসপুরের রাজার অধীন বড় তালুকদার জয়নারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে কুন্তীর অঘোরপন্থী পিতা নন্দন গিরির বিলাসপুরাধিপতির বিরুদ্ধে

চক্রান্তের বিবরণটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও বাস্তবানুগ। জয়নারায়ণ যে কারণে নন্দন গিরিকে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছে তা বিশ্বাস যোগ্য হয়েছে। তার বক্তব্য বিলাসপুরাধিপতির ক্ষমতা প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ তালুকদার-দের দায়িত্ব বৃদ্ধি। একশত বিঘা বলে যেখানে আটশত, দশশত বিঘা জমি তারা ভোগ করে, পাঁচ বছরে যেখানে এক বছরের খাজনা দাখিল করে, সেক্ষেত্রে সমস্ত জমি জরিপ হলে তাদের রাজাকে দেয় রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। তাই জয়নারায়ণ নন্দন গিরিকে রাজ বাড়ী আক্রমণের জন্য সাত, আটশত লাঠিয়াল ও আরও পাঁচ, ছয়শত বাজে লোক সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। নন্দন গিরি তার নিজস্ব সংগৃহীত পাঁচশত লোকের সাহায্যে ভৈরবীর সহায়তায় রাজার অনুপস্থিতিতে রাজবাড়ী আক্রমণ ও পর্যুদস্ত করেছে।

কাপ্তেন হেনরীর কর্ণেল পদে উন্নীত হওয়া এবং বিলাসপুরকে ইংরেজদের করতলগত করা, রাজাকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করা আসলে ইংরেজদের এদেশের ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে গ্রাস করার নিপুণ রাজনৈতিক কৌশলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

শশাঙ্কের প্রাণ রক্ষাকারী তার গুরুদেব সন্ন্যাসী তৎকালীন ইংরাজ শাসকদের অনুকূলে যে মন্তব্য করেছেন, তা তখনকার বৃহৎ সংখ্যক ইংরেজ অনুগামী ভারতবাসীর মানসিকতাকেই প্রতিফলিত করেছে। সন্ন্যাসী চেয়েছিলেন সমস্ত ভারতবর্ষ যেন ইংরেজদের অধীন হয়, 'দেশীয় স্বাধীন রাজ্যগুলি বিস্তীর্ণ ভারতের প্রশস্ত বুকে ভাঙ্গা বেড়ার মত কেবল অপকারের আকর এবং উন্নতির বাধা হইয়া আছে। এই ভাঙ্গা বেড়ার আড়ালে কতকগুলি অপদার্থ মানুষের বিলাস সাধনের সুবিধা বই আর দেশের কোনই মঙ্গল নাই। এর পরিবর্তে সমস্ত ভারতে ইংরেজদের অখণ্ড শাসন বিস্তৃত হইলে ভাল হইবে। পঁচিশ কোটি ভারত সন্তান এক ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে শিখিবে। সমদুঃখের ন্যায় মানুষের লোহার পিণ্ডের মত প্রাণগুলি সহসা গলাইয়া এক করিবার দ্বিতীয় ঔষধ নাই' (পৃঃ ৫৮)। অবশ্য সমালোচক সন্ন্যাসীর এই বক্তব্যকে লেখকের বক্তব্য জ্ঞানে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, 'এ মত যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এমন কি চিন্তাশীল ইংরাজও স্বীকার করেন…'।

বিলাসপুরের যুবরাজ শশাঙ্কের সঙ্গে হরগোবিন্দের দৌহিত্রী কুন্তলার প্লেটোনিক ভালবাসা ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন। কুন্তলার সঙ্গে শশাঙ্কের ছেলেবেলা থেকেই পরিচয়। সন্ন্যাসীর সঙ্গে শশাঙ্ক দীর্ঘদিন কুন্তলাদের বাড়ীতে ছিল, সেইসূত্রে উভয়ে উভয়ের ভাই বোনের সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা পারস্পরিক প্রেমে রূপান্তরিত হলেও স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর হতে পারেনি। কুন্তলা স্বীকার করেছে, 'আমি ত তাঁহার তুল্য এ জগতে কাহাকেও ভাল বাসি নাই, ভালবাসিনা, ভাল বাসিতে পারিব না। যাকে পাওয়া বলে, তাহাত এই-ই। তবে আবার পাওয়া কি?' (পৃঃ ৩৪১) প্রচলিত রীতিতে শশাঙ্ককে পতিরূপে যে কুন্তলা বরণ করে নিতে পারেনি

তার কারণ স্বরূপ তার স্বীকারোক্তি, 'তিনি দেবতা। আমি মানুষী। তিনি আমার যোগ্য বর নন। তাঁহাকে দেবতা ভাবিয়া সোনার বিগ্রহরূপে শিশুকাল হইতে হৃদয় মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, সমস্ত জীবন যাঁহাকে দেবতা মনে করিয়া পূজা করিলাম, তাঁহাকে মানুষ ভাবিতে আমার মর্মগ্রন্থি সকল ছিন্ন হইয়া যায়!' (পৃঃ ৩৩২) শশাঙ্ক শেখরের বিপদের সম্ভাবনায় কুন্তলার ভীত হওয়া, শশাঙ্কের অদর্শনে তার দুঃখবোধ, কিংবা যে শশাঙ্ক কুন্তলাকে 'দিদি' বলে সম্বোধন করত, পরবর্তীকালে তাকে 'সন্ন্যাসিনী' বলে সম্বোধন, কুন্তলার মুখের দিকে তাকাতে তার লজ্জাবোধ উভয়ের পরস্পরের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন লেখক চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন। কুন্তলার সান্নিধ্যে শশাঙ্কের অনুভূতি, 'যেন একটা ফুলের জগতে বাস করিতেছেন। যেন উপরে, নীচে, আসেপাশে চারিদিকে, কেবল ফুল! কোটী কোটী ফুল! শিশিরে ধোয়া, সুধায়, মাখা ফুল—রাশি রাশি ফুল! কেবল ফুলের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে। কেবল ফুলের শোভা উথলিছে! ভিতরে ফুল! বাহিরে ফুল! ফুলের অনন্ত রাজ্য। ফুল ভরা রাজ্যে, ফুলের ভিতরে ডুবিয়া, ফুলের পাখা তুলিয়া উড়িয়া উড়িয়া, ফুলে গড়া পরীগুলি ফুলের স্বপ্ন ছড়াইতেছে!' (পৃঃ ২৩৫)—লিরিক্যাল সৌন্দর্যে পূর্ণ।

কুন্তলার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা সত্ত্বেও যে শশাঙ্ক তার হৃদয় দৌর্বল্যের কথা কুন্তলাকে বলতে পারেনি, তার কারণ স্বরূপ শশাঙ্ক বলেছে—

'আমি যাহাকে মনে মনে একভাবে পাইতে চাই, সে আমাকে আর একভাবে প্রকাশ্যে পাইয়া বসিয়া আছে। সে আমাকে হৃদয়ে পুরিয়া প্রাণে স্থান দিয়া সুখ শান্তির নিরাবিল সাগরে গা ঢালিয়া ভাসিতেছে। আমার তাহার কাছে যাইতে লজ্জা হয়। তাহার মুখের দিকে চাহিতে কেমন কেমন বোধ হয়।' (পৃঃ ২২২)

শশাঙ্ক তার পিতার মৃত্যুর পর সন্ন্যাসী হয়েছে। স্বামীজীর পাহাড় হয়েছে তার বাসস্থান। আধ্যাত্মিক মার্গের পথিক হওয়া সত্ত্বেও সে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কুন্তলাকে বিস্মৃত হতে পারেনি, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সে নিজেই তা কুন্তলার কাছে স্বীকার করেছে, 'তোমার ভালবাসা এত উঁচু যে, আমি তাহা প্রাণের ক্ষুদ্র হস্তে নাগাল পাইনা—ধরিতে গিয়া অবাক হইয়া যাই; তবুও তুমি স্থির প্রশান্ত। কিন্তু আমি তোমার জন্য দিন রাত্রি অস্থির!' (পৃ, ৩২১—৩২২)

ভবানীশঙ্করের সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তি কুন্তলা শশাঙ্ক শেখরের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা মানোপযোগী একটি নূতন বড় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য, স্থান বিশেষে কতকগুলি নূতন দাতব্য চিকিৎসালয়, পুষ্করিণী খনন, অনাথ নিবাস নির্মাণে দানপত্র করে দিয়ে মৃত্যু পথযাত্রী শশাঙ্কশেখরের কাছে উপনীত হয়েছে এবং শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সে চিরতরে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে।

উপন্যাসটিতে সমসাময়িক সমাজ জীবনের নানা পরিচয় বিধৃত হয়েছে সেই

কারণেও আলোচ্য উপন্যাসটির গুরুত্ব অনেকখানি। সে সময়ে সংস্কৃত শিক্ষাদানের জন্য চতুষ্পাটী প্রতিষ্ঠিত হত, হরগোবিন্দকে চতুষ্পাটী স্থাপন করতে দেখা গেছে। বহুবিবাহ প্রথা যে সমাজ জীবনের কলঙ্ক স্বরূপ ছিল তার পরিচয় মেলে হরগোবিন্দের একমাত্র কন্যার স্বামী রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছত্রিশটি বিবাহের উল্লেখে। জাতিভেদ প্রথা সমাজ জীবনে দৃঢ়মূল হয়ে বসেছিল। নন্দনগিরি তার পরিচারিকা বিজয়াকে তাই নির্দেশ দিয়েছে তালুকদার জয়নারায়ণ চৌধুরীকে কায়স্থদের জন্য নির্দিষ্ট হুঁকা দিতে। ভূস্বামী, জমিদাররা লাঠিয়াল পুষত স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে। রাজবাড়ী আক্রমণে অংশগ্রহণকারী দেশীয় লাঠিয়ালদের সর্দার আরমান খাঁ কুন্তীর প্ররোচনা সত্ত্বেও নীরন্ধ্র শশাঙ্কশেখরকে আঘাত হানা থেকে বিরত ছিল। ধনী ব্যক্তিরা কিভাবে ইংরাজদের তোয়াজ করে কিংবা তাদের স্বার্থে অকাতরে অর্থ ব্যয় করে বিভিন্ন উপাধি লাভ করত, ভবানীশঙ্করের 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভের বৃত্তান্তই তার জীবন্ত প্রমাণ। দস্যুদের বিশেষতঃ জলপথে তাদের যে উৎপাত ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল তার পরিচয় পাই শ্রীহট্ট জেলার ছাতকগ্রাম থেকে নৌকায় ঢাকা যাবার পথে কুন্তলার হরানন্দ ব্রহ্মচারীর লোকদের দ্বারা অপহৃতা হওয়ার ঘটনায়, 'ডাকাতে নদীর' উল্লেখে, প্রসিদ্ধ দস্যুনিবাস বাসুদেবপুরের উল্লেখে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ দানের প্রয়াসও উল্লিখিত হয়েছে প্রসঙ্গত। ভবানীশঙ্করের ছোট ভাই কলকাতায় পাঠরত নির্মলচন্দ্র তার বিধবা ভগ্নী মধুবতীকে লিখেছিল, 'আজ আমি ভক্তিভাজন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গিয়েছিলাম। তোমাকে এখানে আনিতে পারিলে, যখন যেরূপ সাহায্যের দরকার হইবে, তিনি তাহাই করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।··· তোমাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশ্রয়েই রাখিয়া দিব। মধু যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তোমাকে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি সৎ পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতেও প্রস্তুত আছেন।' (পৃঃ ১২৫)

যেসব মেয়েকে সেকালে যমবরা করা হত, তারা চিরকাল অনূঢ়া থাকত। কুন্তলা ছিল এমনই এক যমবরা। প্লেটোনিক ভালবাসার জন্যই সে মূলতঃ শশাঙ্ককে বিবাহ করেনি, তাছাড়াও যমবরা হওয়ার দরুণও তার মনে যে সংস্কার দৃঢ়মূল হয়েছিল, তাও তাকে বিবাহে অসম্মত করে থাকবে। তার ভাষায়, 'আমি যমবরা। শিশুকাল হইতে এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, "যম আমার কাম্য বর, শ্মশান আমার বাসর ঘর, আগুন আমার ফুলশয্যা. ভস্ম আমার পরিণাম।" অন্যপ্রকার বিবাহ-মন্ত্রে আমার দীক্ষা বা শিক্ষা হয় নাই।" (পৃঃ ৩২৯)

এই প্রসঙ্গে কুন্তলার মন্তব্যটিও স্মরণযোগ্য—'ভগবান কাউকে যমবরা করেননি, এসব সমাজের অত্যাচার বই কিছুই নয়। যমবরাদেরও বিয়ে হওয়া উচিত'।

সবশেষে উপন্যাসটির কয়েকটি ত্রুটি বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে।

চক্রান্তকারীদের কারণে বিলাসপুরের রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করা হলে আহত শশাঙ্ককে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে আনতে গিয়ে রাজবল্লভের মৃত্যু ঘটেছে, অথচ সিন্দুক বহনকারী সন্ন্যাসীর কিছু হয়নি। ক্রুদ্ধা সুখদা ও ভবানীশঙ্কর যেভাবে সরমা ও মধুবতীকে হত্যা করে তাদের কাটা মুণ্ড নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছে তা অতিরঞ্জিত। দণ্ডির পাহাড়ে খাসিয়ারাজ মতি রায়ের বাংলা সংবাদ পত্র রাখা কিংবা বাংলা লিখতে পড়তে পারার বিষয়টিও আতিশয্য দোষে দুষ্ট। দণ্ডির পাহাড়ের তিন ক্রোশ উত্তরে হটন সাহেবের সৈন্যবাহিনী যখন খাসিয়াদের আক্রমনোদ্যত, তখন শশাঙ্কের সাহেবের কাছে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘ সময় ব্যাপী আর্য সভ্যতা, হিন্দুধর্ম, ইংরেজদের সঙ্গে হিন্দুদের তুলনামূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ, ইংরেজি-ফরাসী সাহিত্য নিয়ে সারগর্ভ মন্তব্য অবিশ্বাস্য। ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণ সত্ত্বেও নিছক কুন্তলার নির্দেশে কয়েক সহস্র খাসিয়ার তীর ধনুকে সুসজ্জিত থাকা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় থাকা অস্বাভাবিক। ধরণীর কন্যার ভেলায় চড়ে সমুদ্রযাত্রা, বন্দী অবস্থায় কুন্তলার দস্যুদলের কাছ থেকে বাঁশী সংগ্রহ করে তা বাজান যুক্তি-সঙ্গত হয়নি।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় রচিত '**আদরিণী**'র প্রকাশকাল ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ। পুস্তিকাটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত বলে জানান হয়েছে। পুস্তিকাটি উৎসর্গ করা হয়েছে তৎকালীন কলকাতা পুলিসের Detective Superin tendent Henry Samuel Johnstoneকে। নবম পরিচ্ছেদে পুস্তিকাটি সমাপ্ত। লেখক নিজেই তাঁর গ্রন্থটিকে 'উপন্যাস' বলে অভিহিত করেছেন।

পুস্তিকাটির বিষয় হ'ল—হরিদাসী নাম্নী এক অসহায়া বালিকা কেমন করে তার কুমারী ধর্ম রক্ষা করেছিল সেই প্রসঙ্গ।

পুস্তিকাটির প্রথম পরিচ্ছেদেই লেখক সাসপেন্স তৈরী করেছেন। বর্ণিত হয়েছে শ্যামবাজারের গোপীমোহন দত্ত লেনের এক বাড়ী থেকে ভোজনরতা তিনকড়িকে এক সাহেব ও এদেশীয় দুটি যুবক ধরে নিয়ে গেছে। কয়েকদিন পরে দেখা গেছে হরিদাসী বা আহলাদী তারাও বাড়ীতে নেই।

কলকাতা মহানগরীর ছোট আদালতের যে বিবরণ বর্ণিত হয়েছে, তা অত্যন্ত জীবন্ত। এই আদালতেই দেখা গেছে তিনকড়িকে হাজির করতে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে নাকি জনৈক অম্বিকা চরণ দত্তের কাছে টাকা ধার করে পরে তার টাকা আর শোধ করে নি। কিন্তু তিনকড়ি জানিয়েছে সে অম্বিকা চরণ দত্ত বলে কাউকে চেনে না পর্যন্ত, টাকা ধার করা ত দূরের কথা। যাই হোক তিনকড়ির জেল হয়েছে শাস্তি হিসাবে। শেষ পর্যন্ত তিনকড়ির পরিচিত সুরেশ চন্দ্র ও আর একজনের সহায়তায় তিনকড়ি মুক্তি পেয়েছে। জানা গেছে অম্বিকাচরণ নামে কেউই নেই। সাহেব বিচারক পুলিসকে নির্দেশ দিয়েছেন সমস্ত ব্যাপারটি তদন্ত করতে।

তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে সব রহস্য। মরুচর নামক স্থানের জমিদার জগৎ

সিংহ অসহায়া তিনকড়ি ও তার দৌহিত্রীকে সাহায্য করার ছলনায় কলকাতায় এনে সুযোগমত আদরিণীর সর্বনাশে উদ্যত হলে তিনকড়ি বাধা দেয়, তাতেই তার বিরুদ্ধে মিথ্যা চক্রান্তের জাল রচিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আদরিণীর কুমারীত্ব নাশ করতে সক্ষম হয়নি জগৎ সিংহ। মাধব দাসের বাড়ীতে তারা আশ্রয় নেওয়ায় তার বাড়ীতে জগৎ ডাকাতি করিয়ে হরিদাসী বা আদরিণীকে হরণ করিয়েছে। জগৎ সিংহকে পদাঘাত করে হরিদাসী জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। জনৈক নবীন অচৈতন্য হরিদাসীকে উদ্ধার করে পুলিশে খবর দিয়েছে। জগৎ সিংহ প্রভূত অর্থ ব্যয় করে সে যাত্রা রেহাই পেয়েছে।

কলকাতায় সুরেশের বাড়ী হরিদাসী ও তিনকড়ি বাস করার সময় কৌশলে তিনকড়িকে অপহরণ করে হরিদাসীকে নিজের ইচ্ছামত ভোগ করতে চেয়েও জগৎ সিংহ ব্যর্থকাম হয়েছে। পুলিশ এবারে সবকিছু তথ্য হস্তগত করেছে, দোষীরা শাস্তি পেয়েছে।

শতাধিক বৎসর পূর্বে বিত্তবান মানুষ নিজেদের বাসনা চরিতার্থতার জন্য যে কত রকমের কৌশল অবলম্বন করত তার পরিচয় আমরা এই ঘটনা থেকে পাই। মিথ্যা মোকদ্দমা, জুয়াচুরি, চক্রান্ত ইত্যাদি ছিল নিত্যকার ব্যাপার। তবে যোগ্য বিচারপতির নজরে পড়লে যে চক্রান্ত ধরা পড়ত, তারও পরিচয় আমরা বর্ণিত কাহিনী থেকে পাই। লেখকের কাহিনী পরিবেশনের নৈপুণ্যকে স্বীকার করতে হয়। তবে উপন্যাসের মর্যাদা আলোচ্য পুস্তিকাটিকে দেওয়া যায় না। কারণ সাংবাদিক সুলভ ভূমিকা গ্রহণ করে লেখক আলোচ্য কাহিনীটি রচনা করেছেন। হরিদাসী মাত্র তের বৎসরের বালিকা হয়েও যে সাহসিকতা দেখিয়েছে, সেজন্য তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জাগে। কিন্তু তার চরিত্রের কোন বিবর্তন দেখান হয়নি, দেখানোর অবকাশও ছিল না। সুরেশ, নবীন—এদের পরোপচিকীর্ষা উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ বিচারপতির কর্তব্য জ্ঞানও তাঁকে শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে।

চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত **'দুখানি ছবি'** উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশকাল ১২৯৫। গ্রন্থটি যে সেকালে জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েছিল তার প্রমাণ মাত্র দশ বছরের মধ্যে উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ (১৩০৫)।

লেখক গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন পুণ্য শ্লোক পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। নিছক প্রাতঃ স্মরণীয় বিদ্যাসাগরের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি প্রদর্শনের জন্যই যে গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল তা নয়, গ্রন্থটির বিষয় বস্তুর কারণেই লেখক গ্রন্থটি ঈশ্বরচন্দ্রকে উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। উপন্যাসটির মূল প্রতিপাদ্য বিধবার ব্রহ্মচর্য ও বৈধব্যের সদ্ব্যবহার কিরূপে সহজসাধ্য ও সুখকর হয় এবং বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা থাকলে কোন্ শ্রেণীর বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গ।

মূলতঃ বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত সমাজ সংস্কার মূলক আন্দোলনের পৃষ্ঠ-

পোষকতা করতেই যে উপন্যাসটির পরিকল্পনা, তা সহজেই বোঝা যায়। তাই নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ইংরেজী শিক্ষার আবশ্যকতা, বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় যৌক্তিকতা ইত্যাদি প্রগতিমূলক চিন্তাধারার প্রতিফলন উপন্যাসটিতে লক্ষণীয়। সেই সঙ্গে কৌলীন্য প্রথার বিষময় ফলও প্রদর্শিত হয়েছে। যদিও বিশেষ এক আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যেই উপন্যাসটি রচনার পরিকল্পনা, তবু লেখকের কৃতিত্ব এই যে তিনি কাহিনীটিকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। নিছক বিশেষ আদর্শ প্রচারের মুখপত্রে পরিণত হয়নি। অবশ্যই কাহিনীতে তেমন জটিলতা কিংবা অভিনবত্বের পরিচয় অনুপস্থিত, কিংবা সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের সন্ধান লাভেও একালের পাঠককে নিরাশ হতে হবে, তথাপি কাহিনী বয়নে চরিত্র চিত্রণে এবং সর্বোপরি ভাষার প্রসাদ গুণে 'দুখানি ছবি'কে রসোত্তীর্ণ রচনা বলেই স্বীকার করতে হয়।

উপন্যাসটির দুই প্রধান নারী চরিত্র হ'ল প্রেমমালা ও মনোরমা। প্রেমমালা উপন্যাসের নায়িকা। অকাল বৈধব্যের পর তাকে দেখা গেছে কঠিন ব্রহ্মচর্যের আশ্রয়ে নিজের পবিত্রতা রক্ষায়। প্রেমমালা সেকালের বিচারে শিক্ষিতা এবং প্রগতিমূলক সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, পর নিন্দা পর চর্চায় রত বয়স্কা মহিলাদের মানসিকতার উৎকর্ষ বিধানে তার নিরন্তর প্রয়াস, বিধবা ননদের বিবাহে তার উৎসাহ প্রেমমালা চরিত্রটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তাছাড়া তার পতি ভক্তি, কর্তব্যপরায়ণতা তার চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। বয়সে প্রেমমালা তার অকাল বিধবা ননদ মনোরমার থেকে খুব বেশি বড় হবে না। একদিকে সে সংস্কার মুক্ত মানসিকতার পরিচয় দিলেও বৈধব্য জীবন যাপনে তাকে কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন মনের অধিকারিণী রূপে দেখা গেছে। নিষ্ঠার সঙ্গে একাদশীর উপবাস করেছে সে, মাথার চুলে তেল দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে, পরিধেয় বস্ত্রাদির ক্ষেত্রেও চরম সংযম ও কৃচ্ছ্র সাধনের পথ অবলম্বন করেছে।

অপরপক্ষে প্রেমমালার তুলনায় মনোরমাকে কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ রূপে চিত্রিত হতে দেখা গেলেও সে মনে মনে তার দাদার বন্ধু শরৎচন্দ্রকে ভালবেসেছে এবং শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রকে বিবাহ করে নতুন করে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেছে। প্রেমমালা ও মনোরমাকে উপলক্ষ্য করেই উপন্যাসটির নামকরণ। উপন্যাসটির নায়ক বিনয় ভূষণ। সে আদর্শ পরায়ণ, উচ্চাশা সম্পন্ন শিক্ষিত যুবক। কিন্তু তাই বলে মাতৃভক্তিতে সে কিছু কম নয়। অল্প বয়সে বিবাহে যদিও তার ঘোরতর আপত্তি তথাপি মাতার আদেশ লঙ্ঘনে অপারগ হয়ে সে ছাত্রাবস্থাতেই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। একদিকে যুক্তি অপরদিকে মাতার প্রতি কর্তব্য, এই দুইয়ের টানা পোড়েনে সে বিচলিত হয়েছে। লেখক নিপুণতার সঙ্গে এই দ্বন্দ্বটি দেখিয়েছেন। যেহেতু বিদ্যাসাগরের আদর্শে লেখক অনুপ্রাণিত ছিলেন, তাই বিনয়ভূষণকে গোপালবাবুর বিধবা কন্যা সরমার প্রতি প্রণয়াসক্ত দেখিয়েছেন, যদিও মাতার কারণে এবং নিজের

ব্যক্তিত্বের অভাবে বিনয়ভূষণ সরমাকে বিবাহ করতে পারেনি। কিন্তু লেখক বিনয়ের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু শরৎচন্দ্রকে বিধবা মনোরমার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে বিদ্যাসাগরের আদর্শকে জয়যুক্ত দেখাতে চেয়েছেন।

বিনয়ভূষণ ও প্রেমমালার বাল্যপ্রণয়ের চিত্রণে লেখক মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসটির সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল সমসাময়িক সমাজ জীবনের নিখুঁত প্রতিফলনে নির্ভরযোগ্য দলিলে পরিণত হওয়া। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে যে গৌরীদান প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল, তার কুফল, বালিকা কন্যার শ্বশুরালয়ে নির্মম আচরণের সম্মুখীন হওয়া, বয়স্ক পাত্রের অর্থের বিনিময়ে দুগ্ধপোষ্য বালিকার পাণিগ্রহণ, বিধবা সম্পর্কে সমাজের সাধারণ মানসিকতা, (বিধবা মেয়ে বেঁচেই বা কি রাজা করবে। পৃঃ ১৫০) জলপড়া, তেলপড়া, কিংবা কবিরাজীর পরিবর্তে ইংরেজ চিকিৎসকদের প্রতি নির্ভরতা, অসহায় মানুষের প্রতি সাহায্যদানে সমাজের কার্পণ্য ইত্যাদি চমৎকার ভাবে উপন্যাসটিতে রূপায়িত হয়েছে।

উপন্যাসটি চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রতিটি পরিচ্ছেদের পৃথক পৃথক নামকরণ করা হয়েছে। একেবারে শেষে উপক্রমণিকা যুক্ত হয়েছে। আদ্যন্ত উপন্যাসটি সাধু ভাষায় রচিত। তবে প্রত্যক্ষ উক্তিগুলি চলিত ছাঁদের—

'প্রেম। তুমি বুঝি মনে করেছ আমি সব ভুলেছি—সকল কথাই আমি মনে করে রেখেছি। কাল সব শেষে তুমিত আমাকে বলেছিলে, "আমাকে দেখে তোমার বড় আনন্দ হয়েছে" …। (পৃঃ ৫০)

প্রকৃতির বর্ণনা দানেও লেখকের মুন্সীয়ানা লক্ষণীয়, বিশেষত বিভিন্ন চরিত্রের মানসিকতার ব্যাখ্যায় প্রকৃতির প্রসঙ্গ তুলনা হিসাবে স্থান পেয়েছে। উপন্যাস মধ্যে লেখকের স্নিগ্ধ পরিহাস প্রিয়তার স্বাক্ষরও বিদ্যমান।

কালাচাঁদ বেশি বয়স হওয়া সত্ত্বেও আশানুরূপ লেখাপড়া করতে পারেনি বলে তার প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে, 'বাল্যকাল হইতে লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া বিংশতিবর্ষ পর্যন্ত লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছেন, এত উন্নতি করিয়াছেন যে, বাগ্দেবী স্বয়ং অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন—এ ছেলেকে কোথায় স্থান দিবেন,…।' (পৃঃ ৪৪)

আসন্ন পতিবিরহে কাতরা ক্রন্দনরতা প্রেমমালাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে—

'বৃষ্টিকালীন জলবিম্বসমূহে সূর্য কিরণ পতিত হইতেছে, এখনই রামধনু দেখা যাবে।' (পৃঃ ৮৪)

প্রায়শই লেখক পাঠককে উদ্দেশ করে নানা নীতি উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। অনেক সময়ে তার বাহুল্য উপন্যাসের শিল্পরীতিকে লঙ্ঘন করেছে।

গ্রাম থেকে উপনীত প্রেমমালার চোখে কলকাতার যে দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে, তা লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচায়ক—'ক্ষুদ্র বৃহৎ অগণ্য অট্টালিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সহরের অনন্ত সৌন্দর্য ও শোভা সম্পাদন করিতেছে

রাজপথের পার্শ্ববর্তী শ্রেণীবদ্ধ আলোক স্তম্ভ সমূহে সূর্যকিরণ প্রতিভাত হইয়া অসংখ্য হীরকখণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে—দেখিলে বোধহয় যেন পৌরাণিক অমরাবতী কল্পনার দ্বারা অতিক্রম করিয়া বর্তমান কলিকাতাতে পরিণত হইয়াছে।' (পৃঃ ১৬৪)।

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ করা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। আলোচ্য উপন্যাসে লেখক স্পষ্টতঃই অনুবাদের দায়িত্ব লঙ সাহেবের উপরেই ন্যস্ত করেছেন

'তিনিই নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।' (পৃঃ ১৬৫)

কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত '**কুমুদিনী**' উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১২৯৫। উপন্যাসটি অক্ষয়কুমার সরকারকে উৎসর্গীকৃত।

উপন্যাসটির প্রস্তাবনায় দুর্গেশ নন্দিনীর প্রভাব লক্ষণীয়—

'১১৩০ সালের বৈশাখ মাসের একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে একজন যুবা, একাকী সুবর্ণগ্রামে বিষয় কার্যোপলক্ষে গমন করিতেছিলেন। অকস্মাৎ পথিমধ্যে একখানি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ পশ্চিমাণ্ডলে উঠিতে দেখিয়া ভীত হইলেন। পরে আশ্রয়স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে সম্মুখে একখানি বিপণি দৃষ্টিগোচর করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।' (পৃঃ ১)

সমগ্র উপন্যাসেই বঙ্কিমের প্রভাব পরিস্ফুট। প্রতিটি পরিচ্ছেদের পৃথক পৃথক নামকরণ করেছেন লেখক, মাঝে মাঝে পাঠককে উদ্দেশ করে বক্তব্যও উপস্থাপিত হয়েছে।

উপন্যাসে স্বপ্ন ও পত্রের ব্যবহার-আধিক্য লক্ষণীয়। এক্ষেত্রেও লেখক বঙ্কিমের অনুসারী, তবে বলাবাহুল্য বঙ্কিমের মত মুন্সীয়ানা লেখক দেখাতে পারেন নি।

উপন্যাসের কাহিনীতে কিছু পরিমাণে কষ্ট কল্পনা লক্ষিত হলেও জটিলতা সৃষ্টি ও তার উন্মোচনে লেখকের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। অলৌকিকতা প্রকাশের সুযোগ থাকলেও লেখক সে সুযোগের অপব্যবহার করেন নি। প্রকৃতির বর্ণনায় লেখক সংস্কৃতানুগ ভাষা ব্যবহার করেছেন। একশত বৎসর পূর্বেকার বাংলার গ্রামীণ জীবনের প্রতিফলনে উপন্যাসটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিছু পরিমাণে রক্ষিত হয়েছে। ব্রাহ্মণের সেবার জন্য পৃথক হুঁকা রাখার রীতি, জমিদারের প্রতি গ্রামের মানুষের ভক্তির ভাব, পাইক-বরকন্দাজ সহ জমিদারদের যাতায়াত করার প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা, গ্রহণ উপলক্ষ্যে গঙ্গা স্নান, জলপথে যাতায়াতের বাহুল্য, ধাত্রীর সাহায্যে সন্তান সম্ভবা রমণীর প্রসব করানো, ডাকাতের অত্যাচার ইত্যাদি তথ্যাদি উপন্যাসটি থেকে লভ্য।

উপন্যাসটির নায়ক সুবর্ণগ্রামের জমিদার রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ। তিনি শিক্ষিত, অমায়িক এবং বিলাসপ্রিয়তা মুক্ত। বিলাসপুরের রজনীকান্তের পত্নী কুমুদিনী পুত্র চন্দ্রনাথ সহ তার পালিতা মাতা ভৈরবীকে দেখার জন্য

আসার পথে ডাকাতদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়। পুত্রসহ কুমুদিনী এক ডাকাত কর্তৃক অপহৃতা হয়। ভৈরবীর নির্দেশে কালকেতু ডাকাতদের নদীর জলে নিমজ্জিত করে। সুরেন্দ্রনাথের দেওয়ান কুমুদিনীকে আশ্রয় দেয়। দেওয়ানের কাছ থেকে প্রাপ্ত পত্রে কুমুদিনী সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ তার সহায়তার জন্য যাত্রা করেন। সুরেন্দ্রনাথ-কুমুদিনীর সম্পর্ক নিয়ে সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী বসন্তকুমারী দুশ্চিন্তার শিকার হন। শেষ পর্যন্ত বসন্তকুমারীর আশঙ্কা কেমন করে ভুল প্রমাণিত হল, রজনীকান্ত পুনরায় তার স্ত্রী কুমুদিনীর সঙ্গে মিলিত হ'ল এই হল উপন্যাসটির মূল ঘটনা।

চরিত্র চিত্রণ আশানুরূপ, তবে ভৈরবী চরিত্রটি আকর্ষণীয় হয়েছে।

বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত '**উপন্যাস কুসুমে**'র প্রকাশকাল ১২৯৬ সাল। আসলে এ'টি ন'টি ছোট গল্পের সংকলন। সম্পাদক গল্পগুলিকেই উপন্যাস নামে অভিহিত করেছেন। সংকলিত গল্পগুলি হ'ল যথাক্রমে ফুলজানি বেগম, কনোজ কুসুম, কুসুমিকা, দেবী না পিশাচী, ভাই ভাই, আমার মৃণাল, স্বামীপূজা, লক্ষ টাকা ও অদ্ভুত রহস্য। 'ফুলজানি বেগম' প্রেমের কাহিনী। আমেদাবাদের দেবী গাওন পল্লীর নারায়ণ রাওএর পুত্র পুরন্দরের সঙ্গে এই গ্রামেরই এক বিধবার কন্যা ফুলবাইয়ের বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু ফুলবাইয়ের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ঔরঙ্গজেব তাকে বেগম করে নেন। এর পর ফুলবাই হল ফুলজানি বেগম। ফুলজানির পরামর্শে পুরন্দর সুরক্ষিত বেগম মহলে উপস্থিত হয়। উদ্দেশ্য দুজনের আত্মহত্যা। কিন্তু তৎপূর্বেই পুরন্দর ধরা পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে তার প্রাণদণ্ড হয়, ফুলজানিও পুরন্দরের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করে। ঔরঙ্গজেব উভয়ের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে দুজনকে একই সঙ্গে কবর দানের ব্যবস্থা করেন আর কবরের ওপর প্রস্তুত করান শ্বেত প্রস্তরের ফোয়ারা।

'কনোজ কুসুমে' কনোজাধিপতি বাসুদেও তার কন্যা ও স্ত্রীকে হস্তীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করায় ইরানের বণিক পুত্রের ছদ্মবেশধারী বেনশাপুরকে উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করতে চাইলে তিনি রাজকন্যার পাণি-গ্রহণের ইচ্ছাপ্রকাশ করে বসেন। কনোজাধিপতি গুরুতর রূপে অসন্তুষ্ট হন, এবং এ প্রস্তাবে অসম্মত হন। পরে প্রকাশ পায় ইনি সচ্চরিত্র তৃতীয় সাপুরের পুত্র বায়রাম, পারস্যে এঁর অবস্থান। রাজকন্যার সঙ্গে বেনশাপুরের বিবাহের আর কোন বাধা রইল না।

'কুসুমিকা' গল্পটি অপেক্ষাকৃত বড় অবং কৌতুক রসের। রামবাবুর বিধবা কন্যা 'কুসুমিকা'র প্রতি বিনোদ এবং গোপাল উভয়েরই আকর্ষণ। বিনোদ ব্রাহ্ম, গোপাল স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। কুসুমিকা উভয়কেই বিবাহ করার সম্মতি জানিয়ে কিভাবে জব্দ করল তারই উপভোগ্য বিবরণে গল্পের পরিসমাপ্তি। দুজনের অন্ধকার গলিতে পরস্পরের অভিলষিত প্রণয়ী জ্ঞানে আলিঙ্গন ও শেষ পর্যন্ত ভ্রমের নিরসন, উভয়ের বিরোধ,

কুসুমিকার নির্দেশে উভয়ের ওপর গরল জল নিক্ষেপ এবং ধরা পড়ার মধ্য দিয়ে গল্পের সমাপ্তি টানা হয়েছে। 'দেবী না পিশাচী' গল্পে মদ্যপ ও দুশ্চরিত্র হীরালালের পত্নীর পাতিব্রত্য এবং কুসুমনাম্নী বারাঙ্গনার কর্তব্য পরায়ণতা দেখান হয়েছে। হীরালালের দেওয়া সমস্ত কিছু বিক্রয় করে বিক্রয় লব্ধ অর্থ হীরালালকে দিয়ে কুসুম আত্মহত্যা করে হীরালালের পরিবারকে বাঁচিয়েছে।

'ভাই ভাই' গল্পে এক রমণীকে কেন্দ্র করে দুই ভ্রাতা সুরেশ ও যোগেশের যে দ্বন্দ্ব ও তার পরিণাম বর্ণিত হয়েছে।

'আমার মৃণাল' গল্পে দুর্যোগের শিকার লেখক তার অভিন্ন হৃদয় স্ত্রী মৃণাল জ্ঞানে যার কেশগুচ্ছ ধরে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন, ঝড়ের অবসানে দেখলেন সে মৃণাল নয়, অপর স্ত্রীলোক।

'স্বামী পূজা' পারস্পরিক সন্দেহ কেমন করে সুখী সংসারকে বিধ্বস্ত করে তার বিবরণ। যে বিমল ও স্নেহের মধ্যে ছিল মধুর সম্পর্ক, সেই বিমল সন্দেহ করল তার স্ত্রী স্নেহ দেওর চারুর প্রতিই বুঝিবা আকৃষ্টা। সে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে স্নেহকে হত্যা করতে উদ্যত হলে, স্নেহই আত্মহননের পথ নিয়েছে, তবে তার আগে বিমলের প্রতি তার ঐকান্তিক ভক্তির পরিচয় দিয়ে গেছে।

গল্পগুলি রচনায় লেখকের আঙ্গিকগত কোনো মুন্সীয়ানার তেমন পরিচয় মেলেনা। গল্পগুলির উপস্থাপনা যেমন নাটকীয় হয়নি, তেমনি সমাপ্তিতেও কোন চমক দেখা যায় না। নিতান্ত সহজ সরল ভাবে গল্পগুলি বর্ণিত। তবে কাহিনী নির্বাচনে লেখকের কৃতিত্বকে স্বীকার করতে হয়। সংকলিত গল্পগুলির বৈচিত্র্যও মন্দ নয়। তবে ন'টি গল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল প্রথম গল্পটি। ভাগ্যের পরিহাসে ফুলবাই ফুলজানি বেগমে পরিণত হলেও সে যে তার প্রথম স্বামী পুরন্দরের প্রেমে অবিচল ছিল তার পরিচয়ে এবং প্রেমের মর্যাদা রক্ষাকল্পে উভয়ের মৃত্যু বরণে গল্পটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। ঔরঙ্গজেবের উভয়ের প্রেমের স্বীকৃতিদানে গল্পটির মাধুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। 'কুসুমিকা' গল্পটির কৌতুক রস উপভোগ্য হলেও, কুসুমিকার বিনোদ ও গোপালের সঙ্গে অভিনয় অনবদ্য হলেও উভয়ের প্রতি গরম জল ফেলার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন কুসুমিকার রূঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি কৌতুকরসও কিছুটা ম্লান হয়েছে। 'দেবী না পিশাচী' গল্পের নাম ভূমিকায় দেখা গেছে কুসুমকে। কুসুমের আত্মহননের মাধ্যমে হীরালালের প্রতি তার একনিষ্ঠ প্রেমই সূচিত হয়। 'ভাই ভাই' ত্রিভুজ প্রেমের গল্প। তবে পরিণতি কিছুটা অবাস্তব।

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বিরচিত **'ভবানী-ঠাকুর'** উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১২৯৭। উপন্যাসটি অষ্ট পঞ্চাশৎ চিত্রে সমাপ্ত। প্রতিটি চিত্র আরম্ভ হয়েছে পৃথক পৃথক নামকরণে এবং বিষয় অনুগত কবিতার উদ্ধৃতির মাধ্যমে। 'ভবানী-ঠাকুর' আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস। নায়ক ভবানীর জবানীতে রচিত। উপন্যাসটি যেমন বিশাল, তেমনি তা অসংখ্য চরিত্র ও ঘটনারাজিতে সমাকীর্ণ।

উপন্যাসের সিংহ ভাগ অবশ্য অধিকার করেছে দস্যুদলের নৃশংস ও রোমাঞ্চকর কার্যাবলী। ভাগ্যের বিপর্যয়ে ভবানী দস্যুদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এইসব কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করেছে। তবে শুধু দস্যুতাই নয়, সেই সঙ্গে প্রেম, প্রেমের জন্য চরম কৃচ্ছ্রসাধন, সম্পত্তির প্রলোভনে মানুষের চরম নীচতা ইত্যাদি নানা ঘটনারাজি উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চলকেই উপন্যাসের পটভূমি রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয় বস্তুর অভিনবত্বে, উপস্থাপনার নৈপুণ্যে এবং সর্বোপরি সংক্ষিপ্ত ও সরল কথ্য ভাষার কারণে উপন্যাসটি আকর্ষণীয়, সুখ পাঠ্য ও গতি সম্পন্ন হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাঠকের আকর্ষণ বজায় থাকে। উপন্যাসটির আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য তৎকালীন সমাজ জীবনের উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন, যা উপন্যাসটির গুরুত্বকে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে।

লেখক নিজে উপন্যাসটিকে অভিহিত করেছেন 'মানবচরিত্রের অপূর্ব ইতিহাস' বলে, বস্তুত অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ যেমন উপন্যাসটির আকর্ষণ ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছে, তেমনি চরিত্র চিত্রণ নৈপুণ্য লেখকের শক্তিমত্তা প্রমাণ করেছে। তবে দু'একটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ চরিত্রই সীমিত পরিসরে উপস্থাপিত হয়েছে। চলমান গাড়ি থেকে দেখা মানুষের মত চরিত্রগুলি অল্প সময়ের জন্য আত্মপ্রকাশ করেই অন্তর্হিত হয়ে গেছে। ফলে চরিত্রগুলির বিবর্তন ঘটেনি।

কমল খাঁ জাতিতে হিন্দু, তার আসল নাম কমল রায়। মুসলমান ফৌজদারের কাছে নিজের ভগ্নীকে সমর্পণ করে কর আদায়কারীর পদ লাভ করেছে। কমল খাঁ ছিল অতিশয় অত্যাচারী। বিদর যাত্রার পথে পীর মহম্মদের হাতে সে খুন হয়েছে।

অজমা চরিত্রটি খুবই আকর্ষণীয়। বিদরে অজমা মহম্মদকে জীবনসঙ্গী রূপে লাভ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সে আত্ম পরিচয়ে জানিয়েছে ধনবানের কন্যা, কিন্তু তার স্বামী সুরাপায়ী, ক্রোধী এবং অত্যাচারী। পিতার সম্মতিতে পীর মহম্মদ অজমাকে নিকে করেছে। জব্বলপুর থেকে ফতেপুর আসার পথে অজমা ধনরত্ন সহ পলাতকা হয়েছে। মহম্মদ ভবানী সহ বীরভানুপুরে উপস্থিত হয়ে জানতে পেরেছে অজমা মারা গেছে। মহম্মদ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে তার প্রাণাধিক প্রিয় অজমার হত্যাকারীকে উপযুক্ত প্রতিফল দেবেই। কিন্তু মিনারে উপস্থিত হয়ে অজমার বাড়ীতেই অজমার সন্ধান মিলেছে। জানা গেছে সে দস্যুদলের প্রধানা। অর্থ উপার্জনই তার একমাত্র লক্ষ্য। প্রেমের অভিনয়ে সে মহম্মদকে প্রতারিত করেছে, হস্তগত করেছে প্রভূত ধনরত্ন। মহম্মদের মোহভঙ্গ হয়েছে।

হিঙ্গনা আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। সুন্দরী বলে মাত্র সাত বছর বয়সেই সে পিতা-মাতার স্নেহচ্ছায়া থেকে অপহৃতা হয়েছিল। সে ক্ষত্রিয় কন্যা। দশ বৎসর বয়সে তাকে নৃত্য শিক্ষা দিয়ে বাইজী রূপে নিযুক্ত করা হয়। মহম্মদ হিঙ্গনার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়েছে। হায়দরাবাদে অবস্থানকালে

মহম্মদ ও ভবানী অবহিত হয়েছে হিঙ্গনা নেই। বিদরে সন্ন্যাসী রূপী দস্যুর বসার আসনের তলদেশ থেকে তার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বেচারী আক্ষরিক অর্থেই হতভাগিনী। জীবনে তার সুখ কোনদিনও জোটেনি। অকারণে শুধু দুঃখ ভোগ করে গেছে সারাজীবন। অজমার পলায়নের জন্য মহম্মদ তাকেই সন্দেহ করেছে, নানা ভাবে পীড়িত ও লাঞ্ছিত করেছে তাকে। মহম্মদকে স্বামী রূপে গ্রহণ করেও সে স্ত্রীর মর্যাদা পায় নি। সেখানেও বাধ সেজেছে ছলনাময়ী অজমা। অপমানিতা হিঙ্গনা সন্তানসম্ভবা হয়েও পথেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। তার একটি সন্তান হয়েছে। অতি-কষ্টে হিঙ্গনা তার সন্তানের জীবন রক্ষা করেছে। গঙ্গামণির কৃপায় তার আশ্রয় লাভ ঘটেছে। তার পাতিব্রত্য অতুলনীয়। সন্তানকে মহম্মদের হাতে তুলে দিয়ে হিঙ্গনা মৃত্যুর শীতল স্পর্শ লাভ করেছে। মহম্মদ যখন হিঙ্গনাকে বুঝতে পেরেছে, তখন তার আর জীবনের মেয়াদ বেশি দিন ছিল না, ফলে পতির প্রেম লাভে বঞ্চিত থেকে অতৃপ্তি জনিত দীর্ঘশ্বাস নিয়েই মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে।

মা-বাবার কারণে কন্যা কিভাবে বিপথ গামিনী হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত করুণা। ধনী গণেশলালের বিবাহিতা কন্যা করুণা। করুণাকে গর্ভবতী করতে তার মা তাকে ভবানীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে প্ররোচিত করেছে। ভবানী করুণার প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। করুণা কিশোরীচাঁদের সঙ্গে পালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে সে বারবিলাসিনীর জীবনকে বেছে নিয়েছে।

জিন্নৎ আলীমীর দস্যু সর্দার। দস্যুতা করে প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারী হলেও শেষ পর্যন্ত স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সে গঙ্গাবাসী হয়েছে। পুত্র মহম্মদ ও পালিত পুত্র ভবানীকে পাপের পথ পরিহার করার পরামর্শ দিয়েছে সে। তার উপার্জিত বিষয় ও অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তি ও জন-কল্যাণে ব্যয়ের ব্যবস্থা করে অবশিষ্ট সম্পত্তি মহম্মদ ও ভবানীর মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়ে ভবানীর প্রতি তার কর্তব্য ও স্নেহের পরিচয় রেখেছে।

সত্যচরণ গাঙ্গুলী সমাজের একজন মাথা, কিন্তু নিজের পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনীর গর্ভ সঞ্চার করেছে সে।

মুর্শিদাবাদের গণেশলাল ধনী কিন্তু অপুত্রক। পাছে ছোট ভাই বেণওয়ারীলালের সন্তান সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাই ডাক্তার কালী চরণ ঘোষের সহায়তায় দু'হাজার টাকার বিনিময়ে সে বেণওয়ারীলালের সন্তান সম্ভবা স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করিয়েছে। শুধু তাই নয় ঝণ্টুলালের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত হয়েছে বেণোয়ারীকে হত্যা করাতে। শেষে অন্যান্যদের সঙ্গে গণেশলাল ধরা পড়ে শাস্তি লাভ করেছে।

রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ হলেও ব্যর্থ প্রেমের কারণে প্রতিহিংসা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সে ডাকাত দলে নাম লিখিয়েছে। হরিহর মুখুজ্যের কন্যার প্রেমিক ছিল সে। তথাপি মহামায়ার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হল জমিদার রাধাকান্ত

ভট্টাচার্যের পুত্র রজনীকান্তের। বিবাহের পরেও মহামায়ার সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথের সম্পর্ক থেকে যায় আর তারই ফলে মহামায়ার একটি কন্যা সন্তান জন্মে। রজনীর আক্রোশে পড়ে রাজেন্দ্রনাথের যথাসর্বস্ব যায়। সে তখন ডাকাত দলে যোগদান করে রজনীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে। সুযোগমত রজনীকে সে হত্যাও করে। ধরাও পড়ে সে। সুশীলার সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার রাজেন্দ্রনাথের অপত্য স্নেহের পরিচায়ক।

ধর্ম প্রচারকের চারিত্রিক শৈথিল্য চমৎকার দেখিয়েছেন লেখক। 'প্রেমের নিকটে জাতি ভেদ তুচ্ছ! সমাধি প্রাপ্ত সমদর্শীর চক্ষে উচ্চ নীচ নাই—' প্রচারক পরিচারিকা বিমলের সঙ্গে দৈহিক মিলনের মাধ্যমে যেন তার প্রচারিত ধর্মাদর্শকেই প্রমাণ করেছে!

ভবতারণ তত্ত্বদর্শীর শিষ্য ভবানীর প্রতি স্নেহ ও কর্তব্য বোধ তাঁর চরিত্রটিকে শ্রদ্ধাস্পদ করে তুলেছে। ভবতারণ যোগ বলের অধিকারী। তিনি যোগবলের সাহায্যে ভবানীকে নির্মলার সঙ্গে মিলিত হতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি নির্মলা ও ভবানীকে নিতাইয়ের কাছ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত মধুপুর গ্রামের ভৃঙ্গরাজ মিত্রের দুটি বিয়ে। সন্তান হীন ভৃঙ্গরাজ সন্তান লাভের আশাতেই একাধিক বিবাহ করেছিল। প্রথমা স্ত্রী দ্বিতীয়া স্ত্রীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করত। বেচারী স্বামীর সাক্ষাৎলাভ থেকেও বঞ্চিতা ছিল। প্রথমা স্ত্রী তার প্রেমিককে ভাই বলে বাড়ীতে স্থান দিয়েছিল। সতীনকে এক রাত্রে খুন করতে এসে বড় বধূ নিজের ছুরির আঘাতে মৃত্যু বরণ করে। মৃত্যুর পূর্বে সে স্বীকার করে যায় ব্রাহ্মণ সন্তান গজপতির সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের কথা। প্রথমা স্ত্রীর বিবেক দংশন এবং নিজের অন্যায় কর্মের জন্য তার দুর্বল চিত্ততা ও বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার বিবরণ দানে লেখক প্রশংসনীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন স্বীকার করতে হয়।

ভবানী ও নির্মলার প্রণয় বৃত্তান্তটিও রমণীয় ও স্নিগ্ধ। উপন্যাসের সমাপ্তিতেও লেখক পাঠকদের জন্য বিস্ময় রেখে গেছেন। আমরা জানতে পারি নির্মলার পিতা মাতা আসলে তার পালক পিতা মাতা, তারা ভবানীর প্রকৃত পিতা মাতা। দুটি পরিবারের পুত্র ও কন্যা সন্তান পরিবর্তনের জন্যই এমনটি ঘটে ছিল। শেষে প্রকৃত সত্য প্রকাশ পেয়েছে।

উপন্যাসটিতে আমরা সমসাময়িক সমাজ জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি লাভ করি। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এদেশের প্রজারা কিভাবে জমিদারের কর্মচারীদের হাতে নিগৃহীত হত ইসলামপুরের কেবল রাম দাসের বিবরণে তার পরিচয় পাই—'চার কুড়ি-সাড়ে তিন গন্ডার জমা আমার। গেল সন আমি, পাঁচ কুড়ি চার গন্ডা দিয়েছি, তবুও আখিরী কবজ পাই নাই। সন সন খাজনা, হার, পার্বনী, নজর আনা, তলব আনা, কাছারী বাড়ীর সাদা জ্বালানী, আরিন্দা খরচ, সব কড়ায় গন্ডায় চুকিয়েছি, কিন্তু আখিরী কবজ পাইনা—গত সন নায়েব মহাশয়ের ছেলের অন্নপ্রাশনে স ছ গন্ডা চাঁদা ধরেন,

গরীব আমি, অজন্মা, ছাঁ পোষা মানুষ, দিতে পাল্লেম না। দশটি টাকা নিয়ে হাতে পায়ে ধোরে দিতে গেলেম, নায়েব মহাশয় নিলেন না। সাত দিন পরেই তিনশ টাকার বাকী খাজনা কোল্লেন। কবজ ছিল না, সাক্ষী সাবুদ ছিল না, ডিক্রী হলো। ধর্মাবতার আপনি, বোলতে কি, নায়েব মহাশয় আমার যথাসর্ব্বস্ব বেচে নিলেন। বাইশটে রূপার পাতের মত বলদ, তেরটা গাই গরু, তিন মরাই ঠাসা ধান, ঘটী, বাটী, কাপড় চোপড়, সব বেচে নিলেন।' এমনকি নায়েব কেবলরাম দাসের তের বছরের মেয়ের ইজ্জত পর্যন্ত নিয়েছে সে। প্রজাকে জব্দ করতে জাল দলিল তৈরী করা হয়েছে।

হরিহর পুরের জমিদার মহেন্দ্র কর্তৃক ভৃঙ্গ রামের ইসলাম পুরের কাছারি বাড়ি লুট এক জমিদারের সঙ্গে অন্য জমিদারের বৈরী সম্পর্ক ও তার পরিণামকেই সূচিত করেছে।

কুলবেড়িয়া গ্রামে ভবানী এক বিবাহ বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে যেখানে সাত শত টাকার বিনিময়ে সাত বছরের কন্যার পিতা তার কন্যার সঙ্গে ৭০।৭৫ বৎসরের বৃদ্ধের বিবাহ দিয়েছে। বৃদ্ধ বর তন্মধ্যে ১১৩ টাকা না দিতে পারায় তাকে দিয়ে খত লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। অল্প বয়সী কন্যাদের বিবাহ প্রথা, বৃদ্ধের সঙ্গে অল্প বয়সী কন্যার অসম বিবাহ ইত্যাদি সে সময়ের সমাজ জীবনের অঙ্গ ছিল, এসব তারই পরিচয়। সে সময়ে ডাকাত দলের যে আধিপত্য সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল, ইংরেজ শাসনে ঠগীদমন ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিবরণে আলোচ্য উপন্যাসটি সমৃদ্ধ। অতএব ড. রামদুলাল বসু 'ঠগী দমনের জন্য বাঙ্গালী কর্মচারীরা কর্নেল শ্লীম্যানকে কিভাবে সাহায্য করেছিল তার কাহিনী' বলে যে 'ভবানী ঠাকুর' উপন্যাসটির পরিচিতি দিয়েছেন তা যে অসম্পূর্ণ ও আংশিকতা দোষে দুষ্ট তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

যোগেন্দ্রনাথ দে কর্তৃক প্রকাশিত **'স্নেহলতা'** উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৩০১। ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদে উপন্যাসটি সমাপ্ত। কাহিনী পরিকল্পনায় লেখকের মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে উপন্যাসটি বেশ সুখপাঠ্য।

নায়িকা দুর্গাপুরের জমিদার দুর্গাদাসবাবুর কন্যা। নায়ক সুরেন্দ্র। এক ঝড়বৃষ্টির দিনে ভগ্ন এক মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণকারী সুরেন্দ্র মন্দিরের বাইরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকা 'স্নেহলতা'কে সুস্থ করে। এইসূত্রে স্নেহলতার সঙ্গে সুরেন্দ্রের পরিচয়। তারপর স্নেহলতাদের আশ্রিত বিপিন ও স্নেহলতার সঙ্গে সুরেন্দ্র দুর্গাপুরে স্নেহলতাদের বাড়ীতে দিন তিনেক অতিবাহিত করে। এতে পরস্পরের আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কেউই তা প্রকাশ করেনা। কিন্তু উমানাথের সঙ্গে স্নেহলতার বিবাহের সম্পর্ক হচ্ছে জেনে সুরেন্দ্র বিচলিত হয়েছে। উমানাথের পত্রে সুরেন্দ্র যখন জেনেছে পাত্রী উমানাথের পছন্দ, তখন সুরেন্দ্র আর স্থির থাকতে পারেনি,

সে পত্র দিয়েছে বিপিনকে এই মর্মে যে স্নেহলতাকে যেন সৎপাত্রে বিবাহ দেওয়া হয়, আর বিবাহের ব্যাপারে যেন স্নেহলতার মত গ্রহণ করা হয়, নতুবা তার দাম্পত্য জীবন অশান্তিময় হতে পারে। বিপিনই স্নেহলতাকে মানুষ করেছে। যদিও সে দুর্গাদাসবাবুর আশ্রিত, তথাপি দুর্গাদাসবাবু স্নেহলতার বিবাহের সব দায়িত্ব বিপিনের ওপরেই ন্যস্ত করেছিলেন। বিপিন বুঝলে সুরেন্দ্রর মনোভাব। সে স্নেহলতাকে সুরেন্দ্রর কথা বলা সত্ত্বেও স্নেহলতা কিন্তু কোন কৌতূহল দেখাল না। কিন্তু স্নেহলতা দীর্ঘকাল তার মনোভাবকে গোপন রাখতে পারেনি। বিপিন লক্ষ্য করল স্নেহলতা গোপনে বিপিনের পকেটে সুরেন্দ্রের পত্রের সন্ধান করে।

এদিকে সুরেন্দ্রের পিতার বাল্যবন্ধু বলরামের একান্ত ইচ্ছা তার কন্যার সঙ্গে সুরেন্দ্রর বিবাহ হয়। বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৈষ্ণব মুকুন্দ ঠাকুরের আবার ভ্রাতুষ্পুত্রী বারুণীর পাত্র হিসাবে উমানাথকে পছন্দ। উমানাথ বারুণীকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়েছে, সে আর স্নেহলতাকে বিবাহ করার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। বলরামের আগ্রহাতিশয্যে সুরেন্দ্র বারুণীকে দেখতে এসেছে। আকস্মিকভাবে বলরামের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে সে বারুণীকে সুরেন্দ্রের হাতেই সমর্পণ করেছে। সুরেন্দ্র যখন বারুণীর পাণি গ্রহণের জন্য মনে মনে প্রস্তুত, এমন সময়ে বিপিনের পত্রের মাধ্যমে জেনেছে স্নেহলতা তার প্রতি আসক্ত। উমানাথ স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে মুকুন্দ ঠাকুরের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে জেনেছে বারুণীকে সুরেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই সংবাদে উমানাথ ভেঙ্গে পড়েছে। সুরেন্দ্র কিন্তু বারুণীকে বিবাহ করল না। স্নেহলতাকে বিবাহের ইচ্ছা জানিয়ে সে পত্র দিল। মুকুন্দ ঠাকুর সুরেন্দ্র যাতে বারুণীকে বিবাহ করে সেজন্য চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। দুর্গাদাসবাবুর সুরেন্দ্রের সঙ্গে স্নেহলতার বিবাহে মত ছিল না। তাই তাঁর অনুপস্থিতিতে এবং বিপিনের গৃহত্যাগের কারণে স্নেহলতার মা সুরেন্দ্রের সঙ্গে স্নেহলতার কালীঘাটে বিবাহের আয়োজন করেছে। ঘটনাচক্রে বারুণী বিবাহ বাসরে উপস্থিত হয়েছে। তার সমস্ত গহনা স্নেহলতাকে উপহার দিয়ে গৈরিক বেশ ধারণ করে সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প ঘোষণা করেছে। অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হয়েছে সুরেন্দ্র। ত্রিভুজ প্রেমের এই কাহিনীতে উমানাথ তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেনি। সুরেন্দ্রের প্রতি আসক্ত দেখা গেছে উভয়কেই—স্নেহলতাকে এবং বারুণীকে। তন্মধ্যে স্নেহলতার আসক্তির মূলে রয়েছে তাকে বিপদে সুরেন্দ্র যে রক্ষা করেছিল সেইজন্য কৃতজ্ঞতাবোধ ও সেই কৃতজ্ঞতাবোধই শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্রের প্রতি স্নেহলতাকে আসক্ত করে তোলে। স্নেহলতা প্রথমে সুরেন্দ্রের প্রতি তার দুর্বলতাকে গোপন করলেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু সুরেন্দ্রের প্রতি তার আসক্তির মনোভাব আর চাপা থাকেনি। লেখক সুরেন্দ্রের প্রতি স্নেহলতার মনোভাবের প্রকাশকে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বসম্মত করে প্রকাশ করেছেন। প্রথমে সে গোপনে

বিপিনের পকেটে সুরেন্দ্রের পত্রের সন্ধান করেছে। তারপর সুরেন্দ্রের উদ্দেশে পত্র লিখতে উদ্যত হয়ে চাঞ্চল্যের পরিচয় দিয়েছে সে। লেখকের ভাষায়, 'একবার লিখিলেন, লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন,—আবার লিখিলেন, আবার ছিঁড়িলেন। কতবার কত কাগজ নষ্ট হইল, কত ভাবনা আসিয়া জুটিল, কত নূতন নূতন ভাব উপস্থিত হইল, কিছুতেই মন স্থির হইল না। পত্র সম্পূর্ণ হইল না, অথচ স্নেহলতা ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।' (পৃঃ ৪৯)

শেষ পর্যন্ত অকপটভাবে তাকে সুরেন্দ্রের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করতে দেখা গেছে। দেখা গেছে সুরেন্দ্রের রূপে তাকে পাগল হতে। তার বক্তব্য 'লোক নিন্দায়, লোকের গঞ্জনায় আমি কর্ণপাত করিনা। আমি যাহাকে জানিয়াছি, যাহাকে মন দিয়াছি যাহাকে ভালোবাসিয়াছি, সেই-ই আমার, তিনি ভিন্ন জগতে আমার আর ভালবাসার পাত্র কেহ নাই, কেহ হইতেও পারিবেন না।' (পৃঃ ৮৮)

বারুণী চরিত্রটির ট্রাজেডি আমাদের বেদনার্ত করে তোলে। বলরামের কন্যা সে। তিন বছর বয়সেই তার মাতৃবিয়োগ হয়েছে। পিতাকে তার অকারণে দীর্ঘ কারাবাসে অতিবাহিত করতে হয়। খুল্লতাত মুকুন্দ ঠাকুরের আশ্রমে সে প্রতিপালিতা। আশ্রমে দ্বিতীয় কোন স্ত্রীলোক ছিলনা যে তাকে মুহূর্তের জন্য সান্ত্বনা দেয়। শ্যামসুন্দরের প্রতি তার ঐকান্তিক ভক্তি। নিজের পছন্দে বিবাহ করতে সে অনিচ্ছুক। স্নেহলতার মত যেমন সে সৌভাগ্যবতী নয়, মাতৃ পিতৃপ্রেম থেকে বঞ্চিতা, তেমনি স্নেহলতার মত সে নিজের পছন্দে বিবাহ করতেও অনিচ্ছুক। সে অদৃষ্টবাদিনী। সে জানে অলঙ্ঘনীয় অদৃষ্ট চক্রে তাকে যার হাতে পড়তে হবে, তাকেই সে পতিরূপে বরণ করে নেবে। অদৃষ্টবাদী বৈষ্ণব মুকুন্দের প্রভাবে সে তার স্বাধীন প্রবৃত্তিকে জয় করতে শিখেছিল। দৈবের চক্রান্তে সে মৃত্যুপথ যাত্রী বাবার ইচ্ছামত সুরেন্দ্রের ভাবী পত্নী হতে চলেছিল, আবার অদৃষ্টের ফেরে সুরেন্দ্র স্নেহলতার পাণি গ্রহণ করলে তার আর সুরেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ হতে পারেনি। জনম দুঃখিনী বারুণী সুখী দাম্পত্য জীবন ভোগের অধিকার থেকেও বঞ্চিতা হয়েছে। স্নেহলতাকে তার সমস্ত গহনা দিয়ে গৈরিক বসন স্বীকার করে নিয়ে সে সংসার ত্যাগিনী হয়েছে। কিন্তু তাই বলে মন থেকে যে সে সুরেন্দ্রকে ত্যাগ করতে পারেনি তা তার উক্তিতেই ধরা পড়েছে, 'তুমি অধিনীকে পামরী জ্ঞানে চরণে স্থান দিলে না, আমি তজ্জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নহি। আমি চিরদিন তোমার চরণ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিব। এ জীবনে আর কেহই এ হৃদয়ে স্থান পাইবেনা।' (পৃঃ ১১৭)

সুরেন্দ্রের উভয় সঙ্কট। সে ভালবাসে স্নেহলতাকে। কিন্তু ঘটনাচক্রে পিতৃবন্ধুর কন্যা বারুণী হয় তার বাগ্‌দত্তা। মৃত্যুপথযাত্রী বলরামের ইচ্ছাকে শিরোধার্য করতেই তাকে বারুণীর পাণিগ্রহণে সম্মত হতে হয়েছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে সে জেনেছে স্নেহলতাও তার প্রতি আসক্ত, সেই মুহূর্তেই সে স্থির সিদ্ধান্ত করেছে, স্নেহলতাকে বিবাহ করার। যদি বারুণীকেই সে

বিবাহ করত, সে ক্ষেত্রে মৃত্যুপথযাত্রী বলরামের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হলেও স্নেহলতার জীবনও করুণ পরিণতির শিকার হ'ত। স্নেহলতার সঙ্গে বিবাহ হলেও বারুণীর কারণে তার পক্ষে যে দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়া সম্ভব হত না সে ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন।

'ভবের হাট' (১ম ভাগ) উপন্যাসটির রচয়িতা মানিকলাল চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৩০১ বঙ্গাব্দ। গ্রন্থের অবতরণিকায় লিখিত হয়েছে 'ভবের মজার কত সাজা আর ভবের মজা কত সোজা ইহাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য… ।'

বস্তুতঃ উদ্দেশ্য প্রণোদিত রচনা হওয়ায় উপন্যাসটি রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। একথা স্বীকার করতেই হবে যে লেখকের ছিল সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা আর বর্ণনা করার শক্তি। ইচ্ছা করলেই তিনি সার্থক উপন্যাস রচয়িতার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারতেন। কিন্তু সমাজ বিপ্লব, প্রকৃতিতত্ত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ায় কাহিনীর দাবী উপেক্ষিত হয়েছে প্রায়ই, তত্ত্বকথা এবং লেখকের গুরুগম্ভীর আলোচনা কাহিনীর গতিকে প্রায়ই রুদ্ধ করে দিয়েছে।

লেখক উপন্যাসটির ঘটনাকাল হিসাবে সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ববর্তী সময়কে নির্বাচন করেছেন। প্রকৃতির বিবরণদানে লেখক নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু পরিচয় উদ্ধৃত হল—'আজি অমাতিথি নিশাসতী, পতিহীনা হইয়া ম্লান বদনখানি তিমির বসনে আবৃত করিয়া ক্রমে দেখা দিল, এতক্ষণ কুমুদিনী স্বপত্নি নিশাদেবীকে ফাঁকি দিয়া পতি সম্ভোগ ইচ্ছায় উৎফুল্ল মুখে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল শেষে কুমুদ বান্ধব দেখা দিল না দেখিয়া নিরাশা পবনবেগে অভিমান সরোবরে গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া চলিল, ঝিল্লিগণ তাই দেখিয়া হায় কি হইল বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল খদ্যোৎদল এতদিন কুমুদনাথের প্রভা দেখিয়া মলিন হইয়া ছিল আজি জ্ঞাতির দুর্দশা দেখিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে আত্মীয়তা দেখাইবার জন্য সকলে প্রফুল্ল মনে যে যাহার ক্ষুদ্র দীপালোক জ্বালিয়া সরোবরে চতুর্দিকে কুমুদিনীকে খুঁজিতে লাগিল……।' মাঝে মাঝে লেখক উপরি উদ্ধৃত অংশের মত দীর্ঘাকৃতি বাক্যের ব্যবহার করেছেন।

হাস্যরস সৃষ্টিতে লেখক কিছুটা ক্ষমতা দেখিয়েছেন। ক্ষেত্র বিশেষে যদিও তা স্থূলতাকে অতিক্রম করতে পারেনি। যেমন—'যাহার বিক্রয় হয় নাই তাহার আর বারবার ধুনা গঙ্গাজল দিয়া তৃপ্তি হইতেছে না, মৃত্তিকার গণেশটি গলিয়া যাইবার উপক্রম, তহবিল বাক্সটির একপুরু বারনিশ উঠিয়া গেল ধুনার ধূমে মহাষ্টমির সন্ধিক্ষণ দেখা দিল।'

কিংবা, কুমদাকান্তের রক্ষিতা মনিয়া বিবিকে উদ্দেশ করে মাখনবাবুর উক্তি—'তুমি আমার আর জন্মে গর্ভধারিণী মা জননী ছিলে, এখন একবার মহিসুরের ভাজ দিয়ে দস্যি মদনটাকে ভস্ম করে ফেল, আমি ঘুঁড়ির লাট খাওয়ার মত লাট খেতে খেতে স্বশরীরে স্বর্গে যাই।' মনিয়া বাইয়ের গুরুজী

গান শুরু করলে, 'মাখনবাবু বিকট আওয়াজে বিরক্ত হইয়া হেলিতে দুলিতে উঠিয়া ওস্তাদের লম্বিত চৈতন্য গুচ্ছ ধরিয়া স্ববলে পাকাইতে আরম্ভ করিল, তদ্দর্শনে মনিয়া বিবি অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া হাসির স্রোতে ভাসিতে লাগিল।' গুরুজী মাখনবাবুর আচরণে বলেছেন, 'একি করছেন মশাঁ, শুনিয়ে শুনিয়ে জেরা ঠাণ্ডা হোকে বৈঠিয়ে গান শুনিয়ে।'

মাখনবাবু জবাবে বলেছে, 'তোমার বাবার শ্রাদ্ধের যোগাড় করচি, আট-কুড়ির বেটা ! আমার কানে তালা ধরিয়ে দিলি ?'

গঙ্গাধরের স্ত্রী বিয়োগ হলে যারা শ্মশানযাত্রী হতে অস্বীকার করেছিল তাদের প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্যটিও হাস্যরসের উদ্রেক করে—'এই অবসরে বৃত্ত ভোগী বচন ব্যবসায়ী ষণ্ডামার্কা ভট্টাচার্যের দল ; পেনসন হোল্ডার অকরমণ্য বদমায়েসগণ ; চণ্ডিমণ্ডপ আলোকরা সংসারের বিধাতা পুরুষগণ ; যেমন ব্রহ্মলোকে লোকপিতামহ ব্রহ্মা, কর্ম কর্তারূপে জীবগণকে কার্যে নিযুক্ত করিতেছেন সেইপ্রকার মর্ত্যলোকে মহামহোপাধ্যায় বৃদ্ধ দাদা মহাশয়গণ বহুদর্শিত গুণে গৃহস্থালির মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত।' বেতসপুর গ্রামের সংলগ্ন গঙ্গায় স্নান, পূজারত ব্যক্তিদের বর্ণনাটি বাস্তবানুগত। লক্ষ্মীপুর বাসীদেব গ্রাম্য রাজনীতি যতই বীভৎস হোক, তা জীবন্ত রূপে বর্ণিত হয়েছে। গঙ্গাধর মুখুজ্যের সঙ্গে হরিহর ঘোষালের বন্ধুত্ব স্থাপনের সূত্রটি চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। শিবালয়ের মধ্যস্থিত কুমদাকান্তের গুম ঘরের বিবরণদানে লেখকের কল্পনাশক্তির পরিচয় মেলে। গোয়ালিনী ও মালিনীর ছড়ার সাহায্যে কথোপকথন অত্যন্ত জীবন্ত ও উপভোগ্য।

চরিত্র চিত্রণে লেখক বৈপরীত্যের সাহায্য নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিনয়-নবীন দুই নবীন সন্ন্যাসী ও বিধুভূষণ ঘোষের দুই ছেলে কমলাকান্ত-কুমদাকান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। নবীন সন্দিগ্ধপরায়ণ, সে স্মৃতির ভারে ভারাক্রান্ত। হিংসা, বিদ্বেষ ও লোভ শূন্য স্থানের সন্ধান লাভে ব্যাকুল। কমলাদেবীর মন্দিরের স্বামীজীকে তার অপছন্দ, কেননা তিনি ইন্দ্রিয় পরায়ণ, সুন্দরী রমণীকে পাশে বসিয়ে পূজা করেন, সস্ত্রীক শিষ্য পেলে দীক্ষা দেন, ধনাঢ্যের আহবানে তাদের অন্তঃপুরে যান। বিনয় কিন্তু নবীনের বিপরীত। সে ছিদ্রান্বেষণের বিরুদ্ধে। সে সুখ-দুঃখকে সমান দৃষ্টিতে দেখে। সে পবিত্র প্রেমের সন্ধানে ব্রতী। অভিমান শূন্য হয়ে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্য ঘুচিয়ে সকল প্রকার সংশয়কে বিসর্জন দিয়ে দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে পুণ্য ক্ষেত্র দর্শনের অভিলাষী সে।

কমলাকান্ত বিধুভূষণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সে জিতেন্দ্রিয়, উদারচেতা, পর দুঃখে কাতর। দীন-দরিদ্রের বন্ধু সে, অনাথের পিতা-মাতা। পূজনীয় ব্যক্তির সে সেবাদাস। পৈতৃক কীর্তি দেব সেবা, অতিথিশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ইত্যাদি সে বজায় রেখেছিল। কিন্তু কুমদাকান্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে ইন্দ্রিয়াসক্ত, মদ্যপ। মনিয়া বাইজীকে নিয়ে তার প্রেমালাপ ও ভোগাসক্তি তার নির্লজ্জতার পরিচায়ক।

ভৈরবী চরিত্রটি আকর্ষণীয় হয়েছে। বন্দী যোগেশকে সে মুক্ত করেছে, শুধু তাই নয় সে যেভাবে ভণ্ড পরমহংসের হাত থেকে রাজ্ঞীকে উদ্ধার করেছে, তা আমাদের চমৎকৃত করে।

কৈলাস ডাক্তারের চরিত্রটি অত্যন্ত বাস্তব হয়েছে। চিকিৎসা বিদ্যায় তার তেমন ব্যুৎপত্তি নেই অথচ অর্থ উপার্জনে তার কৌশল অসামান্য। গঙ্গাধর মুখুজ্যের স্ত্রীর চিকিৎসা করতে এসে সে সান্ত্বনা দিয়েছে শীঘ্রই রুগী ভাল হয়ে উঠবে। দেখা গেল শেষ পর্যন্ত রুগীর মৃত্যু ঘটেছে। অথচ গঙ্গাধরের মাকে পিসিমা সম্বোধন করে বলেছে, 'দেখ পিসিমা, যেমন শ্রাদ্ধ করিতে গেলে অগ্রে অগ্রদানির দান না দিলে কার্য সিদ্ধি হয় না, রোগের অগ্রদানি ডাক্তারদের কিছু না দিলে রোগের শান্তি হয় না একেবারে বিধিবাক্য।'

ধর্ম কি, ধার্মিক কে, উচিত অনুষ্ঠান কাকে বলে, গীতার মাহাত্ম্য, সংসারী ব্যক্তির গুরু, ইন্দ্রিয়াসক্তির পরিণাম, পৃথিবীর ছলনাময়ী রূপ, পার্থিব জগতের অর্থহীন সংকট ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত তাত্ত্বিক আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই যেমন অপ্রাসঙ্গিক হয়েছে, তেমনি উপন্যাসটির স্বচ্ছন্দ গতিকে ব্যাহত করেছে।

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত **'রোহিণী'** উপন্যাসটির প্রকাশ কাল ১৩০৪ বঙ্গাব্দ। প্রকাশক যোগেশচন্দ্র ঘোষ। উপন্যাসটি সুবৃহৎ এবং মোট চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রতিটি পরিচ্ছেদের পৃথক পৃথক নামকরণ যেমন করা হয়েছে, তেমনি Shakespeare, মাইকেল মধুসূদন, Scott, Tennyson, Grey, কালিদাস, Cowper, ভবভূতি, হেমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, Coleridge, Byron প্রমুখ দেশী ও বিদেশী লেখক ও কবিদের বিষয়োপযোগী উদ্ধৃতি প্রতিটি পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে সংযোজিত হয়েছে।

লেখক মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই যে উপন্যাসটি রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার পরিচয় উপন্যাসটির নানা ক্ষেত্রেই বর্তমান। উপন্যাসটির নামকরণ করা হয়েছে রোহিণী। তাছাড়া উপন্যাসের আর একটি চরিত্র হরলাল—এ দুটি নামই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে গৃহীত।

উপন্যাসটির ভূমিকাংশেও 'দুর্গেশনন্দিনী'র ছায়াপাত ঘটেছে। বঙ্কিম-উপন্যাসের অপর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলনও আলোচ্য উপন্যাসে লক্ষণীয়—যেমন অলৌকিকতার বিবরণ দান, জ্যোতিষ সম্পর্কিত তথ্যাদির উল্লেখ, পত্রের ব্যবহার।

গঙ্গাসাগরে শাশুড়ী ঠাকরুণের সঙ্গে রোহিণী উপনীত হয়েছিল। এখানে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বেলাভূমিতে বিচরণকালে সে তার পাশে পাশে এক সন্ন্যাসিনীকে আসতে দেখল। সন্ন্যাসিনী ভৈরবী। হাতে তার ত্রিশূল, কটিতে আজানুলম্বিত গৈরিক বহির্বাস, গলদেশে নরকপালমালা। রোহিণী আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ভৈরবীকে পরিত্যাগে সক্ষম হল না। তার বিপুল আকর্ষণী শক্তিতে সে তার সহগমনে বাধ্য হল। উভয়ে উপনীত হল সাগর পারে।

সেখানে উপনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি তরী তীরে এসে লাগল। তরীটি জল থেকে কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে ভাসমান হল। তরী ভৈরবী ও রোহিণীকে নিয়ে কিছু-দূর অগ্রসর হবার পরই রোহিণী দেখল ভৈরবী তার জননীতে রূপান্তরিত হয়েছে। রোহিণী মাতাকে আলিঙ্গনে প্রয়াসী হলে দেখা গেল তরীতে কেউ নেই। রোহিণী অতঃপর নানাদিকে অস্বাভাবিক দৃশ্যাদি প্রত্যক্ষ করতে লাগল। দেখল গলবস্ত্র হয়ে তার মাতা কাত্যায়নীকে ধর্মরাজের কাছে কার জন্য কি প্রার্থনায় রত। শেষ পর্যন্ত রোহিণী জলধিগর্ভে নিমজ্জিত হল। রোহিণীর জীবনের অকাল পরিসমাপ্তির মূলে এই অলৌকিক ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রোহিণী চরিত্রটির সঙ্গে বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি গভীর সাদৃশ্যে বর্তমান। কপালকুণ্ডলা লালিত হয়েছিল বনে কাপালিকের দ্বারা। তারপর নবকুমারের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। সেইসূত্রে সে সংসারী হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার সংসার জীবন সুখের হয়নি। তাকে সংসার জীবন অসমাপ্ত রেখেই আত্ম বিসর্জন করতে হয়েছে। অনুরূপ ভাবে রোহিণী ছিল হিমালয়ের এক আশ্রম কন্যা। ঘটনাচক্রে ইন্দু-শেখরের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সংসারী হয় কিন্তু স্বামীর প্রতি সন্দেহে এবং শাশুড়ীর নির্মম অত্যাচারে বেচারী সংসার জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অসময়ে সংসার জীবন পরিত্যাগ করে চলে যায় মহাকালের পথে।

আর একটি দিক দিয়ে বঙ্কিম উপন্যাসের সঙ্গে 'রোহিণী'র সাদৃশ্যের সন্ধান লভ্য। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সংস্কারে বিশ্বাসী। তাই 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বিধবা রোহিণীর প্রেমে গোবিন্দলাল আকৃষ্ট হলে শেষে তাকে অতর্কিত মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। 'রোহিণী' উপন্যাসে লেখক বর্ণনা করেছেন প্রেমলতা ওরফে নৃত্যকালী নটবরের হাতে ছুরিকাঘাতে মৃত্যু বরণ করেছে। এক্ষেত্রে লেখকের ইঙ্গিত নৃত্যকালী পূর্বে ইন্দুশেখরের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল, পরে ভ্রমবশতঃ ঘটনাচক্রে সেইই প্রেমলতা রূপে আদিনাথের সঙ্গে দ্বিতীয় বার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়, বলাবাহুল্য প্রথম স্বামীর বর্তমানেই। হিন্দু রমণীর স্বামীর জীবিতাবস্থায় দ্বিতীয় বার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়াকে লেখক এই-ভাবে দণ্ড বিধান করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তাঁর উপন্যাসে চরিত্র চিত্রণ অপেক্ষা ঘটনা-বৈচিত্র্য ও গল্পাংশের আকর্ষণ বৃদ্ধিতেই অধিকতর মনোযোগী ছিলেন, 'রোহিণী'র লেখকও তেমনি চরিত্র চিত্রণ অপেক্ষা ঘটনাকে বৈচিত্র্যময় করে তোলার ব্যাপারেই অধিকতর নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তবে বঙ্কিমের ভাষা যেমন সন্ধি ও সমাস বদ্ধ পদের সমারোহে অপেক্ষাকৃত সংস্কৃতানুগ বলে প্রতিভাত হয়, 'রোহিণী' তেমন নয়।

বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসে যেমন কম-বেশি ইতিহাসের ছায়াপাত ঘটেছে, আলোচ্য উপন্যাসেও লেখককে সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকাটিকে উপন্যাসের প্রেক্ষাপট রূপে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। এ পর্যন্ত গেল আলোচ্য উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা। এইবার আমরা আলোচ্য উপন্যাসটি রচনায় লেখকের কৃতিত্বের পরিমাপ নিরূপণে প্রয়াসী হতে পারি।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ইন্দুশেখর-প্রেমলতার আখ্যানটি। উপন্যাসের প্রায় শেষাংশে পাঠক জানতে পারেন যে আদিনাথের বিবাহিতা স্ত্রী প্রেমলতা যাকে ইন্দুশেখরের প্রেমাসক্ত রূপে চিত্রিত করা হয়েছে, সে আসলে ইন্দুশেখরেরই প্রথম পক্ষের স্ত্রী। আদিনাথের সঙ্গে তাকে পরকীয়া প্রেমের স্বপক্ষে তর্কে প্রবৃত্ত হতে দেখে কিংবা স্বামীর উপস্থিতিতেই প্রকাশ্যে ইন্দুশেখরের সঙ্গে মিলিত হতে দেখে তার প্রতি পাঠকের ঘৃণা জন্মে। অবশ্য এক্ষেত্রে লেখক প্রেমলতার স্বপক্ষে একটি যুক্তি দেখিয়েছেন যে সে অল্পবয়সী হওয়া সত্ত্বেও বয়স্ক আদিনাথ যার নাকি প্রথম পক্ষের স্ত্রী গত হয়েছিল তার সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া হয়েছিল প্রেমলতার পালক পিতা নিতাই বাবুর অপত্য স্নেহের কারণে কন্যাকে নিজের গৃহে রাখতে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে প্রেমলতা তার দ্বিতীয় স্বামী আদিনাথের কাছে তার প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন কালে পাঠক বুঝতে পারে সে দ্বিচারিণী নয়। এবং এ পর্যন্ত আদিনাথের সঙ্গে তার তথাকথিত অস্বাভাবিক আচরণও সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে এত বড় ভুল হল কিভাবে ? নৃত্যকালীর খুব অল্প বয়সেই ইন্দুশেখরের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। এরপর ঘটনাচক্রে মায়ের কাছ থেকে নৃত্যকালী এক রেল স্টেশনে হারিয়ে যায়। তার সম্পর্কে প্রচার করা হয় যে সে মৃত। ফলে ইন্দুশেখর নৃত্যকালীকে মৃত বলেই জেনেছিল। দ্বিতীয়-বার রোহিণীকে বিবাহ করেছিল, রোহিণীর প্রতি কৃতজ্ঞতা বশে এবং তার সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণবশতঃ। এদিকে খ্রীস্টানদের দ্বারা পালিতা নৃত্যকালী যে নাকি প্রেমলতা নামে পরে পরিচিতা হয়, তাকে পালিতা কন্যা রূপে গ্রহণ করেছিলেন নিতাইবাবু। কোন ভাবেই কিন্তু নৃত্যকালী কিংবা ইন্দুশেখর পরস্পরকে চিনে উঠতে পারেনি। মৃত্যুর ঠিক পূর্বে প্রেমলতার ইন্দুশেখরকে মনে পড়ার তেমন যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শিত হয়নি উপন্যাস মধ্যে।

উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে 'রোহিণী', কারণ লেখক 'রোহিণী' কে নায়িকা রূপে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু রোহিণীর তুলনায় উপন্যাসে প্রেমলতার ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। নায়িকার দাবী তারই অধিক। প্রেমলতার জীবনের নানা পর্যায়, বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তার ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানের পরিধিও আকর্ষণীয়। তবে প্রকৃতিতে সে বেপরোয়া এবং রোহিণীর তুলনায় নির্লজ্জ। অপরপক্ষে রোহিণী সহজ সরল, পতিগত প্রাণা এবং সংস্কারাচ্ছন্ন। অভিমানী রোহিণী যদি হয় বনের ফোটা ফুল, তবে প্রেমলতাকে অভিহিত করতে হয় গৃহস্থের সযত্নে লালিত কুসুম রূপে।

রোহিণী দৈব নির্ভর, নিজের প্রাপ্যকে জোর পূর্বক আদায় করতে তার প্রবল অনীহা। অপরপক্ষে প্রেমলতা নিজের ভাগ্যকে নিজেই প্রস্তুত করে নিতে জানে। সে যাকে তার প্রাপ্য বলে মনে করে, প্রয়োজনে তার জন্য সে সর্বস্ব পণ করতে পারে। রোহিণী অবশ্য হিসেবী, প্রেমলতা কিন্তু সেই বিচারে শুধু বেহিসাবী নয়, উচ্ছৃঙ্খলও বটে। লোক নিন্দাকে সে পরোয়া করে না।

ইন্দুশেখর উপন্যাসটির নায়ক। লেখক তার দোলাচল চিত্তের পরিচয়

উপস্থিত করেছেন উপন্যাস মধ্যে। রোহিণীর প্রতি তার অমোঘ আকর্ষণ সত্ত্বেও এবং তার কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়েও সে প্রেমলতার সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। অথচ তার মাতার সঙ্গেও সে বিরোধ করেছে রোহিণীর ব্যাপারে। উপন্যাসে লেখক কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে ফাঁসীর আসামী নটবরের মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিবরণ দান, দাঁড়ী মাঝির ছদ্মবেশে রত নটবরকে পুলিশের গ্রেপ্তার ইত্যাদির বিবরণ দান উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন ব্যক্তির রূপ বর্ণনায় লেখক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নটবরের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন :

'বর্ণ কৃষ্ণ, মর্মর ন্যায়, অবয়ব খর্ব, কিন্তু দৃঢ় ও মাংসল ; গ্রন্থি নিকটস্থ মাংস পেশীবদ্ধ। কেশগুলি আফ্রিকাবাসীর মত কুঞ্চিত, এবং মস্তকের উপরি চতুষ্পার্শ্বে তরঙ্গিত, সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ পর্যন্ত এক সিঁথি কেশগুলিকে দুই পার্শ্বে বিন্যাসে বিভক্ত করিয়া মাথার মধ্য দিয়া ধাবিত হইতেছে ; কেশগুচ্ছ গুলি দেখিলে, অতিশয় সাবধানে ও যত্নে রক্ষিত বলিয়া বোধ হয়। মুখের আয়তন গোল, চক্ষুও গোল ; ভ্রূদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন, সংযোগস্থলে ললাটে একটি আঁচিল আছে। নাসিকা খর্ব ; শেষাংশে বিস্তৃত। দন্তগুলি ঈষৎ হরিদ্রা আভা যুক্ত, শ্লথ ও পরস্পর অসংলগ্ন ; ললাট অপ্রশস্ত ; কর্ণদ্বয় হ্রস্ব ; শ্মশ্রুগুম্ফে বদন অল্প অল্প আচ্ছাদিত করিয়াছে। শ্মশ্রু মধ্যে একস্থানে লোপ পাইয়াছে ; তাহার কারণ, বাল্যে সে স্থান কাটিয়া গিয়াছিল। ওষ্ঠ খর্ব ও স্থূল ; তাম্বুল রাগে রঞ্জিত হইলে তথায় ত্রিবেণীর ন্যায় শোভা হয়। উপবীত খণ্ড গলদেশে মাল্যাকারে রক্ষিত।' (পৃঃ ৬৭)

এই বিবরণ যেন ব্যক্তিটিকে পাঠকের সামনে জীবন্ত রূপে উপস্থিত করে। শুধু তাই নয়, তার অবয়বের বিবরণে তার চরিত্রেরও যেন আভাস লাভ করা সম্ভব হয়।

প্রকৃতির বিবরণ দানেও লেখকের মুন্সীয়ানা প্রশংসনীয়। গঙ্গাসাগরের বিবরণ নিম্নরূপে প্রদত্ত হয়েছে—

'উপবে নীল আকাশ নিম্নে অভিন্ন বিস্তৃত বালুকান্তর, সম্মুখে দিগন্ত ব্যাপী বারিধির অনন্ত ঊর্মি-প্রদর্শনী। মহানীলদ্বয়ের মধ্যপথে অর্ণবচর বিহঙ্গমকুল পক্ষ বিস্তার করতঃ উড্ডীয়মান ; উহারা সময়ে সময়ে সলিলের এত নিকটবর্তী হয়, যে দেখিলে, বোধহয়, যেন তরঙ্গের সহিত অবিরত স্পর্শ ক্রীড়ারত ; প্রতি তুফানই যেন চঞ্চুদ্বারা উচ্ছিষ্ট করিতে করিতে বায়ুভরে চলিয়াছে ;' (পৃঃ ১৬৭)।

প্রভাতের বর্ণনায় লেখক লিখেছেন—'প্রাতঃকাল ; তথাপি অল্প অল্প মেঘাচ্ছন্ন। অরুণের শুভাগমন প্রত্যাশায় বরুণদেব সম্মানার্থ পশ্চিমদিকে এক বৃহৎ ইন্দ্রধনুর তোরণ সৃষ্টি করিতেছেন ; পাপিয়া, চাতক প্রভৃতি সুন্দরবন নিবাসী পক্ষিগণ স্ব স্ব কুলায় হইতে আপন আপন অভ্যস্ত বুলির আবৃত্তি করিতেছে, নবকুসুমিতা বন্যলতাগণ সহোদরার ন্যায় অঙ্গে অঙ্গ

মিলাইয়া চতুর্দিকে সৌরভ বিতরণ করিতেছে।' (পৃঃ ১৬৮)

সমসাময়িক সমাজজীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির উপস্থাপনায় উপন্যাসটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসঙ্গত 'একমনীর চাতরে'র বিবরণদান উল্লেখ্য। তাছাড়া সেকালে কাশীর সমাজজীবন, গঙ্গাসাগরে উপনীত তীর্থযাত্রীদের বর্ণনা ইত্যাদি ত আছেই। লেখক প্রায়ই ছড়া, প্রবাদ, প্রবাদমূলক বাক্যাংশের প্রয়োগে ব্যবহৃত গদ্যকে আকর্ষণীয় ও সাবলীল করে তুলেছেন। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, হিতে বিপরীত, বিষে বিষক্ষয়, মার্জারের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে যাবে কে, উচিত কথায় বন্ধু বিগড়োয়, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খাগড়ার প্রাণ যায়, মান্ধাতার আমল, বেল পাকলে কাকের কি, আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে দরকার কি প্রভৃতি প্রবাদ অথবা প্রবাদমূলক বাক্যাংশের ব্যবহার লক্ষিত হয়। লেখক কোনো কোনো অধ্যায়ে অহেতুক অপ্রাসঙ্গিক ভূমিকার অবতারণা করে পাণ্ডিত্য জাহির করেছেন যা উপন্যাসের শিল্পরীতিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। যেমন দশম পরিচ্ছেদে নিতাইবাবুর ভাগ্নে নটবরের প্রসঙ্গে বিবর্তনবাদের উপস্থাপনা করা হয়েছে। তবু সব মিলিয়ে 'রোহিণী' উপন্যাসটি রচনায় লেখকের শক্তি মত্তার প্রশংসাই করতে হয়। কাহিনী চয়নে এবং তার সার্থক উপস্থাপনায় 'রোহিণী' আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ রচিত '**আকবর**' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩০৫। 'আকবর' উপন্যাসোপম বড় গল্প। মূল চরিত্র তিনটি অমর, আকবর ও ললিত। তিন জনে দেবগ্রামে মাধববাবুর বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়াশুনা করত। অমর প্রাণাধিক ভালবাসত ললিতকে আর আকবর ভালবাসত অমরকে। অপর পক্ষে ললিত ধনীর দুলাল একদিকে আকবরকে মুসলমান বলে যেমন ঘৃণা করত, তেমনি অমরের সঙ্গে আকবরের গভীর মেলামেশা থাকায় অমরকেও সে সহ্য করতে পারত না। নিদারুণ অবহেলা এবং অবজ্ঞা সহ্য করেও অমর কিন্তু ললিতের জন্য ছিল পাগল। তার এই দুর্বলতার জন্য নানা সময়েই সে ললিতের কাছে চরম অপমানের সম্মুখীন হয়েছে। অমর বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করলে ললিতের অমর-বিদ্বেষ শতগুণে বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে এই বিদ্বেষের শোচনীয় পরিণামে ললিত আকবরের বাড়ি ডাকাতি করে। গভীর ললিত-প্রেম সত্ত্বেও অমর ললিতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। ললিত আত্মহত্যা করে। আকবর তার সমস্ত বিষয় সম্পদ অমরের নামে উইল করে দেয়। অমর কিন্তু সেসব নিজে গ্রহণ না করে ললিতের নাবালক পুত্রদ্বয় ও তার পরিজনদের দিয়ে দেয়।

বিষয়লোভী মহাভারতের অসহায় অমরদের সম্পত্তি গ্রাস, কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে অমরের মানুষ হওয়া, আকবর ও অমরের আদর্শ বন্ধুত্ব, অমরের জননীর আকবরের প্রতি অপত্য স্নেহ, মহাভারতের পুত্র রামায়ণের বৈষ্ণবের ভেকে বিষয় রক্ষা, আকবরের পিতার মহানুভবতা—এসব বিষয়

গ্রন্থটির আকর্ষণকে বৃদ্ধি করেছে। অমর এবং আকবরের জবানীতে গ্রন্থটি রচিত।

বাংলা নাট্য সাহিত্যে মহামতি শেক্সপীয়রের প্রভাব সীমাহীন। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'শেক্সপীয়ারের নাটক বরাবর আমাদের কাছে নাটকের আদর্শ।' কিন্তু মনে রাখতে হবে যে শেক্সপীয়রের প্রভাব শুধুমাত্র বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেই প্রভাব দৃষ্ট হয়ে থাকে।

১৯০৫ সালে শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী '**হীরাবাই**' নামে যে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'টি রচনা করেন, সেটি মূলত শেক্সপীয়রের বহুখ্যাত 'As you like it' এরই উপন্যাস রূপ। কলকাতার Kisory Lal Joynee কর্তৃক উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত হয় কলকাতার জগবন্ধু দত্ত কর্তৃক 'সুলভ প্রেসে'। উল্লেখ করা যেতে পারে উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণই ৮০০০ কপি মুদ্রিত হয়েছিল। লেখক গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর পিতৃদেব স্বর্গীয় পণ্ডিত কালীময় ঘটককে। লেখকের পূর্বাশ্রমের নাম অজ্ঞাত, কৃষ্ণানন্দ শর্মা তাঁর সন্ন্যাস জীবনের নাম। উপন্যাসটি পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত।

'As you like it'-এর অনুকরণে রচিত হলেও লেখক ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু স্বকপোলকল্পিত ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন। প্রথমে শেক্সপীয়রের অনুকৃতি সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে।

উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে অনুজ হরপত রাওয়ের অত্যাচারে তাঁর জ্যৈষ্ঠ নরপত রাও বনবাসী হয়েছিলেন, তাঁর রাজত্ব হস্তান্তরিত হয়েছিল হরপত রাওয়ের কাছে। তবে নিজে বনবাসী হলেও মাতৃহারা কন্যা ধীরাবাইকে রেখে গেছিলেন হরপত রাওয়ের কাছে। হরপত রাওয়ের কন্যা হীরাবাইয়ের সঙ্গে ধীরাবাইও প্রতিপালিত হচ্ছিল। হীরাবাই এবং ধীরাবাইয়ের মধ্যে বন্ধুত্বও ছিল সুগভীর। এর পর ধীরসিংহ নামক এক যুবক রাজমল্ল নামীয় হরপত রাওয়ের প্রধান মল্লের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে এলে তার তারুণ্যে ও রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হরপত রাও তাকে মল্লযুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বীরসিংহ তার সিদ্ধান্তে অটল থাকলে হরপত রাও ধীরসিংহকে মল্লযুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে কন্যা হীরাবাই ও ভ্রাতুষ্পুত্রী ধীরাবাইয়ের শরণাপন্ন হন। হীরা ও ধীরার ঐকান্তিক অনুরোধ সফল হয় না। যাইহোক মল্লযুদ্ধে ধীরসিংহ সাফল্য অর্জন করে প্রশংসিত হয়। কিন্তু হরপত রাও যেই অবগত হন যে নির্বাসিত রাজার প্রিয়বন্ধু সুররাও সিংহের পুত্র হ'ল ধীরসিংহ, সঙ্গে সঙ্গে হরপত রাও ধীরসিংহের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগের নির্দেশ দেন।

রাজপ্রাসাদে অবস্থান কালে ধীরসিংহ এবং ধীরাবাই পরস্পর পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হয়। রাজপ্রাসাদ থেকে বিতাড়িত ধীরসিংহ নিজের গৃহেও শান্তিতে অবস্থান করতে পারে না। বৃদ্ধ ভৃত্য লাখপাতিয়া মারফৎ সে অবহিত হয়

তাঁর পিতৃব্য হরসিংহ তার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অতঃপর লাখপতিয়ার পরামর্শ অনুযায়ী ধীরসিংহ লাখপতিয়ার সঞ্চিত অর্থ নিয়ে লাখপতিয়া সহ নির্বাসিত রাজার সঙ্গে মিলিত হতে যাত্রা করে। নির্বাসিত নরপত রাও ধীরসিংহকে পেয়ে খুবই প্রীত হন।

এদিকে হরপত রাও ভ্রাতুষ্পুত্রী ধীরাবাইকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে যাবার নির্দেশ দেন। হীরাবাইও তার সঙ্গী হয়। ধীরাবাই পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে। তার নাম হয় কিশোরীলাল। হীরাবাই হয় লালমণি। সে পল্লীবালার ছদ্মবেশ ধারণ করে। উভয়ে পৌঁছায় বনে।

হরসিংহের পুত্র বীরসিংহের কার্যকলাপের প্রতিবাদ করলে হরসিংহ পুত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হন, বীরসিংহ নিজগৃহ ত্যাগ করে ধীরসিংহের সহচর হন। বনবাসী নরপত রাও, ধীরসিংহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত হরপত রাও ও হরসিংহের চক্রান্ত সব ব্যর্থ হয়। সসম্মানে নরপত রাও তাঁর সিংহাসনে পুনরায় বসেন। নরপত রাও কৃতজ্ঞতা বশত, এবং বয়সের কারণে রাজত্ব করতে অনীহা প্রকাশ করেন। রাজপদে অভিষিক্ত হন ধীরসিংহ। কিন্তু ধীরসিংহও এই দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মত হন। ভ্রাতা বীরসিংহকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। হরপত রাও তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। হরসিংহও অনুতপ্ত হন। ধীরসিংহের সঙ্গে বিবাহ হয় ধীরাবাইয়ের, অপর পক্ষে বীরসিংহ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন হীরাবাইয়ের সঙ্গে।

শেক্সপীয়রের 'As you like it'-এর নির্বাসিত ডিউক আলোচ্য উপন্যাসে রূপান্তরিত হয়েছেন নরপত রাওয়ে অপরপক্ষে নির্বাসিত ডিউকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপান্তরিত হয়েছেন হরপত রাওয়ে। নামের পার্থক্য ঘটলেও উভয়ক্ষেত্রে আচরণগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

Rosalind এবং Celia উপন্যাসে রূপান্তরিত হয়েছেন যথাক্রমে হীরাবাই ও ধীরাবাইয়ে। শেক্সপীয়রের নাটকের মত উপন্যাসেও দুই বোনের মধ্যেকার গভীর প্রীতির সম্পর্ক দেখা গেছে। Rosalind এর কারণে Celia স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগিনী হয়েছিলেন। উপন্যাসেও ধীরাবাইয়ের কারণে হীরাবাইকে স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগিনী হয়ে ধীরাবাইয়ের অনুগামিনী হতে দেখা গেছে।

গৃহত্যাগের সময় Rosalind এর মত ধীরাবাইও পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন।

'As you like it' এর মত উপন্যাসেও মল্লযুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়েছে। মল্লবীর Charles উপন্যাসে হয়েছে রাজমল্ল আর Orlando হয়েছে ধীরসিংহ। শেক্সপীয়র বর্ণনা করেছেন তাঁর নাটকে যে ডিউক ফ্রেডারিক মল্লযুদ্ধ থেকে Orlando-কে বিরত করতে চেষ্টা করেছিলেন, ব্যর্থ হয়ে তিনি এ ব্যাপারে তাঁর কন্যা Celia ও ভ্রাতুষ্পুত্রী Rosalind এর শরণাপন্ন হন। উপন্যাসেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। এমন কি 'As you like it' এর Rosalind যেমন Orlando-র প্রেমে পড়েছিল, তেমনি উপন্যাসে ধীরসিংহের

প্রেমে পড়েছে—নরপত রাও-এর কন্যা ধীরাবাই। শেক্সপীয়রের মতই উপন্যাসে মল্লযুদ্ধে ধীরসিংহকে বিজয়ী হতে দেখা গেছে, প্রথমে সে রাজানুগ্রহ লাভ করলেও পরে রাজার বিরাগ ভাজন হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই এই বিরাগভাজন হওয়ার কারণও এক। 'As you like it' এ Orlando তাদের প্রাচীন ভৃত্য Adam এর পরামর্শে প্রাণ রক্ষার্থে গৃহত্যাগী হয়েছিল। Adam ও তার সঙ্গী হয়েছিল। সঙ্গে নিয়েছিল Adam এর সঞ্চিত অর্থ। উপন্যাসে Adam হয়েছে লাখপতিয়া দুই ভৃত্যের মধ্যেকার নামের ক্ষেত্রেই মাত্র পার্থক্য, আচার আচরণ অভিন্ন দেখা গেছে।

বনমধ্যে Orlando তার প্রেয়সী Rosalind এর উদ্দেশে বৃক্ষগাত্রে প্রেম নিবেদন করেছে। উপন্যাসেও ধীরাবাইয়ের উদ্দেশে একই ভাবে প্রেম নিবেদন করতে দেখা গেছে ধীরসিংহকে।

শেক্সপীয়রের নাটকে Orlando'র সঙ্গে বিবাহ হয়েছে Rosalind এর, এবং Celia'র সঙ্গে Oliver এর। উপন্যাসেও ধীরাবাইয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে ধীরসিংহের এবং হীরাবাইয়ের পাণিগ্রহণ করেছে বীরসিংহ।

কৃষ্ণানন্দ শর্মা অবশ্য উপন্যাসে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হ'ল—'As you like it'-এ ডিউক ফ্রেডারিকের পরিবর্তন ঘটেছে অভাবনীয় ভাবে। বনমধ্যে অবস্থানকারী নির্বাসিত ডিউককে আক্রমণ করতে সৈন্যসহ যাত্রা করে পথিমধ্যে এক বৃদ্ধ ধার্মিক ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁরই পরামর্শে তিনি সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তিত হন। স্বেচ্ছায় সিংহাসন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সমর্পণ করে নিজে অধ্যাত্ম জীবন যাপনে ব্রতী হন। কিন্তু উপন্যাসে হরপত রাওকে যুদ্ধে পরাস্ত হবার পর সিংহাসন চ্যুত হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগামী হয়ে বনে যেতে দেখা গেছে। শেক্সপীয়রের নাটকে যেখানে স্বয়ং ডিউক ফ্রেডারিকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে সৈন্যসহ বনমধ্যে অভিযান পরিচালনা করার কথা বর্ণিত হয়েছে, উপন্যাসে তৎ পরিবর্তে সেনাপতিদের যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। 'As you like it' এ যুদ্ধ করার পূর্বেই ফ্রেডারিকের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসে রীতিমত যুদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে বিস্তারিত ভাবে। নাটকে দুটি বিবাহই সম্পন্ন হয়েছে বনমধ্যে, কিন্তু উপন্যাসে তা হয়নি। তাছাড়া নাটকে নির্বাসিত ডিউককে পুনরায় সসম্মানে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। উপন্যাসে তা হয়নি। উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত বীরসিংহকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। এ ব্যাপারে বীরসিংহ তার ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। স্বেচ্ছায় তিনি সিংহাসনের অধিকার ত্যাগ করেছেন। নাটকে যেখানে Rosalind-কেই পুনরায় শাসনকর্তার কন্যা রূপে দেখা গেছে, উপন্যাসে সেখানে যে ধীরাবাই হীরাবাইয়ের জন্য অশেষ ক্লেশ স্বীকার করেছিল তাকেই রাজরানীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। নাটকে orlando-র শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছিলেন তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা oliver। কিন্তু উপন্যাসে ধীরসিংহের শত্রুতায় লিপ্ত হতে দেখা গেছে তার পিতৃব্যকে। ঔপন্যাসিক হরসিংহের শত্রুতার কারণ স্বরূপ পুত্র স্বার্থ

রক্ষার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। নাটকে oliver-কে বনমধ্যে তার ভ্রাতা সিংহের আক্রমণ জনিত নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করায় orlando'র সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসে খুল্লতাতের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রের স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে ভিন্নতর ভাবে।

শেক্‌সপীয়র অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী। তাই তাঁর 'As you like it' এর যে রচনাগত উৎকর্ষ ও আকর্ষণ তা আলোচ্য উপন্যাসে আশা করাই অন্যায়। তবু লেখক শেক্‌সপীয়রের একটি উপভোগ্য কাহিনীকে অবলম্বন করায় উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহলকে জাগ্রত রাখে। শেক্‌সপীয়র লিখেছিলেন নাটক, অপর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ শর্মা লিখেছেন উপন্যাস। দুটির উপস্থাপন রীতি ভিন্ন। নাটকের ঘটনাস্থল ফ্রান্স, অপরপক্ষে উপন্যাসের ঘটনাস্থল হ'ল রাজপুতানার কৈলবার প্রদেশ।

লেখক ভাষা প্রয়োগে যথেষ্ট নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন স্বকপোলকল্পিত কিংবা প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাস রচনার যে তিনি অধিকারী সে প্রমাণ তিনি রেখেছেন আলোচ্য উপন্যাসটিতে।

পশু চিকিৎসা, হেকিমি চিকিৎসা (সংকলন) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা কবিরাজ এস. বি. পাল '**চন্দ্রকান্ত**' নামে একটি উপন্যাসও রচনা করেন (১৩১২)। উপন্যাসের নামপত্রেই লেখক পাঠকের উদ্দেশে যে জ্ঞান প্রদান করেছেন তা হ'ল—

মায়া হতে হয় প্রেম শৃঙ্খল সৃজন ;
পরস্পর সৌহৃদ্যতায় হয় যে বন্ধন।
শুনি সুধিগণ মম এ জ্ঞান বারতা,
কোষ্টিতে পরীক্ষা করি প্রেমে হও গাঁথা॥

'চন্দ্রকান্ত' উপন্যাসটিতে লেখক বহু চরিত্রের উপস্থাপনা যেমন করেছেন, তেমনি নানা ঘটনার অবতারণায় কাহিনীকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছেন। ত্রিংশ অধ্যায়ে সমাপ্ত এই উপন্যাসটিকে লেখক ছদ্ম ঐতিহাসিক উপন্যাস রূপে উপস্থিত করেছেন।

উপন্যাসটির কাহিনীর আরম্ভ সপ্তদশ শতাব্দীতে। দ্রাবিড় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মহারাজ আদিত্য নারায়ণ সিংহের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর নবম বর্ষীয় পুত্র দেবকান্তকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সভাসদ্‌গণ সহ মন্ত্রী, দেওয়ানজী প্রমুখেরা। কিন্তু মন্ত্রী পুত্র চন্দ্রকান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করে বসে সে হবে রাজা। মন্ত্রীও পুত্রের মনোবাসনার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পান। আদিত্য নারায়ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা গঙ্গাধরের চক্রান্তে বিষ মিশ্রিত দুগ্ধ পানে রাজকুমার দেবকান্ত ও রাজকুমারী মনোরমার মৃত্যু হয়। মৃতদেহ দুটিকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে মন্ত্রী অমরেশ্বর সিংহই কার্যত রাজার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে রাজস্ব

চালাতে থাকেন। এক দোল পূর্ণিমায় রাজবাটীতে মহোৎসব দেখতে উপস্থিত হয় গোপী গোয়ালিনীর পালিতা অপরূপ সুন্দরী ইন্দুমতী। মন্ত্রী পুত্র চন্দ্রকান্ত এবং ইন্দুমতী পরস্পরকে দেখে আকৃষ্ট হয়। চন্দ্রকান্তের সঙ্গে ইতি-পূর্বে দেওয়ানজী ক্ষেত্রনাথ রানার কন্যা ভানুকুমারীর বিবাহ স্থির হয়েছিল। সেই সূত্রে ভানুকুমারী চন্দ্রকান্তের প্রতি তীব্র ভাবে আসক্ত হলেও চন্দ্রকুমার কিন্তু ভানুকুমারীর প্রতি আসক্ত না হয়ে ইন্দুমতীকে লাভের জন্য ব্যাকুল হয়। ইন্দুমতী সদৃশ এক কন্যা রত্নের মৃতদেহ দর্শনে চন্দ্রকান্তের এতদূর বৈরাগ্য উপস্থিত হয় যে সে সংসার ত্যাগ করে। তার সঙ্গে সঙ্গে ভানুকুমারীও সংসার ত্যাগ করে।

ইন্দুকুমারী বালকের ছদ্মবেশে গোপী গোয়ালিনীর গৃহ ত্যাগ করে এসে শেষে গৌরীশঙ্কর উপাধ্যায়ের কাশীর বাটীতে আশ্রয় লাভ করে। সে পরিচিতি লাভ করে দেবীপ্রসাদ নামে। দেবীপ্রসাদের সাহায্যে গৌরীশঙ্করের একমাত্র কন্যা চারুশীলার পতি দেবী সিংহের সন্ধান মেলে, দীর্ঘকাল পরে উভয়ের মিলন হয়।

এদিকে কাশীধামেই সন্ন্যাস বেশ ধারী চন্দ্রকান্ত ও ভৈরবী রূপী ভানুকুমারীর সাক্ষাৎ পায় দেবীপ্রসাদ। অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এদের সে গৌরীশঙ্করের গৃহে নিমন্ত্রণ করে। গৌরীশঙ্করের গৃহে উপস্থিত হন শিবানন্দ স্বামী। স্বামীর নির্দেশে ভানুকুমারীকে চন্দ্রকান্ত পত্নীরূপে গ্রহণে স্বীকৃত হয় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও। অতঃপর দেবীপ্রসাদ রূপী ইন্দুমতীও আত্মপ্রকাশ করে এবং তার দীর্ঘদিনের অভিলষিত চন্দ্রকান্তকে স্বামী রূপে বরণ করে। প্রকাশ পায় জহুরী কিশোরীলাল ওরফে দেবীসিংহ আসলে রাজকুমার দেবকান্ত এবং ইন্দুমতী রাজকুমারী মনোরমা। শিবানন্দ স্বামী উভয়কে বাঁচিয়ে ছিলেন। গৌরীশঙ্করকে দিয়েছিলেন তিনি দেবকান্তকে মানুষ করার জন্য, অপরপক্ষে গোপী গোয়ালিনীকে দিয়েছিলেন মনোরমাকে। কাশীতেই সন্ধান মেলে গঙ্গাধর এবং গোপী গোয়ালিনীর। গঙ্গাধর গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করে। অপরপক্ষে শিবানন্দ স্বামীর নির্দেশে গোপী আশ্রয় লাভ করে দেবকান্ত ও চন্দ্রকান্তের। দেবকান্ত দ্রাবিড় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। মন্ত্রীর পদে আসীন হয় চন্দ্রকান্ত।

লেখক একদিকে যেমন নানা চরিত্রে ও ঘটনায় আতিশয্য দোষ ঘটিয়েছেন, তেমনি কাকতালীয় ঘটনার সমাবেশে কাহিনী অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। রাজা আদিত্য নারায়ণের পুত্র সন্তান হবার পরই কাহিনীর প্রয়োজনে যেন মন্ত্রীরও পুত্র সন্তান হল। দুই সন্তানেরই ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনা ঘটল একই দিনে। আবার যেদিন মহারানী চন্দ্রলেখার কন্যা হল, সেইদিনই দেওয়ানজীর মহিষীও কন্যা প্রসব করলেন। মহারানী চন্দ্রলেখার মৃত্যু শোকে রাজার বিকলচিত্ত হওয়া এবং শেষে মৃত্যু বরণ আতিশয্য দোষে দুষ্ট, একই ভাবে চন্দ্রলেখার মৃত্যু জনিত শোকে সচিব মহিষীর মৃত্যু বরণও আতিশয্য দোষে দুষ্ট। দীর্ঘ দিন ধরে ইন্দুমতীর বালক বেশ ধারণ করে থাকার ঘটনাও অবিশ্বাস্য বিশেষতঃ

যেখানে গৌরীশঙ্করের কন্যা চারুশিলা তাকে ভ্রাতা রূপে বরণ করে নিয়েছিল।

রাজবাটীতে উপস্থিত হয়ে গোপী গোয়ালিনীর ইন্দুমতীর অপহারক জ্ঞানে মন্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা ও গালমন্দ করার ঘটনাও অবিশ্বাস্য।

ইন্দুমতী এবং ভানুমতীর চন্দ্রকান্তকে স্বামী পদে বরণ, কাহিনীর সহজ-লভ্য সমাধানের সূত্রের তাগিদে নিষ্পন্ন হয়েছে। স্পষ্টতঃই লেখক এক্ষেত্রে বহু বিবাহ প্রথার দ্বারা চালিত হয়েছিলেন বোঝা যায়। ঘুরে ফিরে কাহিনীর সব কয়টি উল্লেখযোগ্য চরিত্রের কাশীতে উপস্থিতিও কাকতালীয় দোষে দুষ্ট। ইন্দুমতীকে মৃত জ্ঞানে চন্দ্রকান্তের যে বৈরাগ্য প্রদর্শিত হয়েছে তাও স্বাভাবিকতার সীমাকে অতিক্রম করে গেছে স্বীকার করতে হয়। কিছু কিছু তথ্য গত ত্রুটিরও সন্ধান মেলে। যেমন চারুশীলা জানিয়েছে তার যখন দু'বছর বয়স, তখন দেবী সিংহের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। অপরপক্ষে দেবী-প্রসাদের প্রশ্নের উত্তরে দেবী সিংহ জানিয়েছে তার বিবাহের সময় স্ত্রীর বয়ঃক্রম ছিল তিন বৎসর। দ্রাবিড় রাজ যেখানে আদিত্য নারায়ণ সিংহ, সেখানে তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম উল্লিখিত হয়েছে গঙ্গাধর মিশ্র বলে। উপন্যাসের দুটি ক্ষেত্রে সেকালের সমাজ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে লক্ষিত হয়।

গৌরীশঙ্কর তাঁর কন্যা চারুশীলার সঙ্গে পাঠান বালকের বিবাহ দিয়েছেন এই ওজুহাতে তাঁকে সমাজ চ্যুত করার যে ঘটনা উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে, কিংবা দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের সঙ্গে দু'বছরের চারুশীলার বিবাহ দান—এখন থেকে আশী বৎসর পূর্বেকার সমাজ-জীবনেরই প্রতিফলন।

উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ সহজ ছাঁদের হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। মোটের ওপর ভাষা ব্যবহারে লেখকের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়।

'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসটির রচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯০৬। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে লেখক উপন্যাসটি রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। উপন্যাসটি পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত।

উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রবোধচন্দ্র, সেই নবীন সন্ন্যাসী। তারই কারণে উপন্যাসটি 'নবীন সন্ন্যাসী' নামে অভিহিত হয়েছে। ভাগ্য বিপর্যয়ে যে প্রবোধচন্দ্র সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীতে পরিণত হয়, দীর্ঘ দিন পরে নানা ঘটনার পর, নানাবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই নবীন সন্ন্যাসীর বাল্য বয়সে বিবাহ করা পত্নী সরযূর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে। লেখক সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ না করলেও অনুমিত হয় নূতন করে প্রবোধচন্দ্র তার দাম্পত্য জীবনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। উপন্যাসটির মুখ্য আকর্ষণ নবীন সন্ন্যাসী। লেখক তার চরিত্রটিকেও আকর্ষণীয় করে চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসটি তারই জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার নিরিখে রচিত হয়েছে। প্রেক্ষাপট হিসাবে একদিকে

যেমন ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চল গৃহীত হয়েছে, তেমনি লেখক বিদেশকেও কিছু সময়ের জন্য প্রেক্ষাপট রূপে ব্যবহার করেছেন।

প্রবোধচন্দ্র মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য করে নানাবিধ গুণের অধিকারী হয়—সে যেমন শরীর চর্চায় মনোযোগী হয়, তেমনি বিদ্যা চর্চাতেও ব্রতী হয়। সে কুস্তী শেখে, শেখে লাঠি খেলা, তরবারি খেলা। তাছাড়া অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোঁড়া, বকশিং এসবও তার আয়ত্তে আসে। শিরোমণির টোলে সে 'সনাতন ধর্ম' শিক্ষা করে, পাঠ নেয় ব্যাকরণ ও সাহিত্যেরও।

সরযূ নদীর তীরে গুরুর সাক্ষাৎ পায় সে, শিব মন্ত্রে দীক্ষিত হয় প্রবোধচন্দ্র। গুরুর নির্দেশে তার সন্ন্যাস অবলম্বন। মথুরা থেকে ভরতপুরের রাজপথে যাবার সময় রেভারেন্ড টমাস গ্রীনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। রেভারেন্ডের কাছে প্রবোধচন্দ্র হিন্দু ধর্মের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছে, ব্যাখ্যা করেছে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, নাভি পদ্ম ও কমলযোনি ব্রহ্মার। বোঝা যায় শিরোমণির কাছে তার 'সনাতন ধর্ম' শিক্ষা সার্থক হয়েছে। টমাস গ্রীনের অনুরোধে সে বিদেশে যাত্রা করেছে, সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও সে কোন প্রকার সংকীর্ণতা কিংবা ধর্মীয় গোঁড়ামির পরিচয় দেয় নি। পর্যটন করেছে স্কটল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, পর্তুগাল, আমেরিকা, আয়ারল্যাণ্ড, রোম ইত্যাদি।

প্রবোধচন্দ্র অতিশয় সৎ ও চরিত্রবান। বাল্যেই তার যজ্ঞপতির কন্যা সরযূর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। বিলাতে অবস্থানকালে মিসরের রেসিডেণ্টের ভগ্নী প্রবোধচন্দ্রের প্রেমে পড়ে, কিন্তু প্রবোধচন্দ্র নানা কৌশলে তাকে নিবৃত্ত করে।

প্রবোধ বলেছে, 'পরের বিপদুদ্ধারে প্রাণপণে যত্ন করিতে না পারিলে আমি পাগল হইয়া যাই।' লেখক প্রবোধচন্দ্রের এই উক্তির যথার্থতা দেখাতে তাকে এত বেশী পরোপকারী রূপে উপস্থাপিত করেছেন, যার ফলে প্রবোধচন্দ্রের কার্যাবলী কিছুটা আতিশয্য দোষে দুষ্ট হয়েছে। সে সরলাকে বাঁচিয়েছে, মল্লিকদের বাঁচিয়েছে ডাকাতদের আক্রমণ থেকে, নিজের জীবন বিপন্ন করে জলমগ্ন পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকাকে রক্ষা করেছে, অচৈতন্য ও গুরুতর রূপে আহত ভিখারীকে উদ্ধার করেছে, এক বিপদাপন্ন নারী ও তার শিশু পুত্রকেও সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। এক কথায় প্রবোধচন্দ্র মুস্কিল আসানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের ক্লেশ নিবারণের জন্য গুদামজাত শস্য লুণ্ঠনের যে চমৎকার ব্যবস্থা সে করেছে, তাতে তার বুদ্ধিমত্তা ও অসহায় মানুষের প্রতি আন্তরিক দরদের পরিচয় মেলে।. প্রবোধচন্দ্রের পরিকল্পনা অনুসৃত হওয়ায় বিকানীর, যোধপুর ও মিবারের দুর্ভিক্ষ দূর হয়েছে।

প্রবোধচন্দ্র ছিল অহংবোধ মুক্ত। মহারাজগণ মানসিংহের হাতে নবীন সন্ন্যাসীর জন্য তিন লক্ষ টাকা তুলে দিলে সে কুণ্ঠিত হয়েছে তার প্রশংসায়, এই প্রসঙ্গে তার উক্তিটি উদ্ধার যোগ্য 'সুদৃশ্য, কাষ্ঠনির্মিত বস্তু প্রস্তুত করিয়াছে বলিয়া, যদি বাটালী অহঙ্কার করে কাষ্ঠে তাহারই সহিত সম্বন্ধ

হইয়াছিল বলিয়া, মুক্ত কণ্ঠে যদি সে কাষ্ঠও তাহারই পক্ষীয় সাক্ষী হয়, তাহা হইলে মুদ্গর কালবিলম্ব ব্যতিরেকে সে বাটালীর অঙ্গে চপেটাঘাত করিয়া দাম্ভিকের স্বরে তাহাকে বলে, "মূঢ়, আমারই আঘাতে কাষ্ঠ কর্তিত হইয়াছে, তুই কে রে?" আবার মুদ্গরের অহঙ্কারে মিস্ত্রি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নীরস দেহে পদাঘাত করতঃ বলে 'রে চৈতন্য বিহীন মুদ্গর! তুই আমারই হস্তস্থিত হইয়া আমারই বল প্রয়োগানুসারে বাটালীর উপর আঘাত করিয়াছিলি। তোর এত দাম্ভিকতা কেন?" মিস্ত্রীর কথায় মুদ্গর বাটালী উভয়েই কুণ্ঠিত, উভয়েই নির্বাক হয়।'

নবীন সন্ন্যাসী বা প্রবোধচন্দ্রের পরই যে চরিত্রটির উল্লেখ করতে হয় সেটি হ'ল বেচুয়া বা আয়েষার চরিত্র। অমৃতবাজার পত্রিকায় (৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪) আলোচ্য উপন্যাসটির সমালোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ করে বেচুয়া চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের নৈপুণ্যের উল্লেখ করা হয়েছিল, 'His searching and psychological analysis of Bechua's character is quite striking' বেচুয়ার শৈশবে তার পিতা-মাতার ভয়ঙ্কর মৃত্যু হয়। একজন বাইজী তাকে মানুষ করে। পরোপচিকীর্ষা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সুযোগ পেলেই তাকে পরোপকারে ব্রতী হতে দেখা গেছে। অশ্বারোহী এলাহীর ক্ষতস্থান সে নিরাময় করেছে।

বেচুয়ার কৃতজ্ঞতাবোধ প্রশংসনীয়। যে গ্রামে তার প্রতিপালিকার জন্ম, সেই গ্রামের মানুষের দুঃখ মোচনের দ্বারা সে তার প্রতিপালিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছে। তার সখীপ্রেমও উল্লেখযোগ্য, উল্লেখযোগ্য তার ধর্ম বিষয়ে সহিষ্ণুতা। আয়েষা তার পিতৃ ও পিতৃব্যের সম্পত্তি লাভের পর পিত্রালয়ের বহির্ভাগ সরযূর নামে এবং অন্দরমহল তার নিজের নামে লিখিত হয়। সরযূর অংশের নামকরণ করা হয় অনাথাশ্রম, আয়েষার অংশের নাম করণ করা হয় গরীবখানা। শুধু তাই নয়, সদর বাটীর সম্মুখস্থ ভূমিতে একটি সুন্দর শিবমন্দির স্থাপিত হয়েছে, অপরপক্ষে অন্দর মহলের পশ্চাদ্বর্তী ভূমিখণ্ডে একটি সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণের ব্যবস্থা আয়েষা করেছে।

নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি ছিল তার অন্তরের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা। সন্ন্যাসীর বিপদাশঙ্কায় তাকে চোখের জল ফেলতে এবং ঈশ্বরকে ডাকতে দেখা গেছে। তরুবালার মা যেন পুনরায় তার হারানোর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে পারে, এই প্রার্থনায় সে মসজিদে জোড়া মুরগী মানত করেছে।

বেচুয়ার রসিকতাবোধ তার চরিত্রকে উজ্জ্বল করেছে। নবীন সন্ন্যাসীর উদ্দেশে তাকে বলতে দেখা গেছে, 'হস্তী দূরবর্তী পদার্থ দেখিতে পায়, কিন্তু অতি নিকটস্থ তাহার প্রকাণ্ড দেহ সে তাহা দেখিতে পায়না। সে পশুর মধ্যে বড়, আপনিও মনুষ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং দৃষ্টি সম্বন্ধে আপনি তাহারই অনুকরণ করিতে পারেন বলিয়া, আমি আপনাকে নিকটস্থ বা নিজ অঙ্গ স্বরূপ বস্তুটি উৎকৃষ্টরূপে দেখাইয়া দিব।'

অন্যত্র সে বলেছে, 'আমাকেও তোমার বামচরণ তলে দাসী লিখতে দিবে, তবে আমি হাস্‌তে হাস্‌তে দুটী হাত তুলে খোদার নাম করে আশীর্বাদ করবো, জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে সহস্র বৎসর তোমার মেড়ার নাকে দড়ি দিয়ে তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িও।'

বেচুয়া চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিনী। আহত তরুবালার পিতাকে ঔষধ দানে, তার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করায় তা প্রমাণিত। প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক মহম্মদ ছফিউল্লা ভিখারীর দেহে অস্ত্রোপচার করে অকপটে বলেছে, 'চিকিৎসা সম্বন্ধে তিনি আমা অপেক্ষা সমধিক সুপণ্ডিতা। কৃষিকার্যে অতি সুপণ্ডিত লোক যেমন বলবান ইতর লোকদ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া লয়েন, এ রমণী প্রধানাও তেমনই আমার দ্বারা আবশ্যকমত চর্ম ও মাংস চিরিয়া লইয়াছেন।'

কিন্তু সেই সঙ্গে পাঠক মনে প্রশ্ন জাগে বেচুয়ার মত একজন স্ত্রীলোকের চিকিৎসা বিদ্যায় এতদূর পারদর্শিনী হওয়ার রহস্য কি? লেখক উপন্যাসে কিন্তু তার কোন সদুত্তর দেন নি। বেচুয়া ছিল জগৎ সিংহের প্রণয়িনী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার বিবাহ হয়েছে এলাহীর সঙ্গে।

লেখক উপন্যাসে হিন্দুর মাহাত্ম্য প্রচারে কিঞ্চিৎ অধিক উৎসাহ দেখিয়েছেন। জগৎ সিংহকে বলতে শোনা গেছে, 'যবন অপেক্ষা হিন্দুসন্তান-দিগেরই শাস্ত্রে অধিক বিশ্বাস আছে। যুক্তি সম্বন্ধেও তাঁহারা ম্লেচ্ছ অপেক্ষা তীক্ষ্ন বুদ্ধিই ধারণ করে!'

আফ্রিদিদেশের যবন যুবা বিকানীর অধিপতির সেনাধ্যক্ষ মানসিংহকে উদ্দেশ করে বলেছে, 'যে বিশ্বাসে এ নিশীথ সময়ে এ শত্রু পরিপূর্ণ দেশেও আপনি একাকী আমার সহিত এ দূরবর্তী নির্জন স্থানে আসিতে সাহসী হইয়াছেন, সে বিশ্বাস, সে সাহস অদ্যাবধি যবন হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই সেই বিশ্বাস ও সাহস হিন্দু ক্ষত্রিয়ের হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং তাঁহাদিগের হৃদয়েই আজি পর্যন্ত বাস করিতেছে।'

হিন্দু রমণীর পাতিব্রত্যের প্রশংসা প্রসঙ্গে মুসলমান রমণীদের নিকে প্রথার সমালোচনা করা হয়েছে—'আঁটা পত্রের উপর ব্লটিং ভিজাইয়া দিলে খাম সংলগ্ন আটা যেমন আল্‌গা হইয়া যায়, কামনা ব্লটিং ভিজাইয়া পূর্ব পতি সংলগ্ন ভালবাসার উপর দিলে, তাহাদের সে ভালবাসা আল্‌গা হইয়া যায় না, তাঁহারা তাহা পূর্বপতি হইতে উঠাইয়া লইয়া নেকার বরের গায়ে লাগাইয়া দিতে পারেন না।'

সমসাময়িক সমাজজীবনের প্রতিফলন স্বাভাবিক ভাবেই উপন্যাসে ঘটেছে। বিধুর আখড়াই বাজানোয় পারদর্শিতা স্মরণ করিয়ে দেয় এদেশের আখড়াই হাফ আখড়াইয়ের জনপ্রিয়তার কথা। প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে সরযূর যখন বিবাহ হয়, তখন উভয়েই নিতান্ত বালক-বালিকা। বাল্যবিবাহ প্রথা যে প্রচলিত ছিল, তারই ইঙ্গিত এতে লভ্য। বহু বিবাহের প্রসঙ্গও একাধিকবার এসেছে। উনিশ বছর বয়সে যজ্ঞপতির পত্নীবিয়োগ হওয়ায় যজ্ঞপতির মাতুল তার পাঁচটি

বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। যজ্ঞপতির পিতার উনপঞ্চাশটি বিবাহ হয়েছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে। সে সময়ে দস্যুদলের উপদ্রব যে কি সাংঘাতিক ছিল, সে পরিচয়ও উপন্যাসটিতে মেলে।

উপন্যাসে অসংখ্য চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। অনেক সময়েই এমন অনেক ঘটনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে, যা উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না, কিংবা মূল কাহিনীর সঙ্গেও তা তেমন ভাবে যুক্ত নয়। লেখক নিজেও এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়, 'নবীন সন্ন্যাসীর মূল সূত্রে সংলগ্ন কতিপয় গল্প, মধ্যে মধ্যে অল্পক্ষণের নিমিত্ত তাহার গতিরোধ করিয়াছে।' লেখক আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছেন, 'সমুদ্র বা নদীর গতিও অব্যাহত নহে। তাহাতেও দ্বীপ বা চড়া দেখিতে পাওয়া যায়।' অমৃতবাজার পত্রিকাও লেখকের বক্তব্যের সমর্থন করে লিখেছিল, 'A novel gesture of the book is that it is interspersed with stories so clearly woven into the thread of the main story, that we donot at all regard them as any burden on the latter' কিন্তু আমরা লেখক কিংবা অমৃতবাজার পত্রিকার বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারছিনা। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় নবীন সন্ন্যাসীর বিদেশ যাত্রার বিবরণের গুরুত্ব কি? মূল কাহিনীর সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কি?

'বঙ্গবাসী' পত্রিকার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে (১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪) বলা যায়, 'উপন্যাসে শৃঙ্খলাবদ্ধ আখ্যায়িকার মাঝে মাঝে ত্রৈলোক্যবাবু উপদেশচ্ছলে অবান্তর উপাখ্যান সংযোজিত করিয়াছেন।' তাছাড়া যে সব চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, লেখকের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, প্রতিটি চরিত্রের পরিণাম দর্শানোয় তিনি আগ্রহী। এতেও উপন্যাসের আকৃতি স্ফীত হয়েছে, যা অনায়াসেই এড়ানো যেত।

যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত '**লহরী**'র প্রকাশকাল ১৩১৩। গ্রন্থটি কাকিনাধিপতি রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরীকে উৎসর্গ করা হয়েছে। 'লহরী' গল্পের সংকলন। সংকলিত গল্পের সংখ্যা সাত—কর্মফল, সুখের সংসার, একটি চিত্র, কন্যাদায়, বঙ্গ-বিধবা, প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিহিংসা।

মনোহর মুখুজ্যের কন্যা চারুশীলা গরুর গাড়ীতে করে শ্বশুরবাড়ী যাত্রাকালে গাড়োয়ান পথিমধ্যে লোভের বশবর্তী হয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে চারুশীলার কাতর প্রার্থনায় দেবী তার প্রতি করুণা পরবশ হয়ে কেমন করে রক্ষা করলেন এবং লোভী গাড়োয়ানের অভাবনীয় ভাবে মৃত্যু হল—তারই সাদা মাটা কাহিনী 'কর্মফলে' বর্ণিত হয়েছে।

'কর্মফল' নামকরণটি অবশ্য দু'দিক দিয়েই সার্থক হয়েছে। লেখক আলোচ্য গল্পে পাপিষ্ঠের পরিণতি যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি ধর্মপথে যে থাকে তাকে যে ধর্ম রক্ষা করেন তাও বলেছেন। সমসাময়িক সমাজজীবনের চিত্র আলোচ্য গল্পটিতে প্রতিফলিত।

দ্বিতীয় গল্পটি হ'ল 'সুখের সংসার'। গোবিন্দপুরের নিত্যানন্দ

চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র মনোমোহনের সঙ্গে স্বর্গীয় ধর্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা কমলার বিবাহ হয়। মনোমোহন এবং তার স্ত্রী কমলার যৌথ প্রয়াসে ও পরিশ্রমে দরিদ্র মনোমোহনের সংসার কেমন সুখের হয়ে উঠল তাই নিয়েই এই গল্প। এই গল্পেও বাল্য বিবাহপ্রথা, কুলীন ব্রাহ্মণের মর্যাদা রক্ষার্থে পণদানের রীতি ইত্যাদি সমসাময়িক সামাজিক রীতি-নীতির কথা বর্ণিত হয়েছে। হিন্দু বিধবার করুণ অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে গল্পে লেখক লিখেছেন ঃ

'সে জীবিত থাকিলেও মৃত, নিকটে থাকিলেও কেহ তাহাকে ডাকেনা, কেহ তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহে না, তাহার ভাল কাপড় থাকিলেও পরিবার জো নাই, ভ্রমর কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশরাজির সংস্কার করিবার তাহার অধিকার নাই, রূপ থাকিলেও, তাহা দেখাইবার জো নাই, সে জগতের একটি প্রান্তে একাকিনী পড়িয়া সেই কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করে।' (পৃঃ ১৭-১৮)

তৃতীয় গল্প 'একটি চিত্র'। ঋণভারে জর্জরিত নবীন তার সাধ্বী স্ত্রীর সাহায্যে কিভাবে ঋণমুক্ত হলেন তারই কাহিনী।

চতুর্থ গল্পটি হ'ল 'কন্যাদায়'। বিবাহে পণপ্রথার মন্দ পরিণাম এই গল্পেও লেখক দেখিয়েছেন। বিধবা বিন্দুবাসিনী তার একমাত্র কন্যার বিবাহ দিলেন ধনবান বীরেশ্বরবাবুর পুত্রের সঙ্গে, বিনিময়ে তাকে তার ভদ্রাসনখানি লিখে দিতে হল জামাইকে। স্থির হল বিন্দুবাসিনী আজীবনকাল মাসিক দশ টাকা করে সাহায্য পাবেন। অর্থ পিশাচ বীরেশ্বরবাবু এই মাসোহারা বন্ধ করে দেওয়ায় বিন্দুবাসিনী অকল্পনীয় আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হলেন।

বঙ্গ-বিধবা পঞ্চম গল্পটির নাম। অল্প বয়সী বিধবা বিজয়াকে মৃত্যু-পথযাত্রী মাতামহ শ্যামাচরণের অনুরোধে বিপত্নীক বিমলানন্দ বিবাহ করে। লেখক বিধবা বিবাহের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই যে গল্পটি রচনা করেছেন, তা বোঝা যায়।

ষষ্ঠ গল্পটি হল 'প্রায়শ্চিত্ত'। বিমলা নাম্নী মহিলা তার সৎ দেবর সতীকান্তের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করায় সে গৃহত্যাগী হয়। তার কারণে তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিমলার স্বামী নলিনীকান্ত তীর্থবাসী হয়। অভিভাবকহীনা বিমলা বিপথে চালিত হয়। বৃন্দাবনে এক গুরুদেবের আশ্রমে সতীকান্তের সঙ্গে নলিনীকান্তের মিলন ঘটে। অন্যদিকে কঠিন রোগ ভোগে বিমলার মৃত্যু হয়। গল্পে অলৌকিকতা যুক্ত হয়েছে। কাহিনীও বড় কৃত্রিম।

শেষ গল্পটির নাম 'প্রতিহিংসা'। বৃদ্ধ রামধন শিরোমণির সঙ্গে যুবতী ভগ্নীর বিবাহ দিতে নরেশচন্দ্র অসম্মত হওয়ায় স্থানীয় জমিদার গৃহে ব্রাহ্মণ ভোজনের আসরে নরেশ শিরোমণি কর্তৃক অপমানিত হয়। স্বামীর অপমানে দুঃখিতা কমলা চলন্ত গাড়ী থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। নরেশচন্দ্র ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে। এইভাবে শিরোমণির প্রতিহিংসায় নরেশের সুখের সংসার ভেঙ্গে যায়।

লেখক আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট গল্পগুলির কাহিনী নির্বাচনে কোনো অভিনবত্ব দেখান নি। বিশেষ করে মহিলাদেয় জন্য গ্রন্থটি রচিত বলে প্রায়

প্রতিটি গল্পে নারীর আদর্শ, কর্তব্য পরায়ণতা, পতি ভক্তি ইত্যাদির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। অথবা এসবের অভাবে স্ত্রী যে আদর্শ রমণী হতে পারে না, এবং সংসার দুঃখের আগারে পরিণত হয় তাই দেখান হয়েছে। সংসারের কর্ত্রী নারী, তাই সেই নারীকে আদর্শ পরায়ণা করে গড়ে তুলতেই গল্পগুলির রচনা।

গল্পগুলিতে ছোটগল্পের রীতি অনুসৃত হয়নি। অনেকক্ষেত্রে পূর্বেই গল্পের পরিণাম বলে দেওয়া হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে লেখক গল্পের শেষে 'উপসংহার' যোগ করে গল্পের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব অথবা নাটকীয়তা গল্পগুলিতে অনুপস্থিত। তবে সমসাময়িক সমাজজীবনের কিছু বিশ্বস্ত চিত্রের উপস্থাপনায় গল্পগুলির অন্যাবিধ গুরুত্ব কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাষা স্বচ্ছ এবং অকৃত্রিম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখক তাঁর প্রশংসনীয় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯০৯) ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক। 'সুধাকর', 'কল্পনা' এবং 'অবকাশ' নামক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন মূলতঃ ঔপন্যাসিক। তিনি বেশ কয়েকটি উপদেশমূলক সামাজিক ও গার্হস্থ্য কাহিনীর রচয়িতা। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কনে বউ (১২৯৭), প্রেম-প্রতিমা বা প্রিয়ম্বদা (১৮৮৬), উপন্যাস লহরী (১২৯৭), প্রসন্নকুমারের উইল (১৯০০), প্রণয় পরিণাম (১৮৮৭), বিমাতা, বড় ভাই (১৩০১), আমাদের ঝি (১৩০২), ঠাকুরঝি (১৩০৭ ; দ্বি সং) ইত্যাদি। যোগেন্দ্রনাথ 'ভণ্ড দলপতি দণ্ড' (তৃ-স ১৩০৩) নামে একটি নাটকও রচনা করেছিলেন। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য তাঁর '**অলৌকিক চিত্র**' (১৩১৩)। এটি একটি গল্প গ্রন্থ। মোট আটটি গল্প গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে। সংকলিত গল্পগুলি হল যথাক্রমে যোগমায়া, প্রেমদাস, জীবনে বোকা, রাক্ষসগণ, দুই সই, টাকার গাছ, কাম না প্রেম? রমাবাই এবং শ্মশানে সন্ন্যাসী। সংকলিত গল্পগুলির সবগুলি সমান আয়তন বিশিষ্ট নয়। কোন কোনটি যেমন বেশ বড়, তেমনি কোন কোনটি আবার বেশ ছোট।

প্রথম গল্পটি হল 'যোগমায়া'। এটি মোট ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। গল্পটির পটভূমি কাশীধাম। বিষয়বস্তুও অভিনব। হুগলীর বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য মুঙ্গেরে অবস্থান কালে রামকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা প্রভাবতীর প্রেমে পড়ে। যেহেতু জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে প্রভাবতীর বিবাহ হলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে তাই তার পিতা প্রভাবতীর সঙ্গে বসন্তের সম্পর্ক অবগত হয়ে স কন্যা মুঙ্গের ত্যাগ করেন। বসন্ত কুমারও দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল প্রভাবতীর সন্ধানে রত থেকে অবশেষে কাশীধামে প্রভাবতীর সন্ধান পায়। প্রভাবতীর সন্ধান লাভ উপলক্ষে বসন্ত কুমার 'যোগমায়া' নাম্নী এক যোগ সাধিকা এবং 'পাগলা বাবা' নামে এক যোগ সাধকের সংস্পর্শে আসে। যোগমায়া যোগসাধনায় রত থাকলেও বসন্তকুমারের প্রেমে পড়ে। বসন্ত

কুমারকে লাভ করার ব্যাপারে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে পাগল বাবা। উভয়ের ষড়যন্ত্রে প্রভাবতীর মৃত্যু হয় কিন্তু এক সাধকের সহায়তায় প্রভাবতী পুনর্জীবন লাভ করে। বসন্ত কুমারের দীর্ঘ দিনের আশা চরিতার্থতা লাভ করে। সাধকের নির্দেশে যোগমায়া এবং পাগলা বাবা তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্তে ব্রতী হয়।

গল্পটিতে যোগসাধনালব্ধ অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় উপস্থাপিত। কাশীর পরিবেশ বর্ণনায় গল্পটির আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বসন্ত কুমারের দীর্ঘ দুঃখবরণের আনন্দময় পরিসমাপ্তি পাঠক চিত্তকে খুশী করে।

দ্বিতীয় গল্পটি প্রথমটির মতই দীর্ঘ এবং দশটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রেমদাস নামীয় এক যুবক ইংরেজী ও বাংলা উপন্যাস ও নাটক পাঠের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নিজেকে নায়ক কল্পনা করে বসে এবং নানা হাস্যকর ঘটনার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত সে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। লেখক নায়ক প্রেমদাসের বর্ণনা দান প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

'প্রেমদাস আমাদের এই আখ্যায়িকার নায়ক, সুতরাং প্রেমদাস যে রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, মানে সকলের অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা বোধ হয়, আমার আর কষ্ট করিয়া কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। তবে নায়ককে আসরে নামাইবার সময় তাহার রূপ ও গুণ বর্ণনা করা গ্রন্থকার দিগের চির-প্রথা, এই প্রথার অবমাননা করা অপরাধে পাছে নিরপেক্ষ সমালোচনী বিচারালয়ে আমায় দন্ডনীয় হইতে হয়, এই ভয়ে পূর্ব হইতেই তাঁবা, তুলসি ও গঙ্গাজল হস্তে সভায় শপথ করিয়া বলিতেছি—হে পাঠক-পাঠিকাগণ, আপনারা যেখানে যেটি থাকিলে সুন্দর বোধ করেন, আমার নায়কের সেইখানে সেইটিই আছে, অর্থাৎ আপনারা পটলচেরা চক্ষু ভালবাসিলে, আমার নায়কের পটলচেরা চক্ষুই আছে, খঞ্জন আঁখি ভাল বাসিলে খঞ্জন আঁখিই আছে।'

(পৃঃ ৬৪)

'জীবনে বোকা' গল্পটি প্রকৃতিতে লোক কথা জাতীয়। অযাচিতভাবে লব্ধ দেবতার বরে 'জীবনে বোকা'র কাঠুরিয়া থেকে জীবন-নগরের রাজা হওয়া এবং অবন্তীনাথের কন্যা শৈলবালার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিদ্যা ও বুদ্ধির অভাবে জীবনে বোকা যে প্রায়ই অবাঞ্ছিত আচরণ করত, তারও পরিসমাপ্তি ঘটেছে দেবতার বরে, শেষ পর্যন্ত জীবনে বোকা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হয়ে যশস্বী রাজা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 'রাক্ষসগণ' গল্পটি করুণ রসাত্মক। ব্যর্থ বাল্যপ্রণয় এই গল্পের উপজীব্য বিষয়।

'দুই সই' গল্পে লেখক অসম বিবাহের কুফল দেখিয়েছেন। এই গল্পের মুখ্য আকর্ষণ খগেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম প্রেম। প্রেমিকাকে সুখী দেখতে চেয়ে সে তার নিজের জীবনকে যেমন চিরন্তন বেদনার সাগরে নিমজ্জিত করেছে, প্রেমিকার জীবনকেও তেমনি শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

'টাকার গাছ' ব্রজনাথ ঘোষালের পরামর্শে রূপচাঁদের পরিবারের সৌভাগ্য

সুখ অন্তর্হিত হবার কাহিনী। 'কামনা প্রেম' গল্পটি অভিনেত্রী বিনোদিনীর প্রেমে উন্মত্ত প্রায় ব্যক্তির শেষ পর্যন্ত সাধনমার্গের পথিক হবার কাহিনীতে রূপান্তরিত।

'রমাবাই'ও একটি প্রেমের গল্প, গল্পটির পটভূমিকারূপে গৃহীত হয়েছে বোম্বাই। বোম্বাইয়ের মহিলাদের স্বাধীনতাকে গল্পটির উপজীব্য করা হলেও অপরূপ রূপবতী রমাবাইয়ের প্রতি আকৃষ্ট বাঙ্গালী যুবক নরেন্দ্রনাথের অতুলনীয় চারিত্রিক সততা এবং নরেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্টা বিলাসবতীর দয়িতকে লাভের জন্য ব্যাকুলতা এবং অকল্পনীয় প্রয়াসই গল্পটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। নরেন্দ্রনাথের চরিত্র পরীক্ষার ব্যাপারটি কিঞ্চিৎ আতিশয্য দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে স্বীকার করতে হয়।

গ্রন্থের সবশেষ গল্পটি 'শ্মশানে সন্ন্যাসী'। শববাহকের মানসিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে গল্পের শুরু আর শ্মশানে আবির্ভূত এক সন্ন্যাসীর সহায়তায় লেখকের অলৌকিক অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে গল্পের পরিসমাপ্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র রায় প্রণীত '**রাজরাণী**' উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৩১৪। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রচিত বলে একদিকে যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষার কারণে উপন্যাসটিতে আধুনিক মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে, তেমনি অপরদিকে মধ্যযুগীয় বিশ্বাসও রূপায়িত হয়েছে। অসুস্থ রোগীর চিকিৎসার জন্য সম্পন্ন মানুষ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে শুরু করেছে, কবিরাজের বদলে ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হয়েছে, মনোমত গৃহাদি নির্মাণের জন্য ইঞ্জিনীয়ারের সহায়তা নিয়েছে। হরিলালবাবুর কন্যার চিকিৎসা কিংবা তাঁর সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণের প্রসঙ্গটি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। তাছাড়া অন্যতম আনন্দানুষ্ঠান হিসাবে ঘোড়দৌড়ের আয়োজনের কথাও উপন্যাসে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আবার মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে হরিলালবাবুর একমাত্র কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ দিনে সঙ্গীসহ শিবের উপস্থিতির বিবরণ দানে। বিনোদিনী ছিলেন আবাল্য শিবের সেবিকা। তাই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে তাঁর মনোভিলাষ মহাদেব পূরণ করেছেন, রাজা বিমলচাঁদের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে বিনোদিনীর, এই সূত্রে তিনি হয়েছেন রাজরাণী। আর তাছাড়া তাঁর বাসনামত স্বয়ং শিব বিবাহ সময়ে বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করতে উপস্থিত হয়েছেন। লেখক নিজেও এই অসম্ভব বিবরণদানের অযৌক্তিকতা বিষয়ে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর বক্তব্য ঃ

'যদ্যপি হিন্দুধর্মে আন্তরিক বিশ্বাস ও প্রগাঢ় আস্থা থাকে, তাহা হইলে যে ইহাপেক্ষা আরও কত অধিকতর আশ্চর্যজনক ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। চাই বিশ্বাস। ধর্মে ও কর্মে সেই বিশ্বাসটুকুই একমাত্র ভিত্তি বা স্থিতি সংস্থান।'

তবু উপন্যাস মধ্যে শিবের উপস্থিতির বিবরণটুকুই হাস্যকর হয়েছে

স্বীকার করতে হয়। শুধু শিব উপস্থিতই হন নি, ত্রিশূল হস্তে পরমানন্দে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বিনোদিনীকে পদ্য ছন্দে দীর্ঘ আশীর্বাদ করেছেন এবং ব্রত কথার অনুসরণে শিব জানিয়েছেন ঃ

প্রতিদিন শিব পূজা করিলেক পর
অবশ্য মিলিবে বর, কামনা যেমন,
এই জ্ঞানে ভক্তগণ, পূজে যেন মোরে

উপন্যাসটি মোটামুটি বৃহৎ, ত্রয়োসপ্ততিতম পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। তবে উল্লেখযোগ্য হ'ল কোন পরিচ্ছেদই তেমন দীর্ঘ নয়।

লেখক উপন্যাসটিতে কয়েক পুরুষের কাহিনীকে স্থান দিয়েছেন। নানা ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ তাই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই লেখকের নৈপুণ্য তেমন চোখে পড়ে না। একমাত্র ব্যতিক্রম অন্নপূর্ণার চরিত্রটি। অন্নপূর্ণা চরিত্রটিকে লেখক ব্যক্তিত্বময়ী করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি, বিচক্ষণতা আমাদের মুগ্ধ করে।

লেখক বর্ণিত কয়েকটি চরিত্রের নামকরণে বঙ্কিমের প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন মৃণালিনী, গোবিন্দলাল ইত্যাদি। মূলতঃ সাধু ভাষায় উপন্যাসটি রচিত হলেও তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর চরিত্রে লেখক চলিত ভাষা প্রয়োগে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রসঙ্গতঃ ক্ষ্যামা ঠাকরুণের ব্যবহৃত ভাষার কিছু নিদর্শন উদ্ধার করা যেতে পারে ঃ

'তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছিলে? তুমি না আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে দেমাক্ করে চলে গেলে? তোমার মুখে কি তখন পোকা পড়েছিল? তখন আমাকে ডাকতে তোমার কি হয়েছিল? আমি বুঝি কেউ নই, তাই সবাইকে ডাকার পর, তবে উনি আমাকে এসে ডাক্‌লেন, আমার বাড়ীর দোর দিয়ে চলে গেলেন, তখন কথা কওয়া হলো না—এত অহঙ্কার থাকবে না, পতন হবে, পতন হবে, পতন হবে'। (পৃঃ ৬৫)।

উপন্যাসে লেখক ঘর জামাই রাখার প্রথার বিরোধিতা করেছেন। প্রকৃতির বর্ণনা নেই বললেই চলে। অষ্ট ষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদে বিনোদের বিবাহ ঠিক হয়ে যাবার পর সুভাষিণী, আমোদিনী প্রভৃতি পাঁচজন বান্ধবীর সঙ্গে বিনোদের পদ্যে রহস্যালাপের যে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে তা কিঞ্চিৎ অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু পার্শী ভাষায় পণ্ডিত গোবিন্দলালের কাছে স্বয়ং দিল্লীশ্বরের আত্মপরিচয় গোপন করে পার্শী ভাষা শিক্ষাদানের যে বিবরণ লেখক দিয়েছেন তা অসম্ভব ও অবাস্তব। গোবিন্দলালকে পার্শীনবীস প্রতিপন্ন করতে এমনতর ঘটনার সংযোজন অপরিহার্য ছিল না।

কালীকুমার দত্ত রচিত '**কেশববাবুর গুপ্তকথা**'র প্রকাশকাল ১৯০৮। গ্রন্থটি ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে উৎসর্গ করা হয়েছে। দ্বাবিংশ স্তবকে গ্রন্থটি পরিসমাপ্ত। প্রতিটি স্তবকেরই বিষয়ানুসারে পৃথক পৃথক নামকরণ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি স্তবকের প্রারম্ভে কবিতাংশের উদ্ধৃতি সংযোজিত

হয়েছে। গ্রন্থটি উপন্যাস পদবাচ্য বলে বিবেচিত হলেও বলাবাহুল্য তা ত্রুটি-মুক্ত নয়।

সত্যি কথা বলতে কি গ্রন্থটিতে যেমন অনেক ত্রুটি লক্ষিত হয়, তেমনি এর কিছু বিরল বৈশিষ্ট্য গ্রন্থটির গুরুত্বকে বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি করেছে। সমসাময়িক জীবনের প্রতিফলনে আলোচ্য গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রন্থটি পূর্ববঙ্গের পটভূমিকায় রচিত। লেখক অত্যন্ত মুন্সীয়ানার সঙ্গে তৎকালীন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের জীবন্ত পরিচয় গ্রন্থ মধ্যে উপস্থিত করেছেন।

গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তবকে লেখক নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন—

'... পূর্ববঙ্গে যখন নীলকুঠী ছিল, তখন নীলকরেরা প্রজার উপর দারুণ অত্যাচার করিত। যদি কোন প্রজা একখানি জমিতে রবি ফসল বপন করিয়াছে এমন কি, ঐ জমিতে গাছ প্রায় অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও বল-পূর্বক উৎপাটিত করত নীলকরেরা পুনর্বার চাষ করাইয়া নীল বুনাইয়া লইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, তাঁহারা উপযাচক হইয়া প্রজামহলে দশ কুড়ি টাকা প্রত্যেক প্রজাকে দাদন দিয়া আয়ত্তাধীনে রাখিত; কিন্তু প্রজাবর্গের মধ্যে কেহই টাকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিত না, তবুও তাহাদিগকে টাকা গছাইয়া দেওয়া হইত। ঐ গচ্ছিত টাকা কোন অংশে কোন কালেই আর পরিশোধ হইত না। যে বৎসর যত নীল জমিতে উৎপন্ন হইত, কুঠীর কর্মচারিগণ তৎ সমুদয় কর্তন করাইয়া তাহাদের আয়ত্তাধীনে লইয়া যাইত; প্রজাগণকে পারিশ্রমিক যৎকিঞ্চিৎ মাত্র দিত।' (পৃঃ ৬) গ্রামের মোড়লের নেতৃত্বে চণ্ডালবর্গের নীলকুঠীর আক্রমণ-জনিত বিবরণে তৎকালীন নীলকরদের অত্যাচারে পীড়িত কৃষিজীবিদের নীলকর বিরোধী সাধারণ মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটেছে।

নীলকরদের অত্যাচার ব্যতিরেকে গ্রন্থটিতে সমসাময়িককালের অপর যে বাস্তব চিত্রটি চিত্রিত হয়েছে, তা হল জলপথে জলদস্যুদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ। আলাই-পুরের নদী বক্ষে জলদস্যুদের হাতে আক্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের মর্মান্তিক বিবরণ সেকালের এই ভয়ংকর অত্যাচার সম্পর্কে একালের পাঠককে অবহিত হবার সুযোগ দেয়। কৌশলে সংবাদদাতা প্রেরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের পর জলদস্যুদের নিরীহ যাত্রীদের আক্রমণ করে তাদের যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করা, ক্ষেত্র বিশেষে তাদের দ্বারা যাত্রীদের নির্মম ভাবে হত্যা সাধন ইত্যাদির লোমহর্ষক বিবরণে শিহরিত হতে হয়। গ্রন্থের যে বিকল্প নামকরণ করা হয়েছে 'পূর্ববঙ্গেব জলদস্যুর ইতিবৃত্ত' তা যথার্থ হয়েছে। জলদস্যুতা সম্পর্কিত এবংবিধ বিস্তারিত বিবরণ অন্যত্র দুর্লভ।

দীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দীকাল পূর্বে হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসেও দেখা যায় ব্রজকিশোর মিত্রের সপ্তম বর্ষীয় পুত্র কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে দুর্গাদাস ঘোষের পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে।

কেশববাবু তার স্ত্রীর শেষ কৃত্য করতে শ্মশানে উপস্থিত হয়ে অন্যান্য শ্মশান যাত্রীদের মধ্যে এক মৃতের দ্বাদশ বর্ষীয়া সহধর্মিনীকে প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে।

গ্রন্থের একবিংশ স্তবকে লেখক তৎকালীন শহর ও গ্রামের চিকিৎসকদের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। লেখকের ভাষায়ঃ

'যিনি ডাক্তারীর "ডা"ও জানেন না কিম্বা কবিরাজীর "ক"ও জানেন না, দেখিতে পাওয়া যায়, আজকাল এইরূপ ডাক্তার কবিরাজের সংখ্যা পল্লীগ্রামেই অধিক। শুধু পল্লীগ্রামে কেন শহরেই বা এই শ্রেণীর চিকিৎসকের অভাব কি? যাহারা গন্ডমূর্খ, যাহারা চিরকাল বদমায়েসী করিয়া কাল কাটাইল তাহারা হঠাৎ খুব জাঁকাল গোছের সাইন্ বোর্ড ঝুলাইয়া "কবি চিন্তামণি" প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়া কবিরাজ রূপে যেন যমরাজের এজেন্ট অথবা যমদূতের 'মাসতুতো ভাই' সাজিয়া বসিল।' (পৃঃ ২০৫)

বেকার ব্যক্তির নিছক অর্থোপার্জনের জন্য এম. ডি. উপাধি গ্রহণ করে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক রূপে অবতীর্ণ হওয়া কিংবা অশিক্ষিত বেকারের কাল্পনিক নামে নানাবিধ রোগের ঔষধ বিক্রয়ের জন্য 'আয়ুর্বেদ ভান্ডার' স্থাপন সম্পর্কিত বিবরণ আপাত ভাবে কৌতূহলোদ্দীপক বলে প্রতিভাত হলেও শতাব্দীকাল পূর্বে দেশের বেকার সমস্যার তীব্রতা এবং সেই কারণে অক্ষম ও অযোগ্য ব্যক্তিদের চিকিৎসকের বৃত্তি অবলম্বনের ঘটনা আমাদের বিস্মিত করে।

আজকাল ধাত্রীদের সহায়তায় গর্ভবতী রমণীর সন্তান প্রসবের তেমন ব্যবস্থা না থাকলেও কিছুকাল আগে পর্যন্ত সন্তান প্রসবের ব্যাপারে ধাত্রীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে কেশববাবুর সন্তান সম্ভবা পত্নীর সন্তান প্রসবের ব্যাপারে ধাত্রীদের ভূমিকা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি পাশকরা কেতাদুরস্ত ধাত্রীর বিবরণও গ্রন্থে লভ্য। এসব ছাড়াও যাতায়াতে পাল্কীর ব্যবহার, আলবোলায় তামাক সেবন ইত্যাদি সেকালের প্রচলিত নানা বিষয়ই স্থান পেয়েছে গ্রন্থটিতে।

জলদস্যুদের প্রসঙ্গ কিংবা নীলকরদের বিষয় ব্যতিরেকে তৎকালীন পুলিশদের ভূমিকাও গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। জলদস্যুদের ধরার ব্যাপারে পুলিশের সক্রিয়তা, এমনকি ছদ্মবেশে দারোগার আত্মগোপনকারী দস্যুদের গ্রেপ্তার করা, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য পুলিশি দাওয়াইয়ের প্রয়োগ ইত্যাদির বিবরণও খুবই প্রাণবন্ত হয়েছে। দস্যুদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য দারোগার নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছিল এইরকম— 'ইহাদের হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া, অঙ্গুলির অগ্রভাগে সূচি বিদ্ধ করিয়া দাও; তাহাতেও যদি স্বীকার না করে, তবে উহাদের বুকে পৃষ্ঠে বাঁশ দিয়া ডলিয়া দিবে।' (পৃঃ ৯১)। দস্যুদের দ্বারা অর্থ লুন্ঠিত হবার সম্ভাবনায় সেকালে মানুষ বিপুল পরিমাণ অর্থ সঙ্গে নিয়ে পথে বের হতেন না, মহাজনের গদীতে অর্থ জমা দিয়ে হুন্ডি করে নেওয়ার রেওয়াজ ছিল, গ্রন্থের চতুর্থ স্তবকে লেখক

সে সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন।

প্রকৃতির বর্ণনায় লেখক নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবি দৃষ্টি। তবে প্রকৃতির বর্ণনায় লেখকের ভাষা সংস্কৃত ঘেঁষা হয়েছে—

(ক) 'এদিকে দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন। ক্রমে ধূসর বসনা সন্ধ্যাসতী ধীরে ধীরে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। পূর্বাকাশে শশধর তদীয় শুভ্র জ্যোৎস্না রাশিতে জগৎকে বিভাসিত করিতে লাগিল। কাননতরু রাজির পত্র সমূহে সুধাকর কর পতিত হওয়াতে বোধ হইলে লাগিল, যেন মরকতমণি গলিত সুবর্ণে বিধৌত হইতেছে' (পৃঃ ১৩৩)।

(খ) 'এদিকে নভোমণ্ডল তারাসহ শশধর বিরাজিত থাকিয়া রজনীকে তদীয় শুভ্র জ্যোতিতে উদভাসিত করিতে লাগিলেন। বনস্থলীর বৃক্ষরাজির পাতায় পাতায় চন্দ্রমাচন্দ্রিকার বিকাশ পরম শোভা ধারণ করিল। মৃদুমধুর সমীরণে নবপল্লবসমূহ ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। তাহার উপর নিশির শিশির কণা লাগাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, মুক্তা-বিম্ব-সকল ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্যোতিষ্মান্ রূপে প্রতিফলিত হইতেছে। এইরূপ নিশীথিনীকে শোভাময়ী করিতে করিতে শশধর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন।' (পৃঃ ১৪০) এইবার 'কেশববাবুর গুপ্তকথা'র অন্য দিকগুলি সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে।

গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে 'কেশববাবুর গুপ্তকথা' কিন্তু গ্রন্থের এবংবিধ নামকরণটির তাৎপর্য ঠিক স্পষ্ট হয়নি। লেখক কেশববাবুর কোন গুপ্তকথা বলতে চেয়েছেন, সেই সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না। কেশববাবুর গর্ভবতী স্ত্রীর প্রসঙ্গটি অনাবশ্যক ভাবে দীর্ঘ করা হয়েছে। শ্মশানে মৃত স্ত্রীর মুখমণ্ডল দর্শন করে কেশববাবুর ছন্দোবদ্ধ পদে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ বড় বেশি কৃত্রিম এবং যাত্রার সংলাপ বলে মনে হয়। কেশববাবুর এই শোকোচ্ছ্বাস অনাবশ্যক ভাবে দীর্ঘ হয়েছে। নিদর্শন স্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে—

'ওহো! কি দগ্ধ অদৃষ্টরে মোর! হা প্রাণেশ্বরি! হা প্রাণেশ্বরি! জীবনের আনন্দদায়িনি! এ মরুময় হৃদয়ের নির্ঝরিণী তুই! হায়! হায়! সত্যই কি এতদিনে ছাড়িলি আমায়? সংসারের সুখসাধ ছেড়ে, মরম-যাতনা দিয়ে প্রণয়ী-হৃদয়ে, হাসিমুখে ত্যজ্য করে যেতেছ কোথায়, কোথা যাও? কোথা যাও? ফিরে চাও ক্ষণেকের তরে।' (পৃঃ ১৪৭)

অষ্টাদশ স্তবকে পত্নী বিয়োগ কাতর কেশববাবুর দেশে পদ্যে স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপনও অনেকটা অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট—

প্রভাতে মঙ্গলবার প্রতিপদ্ তিথি আর
কাল তদা উদিল বিক্রমে॥
চৈত্রের নবম দিনে ব্যথিত করিয়া দীনে
রাত্রি শেষ পঞ্চ ঘটিকায়
স্বজনে ভাসায়ে শোকে গেছে সেই সুরলোকে
আঁধারেতে ফেলিয়া আমায়।

আলোচ্য গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে আছে রূপকথা। এই পর্যায়ে লেখক নানা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কনিষ্ঠা রানীর গর্ভে বানরের জন্ম থেকে শুরু করে রাত্রিকালে স্বপ্নে রাজার সুবর্ণ পত্র সমন্বিত রৌপ্য বৃক্ষে মাণিক্যের ফল দর্শন এবং স্বপ্নে দৃষ্ট ঘটনাকে পুনরায় রাজার সম্মুখে উপস্থিত করতে রাজপুত্রদের প্রয়াস আর এই উপলক্ষ্যে তাদের বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজার বাসনা কার দ্বারা তৃপ্ত হল তা অনুল্লিখিত রয়ে গেছে যদিও রূপকথার সাধারণ চরিত্রানুযায়ী এ বিষয়ে বানর পুত্রেরই সার্থকতা লাভের কথা। বিজয়কৃষ্ণ বাবুর দৃষ্ট চারটি রাজপুত্র যারা ভূতলে নিপতিত হয়ে চীৎকার করছিল এবং গড়াগড়ি দিচ্ছিল তাদের এরূপ আচরণের কারণও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। গ্রন্থের মূল কাহিনীর সঙ্গে রূপকথার অংশটি তেমন সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি এবং মাত্রাতিরিক্ত ভাবে দীর্ঘ হয়েছে।

লেখক গ্রন্থে চরিত্র চিত্রণে তেমন মনোযোগী হন নি, ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনাতেই তাঁর শক্তি ব্যয়িত হয়েছে।

দুর্গাদাস লাহিড়ী রচিত **'রাণী ভবানী'** উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশকাল ১৩১৬। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় অবশ্য লেখক জানিয়েছেন ১৩০৭ সালেই তিনি 'রাণী ভবানী' উপন্যাস প্রণয়নে প্রয়াসী হয়েছিলেন কিন্তু নানা কারণেই সে প্রয়াস তখন সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। অবশ্য 'রাণী ভবানী'কে নিয়ে লেখকের আলোচনার সূত্রপাত তাঁর উপন্যাস রচনার দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পূর্বে 'দ্বাদশ নারী' (১২৯১) গ্রন্থ রচনার সময়েই হয়েছিল। জানা যায় দুর্গাদাস লাহিড়ী বিরচিত 'রাণী ভবানী' উপন্যাসটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। তার প্রমাণ, উপন্যাসটি প্রকাশের মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সংস্করণের ২000 কপি নিঃশেষিত হয়। এরপর গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এবারেও মাত্র দেড় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণের ৪000 কপি নিঃশেষিত হয়। অতঃপর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দেয়। গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৭ সালে।

'রাণী ভবানী' উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার মূলে প্রধানতঃ দায়ী রাণী ভবানীর ঘটনাবহুল জীবন যা একই সঙ্গে চিত্তাকর্ষক এবং চমকপ্রদ। তদুপরি লেখকের রচনানৈপুণ্য যুক্ত হওয়ায় স্বভাবতঃই উপন্যাসটি পাঠক মহলে আলোড়নের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

লেখক আলোচ্য উপন্যাসটিতে ঐতিহাসিক তথ্যাদি পরিবেশনে যথেষ্ট নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রায় একশত বৎসরের বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস এই উপন্যাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বলাবাহুল্য এই সময়ে নানাদিক দিয়েই ভারতবর্ষের বিপর্যয় ঘটেছিল। লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেই একশত বৎসরের ইতিহাসকে আলোচ্য উপন্যাসে মূর্ত করে তুলেছেন। স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে কল্পনা অপেক্ষা ঐতিহাসিক

ঘটনা ও চরিত্রগুলিই আলোচ্য গ্রন্থের সিংহভাগ অধিকার করেছে। লেখক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতার পরিচয় দেওয়ায় মাঝে মাঝে উপন্যাসের পরিবর্তে 'রাণী ভবানী'কে ইতিহাস গ্রন্থ বলে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

সংগৃহীত ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনে ঝোঁক বেশি হওয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল কাহিনীর সঙ্গে তেমন ভাবে সংশ্লিষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও অনেক অপ্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক ঘটনা লেখক সুবিস্তারে বিবৃত করেছেন। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসটির চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ, পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ উল্লেখ্য। উপন্যাসের মূল চরিত্র রাণী ভবানী। লেখক যথেষ্ট মুন্সীয়ানার সঙ্গেই ভবানী চরিত্রটি চিত্রিত করেছেন। ভবানীর কর্তব্যবোধ, উদারতা, পাতিব্রত্য, দেব দ্বিজে ভক্তির পরিচয় যেমন প্রকাশিত, তেমনিই তাঁর প্রশাসনিক নৈপুণ্য এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয়ও আমরা পাই। লেখক চমৎকার ভাবে চরিত্রটির বিকাশ দেখিয়েছেন।

রাজা রামকান্ত ভবানীর কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেলেও তার অস্থির চিত্ততা, কুপরামর্শে চালিত হয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা, স্ত্রী ভবানীর প্রতি ক্রম-নির্ভরতা এবং শেষে দুর্ভাগ্যকে অতিক্রম করে পুনরায় সৌভাগ্য সুখের অধিকারী হওয়া পাঠক চিত্তকে তৃপ্তি দেয়।

দয়ারাম রায়ের চরিত্রচিত্রণ বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। তবে চরিত্রটির পরিণতি সম্পর্কে লেখক তেমন মনোযোগ দেন নি স্বীকার করতে হয়।

কৃত্তিবাস, সদানন্দ স্বামী প্রভৃতিদের চরিত্রগুলি সীমিত পরিসরে হলেও আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপিত।

রাণী ভবানী উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রভাব সহজেই লক্ষণীয়। প্রতিটি পরিচ্ছেদের পৃথক পৃথক নামকরণে, আনন্দ মঠের সন্ন্যাসীদের অনুকরণে সদানন্দ স্বামীর নেতৃত্বে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও পরোপকারে ব্রতী হওয়ার বিবরণ দানে তার পরিচয় মেলে। কোনো কোনো স্থলে ভাষা প্রয়োগেও বঙ্কিমের প্রভাব লক্ষিত হয়। যেমন

'রজনি! তুমি অনন্ত মূর্তি ধারিণী—তুমি অনন্ত কার্য্যকারিণী! কখনও তুমি প্রাণানন্দদায়িনী চন্দ্রমা-শালিনী মধুযামিনী—আবার কখনও তুমি ভুজঙ্গ ভীষণ-ভয় প্রদায়িনী ঘনান্ধকারময়ী প্রকট নিশীথিনী! কখনও মন্দ মন্দ মলয়ানিল বাহিনী মল্লিকা-মালতী-যূথী-ফুল্ল-কুসুম দলশোভিনী কোকিল কণ্ঠ নিনাদিনী সুহাসিনী, আবার কখনও তুমি বিশ্বত্রাসিত বিদ্যুচ্চকিত ঘনঘটাচ্ছন্ন স্ফুরিতানল-বজ্রবর্ষী ভীমা ভৈরবী। রজনি! যখন তোমার অনন্ত প্রসারী নীল বসনাঞ্চলে মণি মুক্তা হীরকোজ্জ্বল নক্ষত্র রত্নমালার অনন্ত চাকচিক্য নিরীক্ষণ করি, তখন মনে হয় তুমিই একমাত্র শান্তি প্রদায়িনী।'

(পৃঃ ১৩৫)।

চণ্ডী শর্মা চরিত্রটিতে কমলাকান্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। চণ্ডী শর্মা ও কমলান্তের মত অহিফেন সেবী এবং অহিফেন সেবন করে দিব্যচক্ষে না হলেও নেশার ঘোরে অনেক কিছু দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে—

'চণ্ডী শর্মা অহিফেনের মৌতাত একটু চড়াইয়া দিয়া ঝিমাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঝিমাইতে ঝিমাইতে তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন,—একদিকে ওলন্দাজ দস্যুগণ, একদিকে বর্গিরদল, একদিকে ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি বণিকগণ আর একদিকে মুসলমানগণ দেশ লুন্ঠন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তিনি দেখিতেছিলেন,—তাহারা দেশ লইতেছে; মনে মনে বলিতেছিলেন, "নেয়, নিক্"। তিনি দেখিতেছিলেন—তাহারা ঘরবাড়ী লুঠ করিতেছে; মনে মনে বলিতেছিলেন,—"লোটে লুটুক" তিনি দেখিতেছিলেন, তাহারা জরু গোরু হরণ করিতেছে।" মনে মনে বলিতেছিলেন,—"করে করুক।" দেশ লইল; ঘরবাড়ী লইল; টাকাকড়ি লইল; জরু গোরু লইল; চণ্ডী শর্মা কোনই আপত্তি করিলেন না। কিন্তু শেষে তিনি দেখিলেন,—"তাহারা তাঁহার সবেধন নীলমণি অহিফেনটুকুও লুটিয়া লইবার উপক্রম করিতেছে।" চণ্ডী শর্মা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সব ছেড়ে দিলাম, তবুও আশ মিটলো না। শেষ আমার নীলমণিকে নিয়ে টানাটানি।' (পৃঃ ২৬৫-২৬৬)

দুর্গাদাস উপমা প্রয়োগেও অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। বিশেষতঃ বিজ্ঞানকে উপজীব্য করে—

ক. বৈজ্ঞানিকগণ বিশিষ্ট আধার সাহায্যে তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া যেমন পদার্থান্তরে ক্রিয়া-প্রকাশে সমর্থ হন, বেণীভূষণও সেইরূপ কৃতান্তকুমারের সাহায্যে দেবীপ্রসাদের উপর আপন কূটনীতি পরিচালনে সমর্থ হইয়াছিলেন। (পৃঃ ৬৯)

কিংবা অন্যবিধ উপমা—

খ. আজি সপ্তবিংশতি বর্ষ পূর্বে ডাক্তার হ্যামিল্টন ইংরেজ জাতির সৌভাগ্য তরুর যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, নবাব আলিবর্দী খাঁর সহায়তায় প্রাপ্তিরূপ জলসিঞ্চনে সে বীজ এখন মুকুলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

(পৃঃ ১৯৯)

প্রকৃতির বর্ণনায় লেখক গাম্ভীর্যময় ভাষা ব্যবহার করেছেন। সমাস ও সন্ধিবদ্ধ পদ এবং তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার এক্ষেত্রে লক্ষণীয়—

সূর্যদেব অস্তগমনোন্মুখ। প্রতীচ্য গমনে রক্তিমাভ খণ্ডমেঘসমূহ মন্থর গতিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। নিম্নে কলনাদিনী পুণ্যতোয়া ভাগীরথী, জলোচ্ছ্বাসে তটভূমি পরিপ্লাবিত করিয়া, তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে নাচিতে সাগর সঙ্গমে ধাবমান হইয়াছেন। ক্বচিৎ মেঘ নির্মুক্ত সূর্যরশ্মি জাহ্নবীর তরঙ্গায়িত জলপ্রবাহে পতিত হইয়া, চাকচিক্য সঞ্চার করিতেছে; ক্বচিৎ বায়ু বিচালিত মেঘসমূহ রশ্মিপথ অবরুদ্ধ করায়, সেই রজত শুভ্র জলধারার উপর আঁধারের দ্বারা নিপাতিত হইতেছে। দূরে আকাশ-পথে উড্ডীয়মান বিহঙ্গমগণ দলবদ্ধ হইয়া, কুলয়াভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। (পৃঃ ১৬৭)

গৌরীদান প্রথা, চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসের বিবরণ, বিবাহে ঘটক ও কুলজ্ঞগণের ভূমিকা, বিবাহের লগ্নপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার বিবরণ, সংস্কারে

বিশ্বাস, সতীদাহের বিবরণ ইত্যাদি সংযোজিত হওয়ায় সমসাময়িক সমাজ-জীবন জীবন্তরূপ পরিগ্রহ করেছে এবং উপন্যাসটির গুরুত্বকে বৃদ্ধি করেছে। পরিশেষে, লেখকের কল্পনাশক্তির পরিচয় দান প্রসঙ্গে দয়ারামের অনুপস্থিতিতে তাঁর বিরুদ্ধে বেণীভূষণের চক্রান্তের জাল বিস্তার, দয়ারামকে বিদায় দান প্রসঙ্গে শয়নকক্ষে রামকান্তের মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হওয়া, নবাব আলিবর্দীর দরবারের বিবরণ, রামকান্তের ভাগ্যবিপর্যয়ে দয়ারামের মানসিক দ্বন্দ্ব, আত্মারাম চৌধুরীর বৈঠকখানায় অনুষ্ঠিত মজলিসের বিবরণ, কাজীর বিচারের বিবরণ, মন্বন্তরের শিহরণ সৃষ্টিকারী বর্ণনা উল্লেখযোগ্য।

চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ প্রণীত '**অনাথ বালক**' উপন্যাসটি প্রায় একশত বৎসর পূর্বে লিখিত। কিন্তু গ্রন্থটি যে সেকালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ গ্রন্থটির একাধিক সংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১৯১১)। গ্রন্থটি সপ্তবিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে লেখক সেই অধ্যায়ের বিষয়-বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে একটি করে পৃথক শিরোনাম দিয়েছেন আর সেই সঙ্গে সংযোজন করেছেন বিষয় অনুযায়ী সংস্কৃত শ্লোক।

লেখক মূলতঃ নীতি-উপদেশ প্রদানের বিশেষ উদ্দেশ্যেই 'অনাথ বালকে'র কাহিনী পরিকল্পনা করেছেন। উপন্যাসের বিষয়বস্তু হল ফতেপুর গ্রামে কালাচাঁদ ও গোরাচাঁদ নামে দুটি ভাই একত্রে বসবাস করত। অল্পবয়সে মাতৃপিতৃহারা অনুজ গোরাচাঁদকে গভীর অপত্য স্নেহে লালন পালন করেছিল কালাচাঁদ। গোরাচাঁদও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ভালবাসত প্রাণাধিক। কালাচাঁদের স্ত্রী লক্ষ্মীও দেবরকে অত্যন্ত স্নেহ প্রীতির চক্ষে দেখত। কিন্তু কালাচাঁদের সুখের সংসারে অকস্মাৎ নেমে এল বিপর্যয়। একে একে মারা গেল লক্ষ্মী, কালাচাঁদ। কালাচাঁদের মেয়ে মোক্ষদার বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। কালাচাঁদ রেখে গিয়েছিল নাবালক পুত্র ইন্দুকে। অতঃপর গোরাচাঁদ আর তার স্ত্রী জ্ঞানদা ইন্দুকে মানুষ করতে যত্নবান হয়। কিন্তু আকস্মিকভাবে অল্প দিন রোগ ভোগ করে গোরাচাঁদও মৃত্যু মুখে পতিত হয়। তখন অসহায় জ্ঞানদা তার ভাসুর পুত্র ইন্দুকে আত্মজ সন্তান জ্ঞানে মানুষ করতে সর্বস্ব পণ করলে। এই ব্যাপারে কেউই তার সহায় হল না, সহায়তা করতে এগিয়ে এল তাদের এক দরিদ্র কিন্তু কৃতজ্ঞ ও বিশ্বস্ত প্রজা রঘু। আত্মীয় পরিজন কেউই তাদের সহায়তা করল না। বরং পাড়া-প্রতিবেশীরা নানাভাবে জ্ঞানদার বিপত্তি সৃষ্টিতে সক্রিয় হল। জ্ঞানদা এসব সত্ত্বেও ইন্দুকে মানুষ করতে পাঠাল দূরের স্কুলে। শেষে এক সহানুভূতিশীল ডাক্তার ইন্দুকে নিজের বাড়ীতে রেখে লেখাপড়ায় সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। ইন্দু মানুষ হ'ল। ওকালতি করে বেশ পসারও হ'ল তার। জ্ঞানদার স্বপ্ন সার্থক হল। শেষে ইন্দুর সচ্ছল সংসার রেখে বৃন্দাবনে সে দেহত্যাগ করল।

উপন্যাসের কাহিনীটির মধ্যে লেখক চেষ্টাকৃত কোন জটিলতার সৃষ্টি করেন নি। সহজ সরলভাবে কাহিনীটি উপস্থাপিত হয়েছে। সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক

দ্বন্দ্ব কিংবা গূঢ় কোনো জীবনদর্শনের পরিচয়ও উপন্যাসটিতে অনুপস্থিত। এমনকি উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও কোনো নতুনত্বের পরিচয় অনুপস্থিত। চিত্রিত চরিত্রগুলি স্পষ্টতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত। এক শ্রেণীর চরিত্র হল অবিমিশ্র আদর্শবাদী। তারা আদর্শের কারণে চরম কৃচ্ছ্রসাধন করেছে। তথাপি বিরল কর্তব্য পরায়ণতা, আন্তরিকতা, ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি মহৎ গুণগুলি তাদের মধ্য থেকে অন্তর্হিত হয়নি। বরং দেখা গেছে যতই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে এইসব চরিত্র, ততই তাদের মানবিক গুণগুলি অধিকতর প্রকট রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এইসব আদর্শবাদী কর্তব্য পরায়ণ চরিত্রগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় জ্ঞানদার। বস্তুত সমগ্র উপন্যাসে তারই ভূমিকা মুখ্য। অন্যান্য আদর্শবাদী চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে একটি ত্রুটি লক্ষিত হয় তা হ'ল বাস্তববুদ্ধি তথা বিচক্ষণতার অভাব। কিন্তু জ্ঞানদার ক্ষেত্রে বিরল বিচক্ষণতার পরিচয়ও প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে তার বিরল আত্মমর্যাদাবোধ, অপার কষ্টসহিষ্ণুতা এবং পরিণামদর্শিতা। মূলতঃ তার বাস্তব বুদ্ধির কারণেই অনাথ বালক ইন্দু জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। উপন্যাসটির নামকরণ করা হয়েছে কালাচাঁদ ও লক্ষ্মীর নাবালক সন্তান ইন্দুকে উপলক্ষ্য করে। যেহেতু শত প্রতিকূলতার মধ্যেও ইন্দু শেষ পর্যন্ত জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বিপর্যস্ত মিত্র পরিবারকে পুনরায় দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু প্রকৃত বিচারে উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে অভিহিত করতে হয় জ্ঞানদাকে এবং তারই নামানুসারে উপন্যাসটির নামকরণ হতে পারত।

আদর্শবাদী চরিত্রগুলির মধ্যে জ্ঞানদা ব্যতিরেকে আর যারা পড়ে তারা হল কালাচাঁদ, গোরাচাঁদ, লক্ষ্মী, কামাখ্যা ও রঘু ডাক্তার। কালাচাঁদ পিতৃমাতৃহীন ভাই গোরাচাঁদকে অপত্যস্নেহে মানুষ করেছে। কিন্তু অতিরিক্ত স্নেহাতিশয্য বশতঃ তার লেখাপড়ার ব্যাপারে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কালাচাঁদ যেমন রোজগার করেছে তেমনি ব্যয়ও করেছে। দুঃস্থ অভাবী মানুষের প্রতি তার সহানুভূতি, দরাজ হাতে দান তার চারিত্রিক ঔদার্য ও মহত্ত্বের পরিচায়ক। তার স্ত্রী লক্ষ্মীও কালাচাঁদের যোগ্য সহধর্মিণী রূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছে। দেবরকে স্নেহ, প্রীতি ও মমতা দিয়ে আগলে রেখেছে। সামান্যতম স্বার্থপরতা তার চরিত্রের পবিত্রতাকে কলুষিত করতে পারেনি।

গোরাচাঁদও কালাচাঁদ এবং লক্ষ্মীকে পিতামাতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি করেছে। কালাচাঁদের তুলনায় তার মধ্যে কিছু ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু লেখাপড়া না শেখায় এবং বাস্তব বুদ্ধির অভাবে চরিত্রটি যেমনভাবে বিকশিত হতে পারত তা হয়নি। তারও অকাল মৃত্যু ঘটেছে। আদর্শবাদী চরিত্র হিসাবে রঘু সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বস্তুতঃ সে নিরক্ষর, দরিদ্র তথাপি বিরল কর্তব্যপরায়ণতার যে পরিচয় সে দিয়েছে তাই তাকে অসামান্য দীপ্তিতে ভাস্বর করে তুলেছে। একসময়ে মিত্র পরিবারের দ্বারা সে উপকৃত

হয়েছে, সেই কৃতজ্ঞতাবশতঃ সে এই পরিবারটির দুঃসময়ে যখন সকলেই তাদের পরিত্যাগ করেছে, সে কিন্তু ত্যাগ করে যেতে পারেনি। সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করেছে, এমনকি নিজে দরিদ্র হয়েও জ্ঞানদা ও তার ভাসুর পুত্রের সংসারকে সচল রাখতে আর্থিক সাহায্য করতেও দ্বিধা করেনি। সকল প্রকার প্রলোভন থেকে মুক্ত থেকেছে সে, মিত্র পরিবারের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করতে গিয়ে অকালে তাকে শোচনীয় মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। মিত্র পরিবারের চরম দুঃসময়ে রঘুকে দেখা গেছে ভগবানের আশীর্বাদের মত।

খল চরিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে প্রধানতঃ রামজয় বসু ও গৌরহরি ভট্টাচার্য। এদের বিবেকের কোন বালাই নেই। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ খুনের ব্যবস্থা করতেও এদের বাধে না। মুখ্যতঃ এই দুজনের চক্রান্তেই রঘুকে জীবন দিতে হয়েছিল। এছাড়াও কৃপণ, স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র রূপে চিত্রিত হয়েছে মোক্ষদার শ্বশুর নিধিরাম ঘোষ, মোক্ষদার শাশুড়ী, ইন্দুর মাতুলানী শিবচন্দ্রের স্ত্রী ইত্যাদি। আদর্শপরায়ণ চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে যেমন আদর্শ পরায়ণতার বাড়াবাড়ি দেখা গেছে, তেমনি বিপরীত কটির চরিত্রগুলির অমানবিক আচরণ তাদের মনুষ্য পদবাচ্য বিবেচনার অতীত করে তুলেছে।

উপন্যাসটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল—তৎকালীন সমাজজীবনের বাস্তব প্রতিফলন। ঘড়িকে সেকালের গ্রামের মানুষের 'ধর্মঘড়ি' রূপে অভিহিত করা, তালপত্রে বর্ণমালা লেখার সূত্রপাত এবং হস্তাক্ষরের পরিপক্কতা অনুসারে কদলিপত্র এবং শেষে মোটা কাগজে পত্রাদি রচনার রীতি, শিক্ষনীয় বিষয় হিসাবে শুভঙ্করের আর্যা, চাণক্যের সংস্কৃত শ্লোক ইত্যাদির উল্লেখ, গৌরীদান প্রথার উল্লেখ, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে বাঙ্গালী কর্মচারীদের অনভিপ্রেত ভূমিকা গ্রহণ, নীলকুঠীর সাহেবের কামরায় জুতাসহ এদেশীয় আমলার প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকা, উপাদেয় মিষ্টান্ন হিসাবে কাশীর চিনি ও বাতাসার কদর, দুঃস্থা রমণীর 'মুড়াচেরা' কাপড়ের ব্যবহার. বিজয়ার দিন গ্রাম বাংলায় নৌকা বাচের আয়োজন, এইদিন অল্পবয়সী ছেলে এবং চাকরবাকরদের আড়ং খরচ স্বরূপ কিছু পয়সা লাভ, কামিকা রমণীদের কথায় কথায় ছড়া কাটা ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। লেখক উপন্যাসে জ্ঞানদা এবং ইন্দুর চরিত্রদ্বয়কে আদর্শ করে তুলতে, তাদের প্রতি পাঠকদের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার অভিপ্রায়ে এবং সর্বোপরি সমাজের একশ্রেণীর মানুষের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য মৃত্যুর আতিশয্য ঘটিয়েছেন। উপন্যাসে সর্বমোট ছয়টি মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে। যাদের মৃত্যুর কথা বর্ণিত হয়েছে তারা হ'ল কালাচাঁদ, কালাচাঁদের স্ত্রী লক্ষ্মী, গোরাচাঁদ রঘু, কালাচাঁদের কন্যা মোক্ষদা এবং সবশেষে জ্ঞানদা।

লেখকের দীর্ঘ ব্যক্তিগত মন্তব্যের সংযোজনও উপন্যাসটির ক্ষেত্রে কিছুটা ত্রুটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে প্রসাদ গুণে সমৃদ্ধ ভাষার ব্যবহারে উপন্যাসটি পাঠে পাঠক তৃপ্তি লাভ করে।

সেকালে The Indian Mirror, The Indian Nation, বান্ধব, সহচর,

বঙ্গবাসী, হিতকরী প্রভৃতি পত্রপত্রিকা উপন্যাসটির প্রশংসায় যেমন পঞ্চমুখ হয়েছিলেন, তেমনি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নবীনচন্দ্র সেন এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তিত্ব উপন্যাসটির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। মূলতঃ সমাজ কল্যাণে উপন্যাসটির ভূমিকা প্রসঙ্গেই এঁদের প্রশংসাবাক্য উচ্চারিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটির সঙ্গে Wake field-এর Vicar-এর সাদৃশ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। গ্রন্থটির কাহিনী, ভাষা ও রচনা শৈলী সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হল

'· It is an exceedingly charming story, charmingly written. The style is one of the best of its kind in the language, chaste and pure, simple and elegant The unpretending story is told with inimitabte grace and simplicity and is in beautiful contrast to the rant and bombast and morbid sensationalism which disfigures Bengali literature at present The pathos is genuine, and shows much power in that style of wrting. The satire is often good, though rare But the highest merit of the work lies perhaps in its pure and lofty morality ···the Bengali writer is perfectly original and in no way indebted to his English Predecesor.'

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রাচীনত্ব যেমন সংশয়াতীত, তেমনিই তার বৈচিত্র্যও আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। বলাবাহুল্য কাব্য, নাটক কিংবা গল্প উপন্যাসের মত মৌলিক সৃজনাত্মক রচনায় লেখকদের বিশেষ বক্তব্য প্রচারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে আত্মপ্রচারের ব্যাপারটিও কম-বেশি কাজ করে। অনেক অক্ষম লেখককেও দেখা যায় সৃজনাত্মক রচনা প্রকাশে, উদ্দেশ্য মুদ্রিতাবস্থায় নিজের নামটি প্রত্যক্ষ করা তথা পাঠক সমাজে পরিচিতি লাভ। কিন্তু প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে আত্মপ্রচারের ব্যাপারটি গৌণ, মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণ সাধনের সদিচ্ছা। একথা ঠিকই, প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে প্রবন্ধকার উল্লেখযোগ্য মৌলিক চিন্তা-ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের রচনায় তা নয়, কিন্তু বিশেষভাবে আমাদের আকৃষ্ট করে তাঁদের মহৎ উদ্দেশ্য।

আমাদের আলোচিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির সিংহ ভাগ অধিকার করে আছে আধ্যাত্মিক বিষয়ক আলোচনা। এক শতাব্দীকাল পূর্বে মানুষের জীবনের সঙ্গে ধর্ম কর্ণের কবচ কুণ্ডলের মতই যুক্ত ছিল। আজকের বস্তুবাদীদের মত জিজ্ঞাসা সে সময়ে সঙ্গত কারণেই অনুপস্থিত দেখা গেছে। মানুষের চরিত্র গঠনে ধর্মকেই অপরিহার্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে, পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ধর্মাচরণে। আর পাঠকের সুবিধার্থে ধর্মের মূল তত্ত্বের সার সংকলন কিংবা পরস্পর বিরোধী ধর্মমতের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের দ্বারা পাঠককে বিভ্রান্তির হাত থেকে মুক্ত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। হিন্দু ধর্মের কথাই প্রায় এই সব গ্রন্থে মূলতঃ প্রকাশিত হলেও একটি গ্রন্থে খ্রীস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রচার কৌশলটির তারিফ না করে উপায় থাকে না।

ধর্ম ছাড়া নিছক সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ গ্রন্থে লেখকদের স্বচ্ছ যুক্তিশীল মনের পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হই। কোনপ্রকার ভাবালুতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে এইসব গ্রন্থে সমাজের বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করে এ দেশের মানুষকে আদর্শ সমাজ গঠনে সহায়তা করা হয়েছে। আবার সমসাময়িক সমাজ জীবনের পরিচয় জ্ঞাপক গ্রন্থ ঐতিহাসিক গুরুত্বের অধিকারী হয়েছে সঙ্গত কারণে। নিছক ব্যঙ্গ করার অভিপ্রায়ে অভিনব পরিকল্পনায় রচিত গ্রন্থও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'জ্ঞান চন্দ্রাংশুঃ' বেণীমাধব ঘোষ কর্তৃক সংগৃহীত এবং মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের আনুকূল্যে প্রকাশিত। প্রকাশকাল ১২৬২ সালের ২৫শে আশ্বিন।

সকামকর্মী এবং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কর্ম ও জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত বিচার স্থান পেয়েছে আলোচ্য গ্রন্থটিতে।

পুরাণ, তন্ত্র, উপনিষদ, গীতা, যোগাবশিষ্ঠসার, বেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্র, মনু, নব্যস্মৃতি, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ইত্যাদির সহায়তায় রচিত সত্য ধর্মোপদেশের সংকলন বর্তমান গ্রন্থটি।

গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখক তাঁর পৃষ্ঠপোষক মহারাজ শিবকৃষ্ণের পূর্বপুরুষের বংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছে রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর পর্যন্ত চার পুরুষের বিবরণ। বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে পয়ারে। বিবরণটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম, যদিও মূল গ্রন্থের সঙ্গে তা সংস্রবরহিত।

লর্ড ক্লাইভের মুন্সীরূপে নিযুক্ত নবকৃষ্ণের 'রাজা' উপাধি লাভের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে

পরে লর্ড সহ দিল্লী রাজধানি যান। সা আলম বাদশা হতে পাইলা সম্মান॥ অর্জির পদের কার্য করিয়া তথায়। মহামান্য রাজোপাধি পাইলেন রায়॥ হস্তী অশ্ব করবাল সকট নির্মাণ। মাহি মোরাতি তোক্ নহবদ্ জান॥ আসা শোঁকা নকিব সিপাহী দ্বারপাল। যোড়া পাগড়ি কলগা শিরপেচ্ ক্রিচ্ জাল॥ ভেরি রণ শিঙ্গা আদি আসারী প্রভৃতি। বাইস পার চার্ খেলাত পাইলা ভূপতি॥ আর পঞ্চ সহস্র সৈন্যের অধিকার। বাদশা হইতে ভূপ পান পুনর্বার॥ নানামতে কোম্পানীর কার্য নিষ্পাদনে। অতি মর্যাদার পাত্র চিন্তা করি মনে॥ মান্য অগ্রগণ্য লর্ড ক্লাইব মহাশয়। বিলাতে দিলেন বার্তা হইয়া সদয়॥ ইংলণ্ডীয় কোম্পানির দরবার হইতে। রাজোপাধি হৈম মুদ্রা প্রদান করিতে॥ আদেশ হইল লর্ড ক্লাইব উপর। আজ্ঞামাত্র সেই মত কৈলা গবরনর॥ একাদশ শতাধিকাশীতি সপ্ত সালে। প্রদত্ত হইল উক্ত মুদ্রা মহিপালে॥ রাজা বাহাদুর খ্যাতি এই মতে পান। পৃথিবী যুড়িয়া অতি বাড়িল সম্মান॥

রাজা নবকৃষ্ণের কৃতিত্বের পরিচয় দান প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে—

সংস্কৃত পারস্য ইংরাজী ভাষা আদি। নিপুণ এসবে আরো নানা শাস্ত্রবাদী॥ দানের তুলনা তাঁর না দেখি সমান। বঙ্গ ইতিহাসে এক আছয়ে প্রমাণ॥ নব লক্ষ মুদ্রা মাতৃ শ্রাদ্ধ ক্রিয়া স্থলে। অনাসে করিলা ব্যয় রাজা কুতুহলে॥ কাশীতে করেন কীর্তি জগতে বিদিত। নবকৃষ্ণেশ্বর শিব করিয়া স্থাপিত॥

এরপর মঙ্গলাচরণ সংযোজিত হয়েছে। তারপরে মূল গ্রন্থের সূচনা।

কি প্রকার কর্মাচরণে প্রবৃত্ত হলে মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধন সম্ভব, নিষ্কাম সাত্ত্বিক কর্মের দ্বারা মানুষের কিরূপ সদ্গতি হয়, সাত্ত্বিক কর্মের লক্ষণ, তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে জীবের কেমন করে মুক্তিসাধন হয়, বেদ চতুষ্টয়ের মধ্যে 'আমিই ব্রহ্ম' এই তাৎপর্যার্থ কিরূপে ঐক্য রূপে নিষ্পন্ন হয়, ব্রহ্ম উপাসনার দিক্ কাল ও তীর্থাদির নিয়ম কিছু আছে কিনা—কর্মী ও জিজ্ঞাসুর কথোপকথনের সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। এরূপ কথোপকথনের সংখ্যা ষোল।

সুদীর্ঘকাল পূর্বে লেখক যে সংস্কারমুক্ত উদার মানসিকতার পরিচয়

দিয়েছেন, তাতে বিস্মিত হতে হয়। সকল মানুষের ব্রহ্ম উপাসনার অধিকার আছে কিনা, বিশেষতঃ শূদ্রের, সেই প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য ঃ

'মানব সকলের মধ্যে বিপ্র কি ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য কিম্বা শূদ্র যে কোন বংশজাত হউক যদি মুক্তি ইচ্ছা করে তবে তাহার সুতরাং জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, কেননা জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি কদাচ হয় না ও সেই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান আত্মার শ্রবণ মননাদি সাধন বিনা উৎপত্তি হয় না এবং উক্ত সাধনের নিয়ত পূর্ববর্তী রূপে কারণ যে ব্রহ্ম বিচার তাহা ও বেদ সকলের আলোচনা ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হইবার নহে অতএব বেদাদির বিচারে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু মাত্রেরই অধিকার রহিল, কিন্তু শাস্ত্রে সামান্যতঃ অজ্ঞ স্ত্রী শূদ্রাদির প্রতি বেদাধ্যয়নে নিষেধ জানিয়া অনেকের চিত্তে এমত সংশয় উপস্থিত হয় যে স্ত্রী শূদ্রাদির মধ্যে জ্ঞানী কি অজ্ঞানী সকলেই বেদপাঠে অনধিকারী হয়েন কিন্তু তাঁহারা যদি শাস্ত্রের পূর্ব্বের সমুদয় বাক্যকে আলোচনা করিয়া তাহার যথার্থ সমন্বয় দ্বারা প্রকৃত তাৎপর্যকে গ্রহণ করেন তবে দেখিবেন যে স্ত্রী শূদ্রাদির প্রতি বেদাধ্যয়নের নিষেধ সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত তাহাদিগের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা না হয়, ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হইলে তৎ প্রতিপাদক শ্রুতি বাক্য শ্রবণাধ্যয়নের দ্বারা কৃতার্থ হইতে কি স্ত্রী কি শূদ্র কি বর্ণাচার বিহীন ব্যক্তি কাহারও প্রতি নিষেধ নাই, অপর প্রমাণ কি বেদেই ইহার সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইতেছে মৈত্রেয়ী ও গার্গী প্রভৃতি কেবল ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুমাত্র হইয়া অবধি বেদের শ্রবণ উচ্চারণ মনন করিয়াছেন বরঞ্চ তাঁহারদিগের স্বীয় বাক্য বেদ হইয়াছে যৎপাঠ দ্বারা শঙ্করাচার্য বেদব্যাস প্রভৃতি পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়াছেন।' (পৃঃ ৪৪-৪৫)

একশত তিরিশ বৎসরেরও পূর্বকালে রচিত বলে লেখকের ব্যবহৃত গদ্যের ভাষায় কিছুটা অস্পষ্টতা বিদ্যমান। সার্থকভাবে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার না করা এবং ব্যবহৃত বাক্যের দীর্ঘাকৃতি এর অন্যতম কারণ।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে 'আশ্চর্য স্বপ্নদর্শন' নামে ধর্মবিষয়ক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটি প্রচারের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে 'অনুক্রমণিকা'য়—'ইহার মধ্যে অনুধাবন করিয়া দেখিলে ধর্ম জীবনের অনেক সত্য লাভ করা যায় এবং তদ্দ্বারা ধর্ম পথের যাত্রীদিগের কিছু না কিছু উপকার দর্শিতে পারে এই আশা করিয়া ইহা প্রচারিত হইল।'

পুস্তিকাটির গুরুত্ব দ্বিবিধ কারণে। প্রথমতঃ বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনার অভিনবত্ব। সরাসরি ধর্মোপদেশ দানের পরিবর্তে রূপকের আশ্রয়ে সংসার ও বিষয়ানুসরণ পরিহারপূর্বক ঈশ্বরারাধনায় ব্যাপৃত হওয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। মূল বক্তব্যটি একজন ব্রাহ্মের দৃষ্ট স্বপ্ন অবলম্বনে রচিত।

দ্বিতীয় গুরুত্ব পুস্তিকাটিতে ব্যবহৃত ভাষার প্রাঞ্জলতায় নিহিত রয়েছে।

'অনন্তর আমরা সেই অরণ্যময় পথ অতিক্রম করিয়া এক রমণীয় উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। আহা! এই কল্পনার অগোচর স্থানটী কি মনোহর! প্রবেশ করিবা মাত্র হৃদয় শীতল হইয়া আনন্দে প্লাবিত হইতে লাগিল। ইহার যে

দিকে নেত্রপাত করি সেই দিকেই দয়াময়ের প্রেম ও করুণার চিহ্ন দেখিতে পাই। ইহার মধ্যে একটি সুরম্য হর্ম্য দেখিতে পাইলাম, তাহার নাম শান্তিনিকেতন।'
(পৃঃ ৪৪-৪৫)

পুস্তিকাটির শেষে দশটি ব্রহ্মসঙ্গীত সংযোজিত হয়েছে। পুস্তিকায় রচয়িতার নাম অনুল্লিখিত রয়েছে। তবে অনুমিত হয় এটির রচয়িতা শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়।

'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ' গ্রন্থটির রচয়িতা তারকনাথ চক্রবর্তী। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১২৭৮ বঙ্গাব্দ। গ্রন্থের নামকরণটি প্রহসন জাতীয় এবং লেখক নিজেও তাঁর গ্রন্থকে 'প্রহসন' বলে অভিহিত করলেও আসলে এটি একটি নীতি পুস্তক। এই পুস্তিকায় লেখক একাধিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে সৎ সঙ্গ লাভের প্রয়োজনীয়তা এবং অসৎ সংসর্গ ত্যাগের কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন। লেখকের ভাষায় 'পুষ্পাভ্যন্তরস্থ কীট সকল সর্বদা পুষ্প সঙ্গে থাকে বলিয়া, সাধুলোকের দ্বারা আদৃত হইয়া দেবতাদিগের মস্তকারোহণ করিতে পায়······।'

গ্রন্থের শেষে লেখক পদ্যে উপদেশ দান করেছেন—

থাকিলে সাধুর সনে, কভু ক্লেশ পাবে না।
তিরস্কার গালাগালি, কখনই খাবে না॥
বরণ সর্বত্র তব, যশ হবে রটনা।
আজীবন হইবে না, কোন বিঘ্ন ঘটনা॥
ফুটিবে জ্ঞানের চক্ষু, ভ্রম তব রবে না।
পাইবে পরম ধর্ম, পাপাসক্তি হবে না॥
যাইবে পবিত্র পুরে পূর্ণ হবে বাসনা।
এমন সাধুর সঙ্গ, ভাল কেন বাসনা?

রামরত্ন পাঠক রচিত **দুর্গোৎসব** গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১২৮১ বঙ্গাব্দ (১৮৭৪)। দুর্গোৎসবের সঙ্গে সংশিলষ্ট কিছু বিশবস্ত সমাজ চিত্রের সংকলন বর্তমান গ্রন্থটি। লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, বাস্তবতাবোধ তথা প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা সঞ্জাত বিবরণেসমৃদ্ধ বর্তমান গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া লেখকও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন লক্ষিত হয়। দুর্গোৎসবের বিবর্তন, মহারাজ শিবকৃষ্ণের পূর্ব পুরুষের বংশ পরিচয় দান, মাটির সাজের পরিবর্তে দুর্গা প্রতিমার ডাকের সাজের প্রবর্তকের উল্লেখ, বঙ্গদেশে আড়ম্বরের সঙ্গে দুর্গাপূজার আয়োজক যাঁরা—মুর্শিদাবাদের রাজা নন্দকুমার, কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ, ঢাকার রাজা রাজবল্লভ, দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ প্রমুখদের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য।

দুর্গাপূজার আড়ম্বর বৃদ্ধির সামাজিক তথা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ বিবৃতি প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—

'নবাবী আমলের তোলপাড়ের পর, হেস্টিংসের আমলে, সুবাত্রয় যখন শান্ত হইয়া আসিল, যখন মারহাট্টাদের ভয় বিদূরিত হইল, ধনপ্রাণ রক্ষার ভার ইংরাজ রাজ করে নাস্ত হইলে অর্থলোলুপ বর্গিদল, বিচ্ছিন্ন হইল ; যখন অর্থাধিকারী বলিয়া, সমক্ষে প্রিয়তম পুত্র মুণ্ড ছিন্ন দেখিতে হইল না ; প্রিয়তমা ভার্যার বক্ষ বিদীর্ণ হইল না ; বৃদ্ধ পিতার করপদ কর্তন সমক্ষে দেখিতে হইল না ; যখন তেলকালির মশালে দীপ্ত শিখায় আপন বদন দগ্ধ হইল না ; চূর্ণ ধূনার উত্তেজনায় যাতনা বৃদ্ধি করিল না ; তখন সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া গৌরব দেখাইতে লোকে সহজে উন্মুখ হইল ; তখন সাধারণে অর্থ ব্যয় করিতে সঙ্কোচ ত্যাগ করিল।' (পৃঃ ১৯-২০)

দুর্গাপূজা উপলক্ষে শহরের চাকুরীজীবিদের দেশে ফেরার প্রস্তুতি, গ্রামের মহিলাদের পূজার দ্রব্যাদি সহ স্বামীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার মানসিক প্রস্তুতি, পূজার দ্রব্যাদি ক্রয় উপলক্ষে স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, বস্ত্র বিক্রেতাদের পূজার বাজারের জন্য প্রস্তুতির বিবরণ খুবই উপভোগ্য। কাপড়ের দোকানগুলির পূজা উপলক্ষে প্রস্তুতির বিবরণে লেখক বলেছেন—

'ফরাসডাঙ্গার নানা-পেড়ে ধুতির সঞ্চয় হইতেছে। হাবড়ার হাটে আমদানি আসল ও নকল কলমে টেক্কা দিবে। ছোট বড় সিমলের ধুতি দোসারে কাটিতেছে। শান্তিপুরে নানাবিধ শাড়ী রঙ্গিনীর মনোনীত হইতেছে। বুটদার গুলবসান রাঙা আঁচলা ঢাকাই বহুমূল্যে বিক্রীত হইতেছে।' (পৃঃ ১৪)

পূজার আমোদের প্রস্তুতির বিবরণে শতাব্দীকাল পূর্বের সময় জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে—

'পূজা আসিতেছে, কতলোক আমোদের কত উপায় চিন্তা করিতেছে। কেহ এবারে বিসর্জনের দিন বাচ করবে ; তাহাতে কে কে সঙ্গে থাকিবে তাহার স্থির হইতেছে : আজ হইতে তবলা আদি মেরামৎ হইয়া থাকিতেছে। পূর্ব হইতে পোষাকের সুট মিলাইয়া রাখা হচ্চে। রুচিসঙ্গত ফ্যাসিয়ানের পিরানটী ইস্তিরী করা চাই। রসিক সে সময়ে নাগরালি করিবে বলিয়া সুখী হইতেছে। নাগরী আনন্দিত হইবে। অবরোধবাসিনী অপেক্ষাকৃত অবকাশ পাইবে ; অবাধে দেখা হইবে, কথা চলিবে।' (পৃঃ ১৬)

লেখক মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন। স্ত্রীর পূজার কাপড় ক্রয়ের ইচ্ছার প্রকাশ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—

'নিজের কথা মুখে আনেনা। মনোগত ইচ্ছা—অবস্থার দিকে একটু নজর রাখিয়া—বালুচরে শাড়ী, নয় ভাল ঢাকাই, নয় শান্তিপুরে ডুরে। কিন্তু মুখ ফুটে বলা হবে না। পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে বলেন, 'আমার কাপড় আছে, একজোড়া বিলাতী দাও।' (পৃঃ ৭)

কিংবা, কৌমুদী ফুলের আত্মপ্রকাশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'পূজার যশে বঙ্গ ধবল হইল। তাহা দেখে ফছকে কৌমুদী ছুঁড়ি সরোবরে ফিক্ করে হেসে উঠ্‌লো।' (পৃঃ ৫৬)

আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের সংস্কৃত সাহিত্য পাঠের পরিচয় মেলে। তবে

ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের ব্যবহারে লেখকের অমনোযোগিতার পরিচয় বিদ্যমান। বিশেষণ পদ ব্যবহারেও নানা ত্রুটি লক্ষিত হয়। যেমন—

ক. গতবারে গাওনা ভাল হয় নাই, বার মাস সেজন্য ক্ষোভিত হইতে হইয়াছিল। (পৃঃ ১৫-১৬)

খ. কিংখাপ শয্যায় দেশী সূত্রে তন্নিত হট্ট ক্রীত বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া (পুরোহিতের প্রাপ্য জন্য) নবপত্রিকাদেবী শয়ান (পৃঃ ৪৪)। সাধু ও চলিতের দৃষ্টিকটু অবাধ মিশ্রণও লক্ষণীয়।

তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় রচিত '**শান্তিশয্যা**'র প্রকাশকাল ১৮৮০। গ্রন্থটি ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত এবং বেঙ্গল ব্রাঞ্চ অফ দি ক্রিশ্চিয়ান ভার্ণাকুলার এডুকেশন সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থটি অভিনব, বলাবাহুল্য খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত। মানুষের জীবনের সর্বাপেক্ষা অনিশ্চয়তাপূর্ণ এবং সেজন্য ভীতিকর যে মৃত্যু, সেই মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিদের মাধ্যমে খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা হয়েছে। জাগুলি নিবাসী পীতাম্বর সিংহ, নবদ্বীপের ভালুকাগ্রামের কুলীন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপ্রসাদ, কলকাতার অদূরে অবস্থিত রামকৃষ্ণপুর গ্রামের কৃষ্ণদাস কৃষক সীতারাম, চন্দন নগরের কৃষ্ণপাল, কায়স্থ বংশোদ্ভূতা জগদম্বা, জগদম্বার কন্যা অলকা, রমজান নামক মুসলমান প্রভৃতি মোট পঁচান্নজন খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের মৃত্যুকালীন জবানবন্দীর সংকলন আলোচ্য গ্রন্থটি।

সকলেই বলেছেন যে মৃত্যু আসন্ন হলেও তাঁরা কেউই মৃত্যু ভয়ে ভীত নন, কারণ যীশু তাঁদের সহায়, আশ্রয়দাতা। বরং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার সুযোগ পেয়ে তাঁরা আনন্দিত। এই কারণেই গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে 'শান্তিশয্যা' (Death bed Scenes of Indian Christians)।

লেখক নিজেও খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত। তবে সরাসরি খ্রীস্টধর্মের প্রচারে স্বয়ং অংশ গ্রহণ না করে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিদের বক্তব্যকেই মূলতঃ এই ব্যাপারে কাজে লাগিয়ে মাঝে মধ্যে লেখক খ্রীস্টধর্মের পক্ষে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন।

গ্রন্থে মুমূর্ষু ব্যক্তিদের বক্তব্য বলে যা উপস্থাপিত করা হয়েছে তার মূল প্রতিপাদ্য হ'ল দেব প্রতিমা মানুষের মঙ্গল করতে অক্ষম, দেবপূজার দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ পরলোক সম্বন্ধে ভীতিমুক্ত হয় না, ভগবান যীশুই একমাত্র পরিত্রাণকর্তা, তিনিই একমাত্র ঈশ্বরের পুত্র, যীশুতে বিশ্বাস স্থাপন করলেই পাপের স্খালন হয় এবং চিত্তশুদ্ধি ঘটে।

মাঝে মাঝে হিন্দুদের দেব দেবীর সঙ্গে তুলনা করে যীশুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে—

'বিষ্ণুর দশটী অবতারের বিবরণ বর্ণিত আছে। কিন্তু কোন অবতারই পাপীর জন্য কিছু করেন নাই। জগন্নাথ নিম কাষ্ঠের ও হস্তনির্মিত মূর্তি মাত্র। হিন্দুদিগের তেত্রিশ কোটি দেব দেবী আছেন। এই সকলই

কোন প্রকারের না কোন প্রকারের পুত্তলিকা মাত্র। শিশুকালে ছেলেরা নির্বোধ অবস্থায় পুতুল লইয়া খেলা করিয়া থাকে; কিন্তু বয়স্ক হইলে সে সকল খেলা পরিত্যাগ করে। তদ্রূপ আমি যতদিন অন্ধ ছিলাম, নানাপ্রকার পুত্তলিকা পূজা করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে মঙ্গলময় প্রভু আমার চক্ষু প্রসন্ন করিয়াছেন। এখন আমি দেখিতে পাইতেছি যে, মূর্তিপূজা ঈশ্বরাবমাননা মাত্র। আমি তজ্জন্যই এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছি'। (পৃঃ ১১৪)
মাঝে মাঝে পয়ারে যীশুর ধর্ম ও জীবনের কথা প্রচার করা হয়েছে—

স্বরগে পিতার কাছে যাইতে বাসনা,
সেখানে নাহিরে শোক অথবা ভাবনা।
যেখানে থাকিয়া যীশু ভকতের তরে,
মিনতি করেন সদা পিতার গোচরে।
সেই হয় ভকতের চির বাসস্থান,
যে সুখ ভবন তরে কাঁদে সদা প্রাণ।
ঈশ অবতার যীশু পতিত পাবন,
ভবে আসি ভক্ত তরে সহিলা মরণ,
স্বর্গের সোপান তিনি পাপির সহায়,
অধীনেরে রেখো প্রভো, ও পদ ছায়ায়। (পৃঃ ২৮)

সংকলিত রচনাগুলির কোন কোনটিতে গল্প রসের সন্ধান মেলে। তাছাড়া এদেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্য বিদেশীয় ধর্মযাজক যথা কেরী, টমাস ইত্যাদি ব্যক্তিদের ভূমিকা সম্পর্কেও কিছুটা জানা যায়। ফলে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সর্বোপরি সমসাময়িক সমাজজীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি স্থান পাওয়ায় গ্রন্থটিতে অন্য এক মাত্রা যুক্ত হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হল। যেমন জগদম্বার কন্যা অলকা মাত্র চার বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল। বিবাহের নামে কি চরম অমানবিকতা সমাজে চালু ছিল এ তারই নিদর্শন। চন্দন নগরের কৃষ্ণচন্দ্র পাল এবং তার বন্ধু গোকুল পাদরীদের সঙ্গে একত্রে ভোজন করায় তারা সমাজচ্যুত হয় এবং পাদরি সাহেবদের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয় তারা। অর্থাৎ পাদরিদের সাধারণ হিন্দু সমাজ যে মোটেই সুনজরে দেখতনা তার পরিচয় মেলে। শ্বশুরালয়ে শাশুড়ী ননদের তাড়নায় বধূদের জীবন কেমন দুর্বিষহ হত সে প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে।

শ্রীনাথ ঘোষের '**আধ্যাত্মিক জ্ঞানোপদেশে**'র প্রকাশকাল ১২৯০। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এর পাঁচ বছর পরে। গ্রন্থটি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণেই তা প্রমাণিত।

সহজ সরল ভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিষয়ক উপদেশাবলীর সংকলন আলোচ্য গ্রন্থটি। কয়েকটি উপদেশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হ'ল—

(ক) রক্ত দেহের যেমন মূল, তেমনিই পরমাত্মা জীবাত্মার মূল, দেহের রক্ত

কম ও মন্দ হইলে, কিংবা ভালরূপে চলাচল না হইলেই, যেমন দেহের আর কিছুতেই রক্ষা নাই, তেমনিই জীবাত্মা পরমাত্মাতে যোগাযোগ না হইলেই, জীবাত্মার আর কোন রকমেই নিস্তার ও রক্ষা নাই। (পৃঃ ২৪)

(খ) পরিমিত অন্ন জল ব্যঞ্জন আর আর উপাদেয় আহারের খাদ্যদ্রব্য সকল নিয়মিতরূপে ভোজন করিলেই রক্ত হইয়া দেহের যেমন ক্রমে ক্রমে পুষ্টি কান্তি ও বল হইতে থাকে, তেমনই অন্নই ব্রহ্মা জলই নারায়ণ সাধু ভক্তেরা ব্যঞ্জন, ইহাদের ভক্ষণ করিয়া পরিপাক করিলেই অর্থাৎ ব্রহ্মবাক্য শব্দবেদ যাহা সাধু ভক্ত মহাজনদের উপদেশ সকল গ্রহণ করিয়া, সাধন পালন ও রক্ষা করিলেই, আত্মাও ক্রমে ক্রমে বলযুক্ত উন্নত প্রফুল্ল প্রসন্ন হইতে থাকে। (পৃঃ ২২-২৩)

লেখক ভাষা ব্যবহারে এবং বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করতে উপমা প্রয়োগে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

'মেয়ে পার্লেমেণ্ট বা ভগ্নীতন্ত্ররাজ্য' (১ম খণ্ড) গ্রন্থটির লেখক গ্রন্থে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন, বলা হয়েছে, 'শ্রীকোন এক ঐতিহাসিক প্রণীত। তবে প্রকাশক হিসাবে নাম মুদ্রিত হয়েছে কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের। অনুমান করা যায় প্রকাশকই গ্রন্থটির লেখক। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯২ বঙ্গাব্দে। এরপর ঐটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দে। অল্প সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা প্রমাণিত। আলোচ্য গ্রন্থটি ন'টি বৈঠকে সমাপ্ত। গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'এই গ্রন্থ ভগ্নী মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ, সুতরাং ইহা অপৌরুষেয়।'

গ্রন্থটির আরম্ভে বলা হয়েছে বাংলা দেশের অন্তর্গত বচনাবর্ত অংশটি ইংরেজরা জেনারেল বিপিনকৃষ্ণের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। জেনারেল এখানে ভগ্নী-তন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করেন। ভগ্নীদের রাজ্য পরিচালনার অঙ্গ স্বরূপ পার্লামেণ্টের অধিবেশনে অংশ গ্রহণ, নারীদের সমস্যা সমাধান কল্পে পার্লামেণ্টে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ, সদস্যদের পারস্পরিক আলোচনা ও প্রস্তাবই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থের নামকরণ ও বিষয়বস্তু থেকেই সহজে প্রতীয়মান হয় যে গ্রন্থটি নারীদের নিয়ে ব্যঙ্গ করে রচিত। লেখক একদিকে যেমন গ্রন্থটির পরিকল্পনায় মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন, তেমনি রচনাতেও তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর বিদ্যমান। এই কৃতিত্বের পরিচয় মেলে উপযুক্ত চরিত্রের পরিকল্পনায় এবং পুরুষদের বিরুদ্ধে নারীদের জেহাদ ঘোষণায়। ব্যঙ্গাত্মক রচনা হলেও তা ঝাঁঝমুক্ত হওয়ায় পাঠক নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে পারে গ্রন্থটি পাঠে। লেখক ভগ্নী রাজ্যের পার্লামেণ্টের মহিলা সদস্যদের অভিহিত করেছেন 'মেম্বরী' অভিধায়। স্পিকারের প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন 'বচন বাগীশ'। পার্লামেণ্টের সদস্যারা **Conservative** এবং **Liberal** এই দুটি দলে বিভক্ত। প্রথমোক্তদের লেখক অভিহিত করেছেন 'কামার বাটী' বলে এবং

দ্বিতীয় দলভুক্তদের অভিহিত করেছেন 'লেবুর দল' নামে। বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে দাম্পত্য দপ্তর, বেশভূষা ও নেত্রপানী দপ্তর, স্ত্রীস্বত্ব রক্ষণাবেক্ষণের দপ্তর ও সেগুলির মন্ত্রীদের নাম উল্লিখিত হয়েছে। মহিলা ডাক্তার চ্যাটার্জীকে বর্ণনা করা হয়েছে 'ডাক্তার চাটুর্যী' নামে। এইবার সদস্যদের কয়েকটি প্রস্তাবের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ডিপুটি প্রেসিডেন্ট' নারীদের সন্তান সম্ভবা হওয়ার হাত থেকে মুক্তিদানের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করে বলেছেন, 'উপযুক্ত আইন কানুন বিধিবদ্ধ করিয়া ভগ্নীদিগের এ ঘৃণিত যন্ত্রণা এবং তাঁহাদিগের রাজকার্য আলোচনার পক্ষে দারুণ প্রতিবন্ধকতা দূর করেন'। (পৃ ১৫)

সভাপত্নীর (?) প্রস্তাব, 'রাজ্য এবং অধিকার যখন ভগ্নীগণের এবং ভগ্নীগণ যখন নানা কার্যে ব্যাপৃত, তখন পৃথিবীতে নূতন জীব অবতারণ করার ক্লেশ ও ভার এখনও কেন ভগ্নীগণের উপরে চাপিয়া থাকে।' তিনি তাই ডেপুটির থেকে একটু অগ্রসর হয়ে প্রস্তাব করেছেন, 'কেবল গৃহকর্ম মাত্র সম্বল ভ্রাতাগণের উপরে উহা অর্পিত হওয়াই শ্রেয়ঃ।' (পৃ: ১৭) মিস্ দুলা ঘণ্টার প্রস্তাব, 'ভগ্নীদের আশ্রিত পুরুষদের পতি খেতাবের পরিবর্তন সাধন'। ভগ্নীতন্ত্র রাজ্যে উত্তর পশ্চিম প্রান্তের শত্রুদের মোকাবিলার জন্য যে সব আয়োজন করা হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল ২৫ জোড়া কটাক্ষ ও নয়ন বাণ, ৫০ কলসী চোখের জল, ৩০ জোড়া জোড়ামল ও ঘুঙ্গুর, বাছাবাছা ৩০ জন আড়খতী নয়না যুবতী, ১০ জন বাইওয়ালী ইত্যাদি।

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় রচিত '**ধর্ম প্রচার**' (ধর্মবিষয়ক কতিপয় প্রস্তাব) ১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। গ্রন্থটির প্রকাশক ফকিরচন্দ্র সরকার।

গ্রন্থকার প্রস্তাবনায় তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে বলেছেন ঃ

'হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সমূহ পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, কোন মতের সহিত কোন মতেরই সামঞ্জস্য নাই। একখানি শাস্ত্রে যে বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হইয়াছে, আর একখানি শাস্ত্রে তাহার তুল্য যুক্তি দ্বারা সেই বিষয়ের নিষিদ্ধতা প্রতিপন্ন হইয়াছে।'

লেখক তাই এই পরস্পর বিরোধী বিধানাবলীর গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণে ব্রতী হয়েছেন।

ধর্মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণে একদিকে মনু, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, শ্রীচৈতন্য, চাণক্য, যীশু, অপরদিকে স্কন্দ পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বামন পুরাণ, ধর্মদীপিকা, শ্রুতি, মহাভারতের সহায়তা নিয়েছেন। ধর্মের দুই প্রধান লক্ষণ স্বরূপ সর্বভূতে ভ্রাতৃত্ব এবং ঈশ্বরের পিতৃত্ব ভাবকে অভিহিত করা হয়েছে।

নানাবিধ ধর্মের মধ্যে কোনটি মানুষের গ্রহণীয়—সে সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য ঃ

'যে ধর্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে ধর্ম সর্বাপেক্ষা পক্ষপাতশূন্য এবং যে ধর্ম

অধিক সারবান, তাহাই মানবের গ্রহণ করা কর্তব্য' (পৃঃ ১৫)। শেষ পর্যন্ত লেখক অবশ্য সনাতন হিন্দু ধর্মের পক্ষেই ওকালতি করেছেন। তাঁর মতে সনাতন হিন্দুধর্ম প্রাচীন তাছাড়া এই ধর্ম সত্য ও অবিনশ্বর এবং বিভিন্ন ধর্মের সংঘর্ষণে প্রকৃতিস্থ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মকে পরাভূত করতে সমর্থ।

লেখক ঘোষণা করেছেন—

'যদি ধর্মের আবশ্যকতা জ্ঞান ও তাহা গ্রহণের স্পৃহা জন্মিয়া থাকে, যদি সংসারে ধর্মের প্রয়োজন হয়, তবে এই বেদোক্ত সনাতন হিন্দু-ধর্ম গ্রহণ করাই কর্তব্য। এই মহান নিত্য ধর্মের অনুসরণ করাই যুক্তি সিদ্ধ।…জগতে এমন পূর্ণাবয়ব, এমন সত্য পূর্ণ, ভ্রমশূন্য ধর্ম আর নাই'। (পৃঃ ১৮)

অর্থাৎ পক্ষপাতশূন্য ধর্মের পক্ষে বলতে গিয়ে লেখক হিন্দু ধর্মের পক্ষেই পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে সংযোজিত অধ্যায়গুলি হল মানবের স্বাধীনতা, সাকার ও নিরাকার, শ্রী, ষড় রিপু, সরল যোগ ও সময়, আয়ু ও অহঙ্কার, পুনর্জন্ম ও পরকাল, যোগ ও যোগী, জীবাত্মা ও পরামাত্মা, তন্ময়ত্ত, শরীর ও শরীরী, প্রার্থনা ও তাহার আবশ্যকতা, অবতার ও অবতারত্ব, শক্তিসাধনা, সকাম ও নিষ্কাম, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ইত্যাদি।

'জীবাত্মা ও পরমাত্মা' অধ্যায়ে লেখক মন্তব্য করেছেন—

'নরক ও স্বর্গ পৃথক স্থানে নহে, সকলই এই মর্ত্যে বর্তমান। জীব এই মর্ত্যধামেই কর্মফল ভোগ করে।' (পৃঃ ৯৪)

মহর্ষি জনক ও ঋষি শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের পৌরাণিক কাহিনী উপস্থাপনা করে লেখক দেখিয়েছেন মানুষ সংসারে থেকেও নির্লিপ্ত হতে পারে, পুনরায় সন্ন্যাসী হয়েও বিষয়াসক্ত হতে পারে (তন্ময়ত্ত)।

'প্রার্থনা ও তাহার আবশ্যকতায়' লেখক বলেছেন ঃ

'প্রার্থনায় যেমন শান্তি পাওয়া যায়, দুর্বল হৃদয়ে যেমন বল পাওয়া যায়, তাপিত প্রাণে যেমন শান্তিলাভ হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। কিন্তু সে প্রার্থনা প্রাণের সহিত হওয়া চাই। নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় মানব হৃদয় হইতে যখন আপনা হইতে প্রার্থনা উত্থিত হয়, তাহাই প্রকৃত এবং তাহাই শান্তি দানে সমর্থ।' 'অবতার ও অবতারত্বে' লেখক রামচন্দ্র এবং কৃষ্ণকে অবতারগণের মধ্যে 'শীর্ষস্থানীয়' বলে অভিহিত করেছেন। শেষে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

'যদি জগতে অবতারের আবির্ভাব বিশ্বাস করিতে হয়, তবে কৃষ্ণই প্রকৃত ভগবানের অবতার, অন্যগুলি অসম্পূর্ণ। কৃষ্ণ চরিত্র আদর্শ চরিত্র।' অবশ্য লেখক উল্লিখিত কৃষ্ণ বৈষ্ণব ও ভক্ত কর্তৃক চিত্রিত কৃষ্ণ থেকে পৃথক।

'সকাম ও নিষ্কাম' অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ প্রসঙ্গে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে ঃ

'নিষ্কাম ধর্ম প্রচার একজন ভিন্ন কোন অবতারই করেন নাই। নিষ্কাম ধর্মের তত্ত্ব একজন ভিন্ন আর কেহই প্রকাশ করেন নাই, সেই একজন কৃষ্ণ।

যুগগুলি অবতার দেখিতে পাই, তাহার সকলগুলিতেই একটু একটু অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাই। পূর্ণ ব্রহ্মত্ব দেখিতে পাই না। কিন্তু কৃষ্ণে সকলই যেন সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কৃষ্ণ চরিত্র নিষ্কাম কার্য্যানুষ্ঠানের প্রধান অবলম্বন। কৃষ্ণ চরিত্র আদর্শ চরিত্র।' (পৃঃ ১৩৫-১৩৬)

'কি আছে' অধ্যায়ে শারদীয়া পূজার তাৎপর্য ও দুর্গামূর্তির বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে।

লেখক ধর্ম সংক্রান্ত তত্ত্বকথাগুলিকে পৌরাণিক ও প্রচলিত গল্পের আশ্রয়ে প্রকাশ করায় নীরসতা অন্তর্হিত হয়েছে। সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি লেখকের পক্ষ পাতিত্ব প্রকট। কৃষ্ণের অবতারত্বে লেখকের অপরিসীম আস্থা ও শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশিত। শক্তি সাধনার প্রতিও লেখকের সমর্থন মেলে। সর্বোপরি বাঙ্গালী জাতির অধঃপতনে লেখকের মর্মপীড়া নানা স্থানেই প্রকাশিত হতে দেখা গেছে।

'নব্যভারত' পত্রিকার প্রবর্তক (১২৯০) দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (১৮৫৪-১৯২০) ছিলেন মূলতঃ ঔপন্যাসিক। শরৎচন্দ্র, বিরাজমোহন, সন্ন্যাসী, ভিখারী, যোগজীবন, অপরাজিতা, পুণ্যপ্রভা ইত্যাদি উপন্যাসের রচয়িতা দেবীপ্রসন্ন প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন।

দীর্ঘ প্রায় একশতাব্দীকাল পূর্বে রচিত দেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরীর '**বিবাহ সংস্কার**' (১২৯৫) গ্রন্থটি নানা কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূলতঃ ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ প্রথা সমালোচনা করার উদ্দেশ্যেই বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলির অবতারণা। লেখকের প্রবন্ধগুলি প্রথমে 'নব্য ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত করে। যদিও ব্রাহ্মসমাজকে উদ্দেশ করে প্রবন্ধগুলি রচিত, তবু বিবাহ সম্পর্কিত নানা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনায় বর্তমান গ্রন্থটি সেকালের বাঙ্গালী সমাজের দ্বিধা বিভক্ত রূপটিকে যেমন উজ্জ্বল ভাবে উপস্থিত করেছে, তেমনি বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছে। লেখক শুধু ব্রাহ্ম সমাজের আলোচনাতেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি, বিবাহ বিষয়ে হিন্দুসমাজের অস্থির চিত্ততা তথা অবৈজ্ঞানিক রীতি অনুসরণের অসারতাকে তীব্র ভাবে সমালোচনা করেছেন। ফলে লেখকের একদেশ দর্শী মনোভাব প্রকাশিত হয়নি।

গ্রন্থটি রচনায় লেখক যেভাবে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন অবশ্যই তা সাধুবাদ লাভের যোগ্য। অর্থহীন সংস্কারকে মান্য করার পরিবর্তে লেখক বৈজ্ঞানিক মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে সমাজ তথা রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর, বিবাহের ক্ষেত্রে অনুসরণের জন্য কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। যেমন তিনি বহু বিবাহ প্রথার বিরোধিতা করেছেন শুধু ন্যায় নীতির জন্য নয়, সেই সঙ্গে দারিদ্র্য পীড়িত দেশে জনসংখ্যা হ্রাসের কারণেও। বাল্যবিবাহ প্রথার বিরোধিতা করেছেন যে সব কারণে, তার মধ্যে রয়েছে বালবিধবা হওয়া বন্ধ করা

এবং পণপ্রথার বিলোপ সাধন। লেখক অল্পবয়সী মেয়ে ও ছেলের বিবাহের ফলে কিভাবে পরবর্তী বংশধররা দুর্বল হয় এবং পাত্র পাত্রী উভয়ের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়, তার যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। লেখক বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা বিবাহকে সমর্থন জানিয়েছেন অবশ্যই সেই বিধবা যদি অল্প বয়সী হয়। তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রগতিপূর্ণ মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে অসবর্ণ বিবাহের সমর্থনে, বিশেষতঃ, আন্তঃরাজ্য বিবাহের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশে। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে দীর্ঘ এক শতাব্দীকাল পূর্বে লেখক এমন এক স্পর্শকাতর বিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্যের অবতারণা করেছিলেন। আন্তঃরাজ্য বিবাহের স্বপক্ষে বলতে গিয়ে লেখক মূলতঃ দেশ প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ তিনি এইভাবে বহুধা বিভক্ত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ দেখতে চেয়েছেন। সংহতির ক্ষেত্রে এর থেকে বড় করণীয় আর কি হতে পারে?

লেখক অতিমাত্রায় বাস্তববাদী। তাই দীর্ঘদিনের প্রচলিত বিবাহের মত সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি তর্কের ওপরই নির্ভর করেননি, সেই সঙ্গে শাস্ত্র এবং পৌরাণিক নিদর্শনেরও উল্লেখ করেছেন। কারণ লেখক জানতেন যে সমাজ সংস্কারে শাস্ত্র এবং পুরাণের একটা বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা আছে। নিছক বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্কই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।

গ্রন্থমধ্যে আমরা লেখকের বহু পঠনের পরিচয় পাই। সরকারী নথিপত্র থেকে শুরু করে—দেশী বিদেশী নানা ব্যক্তির রচনার উল্লেখ গ্রন্থের নানা স্থানেই লক্ষিত হয়। অবশ্যই এগুলি লেখক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখ করেছেন।

এদেশে তখন ইংরেজ সরকার অধিষ্ঠিত। লেখক এই বিদেশী সরকার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে তাঁর যুক্তি নিষ্ঠা এবং স্বদেশ প্রাণতার পরিচয় দিয়েছেন। লেখক বলেছেন ঃ

'যে বিদেশী রাজা নিজের স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত, সে কখনও সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে বিদেশী রাজা আপনি উত্থিত—স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত, ধর্মলক্ষভ্রষ্ট প্রেমহীন, কঠোর, অত্যাচারী, কাজেই আমরা তাহার সমস্ত কথা প্রতিপালন করিয়া চলিতে ধর্মত বাধ্য নই; (পৃঃ ৮৬-৮৭)।' অবশ্যই গ্রন্থটি যে ত্রুটিমুক্ত তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর বক্তব্যে যেমন পুনরাবৃত্তি ও স্ববিরোধিতা ঘটেছে, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তি অপেক্ষা ভাবাবেগ ও যুক্তিহীন উচ্ছ্বাসের প্রতিফলন ঘটতে দেখা গেছে। যেমন, কোনো অবস্থাতেই লেখক বিবাহ ভঙ্গ প্রথাকে সমর্থন করেননি। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হওয়ার পর লেখক পাত্র পাত্রীর মধ্যেকার সাক্ষাৎ ও আলাপাদির বিরোধিতা করেছেন। স্ত্রী বিয়োগের পর যদি কেউ বিবাহ করে, তবে লেখক তাকেও বহু-বিবাহ বলে গণ্য করেছেন 'স্ত্রী ইহকালেই থাকুন পরকালেই থাকুন, একাধিকবার বিবাহ করিলে বহুবিবাহ হয়।' সমাজ কি

পরিমাণে ধর্মাচরণে আনুকূল্য করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে লেখক তার আদর্শ রূপের সন্ধান করেছেন। লেখক আদর্শ বিবাহ বলতে যা নাকি ভগবানের আদেশে সংঘটিত তাকেই বুঝিয়েছেন, অন্য পক্ষে নিছক মনুষ্য দ্বারা সংঘটিত বিবাহকে অধর্মের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। কিন্তু এই দুই বিবাহের মধ্যে প্রথমটির ক্ষেত্রে যে ভগবানের দ্বারা সংঘটিত তার প্রমাণ কি ? যাইহোক এসব সত্ত্বেও লেখককে এমন একটি গ্রন্থ রচনার জন্য প্রশংসা করতে হয়। গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষাও অত্যন্ত সাবলীল ও বিষয়ের উপযোগী।

এইবার আমরা গ্রন্থটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় ব্রতী হতে পারি। বিবাহ-সংস্কার গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয় যৌবন বিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ। এই প্রবন্ধে লেখক একদিকে বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করেছেন, অপর দিকে বিধবা কিংবা বিপত্নীক বিবাহকে বহুবিবাহের অঙ্গ স্বরূপ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। লেখকের মতে 'মানুষ ধর্মপ্রধান জীব।' লেখক যে বাল্যবিবাহের বিরোধী তার কারণ অল্পবয়সের ছেলেমেয়েরা ধর্মকে ঠিকমত উপলব্ধি করতে অপারগ। এমনকি বিবাহের মন্ত্রের তাৎপর্যও তাদের কাছে ধরা পড়েনা। ধর্মজ্ঞান ভিন্ন মানুষ বিবাহিত জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেনা বলে লেখকের বিশ্বাস। ধর্মকেই লেখক বিবাহের লক্ষ্য বলে মনে করেছেন।

ব্রাহ্মসমাজের তীব্র সমালোচনায় ব্রতী হয়েছেন লেখক, যেহেতু সমাজের ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্কে সম্পর্কিত যারা তারা অনেক সময়ে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে যুক্ত হয়। লেখকের এই প্রসঙ্গে মন্তব্য—

'আজ যিনি দাদা, কাল তিনি স্বামী—এটা যে ভয়ানক গর্হিত কার্য, ইহা এ সমাজের অনেকেই বুঝেন না'।

অবশ্য লেখক হিন্দু সমাজের ওপর ব্রাহ্ম সমাজের অমোঘ প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। এমনকি এখানকার হরিসভা একসময়ে ব্রাহ্মসভারই অনুরূপ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি ক্রমে হিন্দু সমাজে গৃহীত হচ্ছে। সুতরাং লেখক ব্রাহ্মসমাজের সমালোচনা করেছেন একে ত্রুটিমুক্ত করতে যাতে তার দ্বারা প্রভাবিত হিন্দু সমাজের কোনো অনিষ্ট না হয়।

প্রবন্ধে লেখকের এক বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হয়েছে। লেখক বলেছেন, 'বরের পণ দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয়, এদেশে সময়ে কন্যা জন্ম বিশেষ বিরক্তির হইবে এবং অর্থাভাবে কন্যাকে যথাসময়ে পাত্রস্থ করিতে না পারায় বয়স আরো খুব বাড়িয়া যাইবে'। আজ প্রায় একশত বৎসর পরে লেখকের অনুমান সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে স্বীকার করতে হয়।

এদেশের লোক যে আইনের দ্বারা সমাজ-সংস্কার সাধনে বিশ্বাসী নয়, এই বিশেষ মানসিকতা লেখক তাঁর বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে আবিষ্কার করেছিলেন।

বাল্যবিবাহের বিরোধিতায় লেখকের প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রকাশিত হলেও অপরপক্ষে তাঁকে চরম প্রাচীনপন্থী রূপে দেখা গেছে, কারণ বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে তিনি শারীরিক ব্যাপারটিকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে

নিছক ধর্মীয় বুদ্ধির অপ্রতুলতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি লেখক বিধবা বিবাহ এবং বিপত্নীক বিবাহকে বহুবিবাহের অঙ্গস্বরূপ বিবেচনা করতেও কুণ্ঠিত হননি এবং প্রকারান্তরে বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেছেন।

গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি হল 'বাল্যবিবাহ, চন্দ্রনাথ বাবুর মত ও গৃহস্থাশ্রম'। এই পরিচ্ছেদে লেখক মূলতঃ চন্দ্রনাথ বাবুর বিবাহ সম্পর্কিত অভিমতের সমালোচনা করেছেন। চন্দ্রনাথ বাবু তাঁর 'হিন্দুপত্নী এবং বিবাহের বয়স' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছিলেন স্বামীর বয়স হওয়া চাই তিরিশ অপর পক্ষে কন্যার বিবাহের আদর্শ বয়স হল বারো। এর কারণ তাঁর মতে 'হিন্দু পরিবার একান্নবর্তী, হিন্দু পত্নী কেবল পতির জন্য নয় কিন্তু পরিবারের জন্যও। পতির পরিবারের সকলের সহিত পত্নীর আত্মীয়তা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। অধিক বয়সে তাহা হয় না।'

কিন্তু লেখক চন্দ্রনাথ বাবুর বক্তব্যকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। একের পর এক যুক্তি প্রকাশ করে লেখক দেখিয়েছেন চন্দ্রনাথ বাবুর বক্তব্য কতখানি যুক্তিহীন। লেখক যথার্থই বলেছেন পত্নী কেবল পরিবারের জন্যই নয়, পতির জন্যও। তাই স্বামী স্ত্রী পরস্পরের ভালবাসার উপযুক্ত কিনা এ বিষয়ে কেবল অভিভাবকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হতে পারেনা, বর-কন্যারও এই ব্যাপারে মত থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া স্ত্রী অল্পবয়সী হলেই পতির পরিবারকে ভালবাসতে সক্ষম হবেন এমনটা ভাবাও ঠিক নয়। লেখক বলেছেন যখন স্ত্রী স্বামীকে যথার্থভাবে ভালবাসতে পারবেন, তখনিই তারপক্ষে স্বামীর প্রিয়জনেরা প্রাণের জিনিষ হতে পারে। তাই অল্পবয়সে কন্যা বিবাহ দিলে একদিকে তারপক্ষে যেমন স্বামীকে যথার্থভাবে ভালবাসা সম্ভব হয় না, তেমনিই সম্ভব হয় না স্বামীর প্রিয়জনকে প্রিয় করে নেওয়া।
চন্দ্রনাথ বাবুর বক্তব্য ছিল, 'হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য পতি পত্নীর একীকরণ, হিন্দু পত্নী পতির সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাইবেন। বয়স্থ পতি বিবাহের পর বালিকা পত্নীকে গড়াইয়া পিটাইয়া আপনাতে মিলাইয়া লইবেন।' লেখক চন্দ্রনাথ বাবুর বক্তব্যের উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্থন জানালেও তাঁর কথিত রীতিকে সমর্থন করতে পারেননি সঙ্গত কারণেই, 'পতিত্ব স্ত্রীত্বে, স্ত্রীত্ব পতিত্বে মিশান চাই। উভয়ের মন উভয়কে দেওয়া চাই। কিন্তু অপরিপক্কবুদ্ধি বালিকা কিরূপে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মিলাইয়া পতিত্বে মিলিবেন, আমরা বুঝি না।' লেখক আরও প্রশ্ন তুলেছেন যে বর-কন্যা উভয়েই যদি উপযুক্ত বয়সের অধিকারী হয় তবে সেক্ষেত্রে বিবাহ যে সুন্দর হবে না তার প্রমাণ কি? তাছাড়া পতিরই কেবল পত্নীকে শিক্ষাদানের অধিকার—লেখক এ বক্তব্যও স্বীকার করেন নি। লেখকের বক্তব্য, 'পত্নীর মধ্যেও এমন কিছু আছে, যাহা পতির নাই,...সেই কিছু পতিকে দিবার জন্য পত্নী অধিকারী নন কেন? বালিকা বলিয়া নয় কি? এ স্থানেও আমরা তাঁহার যুক্তিতেই বলিতে পারি, উভয়ের অধিক বয়স হইলেই পরস্পরকে নিজের উপযোগী করিবার শক্তি জন্মে। সুতরাং যৌবন-বিবাহই অধিক যুক্তিযুক্ত।'

মনুর অনুসরণে চন্দ্রনাথ বাবু বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের অধিক বয়সের প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন জানিয়েছেন। আমাদের লেখক চরক সুশ্রুতের নির্দেশানুযায়ী কন্যার অধিক বয়সের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন।

প্রবন্ধটির দ্বিতীয়াংশে লেখক যৌবন বিবাহ প্রচলনে ব্রাহ্ম সমাজের গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকার যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনি গৃহস্থাশ্রম সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। লেখক একান্নবর্তী পরিবার প্রথাকে প্রেমসাধনার উৎকৃষ্ট উপায় বলে অভিহিত করেছেন এবং যৌবন বিবাহ ধর্মমূলক হলে এই প্রথা রক্ষা পাবে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

লেখক এই প্রবন্ধে স্বচ্ছ যুক্তির দ্বারা চন্দ্রনাথ বাবুর বক্তব্যের অযথার্থতা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু বিরোধিতা কখনই ব্যক্তিগত আক্রমণে পর্যবসিত হয়নি। শুধু তাই নয় চন্দ্রনাথ বাবুর শাস্ত্র নির্ভর বক্তব্যের অযথার্থতা প্রতিপন্ন করতে লেখককে চরক সুশ্রুতের উল্লেখ করতে দেখা গেছে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি লেখকের আত্যন্তিক অনুরাগ তাঁকে ব্রাহ্ম সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কিত সমালোচনায় বিরত করেনি। লেখকের নিরপেক্ষতাই এর প্রমাণ।

গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদেও ব্রাহ্মসমাজের বিরূপ সমালোচনা স্থান পেয়েছে। স্বাধীনতার নামে ব্রাহ্মসমাজে প্রকারান্তরে স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দানের বিষয়েই লেখকের অভিযোগ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা ব্যতীত অপর যে কারণে ব্রাহ্মসমাজ লেখকের বিরাগভাজন হয়েছে, তা হ'ল সমাজের বিবেক প্রাধান্যকে গুরুত্বদান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে লেখক বালক বালিকার নীতিশিক্ষা তথা চরিত্র গঠনের ওপরই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাছাড়া বর-কন্যার মনোনয়নে কোন্ কোন্ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন সে বিষয়েও লেখক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। যেমন একই বাড়ীতে বসবাসকারী হলে পাত্রপাত্রীর মধ্যেকার বিবাহের সম্বন্ধ করা অনুচিত বলে লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া প্রতিপালক, অভিভাবক কিংবা শিক্ষকের সঙ্গে তার অধীন বালিকার বিবাহেও লেখক আপত্তি জানিয়েছেন। এমনকি একই বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীর মধ্যেও বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপন অনুচিত বলে লেখক জানিয়েছেন। লেখক সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার যাথার্থকে স্বীকার করে নিলেও বলতে হয় তিনি বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যাপারে রক্ষণশীল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আজকের দিনের পরি-প্রেক্ষিতে লেখকের অভিমত উপহসিত হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদটি অপেক্ষাকৃত বড়। এই পরিচ্ছেদে লেখক মূলতঃ বাল্য বিবাহ কেন সমর্থনযোগ্য নয়, তার বৈজ্ঞানিক কারণসমূহের উল্লেখ করেছেন। লেখক চিকিৎসা শাস্ত্রের অভিমত উল্লেখ করে দেখিয়েছেন বাল্য বিবাহ পরবর্তী বংশধর সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কতখানি অসার্থক—'অপরিপক্ক বীজ হইতে কখন সতেজ বৃক্ষ জন্মে না। অনুর্বর ক্ষেত্রে কি প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় ?' তাছাড়া অল্প বয়সে সংসারী হলে বালক-বালিকা উভয়েরই শিক্ষালাভে

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, অল্পবয়সী স্বামীকে সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুশ্চিন্তার শিকার হতে হয় বালিকা কন্যার দৈহিক পুষ্টিলাভ ঘটেনা। তাছাড়া বাল্যবিবাহ বন্ধ হলে পরিণামে বাল্যবিধবার সংখ্যা হ্রাস পাবে, এমন কি বিবাহে পণপ্রথাও নিবারিত হবে। কারণ লেখকের মতে, 'অধিক বয়স পর্যন্ত কন্যা ঘরে রাখিতে পারিলে, পাত্রই শেষে যৌবনের উত্তেজনায় বিবাহের জন্য লালায়িত হইবে।' তবে লেখক যে যুক্তিতে পাত্রের পাত্রী নির্বাচনের বিরোধিতা করেছেন কিংবা বিবাহকে ঈশ্বরের বিধান জ্ঞানে বিবাহ ভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। এসব ক্ষেত্রে লেখক যুক্তি অপেক্ষা ভাবাবেগের দ্বারাই অধিক চালিত হয়েছেন স্বীকার করতে হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লেখক যৌবন বিবাহে দুর্নীতি নিবারণের উপায় সম্পর্কে আপন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। লেখক যদিও যৌবন বিবাহের সমর্থক, তবুও স্বীকার করেছেন যে যৌবন বিবাহেও দুর্নীতি ও অধর্মের প্রশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। এক্ষেত্রে লেখক অধিকাংশ লোকের সম্মিলিত বিবেকশক্তিকে প্রতিরোধ করার আহবান জানিয়েছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। লেখকের মতে যাতে নিজের ক্ষতি বৃদ্ধি, তাতে নিজের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন—যেমন চিন্তায়, লেখায়, বক্তৃতায় আত্মসংযম। অপর পক্ষে যাতে অন্যের সম্বন্ধ, সেক্ষেত্রে সমাজের অধীন হয়ে চলা আবশ্যক। আর যেক্ষেত্রে সমষ্টিগত মতের সঙ্গে ব্যষ্টি মতের বিরোধ দেখা দেবে, সেক্ষেত্রে সমষ্টির মতকেই মান্য করা উচিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদে লেখক মনুসংহিতা এবং ভারতের বিভিন্ন পৌরাণিক নারী চরিত্রের উল্লেখে হিন্দুশাস্ত্র যে যৌবন বিবাহের অনুকূল তা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

নবম পরিচ্ছেদে লেখক সর্বাপেক্ষা আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। জাতিভেদ প্রথা ভাঙ্গতে, পণপ্রথার অবসানে, জাতীয় সংহতির কারণে এবং আমাদের দেশের লোকের দৈহিক ও মানসিক অবনতি দূরীকরণের জন্য লেখক শুধু অসবর্ণই নয়, আন্তঃরাজ্য বিবাহের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

দশম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে বিবাহের বয়স এবং বহুবিবাহ এবং অসম বিবাহের কুফল সম্পর্কে। লেখকের মতে পাত্রের বয়স হওয়া উচিত ২৩।২৪ বৎসর, অপর পক্ষে পাত্রীর কম পক্ষে ১৫।১৬ বৎসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান ২৫ বৎসরের অধিক হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়। স্ত্রী অপেক্ষা স্বামীর বয়স ৮।১০ বৎসর অধিক হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। বিবাহের সময় বর কন্যার বংশ পরম্পরায় কোন ব্যাধি আছে কিনা, তা দেখা প্রয়োজন। তাছাড়া পাত্র পাত্রীর বয়স, শিক্ষা, চরিত্র, প্রকৃতি দৈহিক গঠন, এমনকি পাত্র পাত্রীর মাতা-পিতার ধাতু প্রকৃতিও বিবেচনা করা দরকার। লেখক অল্পবয়সী বিধবার পুনর্বিবাহ সমর্থন করেছেন। সামাজিক

দুর্নীতি দমনের জন্য বহুবিবাহ ও অসম বিবাহ বিলোপের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে লেখক বলেছেন।

গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদ তথা উপসংহারে লেখক তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য, গ্রন্থ রচনার প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে যৌবন বিবাহ কাম্য কিন্তু তা কখনই যেন ধর্মশূন্য না হয়। ভারতীয় নারীত্বের মহান ঐতিহ্য রক্ষার গুরুত্ব বিষয়েও লেখকের সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে—'ভারত যেন মহা অমূল্য সতীত্ব রত্নে বঞ্চিত না হয়। ভারত রমণীর এই চিরপূজ্য, চিরোজ্জ্বল সতীত্ব রত্নের নিকট কোটী কোটী কোহিনূর তুচ্ছ কথা। সাবধান ভারত যেন এই রত্নহীন না হয়।'

সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত রচিত **'কোণের বউ'** বা **'বঙ্গ সমাজের একখানি সুন্দর চিত্র'** পুস্তিকাটির প্রকাশকাল ১২৯৬। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় এটি গ্রন্থকারে প্রকাশের পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল।

এদেশে নারীদের বিশেষতঃ গৃহবধূদের যে বেদনাময় জীবন যাপন করতে হয়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে পুস্তিকাটি রচিত। লেখক দুঃখ প্রকাশ করেছেন অকারণে বধূদের নানা ভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করার যে প্রচলিত মানসিকতা, তার কারণে—

'…কোণের বউ সকল দিকেই অপরাধী; দ্রুত চলিতে ফড়কা; মন্থরে কুঁড়ে; হাসিলে লজ্জাহীনা, না হাসিলে অহঙ্কারী; কথা কহিলে বাচাল, না কহিলে গর্বিতা; ক্ষুধায় খাইলে রাক্ষসী, না খাইলে তাচ্ছিল্যকারিণী ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া হয়।

গৃহে কোন ক্ষতি হইলে কোণের বউ তাহার দায়ী; কুকুরে হাঁড়ি খাইলে কোণের বউ তাহার দায়ী; বিড়ালে মৎস্য খাইলে কোণের বউ তাহার দায়ী; ইন্দুরে সন্দেশ খাইলে কোণের বউ তাহার দায়ী।'

লেখক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হয়ে একদিকে যেমন স্ত্রী জাতিকে উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দানের পক্ষে সওয়াল করেছেন. তেমনি বাল্য বিবাহের বিরোধিতা করেছেন এবং স্ত্রী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

'সোম প্রকাশে' বর্তমান রচনাটির প্রশংসা করে বলা হয়েছিল, 'বাবু সতীপ্রসাদ সেন সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় বঙ্গ সমাজের যে একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে।'

(সোমপ্রকাশ ; ১৫ই বৈশাখ ; ১২৮৭.)

পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দস্বামী রচিত **'নীতি-রত্নমালা'** প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮১৫ শকাব্দে (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)। বাংলা, বিহার ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশের বিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের চরিত্র গঠন ও ধর্মনীতিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য কৃষ্ণানন্দস্বামী যে 'সুনীতি—সঞ্চারিণী' সভা স্থাপন করেছিলেন, সেই

সভাগুলির সভ্যদের শিক্ষাদানের জন্য তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'সুনীতি' নামক পাক্ষিক পত্রিকায় যে সমস্ত উপদেশ, সঙ্কেত, কবিতা কিংবা প্রবন্ধ তিনি লিখতেন, সেগুলিরই সংকলন প্রকাশিত হয় 'নীতি—রত্নমালা' নামে।

'নীতি-রত্নমালা'য় সংকলিত রচনাগুলিকে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি—

ক. সদুপদেশের সংকলন। সংখ্যায় এগুলি ১৪২। সীমিত সংখ্যক বাক্যে লেখক সুকুমার মতি বালকদের পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, সমাজের শ্রমজীবী মানুষদের মিত্রজ্ঞান, পরনিন্দা থেকে বিরত থাকা, কোনো অবস্থাতেই অশ্লীল বাক্য ব্যবহার না করা. গৃহাগত অতিথির প্রতি আতিথ্য প্রদর্শন, নিজের স্বার্থের পরিপন্থী হলেও বৃহত্তর কল্যাণে আত্মনিয়োগ ইত্যাদি নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন।

খ. চারু চিন্তাবলী। এগুলিও নীতি উপদেশের সংকলন এবং সংখ্যায় ৩২। সদুপদেশের সঙ্গে চারু চিন্তাবলীর পার্থক্য মূলতঃ অবয়বগত এবং উপস্থাপন কৌশলে। 'চারু চিন্তাবলী'র অন্তর্গত উপদেশগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পরিসরে উপস্থাপিত। তদুপরি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপমার আশ্রয়ে বক্তব্য বিষয় প্রকাশিত। লেখক অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং বাস্তবজ্ঞানের চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন। সুখশান্তি ভোগের অধিকারী কে, এই প্রসঙ্গে লেখক শহরের জলের কলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন: 'যে গৃহের জন্য যত অধিক কর রাজাকে প্রদত্ত হয়, সে গৃহের অধিকারী তত অধিক জল পাইতে পারে, সেইরূপ ত্রিতাপ-নিবারিণী ভগবৎ কৃপা গঙ্গা হইতেই জীবের সুখ-শান্তি-ধারা প্রেমের আবেগে চলিয়া আসিতেছে, এ ধারা নিম্ন, ঊর্ধ্ব. বক্র, সরল, ছোট, বড়, স্ত্রী, পুরুষ আদি কিছুই বিচার করেনা, কেবল যাহার হৃদয় রাজরাজেশ্বরের অধিকতর সেবা করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই সুখ শান্তি অধিক ভোগ করিতে পারে।' (পৃঃ ৪৯)

সৎ গুরুর উপদেশ মানুষের অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে কেমন করে সুপথে চালিত করে সেই প্রসঙ্গে লেখক ঘড়ির তুলনা দিয়েছেন:

'যেমন ঘড়ীর কাঁটা কখন ধীর ও কখন দ্রুত গতিতে চলিতে থাকে, তুমি বাহিরে কাঁটা যত বারই ঘুরাইয়া ঠিক করিয়া দেও না কেন, পুনর্বার ধীর বা দ্রুত হইয়া যাইবে।: ঘড়ীর ভিতরের যন্ত্র ঠিক করিয়া দাও. কাঁটা আর বেচাল হইবে না। তদ্রূপ কেহ অপথে বা কুপথে চলিলে সে বাহিরে সাধুর বেশ ধরিলে কি হইবে? সদ্ গুরুর উপদেশে তাহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলেই সে সহজেই সুপথে চলিতে থাকিবে।' (পৃঃ ৫০)

গ. প্রশ্নোত্তর বা সম্বার্তা। নীতি কি. সুনীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বীর কে, বুদ্ধিমান কে, প্রকৃত বন্ধু কে, মৃত্যু কি, স্বর্গ ও নরকভোগ কি ইত্যাদি নানা বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে এই পর্যায়ে।

ঘ. প্রবন্ধ—

প্রতিধ্বনি, বিষম পরীক্ষা, নীতি ও ধর্ম, কয়েকটি সার কথা ইত্যাদি রচনায়

নীতি উপদেশই প্রবন্ধাকারে উপস্থাপিত হয়েছে।

ঙ. নীতি-রত্নমালা

এই পর্যায়ে ১৩টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। সংকলিত কবিতাগুলি সবই নীতিকথাতে পূর্ণ। তবে কোন কোন কবিতায় গীতিকবিতার সুরটি লভ্য যেমন—বন-বৃক্ষ। কবিতাগুলিতে কবির দেশাত্মবোধ মূর্ত হয়ে উঠেছে—

করিবে দেশের হিত নৈতিক কৌশলে।
ভারতের জয়গাথা গাহিবে সকলে॥ (পৃঃ ৭৭)

কিংবা,

ভারতের ভাব রসে মগ্ন হয়ে যাইব।
ভারতের জয়ধ্বনি উচ্চস্বরে গাহিব॥
ভারতে লয়েছি জন্ম ভারতেরি থাকিব।
ভারতীয় ভাবে ধর্ম কর্ম সব শিখিব॥ (পৃঃ ৯৬)

'চিত্র-পয়ার' পর্যায়ে ছ'টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাগুলিতে কবির ছন্দোনৈপুণ্য প্রশংসনীয় ভাবে প্রকাশিত।

চ. গল্প

একটি নীতি কথা, পরম ভক্ত ধনা, ইন্দুরেখা প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্য দিয়ে লেখক নীতিশিক্ষা দিয়েছেন। 'নীতি রত্নমালা' যে জনপ্রিয় হয়েছিল তা এর একাধিক সংস্করণই (৪র্থ সংস্করণ, ১৩৩০) প্রমাণ।

পূর্ণানন্দ স্বরূপ স্বামী (পূর্বাশ্রমের নাম পূর্ণানন্দ সেন ঃ ১২৭১—১৩৩৮) উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত এবং দীর্ঘকাল শিক্ষকতা ব্রতে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি 'বিচার প্রকাশ', 'বলিদান ও আমিষাহার', 'সাধন-শিক্ষা-সোপান', 'নীলাচল লীলা' প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা। এঁর বহু ইংরেজি প্রবন্ধ সেকালের Modern Review, Hindu Spiritual Magazine, Indian Mirror, Indian Nation, Bengalee, Amrita Bazar Patrika প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে। আর বেশ কিছু বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'ধর্মপ্রচারক' নামক মাসিক পত্রিকায়।

'ধর্মপ্রচারকে' পূর্ণানন্দ স্বরূপের প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন **'চিন্তামণি-মালা'** (১৩৪২)। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই গ্রন্থে সংকলিত 'শিবোক্ত আশ্রম ধর্ম' প্রবন্ধটি জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ব্যাখ্যাত মহানির্বাণতন্ত্র থেকে সংকলিত। সংকলিত অন্যান্য প্রবন্ধগুলি ধর্ম-প্রচারকের যথাক্রমে ১৮১৫ শকাব্দের মাঘ-ফাল্গুন, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৮১৭ শকাব্দের ফাল্গুন-চৈত্র এবং ১৮১৯ শকাব্দের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

'চিন্তামণি-মালা'র প্রথম প্রবন্ধ 'ভারতের কল্যাণ কামনা'। এই প্রবন্ধে লেখক ভারতবর্ষের দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে দুর্দশার কারণানুসন্ধান ও মুক্তির পথ নির্দেশে প্রয়াসী হয়েছেন। ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের উল্লেখে লেখক ভারতবর্ষীয়দের ধর্মীয় প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছেন এবং ভারতকে দুর্দশামুক্ত

হতে গেলে ধর্মানুচরণের দ্বারাই তা সম্ভব বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। লেখকের ভাষায়—'ভারতের প্রকৃতি ধর্মের অনুগত, ধর্মই ভারতের নিজস্ব, অন্য সমস্ত কর্মই ভারতে ধর্মের জন্য, তাই ভারতবর্ষই ধর্মের কর্মভূমি। ধর্ম ছাড়িয়া দিলে ভারত মৃত, ধর্মের প্রতিকূলে যে কোন উন্নতি সাধনই হউক না কেন, উহা ভারতের পক্ষে প্রাণহীন দেহের সেবামাত্র, তাহাতে ভারতবর্ষের কল্যাণ কখনই হইবে না।' (পৃঃ ৬)

লেখক ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধনের জন্য নিঃস্বার্থপর সেবকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন—'আপনার স্বার্থ ভারতের কল্যাণের জন্য আহুতি দিতে হইবে, আপনাকে সামান্য মনে করিয়া ভারতের কল্যাণকর কার্যকেই প্রধান করিতে হইবে।' (পৃঃ ৯)

আর নিঃস্বার্থপরতার শিক্ষা লাভ একমাত্র ধর্মের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব বলে লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশিত—'কেবল ধর্মই জীবকে সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিবার শিক্ষা দিতে সমর্থ। ত্যাগী ভিন্ন স্বদেশের উপকার কেহ কখনও করিতে পারে না।' (পৃঃ ৯)

লেখকের ভারতপ্রেম এবং ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কিত সুগভীর ধারণা প্রবন্ধটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বিষয় অনুযায়ী প্রবন্ধটির গাম্ভীর্য মণ্ডিত ভাষাও প্রবন্ধটির উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হয়েছে।

'চিন্তামণি-মালা'র দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'ব্রহ্মচর্যের অভাবে অপকার'। নামকরণেই প্রবন্ধটির বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। লেখক এই প্রবন্ধে সমাজের অনাচার, অত্যাচার অসৎকর্মের প্রসার ইত্যাদি সব কিছুর জন্যই দায়ী করেছেন ব্রহ্মচর্য শিক্ষার অভাবকে। লেখক এই প্রবন্ধে পরস্পরবিরোধী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। একদিকে যেমন তাঁর সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় মেলে তেমনি অপরদিকে আবার সংস্কারাচ্ছন্ন মনেরও পরিচয় দিয়েছেন লক্ষিত হয়। লেখক যখন মন্তব্য করেন, 'সুরাপায়ী স্বামীর ইন্দ্রিয় সেবার সাহায্য করিলেই কি পত্নীর ধর্ম রক্ষা হইবে?' তখন তাঁর বক্তব্যে আমরা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন লক্ষ্য করি। কিন্তু যখন তিনি বলেন, 'দশটি বিধবার বিধবা দিতে বিড়ম্বিত হওয়া অপেক্ষা যদি কেহ আপনার একটি ছেলেকেও বিহিত ব্রহ্মচর্যে রাখিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইতে পারেন তবে হিন্দু মাত্রের নিশ্চয়ই তিনি শ্রদ্ধেয় ও সমাজে কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন' (পৃঃ ১৪); কিংবা, 'ইংরাজী ধরণের শিক্ষায় তো চরিত্রের নীচতা হওয়ার সম্ভবই' (পৃঃ ১৫) তখন বোঝা যায় লেখক সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারের মোহে একদেশদর্শী হয়ে যুক্তির পথ পরিহার করেছেন।

গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ প্রবন্ধটি হল 'সৎ শিক্ষার সর্বনাশ।' এই প্রবন্ধে লেখক তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু মূল্যবান বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘ প্রায় একশত বৎসর পূর্বে লেখক আমাদের দেশের শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা বর্তমান কালেও সমান ভাবে প্রযোজ্য। অথচ এই সময়ের মধ্যে শাসন

ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে শিক্ষার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন হওয়া উচিত ছিল। লেখক যথার্থই বলেছেন, 'গৃহের একটি শিক্ষা শিক্ষকের শত উপদেশের সমান হইলেও আজকাল বাটীতে বালকগণ আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অতি অল্পই উদাহরণ বা উপদেশ পাইয়া থাকে।' (পৃঃ ৫৩) কিংবা যখন তিনি পুস্তকের উপদেশ শিক্ষকের শিক্ষাদান ও বাড়ির শিক্ষার মধ্যে ঐক্য স্থাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তখন তার যাথার্থ স্বীকার না করে উপায় থাকে না।

লেখকের 'সৎ পুস্তক পাঠ সুশিক্ষার একটি সদুপায় বটে, কিন্তু জীবন্ত উদাহরণ ব্যতীত পঠিত উপদেশ অতি অল্পই উপকার দিয়া থাকে' (পৃঃ ৫৬) মন্তব্যটিও সমানভাবে সত্য। কিন্তু লেখক যে ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে সওয়াল করেছেন, কিংবা নিরীশ্বর শিক্ষাপ্রণালীর কারণেই শিক্ষিত সমাজের কলুষিত হবার বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, অথবা আচার, আহার, আলাপ আলোচনা সব কিছুকেই হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত করার বিষয়ে সোচ্চার হয়েছেন, সে সম্পর্কে মত পার্থক্য স্বাভাবিক কারণেই দেখা দেবে। লেখকের মহৎ উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে পথের নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তা অপ্রতর্ক্য নয়। এক্ষেত্রে তাঁর ধর্মীয় সংকীর্ণতা যুক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে। তা না হলে লেখক বলতেন না, 'তিথি বিশেষে ও পর্বদিনে অবৈধ আহার করিতে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেন এবং শাস্ত্র নির্দিষ্ট গৃহস্থের নিত্যকর্ম পুরাণাদি পাঠের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখেন, তবে বাল্যকাল হইতেই বালকগণের স্বভাব সংশোধিত হইয়া যাইতে পারে।' (পৃঃ ৬৪) লেখক স্ত্রীলোকদের রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থের পরিবর্তে নাটক উপন্যাস পাঠেরও বিরোধিতা করেছেন।

লেখক বাক্য ব্যবহারে কোন কোন ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ আড়ষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন 'এখনকার "সুশিক্ষিত" ব্যক্তি পিতাকে বা আত্মীয়বর্গকে অসম্মান করিলে অভিভাবকগণকে নিজ নিজ পাপে প্রায়শ্চিত্ত বোধে সন্তুষ্ট থাকাই উচিত' (পৃঃ ৫২)।

গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধটি হল 'আদর্শ ও অনুকরণ'। লেখক এই প্রবন্ধে একই সঙ্গে তাঁর মননশীলতা এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। লেখক যথার্থই বলেছেন সর্বজন সম্মত এবং সর্বদেশ স্বীকৃত আদর্শ পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। পূর্ণ আদর্শ ইন্দ্রিয়াতীত আবার আদর্শ ব্যতীত কোনো শিক্ষাই সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। জগতে এমন কোনো পদার্থ নেই যা কোন না কোন একটি বিষয়ের আদর্শ হতে পারে না। ক্ষুদ্র বৃহৎ নির্বিশেষে সকলেরই কম বেশি আদর্শ হবার অধিকার আছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে আদর্শ হওয়া অপেক্ষা তার অনুকরণ কঠিনতর।

এখন প্রশ্ন সব আদর্শই কি অনুকরণীয় ? লেখক এই প্রশ্নের অবতারণা করেই তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি, তার যথাযথ উত্তরও দিয়েছেন। প্রথমতঃ অসংখ্য অনুকরণীয় বিষয় থাকলেও সবগুলিই আমাদের উপকারে আসে না।

তাই অনুকরণের ক্ষেত্র নির্বাচনের বিশেষ প্রয়োজন। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে নিজের অবস্থার অনুরূপ অনুকরণ করা বিধেয়, নতুবা অনুকরণে কোনও উপকার হবার সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া অনুকরণের সময় সতর্ক থাকা দরকার যেন গুণের সঙ্গে অনুকরণীয় ব্যক্তি বা বস্তুর দোষও অনুসরণ না করি।

লেখক দেশীয় ভাব ও রীতি নীতি এবং শাস্ত্রাদি শিক্ষা ও পর্যালোচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেও কার্য তৎপরতা, আত্মনির্ভরতা, সময়ের সদ্ব্যবহার, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রিয়তা রূপ গুণগুলির অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে বিদেশীয়দের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এদিক দিয়ে যেমন লেখকের উদার দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত, তেমনি স্ত্রী স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করে সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয়ও দিয়েছেন। লেখক পরামর্শ দিয়েছেন, 'বিলাতের অনুকরণে যাহাতে আমাদের দেশীয় ভাবের পুষ্টি হয় তাহাই প্রকৃত অনুকরণ। দরিদ্র ভারতের বিলাতের বিলাসিতা অনুকরণ করিলে চলিবে না।' (পৃঃ ৭৮)

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা গদ্যে প্রথম চরিত সাহিত্য রচিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে কেরীর নির্দেশে রাম রাম বসু রচনা করেন 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১)। 'ইতিবৃত্তমূলক উপাদান ও প্রচলিত জনশ্রুতি'র সমন্বয়ে রচিত এই গ্রন্থের অনুসরণে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অপর পণ্ডিত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচনা করেন 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫)। তবে গুণগত উৎকর্ষে রাম রামের গ্রন্থটি যত না জীবনচরিতের পর্যায়ভুক্ত হবার দাবী রাখে, তদপেক্ষা এর 'ইতিহাস' হিসাবে স্বীকৃতি লাভের দাবীই অধিকতর। সে তুলনায় রাজীবলোচনের গ্রন্থটি জীবনচরিত হিসাবে অনেক বেশি সার্থক। যাইহোক, এত গেল গদ্যে জীবন চরিত রচনার সূত্রপাতের কথা। মনে রাখতে হবে গদ্য রচিত হবার অনেক পূর্ব থেকেই পদ্য চরিত কাব্য রচিত হতে শুরু করেছিল। চরিত সাহিত্যের শুভ সূচনা বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' দিয়ে হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় অসংখ্য জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থগুলির আলোচনা অনেকেই করেছেন। বাংলা চরিতসাহিত্য শুধু সমৃদ্ধই নয়, অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এক বিভাগ। তবু এখনও অনেক জীবনী গ্রন্থ অনালোচিত রয়ে গেছে; শুধুমাত্র সাহিত্য গুণ কিংবা রচয়িতার রচনারীতির ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যেই এগুলির আলোচনা প্রয়োজনীয় তা নয়, জীবনী গ্রন্থগুলির মাধ্যমে সমসাময়িক যুগের, সমাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি লাভ সম্ভব। কয়েকটি জীবনীগ্রন্থের আলোচনা এই অধ্যায়ে সংযোজিত হল। লক্ষ্য করা যাবে—এর কোনটি রচিত পরাধীন দেশবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে, কোনটি বা রচিত হয়েছে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি রচয়িতার শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে। আবার কোন জীবনী রচিত হয়েছে হয়ত বা বিবেকের তাড়নায়, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। উপন্যাস রহস্য রচনা প্রকাশে দেশের সাধারণ পাঠক বিশেষত কুলবধূদের অনিষ্ট হবার আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে কোনো লেখককে ব্রতী হতে দেখা গেছে নীতিশিক্ষা দানের জন্য ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে জীবনী গ্রন্থ রচনায়।

বিপিনবিহারী মিত্র কর্তৃক সংকলিত কলকাতা শোভাবাজার নিবাসী **'মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জীবন-চরিত'**খানির প্রকাশকাল ১২৮৬ (১৮৭৯)।

রাজা রামমোহন রায়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়বাহাদুর, স্যার রাধাকান্ত দেব, জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন, ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল

শীল, রামদুলাল দে প্রমুখাদির জীবনচরিত রচিত হলেও মহারাজা নবকৃষ্ণ দেববাহাদুরের রীতিমতো কোন জীবনচরিত লিখিত না হওয়ায় লেখক সেই অভাব দূরীকরণে ব্রতী হয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রথম জীবনচরিত হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থখানির এক অতিরিক্ত গুরুত্ব বর্তমান। লেখক বেশ কয়েকটি ইংরেজী এবং বাংলা পত্রিকা ও পুস্তক অবলম্বনে বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করেন।

সীমিত পরিসরে হলেও বর্তমান গ্রন্থে মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বংশ পরিচয়, তাঁর বুদ্ধিমত্তা, চাতুর্য, সাহসিকতা, রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ এবং দানশীলতা সম্পর্কে লেখক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

মহারাজা নবকৃষ্ণের সমসাময়িক যুগটি নানা কারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, আর তেমনি গুরুত্বপূর্ণ নবকৃষ্ণের সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ভূমিকা গ্রহণ। বর্তমান বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে লেখক সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে নবকৃষ্ণের ভূমিকাটিকে জীবন্ত করে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। প্রসঙ্গত নবকৃষ্ণের সমসাময়িক বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব যেমন নীলমণি দে, রামচাঁদ রায় কিংবা জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন, রাধাকান্ত তর্কবাগীশ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ পন্ডিতবর্গের প্রসঙ্গেও কিছু কিছু তথ্যাদি উল্লিখিত হয়েছে।

লেখক সিরাজদ্দৌলাকে অত্যাচারী এবং কলুষিত চরিত্রের বলে উল্লেখ করেছেন এবং ইংরেজ শাসনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন 'যে সুশাসনাধীনে আমাদের ধন ও প্রাণ এক্ষণে তস্কর এবং দস্যুর হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, যে সুশাসনাধীনে আমরা নেতৃজাতির সহিত অনেক বিষয়ে সমকক্ষতা লাভ করিয়াছি, যে সুশাসনাধীনে আমরা নানা সুখের অধিকারী হইয়া নিরুদ্বেগে কালাতিপাত করত পরাধীনতার কষ্ট একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছি এবং কর ভারাক্রান্ত না হইলে যে সুশাসনকে আমরা "রামরাজ্য" মনে করিতাম, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট তারিখে মহাসভার অনুগ্রহে সেই সুশাসনের সূত্রপাত হয়।' (পৃঃ ৩৭)

আলোচ্য গ্রন্থে তৎকালীন কলকাতা মহানগরী সম্পর্কে নানা কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যাদির সন্ধান মেলে। লেখক নবকৃষ্ণের নানাবিধ গুণাবলীর উল্লেখে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও তিনি যে অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করেছিলেন এবং ইন্দ্রিয় দোষে দুষ্ট ছিলেন, নবকৃষ্ণের চরিত্রের এই মসীলিপ্ত দিকগুলির উল্লেখে লেখক তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচয় দিতে প্রয়াস পেয়েছেন লক্ষিত হয়।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে এদেশীয় লেখকরা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তা সচেতন পাঠকমাত্রেরই জানা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় 'আর্যদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'চিন্তাতরঙ্গিনী' (১২৯৬),

'কীর্তিমন্দির' (১২৯৬) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণের নাম (১৮৪৫-১৯০৪)। যোগেন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি জীবনবৃত্ত রচনা করেছিলেন। যাঁদের জীবনবৃত্ত রচনা করেছিলেন, তাঁরা হলেন জন ষ্টুয়ার্ট মিল, গ্যারিবলডী, ওয়ালেস প্রমুখ পাশ্চাত্য দেশের মনীষীবৃন্দ। যোগেন্দ্রনাথের বিশেষ করে যে গ্রন্থটির প্রসঙ্গ আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই, সেটি হল **'জোসেফ্ ম্যাটসিনি ও নব্য ইতালী'**। প্রকাশকাল ১২৮৬।

গ্রন্থের মুখবন্ধেই লেখক আলোচ্য গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন ঃ

'বহুদিনের অধীনতায় ভারতবাসী মাত্রেরই অন্তর হইতে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি প্রেমের ভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। জন্মভূমির মঙ্গলোদ্দেশে ধন প্রাণ বিসর্জন করা স্বজাতির উন্নতি সাধনে জীবন উৎসর্গ করা ভারতবাসীর নিকট অবিশ্বাস্য অলীক ঘটনা।

'... যে যে প্রাতঃস্মরণীয় চরিত মহাত্মাগণের নিরন্তর যত্নে ও অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের মোহিনী শক্তিতে দাসত্ব প্রপীড়িত জাতি সকল আত্ম ভুলিয়া জন্মভূমির চরণে আত্মবিসর্জন করিতে শিখিয়াছে, তাঁহাদিগের জীবিতমালা জাতীয় ভাষায় গ্রথিত করা আমার জীবনের একটি প্রধান ব্রত। সেই সকল জীবনের বলবতী উদ্দীপনায় যদি একজন ভারতবাসীও জন্মভূমির চরণে জীবন উৎসর্গ করিতে শিখেন, যদি একজনও আত্মস্বার্থ জাতীয় স্বার্থে বলিদান করিতে শিখেন, যদি সেই সকল জীবনের মোহিনীশক্তি বলে দুইজন ভারত-বাসীও ভারতের মঙ্গলোদ্দেশে সমবেত হইতে শিখেন তাহা হইলেও আমার পরিশ্রম সফল মনে করিব।' আলোচ্য গ্রন্থটি ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত। গ্রন্থে পরাধীন ইটালীকে স্বাধীন করার মহান ব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ ম্যাটসিনির গৌরবজনক ভূমিকার কথাই সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। ম্যাটসিনি কর্তৃক নব্য ইটালী নামক সমাজ স্থাপন, নব্য ইটালী সমাজের গঠন প্রণালী, পোপ চতুর্দশ গ্রেগরীর পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যাজকমণ্ডলীর প্রতি ম্যাটসিনির উক্তি ইত্যাদি স্থান পেয়েছে।

পরাধীন ভারতবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে লেখক যে বিশেষ করে ম্যাটসিনির জীবনবৃত্ত নির্বাচন করেছিলেন তার পেছনে যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান ছিল। পরাধীন ইটালীর সঙ্গে পরাধীন ভারতবর্ষের নানা দিক দিয়েই গভীর সাদৃশ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন লেখক। ভারতবর্ষ ছিল ইংরেজদের অধীনে, ইটালীও ছিল অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অধীন। পরাধীন ভারতবাসীর অধিকাংশই দীর্ঘদিন ব্যাপী বিদেশী শাসনের অধীন হয়ে থাকাকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখেনি। বরং পরাধীনতার গ্লানিময় জীবনযাপনে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, অপর পক্ষে অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অধীন ইটালীয়গণও একই রূপ মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। ইটালীতে মাঝে মাঝে কোন স্বদেশ প্রেমিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে মাথা তুলতে সচেষ্ট হয়েও তেমন সার্থকতা লাভ করতেন না, যেহেতু সাধারণ মানুষ এইসব প্রয়াসের ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট

থাকতেন। পরিণামে স্বদেশ প্রেমিকদের নির্বাসনদণ্ড লাভ ঘটত, কখনও আবার শিরশ্ছেদ হ'ত। পরাধীন ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল এমনি বিচ্ছিন্ন ব্যর্থ প্রয়াস ঘটতে দেখা গেছে। লেখক এই কারণে ম্যাটসিনি এবং নব্য ইটালীর পরিচয় দান করে প্রকারান্তরে পরাধীন ভারতবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করতে ম্যাটসিনিপ্রদর্শিত পথ অনুসরণের ইঙ্গিত দান করেছেন। গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে লেখক বলেছেন—'ভারতবাসিন! পূর্বপুরুষ গৌরব-দৃপ্ত! স্বদেশানুরাগাভিমানিন! যদি দেশের প্রকৃত হিত ইচ্ছা কর, যদি দেশের বিনষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে চাও, তবে ম্যাটসিনি ও তৎসহচর বৃন্দের নিকট বিপদে ধৈর্য কার্যে অধ্যবসায়, ভবিষ্যতে বিশ্বাস ও দারিদ্র্যে ত্যাগ স্বীকার শিক্ষা কর।'

লেখক মিলের জীবনবৃত্তান্ত যে প্রণালীতে রচনা করেছেন আলোচ্য গ্রন্থেও সেই প্রণালীকেই অনুসরণ করেছেন। ইউরোপীয় রাজনৈতিক ভাব বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা খুব কঠিন কাজ হলেও লেখক এই কার্যে যথেষ্ট নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রায়ই এজন্য লেখককে সংস্কৃত ধাতুমূলের সাহায্যে নতুন শব্দ তৈরী করে নিতে হয়েছে।

'অপূর্ব ভারত উদ্ধার' দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত, প্রকাশকাল ১২৮৬। পুস্তিকাটির নামকরণে মনে হতে পারে এটি বুঝিবা কোন কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু আসলে এটি বাসুদেব বলবন্তের জীবনী। 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় জীবনীটি প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, '......রবুরয়, রবিনহুড, বিশ্বনাথ ও বিশ্বম্ভরদিগের ন্যায় দস্যুবীরও প্রতিদিন সমাজে সমাগত হয়েন না। রণজিৎ সিংহের ন্যায় আদি দস্যু, অন্ত নৃপতিও সংসারে বিরল। যাহাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করিলাম, তাহারা সংসারে অতি বিরল। কিন্তু পুনার বাসুদেব বলবন্তের ন্যায় দেশহিতৈষী দস্যুসমাজে এই নূতন দৃষ্ট হইল। এরূপ নূতন পদার্থের সকল বিবরণই নূতন। পাছে এই নূতন পদার্থের উপলব্ধি পাঠকগণের না হয় এই ভয়ে আমরা চন্দ্রিকায় বাসুদেবের আত্মজীবন প্রথম প্রকাশ করি। দৈনিক পত্রিকার বর্ণিত বিষয় অতি চিত্তহর হইলেও তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। বেনের দোকানে তাহার সদ্গতি হইয়া থাকে। এইজন্য আমরা বাসুদেবের আত্মজীবনী পুস্তিকাকারে পুনঃ প্রকাশ করিলাম।'

প্রকাশকের জবানী থেকে জানা যায় বাসুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কিংবা তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য নয়, পরন্তু যাতে দেশের মানুষ বলবন্তের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, ইংরেজ বিরোধিতায় লিপ্ত না হয় বরং সর্বতোভাবে ইংরেজদের সহায়তা করে, সেই উদ্দেশ্যেই পুস্তিকাটির প্রকাশ।

১৮৪৫ সালে বম্বে প্রেসিডেন্সীর টান্না জেলার অন্তর্গত পালোয়েল তালুকে শ্রীধাম মৌজায় ফাদ্‌কে বংশে বাসুদেবের জন্ম। তাঁর পিতা বলবন্ত রাও। মাতা ভিকুবাই। তখনকার দিনে মাসিক ষাট টাকা বেতনের কার্য ত্যাগ করে ডাকাতি-রাহাজানির মাধ্যমে অর্থসংগ্রহে বাসুদেব ব্রতী হয়েছিলেন,

উদ্দেশ্য এদেশ থেকে ইংরাজ বিতাড়ন। শেষ পর্যন্ত তিনি ধরা পড়েন এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

বাসুদেব বলেছেন, 'শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে সাগরে বিন্দুমাত্র —কিন্তু সেই শিশুও মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। শিশুর যে ক্ষমতা কতদূর তাহা পঞ্চম বর্ষে জানা যায় না। সেইরূপ সামান্য ক্ষুদ্র বিদ্রোহ হইতে স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইবে কেন?'

কিন্তু প্রকাশক এহেন বাসুদেবকে দেশপ্রেমিকের মর্যাদা দিতে সম্মত হননি। তাঁকে সমাজের শত্রু বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা, 'কোন দেশের রাষ্ট্র বিপ্লব এক জনের চেষ্টায় হয় না। এরূপ শাসন বিপ্লব কালের গতিতে হইয়া থাকে। বাসুদেবের ন্যায় বাতুল ভিন্ন কোন সজ্ঞান ভারতবাসীই যে ইংরাজ শাসন উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করা দূরে থাকুক, ইচ্ছাও করিবে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর।······ইংরাজ শাসন প্রণালীর যে গুণ অনেক ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এই জন্যই আমরা ইংরাজ শাসনের পক্ষপাতী। এ শাসন প্রণালীর সহসা যে পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করে, সুতরাং সে আমাদের বিদ্বেষ পাত্র।'

বাসুদেব বিরোধিতার কারণ এখানে সুস্পষ্ট। তবু প্রকাশক ধন্যবাদার্হ হয়েছেন এই কারণে যে বাসুদেবের মতাদর্শের বিরোধী হয়েও তার আত্ম-জীবনী প্রকাশ করেছেন। আত্মজীবনীটি রোজনামচা ধরণের।

জগদ্বন্ধু মৈত্র প্রণীত '**মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী**'র প্রকাশকাল ১২৯৩। আলোচ্য গ্রন্থটিকে পুস্তিকা বলা চলে। মাত্র চারটি পরিচ্ছেদে পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ এবং পৃষ্ঠার সংখ্যা ৭২। তথাপি পুস্তিকাটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিছক এক শতাব্দী কাল পূর্বের রচিত বলেই নয়, সেইসঙ্গে স্বল্প পরিসরে কেশব চন্দ্র সেনের জীবনের মুখ্য ঘটনা ও কার্যাবলীর বিবরণ দানে পুস্তিকাটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য জীবনীতে পর্যবসিত হয়েছে। লেখকের সবথেকে বড় গুণ হল তিনি স্বয়ং ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী হয়েও অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভাবে কেশব চন্দ্রের জীবনী ও তাঁর অবদানকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। এমনকি কেশব চন্দ্রের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল হয়েও তাঁর চরিত্র ও আচরণের বৈপরীত্য সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করতে লেখকের বাধেনি।

গ্রন্থটির আর একটি বড় গুণ এর ভাষা। বস্তুত এক শতাব্দীকাল পূর্বে ভাষাকে এমন সাবলীলভাবে ব্যবহার করার যে নৈপুণ্য লেখক দেখিয়েছেন, সেজন্য তিনি প্রশংসা দাবী করতে পারেন। কিঞ্চিৎ নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত হ'ল—

'কেশববাবুকে সংসারী করিবার জন্য তাঁহার আত্মীয়গণ এই সময়ে বিশেষ যত্নবান হন। এই যত্নের ফল তাঁহার বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চাকরী গ্রহণ। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দের ১লা নবেম্বর তিনি ত্রিশ টাকা বেতনে উক্ত ব্যাঙ্কে

নিযুক্ত হন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। উৎকৃষ্ট হস্তাক্ষরের জন্য ডিপুটী সেক্রেটারী কুক্ সাহেব তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ত্রিশ হইতে তাঁহার বেতন পঞ্চাশ করিয়া দেন।' (পৃঃ ১৮)

বিপিন মোহন সেন রচিত '**চাঁদরাণী**'র প্রকাশকাল ১৩০২ বঙ্গাব্দ (ইং ১৮৯৬)। গ্রন্থটি যে একসময় বিশেষ জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েছিল তার প্রমাণ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ। অবশ্য প্রথম প্রকাশের দীর্ঘ ষোল বৎসর পরে গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশিত হয়। আপাতভাবে গ্রন্থটিকে উপন্যাস বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি জীবনী। লেখক গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন '······ কতকগুলি ঘটনা একস্থানে বিবৃত করিয়া 'চাঁদরাণী'র জীবনী লিখিত হইয়াছে। ইহা কল্পনা প্রসূত উপন্যাস নহে। কিন্তু লক্ষিত হয় যে এই দীর্ঘ গ্রন্থের সীমিত পরিসরেই চাঁদরাণী স্থান পেয়েছেন। বরং সেদিক দিয়ে চাঁদরাণীর স্বামী রাজা রামচন্দ্রের নামে গ্রন্থটির নামকরণ যুক্তিসঙ্গত হত। কারণ গ্রন্থের সিংহভাগ রাজা রামচন্দ্রের কীর্তি কাহিনীতেই পূর্ণ।

লেখক গ্রন্থটি রচনার কারণ বিবৃত করে বলেছেনঃ 'এইক্ষণে নানা নবন্যাস রচিত, ও বিলাতি রহস্যাদি বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া কুলবধূর পাঠ্যপুস্তক মধ্যে পরিগণিত হওয়ায়, দেশের যে কতদূর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা সহৃদয় পাঠকগণ অনায়াসে অনুভব করিতে পারেন। অতএব তাদৃশ নবন্যাস ও রহস্য পাঠের পরিবর্তে চাঁদরাণী ও তন্নায়কের জীবনী পাঠে পাঠক পাঠিকাগণ বিবিধ বিধানে সমাজের উপকার সাধন করিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল।'

লেখকের প্রদত্ত এই বিজ্ঞাপন থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবগত হওয়া যায়। উপন্যাসের পরিবর্তে লেখক 'নবন্যাস' অভিধাটি ব্যবহার করেছেন। পূর্বে যে উপন্যাস অর্থে শব্দটির চল ছিল তা থেকেই বোঝা যায়। কুলবধূদের জন্যই মূলতঃ নবন্যাস কিংবা বিলাতি রহস্য গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রকাশিত হত। প্রাচীনপন্থী লেখক এই ব্যাপারটিকে তেমন সুনজরে দেখেননি। সমাজের পক্ষে তিনি ব্যাপারটিকে ক্ষতিকারক বলেই মনে করেছেন। লেখক যার সাহায্যে পাঠক সমাজ কল্যাণকর কর্মে উদ্বুদ্ধ হতে পারে, তেমন রচনাকেই আদর্শ সাহিত্য বলে গণ্য করেছেন অর্থাৎ মূলতঃ নীতিশিক্ষা দানের কারণেই সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বলে লেখকের বিশ্বাস প্রকাশিত। আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠে দেখা যায় যে লেখক ইচ্ছা করলে একটি আকর্ষণীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করতে পারতেন, সেই সামর্থ্য তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি সে পথের পথিক হননি সমাজ শিক্ষার দায়িত্ব অধিকতর সার্থকতার সঙ্গে পালনের উদ্দেশ্যে।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে ইতিহাসের এক যুগ সন্ধিক্ষণকে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। মুসলমান রাজ্যের শেষ ভাগ এবং ইংরেজ অধিকারের সূত্রপাতের সময়টুকু গ্রন্থটিতে বিধৃত।

গ্রন্থটি সুবৃহৎ। মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ আঠারটি অধ্যায় সম্বলিত। দ্বিতীয় ভাগ তেরটি অধ্যায় সম্বলিত এবং তৃতীয় ভাগ ছয়টি অধ্যায় সম্বলিত। তাছাড়া গ্রন্থশেষে পরিশিষ্ট এবং উপসংহারও সংযোজিত হয়েছে। লেখক প্রতিটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করে তারপর পৃথক শিরোনামা দিয়ে তবেই রচনা শুরু করেছেন। সংকলিত সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমেও নীতিশিক্ষা দানের প্রয়াসই প্রকটিত হয়েছে।

রাজা রামচন্দ্র এবং তাঁর পুত্রপৌত্রাদির জীবনেতিহাস রচনায় লেখকের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়। বিশেষতঃ পিতার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে রামচন্দ্রের প্রয়াস তাঁর চরিত্রের দীপ্তিকে বিশেষভাবে বর্দ্ধিত করেছে। অনুরূপ ভাবে রামচন্দ্র পত্নী চাঁদরাণীর ডাকাত আক্রমণ প্রতিরোধে বীরাঙ্গনা রূপে আত্মপ্রকাশ পাঠকচিত্তে বিশেষভাবে মুদ্রিত হয়ে থাকবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে লেখকের একটি মস্ত ত্রুটি হ'ল অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা। তথ্য-প্রিয়তাই লেখককে এক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ঘটনার বিবরণ প্রকাশে প্ররোচিত করে থাকবে।

আলোচ্য গ্রন্থটি ঐতিহাসিক তথ্যাদির আকরে পরিণত হয়েছে। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ, দিল্লীর বাদশাহ, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা, মহারাজ নন্দকুমার, রাজা নবকৃষ্ণ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সম্পর্কে লেখক নানাবিধ তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন। তৎকালীন সমাজজীবনেরও নানা কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ডাকাতদের উপদ্রব, কবিরাজদের চিকিৎসা নৈপুণ্য, অভিজাত ব্যক্তিদের তীর্থযাত্রা, তান্ত্রিকের ক্রিয়াকলাপ, দুর্গাপূজার সমারোহ, বিজয়ার আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান, ধনী ব্যক্তিদের পোষ্য লাঠিয়াল বরকন্দাজদের ভূমিকা, সতীদাহের বিবরণ ইত্যাদি।

বেশ কিছু মন্দির ও বিগ্রহাদির প্রতিষ্ঠা কাহিনীও গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। বিজাতীয় বিষয়ে লেখকের ক্ষোভ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় 'চাঁদবাণী' গ্রন্থটির প্রথম ভাগ মাত্র শ্রবণ করে মন্তব্য করেছিলেন ঃ

'ইহাতে রাজনীতি, ধর্মনীতি ও সমাজনীতি অতি সুন্দররূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নবন্যাসের মনোহারিতা 'চাঁদরাণী'র প্রায় প্রত্যেক অংশেই বিদ্যমান রহিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চাঁদরাণীর বিবরণ ইতিহাসমূলক হইলেও ইহার প্রায় প্রত্যেক অধ্যায় অনির্বচনীয় রস-মাধুরীতে পরিপূর্ণ। ভক্তি, করুণা ও বীররসে পুস্তকের নানা অংশ আপ্লুত রহিয়াছে।' সুদীর্ঘ প্রায় একশত বৎসর পূর্বে রচিত কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে এই মন্তব্য নিশ্চয়ই গ্রন্থের লেখকের শক্তিমত্তার পরিচায়ক।

'সমাজ-বিভ্রাট' একটি আত্মজীবনী। এটির প্রকাশকাল ১৯০৫। এটির রচয়িত্রীর নাম গ্রন্থে অনুপস্থিত। কারণ, রচয়িত্রীর জীবনের নানা স্খলন-

পতনের কাহিনী গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এইজন্য গ্রন্থটিকে 'গোপনীয়' বা 'Confidential' বলে অভিহিত করা হয়েছে। গ্রন্থের প্রতিটি পাতাতেই গোপনীয় ও Confidential কথাটি মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থটি সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশিত হয়নি। মুষ্টিমেয় কিছু সমাজ পতিকে গ্রন্থটি প্রেরণ করার জন্যই প্রকাশিত হয়েছিল, উদ্দেশ্য তৎকালীন ব্রাহ্মণ কুলীনদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা।

লেখিকা ভূমিকায় বলেছেন তিনি যৎসামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন তাই গ্রন্থ রচনাকালে তাঁকে নিরতিশয় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা এবং রচনাভঙ্গী তা প্রমাণ করে না। সম্ভবত, প্রকাশক কর্তৃক লেখিকার রচনার সংস্কার সাধন হয়ে থাকবে।

'সমাজ-বিভ্রাট' এক কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যার আত্মজীবনী। কন্যাটির মাত্র সাত বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। বিবাহের পর দীর্ঘকাল তাঁকে পিত্রালয়েই অবস্থান করতে হয়েছিল। কিন্তু এরপর শ্বশুরালয়ে গিয়ে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তাতে তাঁর পক্ষে সেখানে অবস্থান করা সম্ভব হয়নি। স্বামীটি ছিলেন অসচ্চরিত্রের। নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর সম্মুখেই তিনি দিনের পর দিন তারই আত্মীয়া এক বয়স্কা রমণীর সঙ্গে সহবাস করতেন। রুচি তার এমনই ছিল যে পরিচারিকার সঙ্গে স্বামী স্ত্রী রূপে বসবাস করতেও তার বাধেনি। এদিকে পিত্রালয়েও কন্যাটির জীবন নিরুপদ্রব ছিল না। পাড়ার শিক্ষিত অশিক্ষিত, আত্মীয় অনাত্মীয় নির্বিশেষে অনেকেই লেখিকার সতীত্ব নাশে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে লেখিকাও অনেকেরই অঙ্কশায়িনী হয়েছেন। অকপটে নিজের এবং স্বামীর কৃত কর্মের বিস্তারিত বিবরণ গ্রন্থে প্রদান করেছেন। এতে লেখিকার সাহসিকতার প্রমাণ পরিস্ফুট। তৎকালীন সমাজজীবন যে কি পরিমাণে কলুষিত হয়ে পড়েছিল, নীতিভ্রষ্টতা সামাজিক জীবনকে পঙ্কিল করে তুলেছিল, চরিত্রহীনতা শিক্ষিত জনকেও নীচতার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল, কৌলীন্য প্রথার বিষময় পরিণাম, অসহায় মানুষের সাহায্যকারীকেও কিভাবে সমাজের কাছে চরম দণ্ডলাভ করতে হত তার পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনার ধারায় গ্রন্থটির তাই উল্লেখযোগ্য স্থান সুনিশ্চিত। সমাজকে কলুষতামুক্ত করার মহান অভিপ্রায়েই যে প্রকাশক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন, গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবিষ্ট 'নিবেদন' অংশটিই তার প্রমাণ।

প্রিয়নাথ সিংহ রচিত '**কৃষ্ণ-পান্তি**'র প্রকাশকাল ১৩১৮। 'কৃষ্ণ-পান্তি' একটি জীবনী গ্রন্থ। রাণাঘাটের সহস্ররাম পালের জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণ পালের জন্ম হয় ১১৫৫ সালে। সহস্ররাম যেহেতু পানের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করত, তাই তাকে পান্তি নামে অভিহিত করা হ'ত। সেই সূত্রে কৃষ্ণও পরিচিত হয় কৃষ্ণ পান্তি নামে।

চরম দারিদ্র্যের শিকার হয়েও নিজের বুদ্ধিমত্তা, সততা শ্রমশীলতা

আত্মমর্যাদাবোধ এবং বিচক্ষণতায় নিরক্ষর কৃষ্ণ পান্তি ব্যবসা করে প্রভূত ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হয়। কিন্তু এতদ্ সত্ত্বেও তার মধ্যে কখনও ধনের গর্ব দেখা যায়নি। তার ধর্মভীরুতা সত্যনিষ্ঠা সারল্য সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনের প্রতি আগ্রহ এবং সর্বোপরি দুঃখ-কাতর মানুষের জন্য বেদনাবোধ এবং তাদের সহায়তায় অগ্রসর হওয়া—তার জীবনকে স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত করে তুলেছিল। লেখক কৃষ্ণ পান্তির জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনা তাঁর গ্রন্থে বিধৃত করেছেন। গ্রন্থটি মোট দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। কৃষ্ণ পান্তির চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে একটি ঘটনা থেকে। সে কোর্টে হলফ নিতে অস্বীকার করেছিল। কারণ তার ভাষায়, 'আদালত মোর কতা পেত্যয় করল না, মোরে হলাফ করাবা, তবে মোর কথা মানবা। সে অপমানডার চেয়ে ট্যাকাডা যাওয়া ভাল লয় ?' (পঃ ১৪৯)।

কৃষ্ণ পান্তির জীবনেতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সমাজ জীবনের বাস্তব পরিচয় বর্ণিত হওয়ায় গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সেকালে জলদস্যুদের অত্যাচার, জমির নিলাম, গ্রামীণ মানুষদের ঐক্য, দেব-দ্বিজে মানুষের অকৃত্রিম ভক্তি, অতিথি পরায়নতা, বংশগত মর্যাদাবোধ, জনকল্যাণ-মূলক কাজে মানুষের আগ্রহ ইত্যাদির পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থে লভ্য।

প্রকৃতির বর্ণনাদানে লেখকের মুন্সীয়ানার পরিচয় প্রকাশিত, 'বর্ষাকাল, অল্পক্ষণ পূর্বেই মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশে এখনও খণ্ড খণ্ড অনেক মেঘ। দক্ষিণা বায়ু ও জুয়ারের টানে নৌকা তীরবেগে ছুটিতেছে। ক্রমে নগর ও উপনগর অতিক্রম করিয়া, দ্রুমরাজি ও দূর্বাদল শোভিত হরিদ্বর্ণ দুই কূলের মধ্যে দিয়া নৌকা চলিতেছে সন্ধ্যা আগতপ্রায়, অস্তমুখে দিনমণির পীত আলোক মেঘগাত্রে প্রতিফলিত। তাহাতে মেঘগুলি যেন জ্বলন্ত সুবর্ণ নির্মিত। আবার মেঘ হইতে প্রতিফলিত আভায় সমস্ত প্রকৃতি যেন কনকময়ী। যেন এইমাত্র সুবর্ণ বৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাতে বৃক্ষ, লতা, ঘর, বাড়ী, পশু, পক্ষী প্রভৃতি চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তু সুবর্ণ বৃষ্টিতে স্নাত হইয়া স্বর্ণ বর্ণে দৃপ্ত। পরেই শিখাহীন অগ্নির ন্যায় দিনমণির অর্ধদেহমাত্র দেখা যাইতেছে। মুহূর্তে পরেই তিনি একেবারেই অদৃশ্য হইলেন ; যেন অন্ধকারের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া লজ্জায় পৃথিবী প্রান্তে গিয়া চিতানলে ঝাঁপ দিলেন।' (পৃঃ ১৩২)

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৌলিক রচনা লেখকের সৃজনী ক্ষমতার পরিচয়বাহী, মূলতঃ রস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই সৃজনাত্মক রচনা রচিত হয়, এক্ষেত্রে নীতিশিক্ষা দানের ভূমিকা গৌণ। কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে অন্য ভাষায় রচিত গ্রন্থ থেকে লব্ধ আনন্দ ও শিক্ষা, সেই গ্রন্থ মূলে পাঠ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিকে দানের উদ্দেশ্যেই অনুবাদক অনুপ্রাণিত হন অনুবাদ কর্মে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই বৈষ্ণব-বৈরাগীদের মধ্যে প্রশ্নোত্তরমালার মাধ্যমে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্য করার যে রেওয়াজ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য ধর্মকে বাদ দিয়ে সে সময়ে শিক্ষাদানের কথা ভাবা সম্ভব ছিল না। এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা গদ্য যখন নিতান্ত সীমিত পরিসরে ব্যবহৃত হ'ত, তখনও যে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যানের প্রয়োজনে গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে, সাহিত্যের ইতিহাসকাররা তা দেখিয়েছেন। অবশ্য পরবর্তীকালে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অবিমিশ্র নীতি শিক্ষাদানের মধ্যেই আর অনুবাদ-কর্ম সীমাবদ্ধ থাকেনি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যা নিজের মাতৃভাষার অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে মূলে পড়া সম্ভব নয়, মূলতঃ সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেইসব গ্রন্থগুলির অনুবাদকর্মে ব্রতী হলেন। অনুবাদকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেমন সংস্কৃত গ্রন্থাদিকে আশ্রয় করেছিলেন, তেমনি অ-ভারতীয় বিদেশীয় ভাষায় রচিত কিছু কিছু গ্রন্থাদিও অনূদিত হতে দেখা গেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

অনুবাদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় বর্ধমানের মহারাজা মহাতাপ চাঁদের (১৮২০-৭৯) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৩০-৭০) প্রসঙ্গ। মহাতাপ চাঁদ বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের মূল এবং অনুবাদ প্রকাশে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি জনসাধারণের মধ্যে যাতে এইসব গ্রন্থ প্রচার লাভ করে সেজন্য তিনি বিনামূল্যে মূল ও অনূদিত গ্রন্থ বিতরণের ব্যবস্থা করতেন। কালীপ্রসন্ন মহাতাপ চাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রন্থানুবাদের ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছিলেন। ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ ও প্রচারে একই সঙ্গে পুণ্যার্জনের আকাঙ্ক্ষা এবং দেশবাসীকে শিক্ষাদানের মহতী ইচ্ছাকে কার্যকরী হতে দেখা গেছিল। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা গুটিকয়েক গ্রন্থের অনুবাদ বিষয়ে আলোকপাত করব, যার থেকে বোঝা যাবে মোটামুটি কি ধরণের গ্রন্থ অনুবাদে অনুবাদকদের ঝোঁক ছিল এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থ ও বিষয় নির্বাচনের সঙ্গে অনুবাদকদের অনুবাদ করার ক্ষমতা কি পরিমাণে সাফল্য অর্জন করেছিল।

সম্রাট হর্ষবর্ধন ব্যোপদেবের 'কথাসরিৎসাগরে'র দ্বাদশ তরঙ্গে বর্ণিত বিদ্যাধররাজ জীমূতবাহনের অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী অবলম্বনে 'নাগানন্দ' শীর্ষক যে পঞ্চাঙ্ক নাটকটি রচনা করেছিলেন, কালীপদ মুখোপাধ্যায় সেটির অনুবাদ করে প্রকাশ করেন ১৭৮৫ শকাব্দে। কালীপদ মুখোপাধ্যায় অনূদিত গ্রন্থটির নামও **'নাগানন্দ'**। কালীপ্রসন্ন সিংহের

অর্থেও অনুমত্যনুসারে গ্রন্থটি রচিত এবং শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গীকৃত। সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ হওয়া সত্ত্বেও লেখক ভাষাকে ইচ্ছাপূর্বক সংস্কৃতানুগ করেন নি। সন্ধি ও সমাসের বাহুল্য অনুপস্থিত। ভাষা বেশ সাবলীল। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধার করা গেল—'এই কথায় চতুরিকা আত্রেয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত সহাস্য আস্যে রহস্য করিয়া কহিল, অগো ব্রাহ্মণ ঠাকুর। যুবরাজ রাজকন্যাকে কেমন সুমধুর কথাটি বলিলেন; কিন্তু তুমি আমাকে রহস্য ছলেও কিছু বলিলে না, তবে আমি তোমাকে একটা কথা বলি। আত্রেয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সপরিতোষে কহিলেন, আঃ! আমাকে জীবন দান করিলে, কি বলিতে ইচ্ছা কর বল, তাহা হইলে বয়স্য আমাকে আর কদাকার বলিতে পারিবেন না; আমি তোমার আশায় এক প্রকার জীবন ধারণ করিয়া আছি। চতুরিকা আত্রেয়কে চক্ষু মুদ্রিত করিতে দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, আমি এই অবসরে তমাল পল্লবের রস লইয়া ইঁহার মুখে লেপন করিয়া দিই, তাহা হইলে মুখখানি উত্তম কালীবর্ণ হইবে। এই স্থির করিয়া তমাল পত্রের রস আনয়ন পূর্বক আত্রেয়ের মুখ মণ্ডলে লেপন করিয়াছিল।' (পৃঃ ৫২-৫৩)

জীমূতকেতুর পুত্র জীমূতবাহনের মিত্রাবসুর কন্যা মলয়বতীর সঙ্গে বিবাহ, শংখচূড়ের কারণে জীমূত বাহনের আত্মবলিদান, কাত্যায়নীর কৃপায় তার পুনর্জীবন লাভের ঘটনা যা নাগানন্দের অবলম্বিত বিষয়, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। কালীপদ মুখোপাধ্যায় সেই চিত্তাকর্ষক বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটকটিকে অনুবাদের জন্য নির্বাচন করে যে যথার্থই মার্জিত রুচি ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা অনস্বীকার্য।

কালীপদ মুখোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন **'উপাখ্যান মঞ্জরি'** গ্রন্থটিও, গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৭০। ইটালীয় লেখক বোকাচিও (Boccacio) রচিত সুবিখ্যাত 'Decamcron' এ বর্ণিত উপাখ্যান অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত।

পাম্পিনিয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী পাম্পিনিয়া ব্যতীত ফিয়ামিটা, ফিলোমিনা, এমিলা, লরেটা, নিফিলী এবং ইলাইজা এই সাতজন রমণী এবং পাম্ফিলো, ফিলাষ্ট্রেটো ও ডাইওনিও—এই তিনজন পুরুষের কথিত মোট দশটি আখ্যানের সংকলন 'উপাখ্যান মঞ্জরি'।

'ডেকামেরনে'র আক্ষরিক অনুবাদ নয় আলোচ্য গ্রন্থটি। লেখক নিজেও সেকথা স্বীকার করেছেন। যে সব স্থল বাংলা ভাষায় নিতান্ত অসংলগ্ন বোধ হয়েছে লেখক তা পরিত্যাগ করেছেন আবার স্থানে স্থানে নূতন নূতন ভাবও সন্নিবিষ্ট করেছেন। তবে চরিত্র কিংবা ঘটনাস্থল অন্য অনেক অনুবাদকের মত এদেশীয়তে রূপান্তরিত করার প্রয়াস করেন নি।

মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের পরিবারের শশিচন্দ্র দত্ত 'Tales of yore' (১৮৪৫) নামে একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। শশিচন্দ্র ছিলেন

ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম ইংরেজী গল্প লেখক। 'Tales of yore' এর অন্তর্গত গল্পগুলির উপাদানের সিংহভাগ লেখক সংগ্রহ করেছিলেন টডের 'রাজস্থান' থেকে। টডের 'রাজস্থান'কে এই প্রথম সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যবহার করা হল। সুদীর্ঘকাল পরে ১৮৭৭ সালের সেপ্টেম্বরে গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় **'উপন্যাস-মালা'** নামে। অনূদিত গ্রন্থে অনুবাদকের নাম উল্লিখিত হয়নি। অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে শশিচন্দ্রের গ্রন্থে ধৃত গল্পগুলি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি কর্তৃক অনূদিত হয়েছিল।

'উপন্যাস-মালা'য় ধৃত গল্পের সংখ্যা ২৪। গল্পগুলি হল যথাক্রমে রঙমহলের ধ্বংস, ইরানী বণিক, গড় বিত্‌লি, উমা ও ভবানী, কনোজ সুন্দরী, সংযোগতার স্বপ্ন, দিল্লীর দাস-রাজা, পরিণাম ফল, বিমাতার উপদ্রব, কোকোবাদের শেষদশা, ভগবানের সাজা, পদ্মিনী উপাখ্যান, জাবুয়া অধিকার, দেবল দেবী, রাজধানী পরিবর্তন, তৈমুরলঙ্গের দয়া, গণনা-সিদ্ধি, মেওয়ারের রাণা সঙ্গ, হুমায়ুনের পলায়ন, কি ভয়ানক চিঠি, নরোজা, অমর সিংহের দরওয়াজা, বাদশাহের হুকুম তামিল এবং মল্লার রায় হোলকার। উল্লেখযোগ্য যে কোনটিই স্বকপোলকল্পিত গল্প নয়। ভারত ইতিহাসের বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনাই গল্পগুলির উপজীব্য। রঙমহলের ধ্বংস, গড় বিত্‌লি, উমা ও ভবানী, সংযোগতার স্বপ্ন, পদ্মিনী উপাখ্যান, দেবল দেবী, মেওয়ারের রাণা সঙ্গ, অমর সিংহের দরওয়াজা প্রভৃতি যেমন রাজপুত কাহিনী অথবা চরিত্র অবলম্বনে রচিত, তেমনি মুঘল ইতিহাসের উপাদান নিয়েও বেশ কয়েকটি গল্প রচিত। এগুলির মধ্যে রয়েছে দিল্লীর দাস-রাজা, পরিণাম ফল, কোকোবাদের শেষদশা, ভগবানের সাজা, রাজধানী পরিবর্তন, হুমায়ুনের পলায়ন, নরোজা ইত্যাদি। আবার 'মল্লার রায় হোলকার' গল্পটি মারাঠা ইতিহাস নির্ভর। 'ইরানী বণিক' আসলে পারস্যরাজ তৃতীয় সাপুরের পুত্র বাইরামগোরের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। উপন্যাস-মালা'র কয়েকটি গল্পে ছোটগল্পের বীজ লক্ষিত হয়।

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় অনূদিত **'চূড়ালা উপাখ্যান'** যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণের নির্বাণ প্রকরণান্তর্গত। প্রকাশকাল ১২৮৪।
গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লেখক তাঁর গ্রন্থ রচনার কারণ সম্পর্কে জানিয়েছেন ঃ

'অধ্যাত্ম শাস্ত্র সকলের মধ্যে যোগাবশিষ্ঠকে জ্ঞানরত্নের এক আকর বলা যাইতে পারে। তন্মধ্যে সুধারস পরিপূরিত যে সকল নীতি ও জ্ঞানগর্ভ সুললিত উপাখ্যান সকল দৃষ্টান্তচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে, আমি সেই সুধার্ণব মন্থন দ্বারা তন্মধ্যে এই চূড়ালারূপ নারীরত্নকে প্রাপ্ত হইয়া সাধারণের মনোরঞ্জনার্থে জনসমাজে স্থাপিত করিলাম। কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সর্বলোকে এই জ্ঞানসিদ্ধা সাধবী সতী কামিনীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাহাতে ইঁহার সমগ্র গুণগ্রাহী হয়েন, এবং তত্ত্ববোধ বিহীন বিষয় ব্যাবৃত গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান লাভে প্রবৃত্তি জন্মে, এই চূড়ালা উপাখ্যান সার

সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার তাহাই তাৎপর্য।'

লেখক ছিলেন বাস্তববাদী তাই যোগাবশিষ্ঠ গ্রন্থে চুড়ালা উপাখ্যানের সঙ্গে নানাবিধ অলৌকিক বিষয় বর্ণিত হলেও একালের অনুপযোগী বিবেচনায় সে সব তিনি যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। এমনকি চুড়ালা উপাখ্যানের বাহুল্যরূপকেও তিনি সম্ভব মত বর্জন করেছেন।

শিখিধ্বজ নামীয় নরপতিকে চিরন্তন সত্য উপলব্ধি করানোর ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছিলেন তাঁর পত্নী চুড়ালা। শেষে শিখিধ্বজ নিজেই রাজ্য সংসার ত্যাগ করে বনবাসী হলেন, ধ্যানে মগ্ন হলেন, কৃচ্ছ্রসাধন করলেন। কিন্তু তবু পরম সত্যের উপলব্ধি তাঁর হল না। তখন চুড়ালা ছদ্মবেশে বন মধ্যে উপস্থিত হয়ে শিখিধ্বজকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করলেন। পরে দুজনেই রাজ্যে ফিরে এসে রাজকার্য করে যথাসময়ে মৃত্যুলোকে যাত্রা করলেন।

কাহিনীর মধ্যে যেমন অভিনবত্ব আছে, তেমনি তা শিক্ষণীয়ও। এই কারণেই লেখক বিশেষভাবে চুড়ালা উপাখ্যান রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। গ্রন্থটির কিছু অংশ গদ্য ও কিছু অংশ পদ্যে রচিত। চুড়ালার নিজরূপ ধারণ, সৈন্য আহরণ ও স্বরাজ্যে গমন এবং উপসংহার অংশ ত্রিপদী ও পয়ারে রচিত। অবশিষ্ট অংশ গদ্যে রচিত।

লেখক গদ্য ও ত্রিপদী রচনায় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। একশত দশ বৎসরেরও পূর্ববর্তীকালের গদ্যের নিদর্শন স্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত হল—

'চুড়ালা কহিলেন, প্রাণেশ্বর! যদি তোমার এইরূপ অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার ইচ্ছা এই যে, আমরা যখন সর্বপ্রকারে বিষয়ের আস্থা পরিত্যাগ দ্বারা নিত্য পরমানন্দ সুখে অবস্থিত হইয়াছি, তখন সম্প্রতি জীবন্মুক্তরূপে সর্বত্র সমান চিত্তের দ্বারা সমান রুচিযুক্ত হইয়া কিয়দ্দিন প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া রাজত্ব পালন দ্বারা কিছুকাল যাপন করিয়া পরে বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হইব।' (পৃঃ ৬৫)

এইবার লেখকের ত্রিপদী রচনার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। শিখিধ্বজের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন ঃ

শিখিধ্বজ রাজপুরী, দ্বিতীয় অমরাপুরী,
তুলনা তাহার কোথা আর।
সুসজ্জিত ঘর দ্বার, সুবর্ণে মণ্ডিত সার,
কি কহিব কত শোভা তার ॥
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে, স্বর্ণলতা মুক্তাফলে,
চিত্রীকৃত বিচিত্র সুন্দর।
অতি অপরূপ মূর্তি, নানারূপ প্রতিমূর্তি,
দেব দেবী ছবিও বিস্তর ॥
স্বর্ণে পুষ্প লতা কাটা, মুকুরেতে মতি আঁটা,
স্থানে স্থানে অতি শোভা পায়।
উপরে চাঁদনি শোভা, যিনি ইন্দ্র মনোলোভা,
শশী যেন নক্ষত্র সভায় ॥ (পৃঃ ৭০-৭১)

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একদিকে যেমন রামায়ণ মহাভারত কিংবা পুরাণের বাংলা অনুবাদের চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে এবং ধর্ম গ্রন্থাদির বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে কেউ কেউ এই ধরণের গ্রন্থাদি প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাপ চাঁদের নাম পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

১২৮৫ সালে প্রতাপচন্দ্র রায় কর্তৃক মহাভারতের বিরাট পর্বটি আদ্যন্ত আক্ষরিক অনূদিত হয়ে প্রকাশিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত হয়। গ্রন্থে অনুবাদকের নাম অনুল্লিখিত রয়েছে। বেদব্যাস প্রণীত মূল মহাভারতের বিরাট পর্বের গদ্যানুবাদ এটি। মোট দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ে সমাপ্ত। অনুবাদটি কি পরিমাণে মূলানুগত হয়েছে তার প্রমাণ স্বরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হল—

'অর্জুন কহিলেন, হে ধর্মরাজ। বিরাট ভবনে গমন পূর্বক "আমি ক্লীব" এই বলিয়া পরিচয় দিব। আমার বাহুদ্বয় সংলগ্ন জ্যাঘাতচিহ্ন গোপন করা দুষ্কর; কিন্তু উহা আমি বলয় দ্বারা আচ্ছন্ন করিব। আমি কর্ণদ্বয়ে সমুজ্জ্বল কুন্তল যুগল, করদ্বয়ে শঙ্খ ও মস্তকে বেণী ধারণ করত আমার নাম "বৃহন্নলা" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব। এই প্রকারে স্ত্রীবেশ ধারণ করত মৎস্যরাজ সদনে অবস্থিতি করিব এবং পুনঃ পুনঃ স্ত্রীজন সুলভ আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া, রাজার এবং অন্তঃপুর বাসিনী রমণীগণের মনোরঞ্জন করিব, আর মহারাজ বিরাটের অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণকে বিবিধ নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি শিক্ষা করাইব এবং প্রজাগণের আচার ব্যবহার কীর্তন করত স্বীয় মায়াবলে আত্মগোপন করিব।' (পৃঃ ৫-৬) কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদের সঙ্গে আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্থের গভীর সাদৃশ্য বর্তমান।

বৈকুণ্ঠনাথ বসু সংস্কৃত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। অনূদিত নাটকটি '**বসন্তসেনা**' নামে প্রকাশিত হয় ১৩০৬ বঙ্গাব্দে।

'বসন্তসেনা' রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। বৈকুণ্ঠবাবু মূল নাটকটির আক্ষরিক অনুবাদে প্রবৃত্ত হননি, তিনি মর্মানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। লেখকের কৃতিত্ব হল মর্মানুবাদে মূল গ্রন্থের মুখ্য ঘটনাবলীকে যেমন ত্যাগ করা হয়নি, তেমনি বিকৃত করাও হয়নি। বরং সাধ্যমত নাট্যকারকে মূলগ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষায় যত্নবান দেখা গেছে।

অভিনয়ের জন্য রচনা বলে 'বসন্তসেনা'র সংলাপ কথ্য ভাষাতে রচিত হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বৈকুণ্ঠনাথের অনুবাদ দক্ষতার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। নাটকের ১ম অঙ্কে চারুদত্ত দুঃখ করে বলেছেন—

সুখং হি দুঃখান্য নু ভূয় শোভতে ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনম্‌ সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং ধৃতঃ শরীরেণ মৃতঃ স জীবতি। বৈকুণ্ঠনাথ

অনুবাদ করেছেন এইভাবে—

দুঃখ পরে সুখ আগমন।
অন্ধকারে দীপ দরশন ॥
সুখ পরে দুঃখেতে পতন।
বেঁচে থাকা জীবন্ত মরণ ॥

মূল নাটকে শকারের উক্তিতে বলা হয়েছে—

বসন্ত শেণিত্র। বিলব বিলব পলহুদি অং বা পল্লবঅং বা শব্বং বা বশন্ত মাশং। মত্র অহিশাসি অন্তীং তুমংকে পলি ওইশলদি?

কিং ভীমশেনে জমদগ্নি পুত্তে কুন্তীশুদে বা দশকন্থলেবা। এসে হগে গেহ্নিয় কেশহস্তে। দুশ্শাশণ শ্শাণুকিদিং

এইবার বৈকুন্ঠনাথের অনুবাদ—ও তোর পল্লবকেই ডাকিস আর মাধবিকাকেই ডাকিস, আর তোর সমস্ত বসন্তকালকেই ডাকিস আমার হাত থেকে আর কিছুতেই তুই এড়াতে পারবি নি। জমদগ্নির বেটা ভীমসেনই আসুক আর কুন্তীর বেটা দশাননই আসুক, এই তোর চুলে ধরে দুঃশাসনের মত করি, কৈ কার সাধ্য এগুক দিকি দেখি!

স্পষ্টতঃই বোঝা যায় লেখক আনুপূর্বিক আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি, কিন্তু যেটুকু অনুবাদ করেছেন তা মূলানুগ। বলাবাহুল্য চতুর্থ অঙ্কে সমাপ্ত 'বসন্তসেনা' সংহত রূপ লাভ করেছে, নাটকীয়তা পূর্ণ মাত্রায় রক্ষিত হয়েছে।

সত্যবাদী ঘোষাল রচিত **'গোবিন্দ সামন্ত বা বঙ্গীয়-কৃষি জীবন'** গ্রন্থটি (১ম খণ্ড) আসলে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে রচিত ঐ একই নামের ইংরেজী (১৮৭৪) গ্রন্থের অনুবাদ। সত্যবাদী ঘোষাল রচিত গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১২৯০। অবশ্য সত্যবাদী রচিত গ্রন্থটিকে লালবিহারী দে'র গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ বলা যাবে না। অনুবাদক মূল গ্রন্থের অংশে বিশেষ পরিত্যাগ করেছেন. ক্ষেত্রবিশেষে আবার নূতন অংশও সংযোজিত হয়েছে। তবে মোটামুটিভাবে মূল গ্রন্থটিকে অনুসরণ করা হয়েছে।

'গোবিন্দ সামন্ত' গ্রন্থটির বিষয় বস্তু বঙ্গদেশের গ্রামীণ জীবন। কিন্তু গ্রন্থটি ইংরেজীতে রচিত বলে বঙ্গভাষা ভাষী অনেকেই এ হেন গ্রন্থের রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিলেন। এইজন্য অনুবাদক বঙ্গভাষাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে এমন একটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। লালবিহারী দে'র কাছে গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রার্থনা প্রসঙ্গে লেখক জানিয়ে ছিলেন ঃ

'It seems to me to be exceedingly interesting and in order to render it more interesting and valuable to the bulk of multitude it ought to be thrown in to the native languages. I have intended to translate it into Bengalee.'

গ্রন্থটি মোট আঠাশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। কোনো পরিচ্ছেদই তেমন দীর্ঘ

নয়। আদ্যন্ত গ্রন্থটি সাধু ভাষায় রচিত। ক্ষেত্রবিশেষে এই সাধুভাষা অনেকাংশে সংস্কৃতানুগ হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে তা সহজ, সরলরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতির বর্ণনায় লেখক অধিকাংশস্থলে গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন—

'.. দক্ষিণ দিক হইতে সুখস্পর্শ মলয়মারুত মৃদুমন্দহিল্লোলে প্রমোদিত-পুষ্পবন-সৌরভ-সম্ভার বহন করিয়া বসন্তলক্ষ্মীকে উপহার দিতেছে। অলিকুল মধুপানে লোলুপ হইয়া প্রস্ফুটিত নলিনী দলে, মল্লিকার কলিকায়, বকুল মুকুলে ও যূথিকাদলে গুঞ্জরণ করিতেছে।' (পৃঃ ৬১)

কিংবা

'ইতিমধ্যে মরীচিমালী রথাঙ্গ বামার শোক উচ্ছলিত করিয়া ও বিষাদে নলিনীমুখ মলিন করিয়া প্রথমে কণামাত্র, পরে কিয়দংশ, তৎপরেই অর্দ্ধভাগ ও অবশেষে সমুদায়শরীর অস্তাচল ভূধরের গুহা দেশে লুক্কায়িত করিলেন।' (পৃঃ ৭২)

অনলঙ্কৃত সাধুগদ্যের ব্যবহারও গ্রন্থমধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। যেমন—

'রামরূপ সরকারের আয় কি? প্রত্যেক বালকের বেতন চারি পয়সা। পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা অন্যূন ৩০। সুতরাং বালক দত্ত বেতনে সরকার মহাশয়ের মাসিক এক টাকা চৌদ্দ আনা আয়। যাহা হৌক খোঁড়া মশাইয়ের আরও কিছু প্রাপ্য আছে। বৈকালে পাঠশালায় আসিবার কালে বালকেরা কেহ একটী পান, কেহ একটী সুপারি ও কেহ একটু তামাক লইয়া আসে।' (পৃঃ ৫৯)

কথ্য-ভাষার ব্যবহারে লেখকের নৈপুণ্য সর্বাধিক চমৎকৃত করে। গ্রন্থমধ্যে কথোপকথন সূত্রেই কথ্য ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে। এই কথোপকথন হয়েছে গ্রামের চৌকিদারের সঙ্গে মানিক সামন্তের, দৈবজ্ঞের সঙ্গে বদনের, বদনের সঙ্গে অনঙ্গের, বদনের সঙ্গে গুরুমশায়ের, ঘটকের সঙ্গে বদনের, মাধবের সঙ্গে স্ত্রীলোকদের, গয়ারামের সঙ্গে তার পত্নী আদুরীর, বৃন্ধার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর, মাধবের সঙ্গে মালতীর।

লেখকের কথ্যভাষার ব্যবহার নৈপুণ্যের নিদর্শনস্বরূপ রূপার মার জবানীতে প্রকাশিত বক্তব্যের অংশবিশেষ উদ্ধার করা গেল—

'দুপুর রাত্তিরের পর ঘরের বাইরে মানুষের পায়ের শব্দোর মতন শব্দ শুনতে পেলাম। সেই শব্দ তারপর ঘরের ভিতর এল, আর যেদিকে দোয়াত ছিল সে দিকে গেল। তার একটু বাদে নেকবার সময় কলমের যেরকম শব্দ হয় তেমনি হতে নাগলো। তখনি আমি বুঝতে পাল্লাম বিদেতাপুরুষ খোকার কপালে নিকবেন। আর যখন ঐ রকম নেকার শব্দ হচ্ছিল তখন খোকাও একটু একটু হাসতে লাগলো। নেকাটেকা হয়ে গেলে বিদেতাপুরুষ যখন ফিরে যান, তকুন আমি গিয়ে হাত যোড় করে বল্লাম ঠাকুর ভাল নিকেচ ত? বিদেতাপুরুষ আমায় অনেকবার দেকেচেন আর যা নিকেচেন তাও বল্লেন। কিন্তু কাউকে বলতে মানা করে গিয়েচেন।' (পৃঃ ৩২)

লেখক ব্যবহৃত সাধু ভাষায় গাম্ভীর্য সৃষ্টিতে ভূমিকা নিয়েছে সমাসবদ্ধ ও সন্ধিযুক্ত পদের বহুল ব্যবহার। যেমন—

অন্ন্যুৎপাদন, গমনোপযোগী, বর্ণনোপযোগী, অনুমতানুসারে, নিষ্ঠুরান্তঃকরণে, প্রাতঃকালাবধি, হলাকর্ষণ, পুনর্জ্জীবিত, জলাশয়াভিমুখে, মস্তকাবরণ, শস্যক্ষেত্রাভিমুখে, বাঙ্‌নিষ্পত্তি, হর্ষোৎফুল্লচিত্তে, প্রাঙ্গনোপরি, ইত্যবসরে, শস্যোৎপাদন, শরীরাচ্ছাদন, রীতিনীত্যনুসারে, পত্রমুখাবলোকনে, পরামর্শানুসারে, পাঠশালাভিমুখে ইত্যাদি।

ক্ষেত্রবিশেষে লেখক অলঙ্কারের প্রয়োগ করেও ভাষার গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করেছেন। যেমন দ্বিরদ রদ নিন্দিত (পৃঃ ১৯), গজরাজ বিনিন্দিত (পৃঃ ১৩০) ইত্যাদি।

খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মহাকবি দণ্ড্যাচার্য প্রণীত 'দশকুমার চরিতে'র অনুবাদ '**দশকুমার চরিত**' নামে প্রকাশিত হয় ১৩০৮ বঙ্গাব্দে। অনূদিত গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন পঞ্চানন তর্করত্ন। মূলতঃ গ্রন্থটির অনুবাদ কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পাঁচজন। সম্পাদক বাদে এঁরা হলেন যথাক্রমে বীরেশনাথ কাব্যতীর্থ, কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ, গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এবং মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

সম্পাদক পঞ্চানন তর্করত্নই গ্রন্থটির সিংহভাগ অনুবাদ করার কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি দশকুমার-চরিতের সমগ্র পূর্ব পীঠিকা ও উত্তর পীঠিকা এবং মধ্যখণ্ডের অবশিষ্ট অংশেরও লেখক। বীরেশনাথ কাব্যতীর্থ রচনা করেছেন মধ্যখণ্ডের ১ম উচ্ছ্বাস; কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ রচনা করেছেন মধ্যখণ্ডের ২য়—৪র্থ উচ্ছ্বাস, গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য রচনা করেছেন মধ্যখণ্ডের ৫ম উচ্ছ্বাস এবং মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য রচনা করেছেন মধ্যখণ্ডের ৭ম উচ্ছ্বাস।
সম্পাদক ভূমিকায় জানিয়েছেন ঃ

'আমাদের এই দশকুমার-চরিত, মূল দশকুমার চরিতের অবিকল অনুবাদ নহে, ছায়ানুবাদ বলা যাইতে পারে। আসলে মূল ঘটনা বর্ণনায় অনবাদকেরা কোনো কার্পণ্য করেননি, কেবল দীর্ঘ উপমা এবং বিশেষণে ভারাক্রান্ত মূল কাহিনীর বর্ণনায় সংক্ষিপ্ততাকে আশ্রয় করেছেন।'

অনুবাদকদের সব থেকে বড় কৃতিত্ব হল দশকুমার চরিতের অনুবাদে নিজেরা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও সাধ্যমত সংস্কৃতানুগ ভাষা পরিহার করেছেন। সন্ধিযুক্ত পদ কিংবা দীর্ঘ সমাস বহুল পদে অথবা তৎসম শব্দের প্রয়োগে রচনাকে তাঁরা অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত করে তোলেননি।

বিশেষত সম্পাদক অনুবাদে সাধ্যমত কথ্য বাংলার ব্যবহারে রচনাকে প্রাঞ্জল ও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। পূর্ব-পীঠিকার ১ম উচ্ছ্বাস শুরু হয়েছে এই ভাবে—

'এক আছেন রাজা তাঁর 'দুয়ো' 'সুয়ো' দুই রাণী নহে,—একটী মাত্র 'সুয়ো' রাণী। রূপে গুণে, ভাবে স্বভাবে যেমন রাজা, তেমনই রাণী; যেন মণি কাঞ্চন যোগ।

হাতী-ঘোড়া, দাস-দাসী, ধন-দৌলত, বল-বিক্রম, সৈন্য-সামন্ত, মান-সম্ভ্রম রাজচক্রবর্তীর যেমন হতে হয়, সে রাজার সে সবই আছে। অথচ যেন কিছুই নাই।··· ভক্ত বৎসলের আরাধনা বিফল হয় না। রাণী কিয়দ্দিন মধ্যে গর্ভবতী হইলেন। 'দু-মাসে কাণাকাণি, তিন মাসে জানাজানি' হইল, রাজা-রাণী নিত্যই নূতন আশায় উৎফুল্ল ; সমগ্র রাজ্য আশার উৎসবে উৎসুক।'

১৮৫২ খ্রীস্টাব্দ থেকেই বাংলায় মৌলিক নাট্যরচনার সূত্রপাত, তার পূর্বে সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদের প্রাবল্য লক্ষিত হয়। যে সব সংস্কৃত নাটকের একাধিক অনুবাদ হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র এর রচয়িতা। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের এই নাটকটি রূপক জাতীয়। নাট্যকার নাটক রচনায় তাঁর অভিনব কল্পনাশক্তি এবং বিরল পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র অনুবাদকদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন (১৮৭১), ঈশ্বর গুপ্ত (বোধেন্দু বিকাশ, ১২৭০), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩০৮)।

ড. সুকুমার সেন বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুবাদে নাটকটির প্রাচীন ঠাট রক্ষিত হতে দেখেছেন। তাছাড়া শ্লোকগুলির অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগত বলেও ড. সেন মন্তব্য করেছেন। অবশ্য সংলাপের গদ্য অংশের অনুবাদে প্রাচীনত্বের সন্ধান পেয়েছেন তিনি। কিন্তু ড. সেন আদ্যানাথ শর্মা কৃত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়ে'র বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে কিছুই উল্লেখ করেননি। ড. সেন বলেছেন 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়ে'র অনুবাদগুলির দুই-একটি ছাড়া কোনটিই নাটক আকারে রচিত হয়নি। আদ্যানাথ শর্মা অনূদিত নাটকটি কিন্তু আদ্যন্ত নাট্যাকারেই রচিত।

গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন, 'পূর্বে দুই তিন জন কৃতবিদ্য পণ্ডিত এই নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারাও তাহাতে সম্পূর্ণ-রূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাই লেখক নাটকটির বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। লেখকের কৃতিত্ব তিনি মোটামুটি সহজ ও বোধগম্য ভাষায় নাটকটির অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেছেন। তাছাড়া অনুবাদ হয়েছে মূলানুগত। আদ্যানাথ শর্মা 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র অন্তর্গত শ্লোকগুলিকেও গদ্যে অনুবাদ করেছেন। যেমন—

বেশ্যাবেশ্মসু সীধু গন্ধিললনাবক্ত্রা সবামোদিতৈ
নীত্বা নির্ভর মন্মথোৎসবরসৈ রুন্নিদ্রচন্দ্রাঃ ক্ষপাঃ।
সর্বজ্ঞা ইতি দীক্ষিতা ইতি চিরাৎ প্রাপ্তাগ্নিহোত্রা ইতি
ব্রহ্মজ্ঞা ইতি তাপসা ইতি দিবা ধূর্তৈর্জগদ্‌বঞ্চ্যতে ॥

আমার শাসিত জনগণ এখন ধূর্ততা আশ্রয় করিয়া রজনীযোগে বেশ্যালয়ে মদ্যপানে মত্ত ও নিরন্তর বারাঙ্গনা সেবনে উন্মত্ত থাকিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া দিবাভাগে আমরা সর্বজ্ঞ, আমরা দীক্ষিত, আমরা চির অগ্নিহোত্রী, আমরা তপস্বী, আমরা ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়া জগৎকে বঞ্চিত ও প্রতারিত করিতেছে।

শব্দ-সূচী